ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০০৩ সফর - রবিউসসানী ১৪২৪ বৈশাখ - আষাঢ় ১৪১০

ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) বিশেষ সংখ্যা

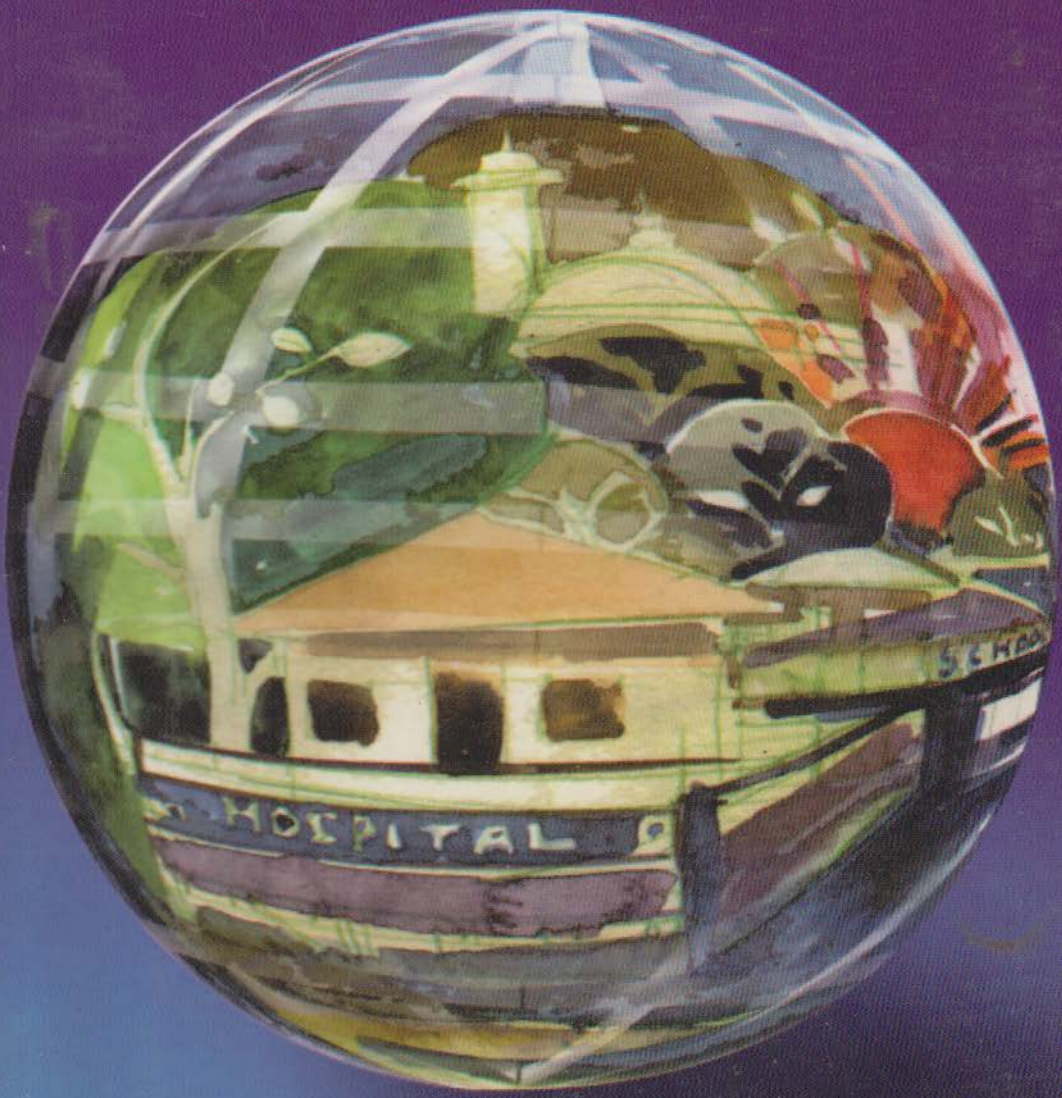

ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক
রেজিস্টার্ড নং ডিএ২০/৭৬

৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
[ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) বিশেষ সংখ্যা]
এপ্রিল - জুন ২০০৩
সফর - রবিউস্ সানি ১৪২৪
বৈশাখ - আষাঢ় ১৪১০

সম্পাদক
সৈয়দ আশরাফ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ নুরুল আমিন

সহযোগী সম্পাদক
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
মনজুরুল করীম চৌধুরী

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
[ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) বিশেষ সংখ্যা]
এপ্রিল - জুন ২০০৩
সফর - রবিউস্ সানি ১৪২৪
বৈশাখ - আষাঢ় ১৪১০

যোগাযোগ
মুহাম্মদ নুরুল আমিন
নির্বাহী সম্পাদক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯১

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহম্মদ মুনসুরউদ্‌দৌলাহ্ পাহ্‌লোয়ান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মদ আবু মুসা

মূল্য : ৪০.০০ টাকা

THE ISLAMIC FOUNDATION PATRIKA
[EID-E-MILADUNNABI (SM) SPECIAL ISSUE]
Quarterly Research Journal of the Islamic Foundation Bangladesh
Registered No. DA 20/76
APRIL - JUNE 2003
Editor
Syed Ashraf Ali
Executive Editor
Muhammad Nurul Amin
Associate Editor
A. M. M. Serajul Islam
Monjurul Karim Choudhury
Edited and Published by Syed Ashraf Ali, Director General
Islamic Foundation Bangladesh. Printed at Islamic Foundation Press
Agargaon, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Bangladesh.
Price : Tk. 40.00

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার নিয়মাবলী

লেখার নিয়ম

পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা টাইপ/কম্পিউটার কম্পোজ করা দুই কপি গবেষকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ নির্বাহী সম্পাদক-এর বরাবরে পাঠাতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে "এ্যাপল"-এ কম্পোজকৃত Floppy Disk সহ জমা দিতে হবে। অন্যত্র প্রকাশিত লেখা প্রেরণ না করার জন্য লেখক/গবেষকগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ থেকে তথ্যসূত্র লিখতে হবে এভাবে— ইমাম গাযালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২০-২২। পত্রিকা থেকে তথ্যসূত্র লিখতে হবে এভাবে— মোহাম্মদ আজরফ, আবুল হাশিম : জীবন ও চিন্তাধারা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা,* ৪২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২, ঢাকা, পৃ.৮-১৩।

কুরআনুল করীমের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'কুরআনুল করীম'-এর অনুবাদ অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র কুরআন করীমের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে।

রচনা মনোনীত হলেও তা প্রকাশের অগ্রিম প্রতিশ্রুতিপত্র দেয়া হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। জমা দেয়া লেখা কোন কারণে লেখক প্রত্যাহার করে নিতে চাইলে নির্বাহী সম্পাদক বরাবরে লিখিতভাবে জানাতে হবে। এক্ষেত্রেও পাণ্ডুলিপি ফেরতযোগ্য নয়। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মতামত ও তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট লেখকের।

প্রকাশিত রচনার ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলে—যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পত্রিকায় সাদরে প্রকাশ করা হবে।

পত্রিকার জন্য লেখা, বিনিময় পত্রিকা এবং গ্রন্থ সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি নির্বাহী সম্পাদক বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

জুলাই থেকে শুরু করে প্রতি তিন মাস অন্তর 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকাসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

একত্রে কমপক্ষে ৫ কপি নগদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৩০% হারে এজেন্সী কমিশন দেয়া হয়। এজেন্ট হওয়া বা এজেন্সী সুবিধা গ্রহণের জন্য কোনরূপ আবেদন পত্রের প্রয়োজন নাই। ৫ কপির কম ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকার অনুরূপ হারে কমিশন প্রযোজ্য হবে।

আগ্রহী ব্যবসায়ী ও হকারগণ সারা দেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যে কোন বিক্রয় কেন্দ্র থেকে উপরোক্ত সুবিধা নিতে পারেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
ড. খোন্দকার আবু নসর মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর / ৭

ইসলামের প্রথম আমেরিকান আবিষ্কারক
সৈয়দ আশরাফ আলী / ২৭

ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার
অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান / ৩৩

শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরিবারের ভূমিকা : ইসলামী চিন্তাধারা
মুহম্মদ শফিকুর রহমান / ৪৩

মুসলিম বিশ্বে শ্রমিক উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি এলাকা
ইসমাইল আর আল ফারুকী, অনুবাদ : এম রুহুল আমিন / ৫৯

আল-কুরআনে পার্থিব জগৎ ও জীবনের তাৎপর্য
আ খ ম ইউনুস / ৬৫

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহ্র অলিগণ : পরিচিতি ও মর্যাদা
ড. মুহাম্মদ মুজাম্মিল আলী ও ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম / ৭৭

ইমাম বুখারী (রহ) : জীবন ও কর্ম
আ. ম. কাজী মুহাম্মদ হারুন-উর রশীদ / ৮৯

অর্থব্যবস্থায় সুদের নেতিবাচক প্রভাব
মুহাম্মদ ছাইদুল হক / ১০৯

সুলতানী আমলে বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা
ড. মোঃ ওসমান গনী / ১৩১

শিক্ষার ইসলামীকরণে প্রজাতন্ত্রের দায়বদ্ধতা : বর্তমান প্রেক্ষাপট
মাহমুদ জামাল / ১৩৭

ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদ : পর্যালোচনা
মোঃ ইব্রাহীম খলিল ও মোঃ রেজাউল করিম / ১৬৫

তুলনামূলক ধর্ম : প্রকৃতি ও স্বরূপ
ড. মোঃ আবদুল হান্নান / ১৭৯

দিল্লীর মুসলিম সালতানাতের সাথে অমুসলিমদের সম্পর্ক : একটি পর্যালোচনা
মুহাম্মদ ইকবাল হোছাইন / ১৮৫

বিকাশমান বাঙালী মুসলিম সমাজের প্রথম শিল্প নিদর্শন :
নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'আনোয়ারা' উপন্যাস
শেখ রেজাউল করিম / ১৯৫

জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা
নাসির হেলাল / ২০৯

ইসলামে খেলাধুলা, শরীর চর্চা ও বিনোদন
আবদুল্লাহ্ আল-মারূফ ২২৩

আরবী পত্র-পত্রিকা : সৌদি আরব প্রসঙ্গ /
ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ / ২৩১

الأعجام : نشأته وتطوره
أحمد على / ২৪৫

গ্রন্থ সমালোচনা

মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো ?
আ. ফ. ম খালিদ হোসেন / ২৫৭

পাঠকের মতামত / ২৬১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল -জুন ২০০৩

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ড. খোন্দকার আবু নসর মুহম্মদ আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর*

আজকের বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ্‌র অন্যতম উৎসবের দিন হচ্ছে পবিত্র 'ঈদে মিলাদুন্নবী'। সারা বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান অত্যন্ত জাঁকজমক, ভক্তি ও মর্যাদার সাথে বছরের তৃতীয় মাস রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে এই 'ঈদে মিলাদুন্নবী' বা নবীর জন্মের ঈদ পালন করেন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই এই 'ঈদের' উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের সাথে পরিচিত নন। যে সকল ব্যক্তিত্ব এই উৎসব মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে প্রচলন করেছিলেন তাঁদের পরিচয়ও আমাদের অধিকাংশের অজানা রয়েছে। এই নিবন্ধে আমি উপরোক্ত বিষয়গুলো আলোচনার চেষ্টা করব।

১. ঈদে মিলাদুন্নবী পরিচিতি

ক. 'মিলাদ' শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

'মিলাদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ : জন্মসময়।[১] এই অর্থে 'মাওলিদ' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। মাওলিদ অর্থ জন্মদিন, জন্মস্থান, জন্ম উৎসব। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মস্থানকে মাওলিদুন্নবী বলে—যা এখানে বিদ্যমান। আল্লামা ইবনে মানযূর তাঁর সুপ্রসিদ্ধ আরবী অভিধান 'লিসানুল আরবে' লিখছেন—

ميلاد الرجل : اسم الوقت الذى ولد فيه

'লোকটির মিলাদ—যে সময়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে সময়ের নাম।'[২]

স্বভাবতই মুসলমানেরা 'মিলাদ' বা মিলাদুন্নবী' বলতে শুধমাত্র নবীজী (সা)-এর জন্মের সময়ের আলোচনা করা বা জন্ম কথা বলা বোঝান না। বরং তাঁরা 'মিলাদুন্নবী' বলতে নবীজীর (সা) জন্মের সময় বা জন্মদিনকে বিশেষ পদ্ধতিতে উদ্‌যাপন করাকেই বোঝান। আমরা এই আলোচনায় 'মিলাদ' বা 'ঈদে মিলাদুন্নবী' বলতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্ম উদযাপন বোঝাব। তাঁর জন্ম উপলক্ষে কোন আনন্দ প্রকাশ, তা তাঁর জন্মদিনেই হোক বা জন্ম উপলক্ষে অন্য কোন দিনেই হোক—যে কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর জন্ম দিবস পালন করাকে আমরা 'মিলাদ' বলে বুঝব। শুধুমাত্র তাঁর জীবনী পাঠ বা জীবনী আলোচনা, তাঁর বাণী তাঁর শরী'আত বা তাঁর হাদীস আলোচনা, তাঁর আকৃতি বা প্রকৃতি আলোচনা করা, তাঁর উপর একাকী বা সম্মিলিতভাবে দরুদ পাঠ করা বা সালাম পাঠ করা মূলত মুসলিম সমাজে মিলাদ বলে গণ্য নয়। জন্ম উদ্‌যাপন বা পালন বা জন্ম উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান করাও মিলাদ বা ঈদে মিলাদুন্নবী। আমরা এখানে মিলাদ উদ্‌যাপনের ঐতিহাসিক দিকগুলো আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

খ. 'মিলাদ' বা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মদিন

মিলাদ অনুষ্ঠান যেহেতু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন কেন্দ্রিক, তাই প্রথমেই আমরা তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব। স্বভাবতই আমরা যে কোন

* সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. ড. ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গীগণ, *আল-মুজাম আল ওয়াসীত* (বৈরুত, দারুল ফিকর)২/১০৫৬

২. ইবনে মনযূর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত, দারু সাদের)৩/৪৬৮

www.pathagar.com

ইসলামী আলোচনা পবিত্র কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসের আলোকে শুরু করি। পবিত্র কুরআনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 'মিলাদ' অর্থাৎ তাঁর জন্ম, জন্ম সময় বা জন্ম উদযাপন বা পালন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কুরআন করীমে পূর্ববর্তী কোন কোন নবীর জন্মের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে কোথাও কোনো ভাবে কোন দিন, তারিখ, মাস উল্লেখ করা হয় নি। অনুরূপভাবে 'মিলাদ' পালন করতে, অর্থাৎ কারো জন্ম উদযাপন করতে বা জন্ম উপলক্ষে আলোচনার মাজলিস করতে বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের কোন নির্দেশ, উৎসাহ বা প্রেরণা দেওয়া হয় নি। শুধুমাত্র আল্লাহর মহিমা বর্ণনা ও শিক্ষা গ্রহণের জন্যই এসকল ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যাদি আলোচনার মাধ্যমে এর আত্মিক প্রেরণার ধারাবাহিকতা ব্যাহত করা হয়নি। এজন্য আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মদিন সম্পর্কে আলোচনায় মূলত হাদীস শরীফ ও পরবর্তী যুগের মুসলিম ঐতিহাসিক ও আলিমগণের মতামতের উপর নির্ভর করব :

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন

হাদীস বলতে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা তাঁর সম্পর্কে কোন বর্ণনা বুঝি। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহাবীগণের কথা, কর্ম, বা অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়ে থাকে।[৩] হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস ও তাঁর সাহাবাগণের মতামত সনদ বা বর্ণনাসূত্র সহ সংকলিত হয়। তন্মধ্যে 'সিহাহ সিত্তাহ' নামে প্রসিদ্ধ ৬ টি অতি প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মবার, জন্মদিন ও জন্ম তারিখ সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ :

১. জন্মবার

মহানবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মবার সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে—

عن أبى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ سُئِلَ عَنَّ صَوْمِ الاِثْنَيْنِ فَقَالَ : "ذٰلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهِ"

হযরত আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সোমবার দিন রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন : 'এই দিনে (সোমবারে) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবূয়ত পেয়েছি।[৪] ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন—

عَنْ أبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "وُلِدَ النَّبِى ﷺ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَتُوُفِّىْ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الاَسْوَدَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ"

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবূয়ত লাভ করেন, সোমবারে ইন্তিকাল করেন, সোমবারে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ানা করেন, সোমবারে মদীনা পৌঁছান এবং সোমবারেই হজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেন।'[৫]

এভাবে আমরা হাদীস শরীফ থেকে রাসূলে আকরাম (সা)-এর জন্মবার সম্পর্কে জানতে পারি। সহীহ হাদীসের আলোকে প্রায় সকল ঐতিহাসিক একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া

---

৩. আবদুল হাই লাখনাবী, *যাফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী* (সংযুক্ত আরব আমিরাত, দুবাই, দারুল ইলম, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃ. ৩১-৩৪

৪. সহীহ মুসলিম (মিশর, কাইরো, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তারিখবিহীন) ২২/৮১৯

৫. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ (মিসর, দারুল মা'আরিফ, ১৯৫০)৪/১৭২-১৭৩, নং ২৫০৬ (সম্পাদক, আহমদ শাকির সনদ আলোচনা করে বলেছেন : হাদীসটির সনদ সহীহ)

www.pathagar.com

সাল্লাম সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ শুক্রবারের কথা বলেছেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তা সহীহ্ হাদীসের বর্ণনার পরিপন্থি। কোন কোন তাবে তাবেয়ী এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশে বিরত থাকতেন। তারা বলতেন রাসূলে আকরাম (সা)-এর জন্মবার সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় নি। সম্ভবত এ বিষয়ের হাদীসটি বা রাসূলে মুসতাফা (সা)-এর জন্ম তারিখ বিষয়ক কোন কিছু তাঁদের জানা ছিল না বলেই এই বিষয়ে মত প্রকাশে বিরত থেকেছেন।[৬]

২. জন্ম বছর

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্ম বছর বা জন্মের সাল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে—

عَنِ الْمطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ جَدَّهَ قَالَ وُلِدْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفِيْلِ، وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ أَخَا بَنِى يَعْمَرَبْنِ لَيْثٍ أأَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكْبَرَ مِنِّى وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِى الْمِيْلاَدِ وُلِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفِيْلِ، رَوَاه التِرمِزى وَقَالَ : هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ".

হযরত কায়স ইবনে মাখরামা (রা) বলেন; আমি ও রাসূলুল্লাহ (সা) দু'জনেই 'হাতীর বছরে' জন্মগ্রহণ করেছি। হযরত উসমান বিন আফফান (রা) কুবাস বিন আশইয়ামকে প্রশ্ন করেন, আপনি বড় না রাসূলুল্লাহ (সা) বড় ? তিনি উত্তরে বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমার থেকে বড়, আর আমি তাঁর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) 'হাতীর বছরে' জন্মগ্রহণ করেন।[৭] হাতীর বছর অর্থাৎ যে বৎসর আবরাহা হাতী নিয়ে কা'বাঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা আক্রমণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ ছিল।[৮]

৩. জন্মমাস ও জন্ম তারিখ

এভাবে আমরা হাদীস শরীফের আলোকে রাসূলে আকরাম (সা)-এর জন্মবার সম্পর্কে জানতে পারি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কোন হাদীসে তাঁর জন্ম মাস ও জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এ কারণেই সম্ভবত পরবর্তী যুগের আলিম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন : আলিম ও ঐতিহাসিকদের মতামত

জন্মবার এবং জন্ম বছর সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া গেলেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্ম তারিখ সম্পর্কে যেহেতু হাদীসে রাসূলে কোন বর্ণনা আসে নি এবং সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না, তাই মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মতপোষণ করেছেন। ইবনে হিশাম, ইবনে সা'দ, ইবনে কাসীর, কাসতালানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক এবং সীরাতুন্নবী লিখকগণ এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেছেন—

১. কারো মতে তাঁর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায় নি, এবং তা জানা সম্ভব নয়। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু জানা যায়, জন্ম মাস বা তারিখ জানা যায় না। এ বিষয়ে কোন আলোচনা তারা অবান্তর মনে করেন।

---

৬. ইবনে রাজাব, *লাতায়িফুল মা'আরেফ* (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা আল বায, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি. ১৯৯৭ খৃ.) ১/১৪৭

৭ তিরমিযী, আল-জামি, প্রাগুক্ত ৫/৫৫০, নং ৩৬১৯। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব।

৮. আকরাম যিয়া আর-উমারী, *আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ আস-সহীহা* (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৩)১/৯৬-৯৮, মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুননাবাবীয়াহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, বাদশাহ ফয়সল কেন্দ্র, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২), পৃ. ১০৯-১১০

www.pathagar.com

২. কারো কারো মতে তিনি মহররম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

৩. অন্য মতে তিনি সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

৪. কারো মতে তিনি রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক ও মাগাযী প্রণেতা মুহাদ্দিস আবু মা'শার নাজীহ ইবন আবদুর রাহমান আস্-সিনদী (১৭০ হি.) এই মতটি গ্রহণ করেছেন।

৫. অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ। আল্লামা কাসতালানী ও যারকানীর বর্ণনায় এই মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন। এই মতটি দুইজন সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস ও জুবাইর ইবন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাতুন্নবী বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (১২৫ হি.) তাঁর উস্তাদ প্রথম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও নসববিদ ঐতিহাসিক তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতঈম (১০০ হি.) থেকে এই মতটি বর্ণনা করেছেন। কাসতালানী বলেন : 'মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর আরবদের বংশ পরিচিতি ও আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ সম্পর্কিত এই মতটি তিনি তাঁর পিতা সাহাবী হযরত জুবাইর ইবন মুতঈম থেকে গ্রহণ করেছেন। স্পেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ আলী ইবনে আহমদ ইবনে হাযম (৪৫৬ হি.) ও মুহাম্মাদ ইবনে ফাতুহ আল-হুমাইদী (৪৮৮ হি.) এই মতটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। স্পেনের মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসূফ ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে আবদুল বার (৪৬৩ হি.) উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিকগণ এই মতটিই সঠিক বলে মনে করেন। মীলাদের উপর প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনে দেহিয়া (৬৩৩ হি.) ঈদে মিলাদুন্নবীর উপর লিখিত '*আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশির আন নাযীর*' গ্রন্থে এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন।

৬. অন্য মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ ১০ রবিউল আউয়াল। এই মতটি হযরত ইমাম হুসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ ইবন আলী আল বাকের (১১৪ হি.) থেকে বর্ণিত। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আমির ইবন শারাহিল আশ্ শাবী (১০৪ হি.) থেকেও এই মতটি বর্ণিত। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবন উমর আল-ওয়াকেদী (২০৭ হি:) এই মত গ্রহণ করেছেন। ইবনে সা'দ তাঁর বিখ্যাত '*আত-তাবাকাতুল কুবরা*'য় শুধু দুইটি মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ।[৯]

৭. কারো মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালামের জন্ম তারিখ ১২ রবিউল আউয়াল। এই মতটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (১৫১ হি:) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন : 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতীর বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন।'[১০] এখানে লক্ষণীয় যে, ইবনে ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথ্য সাধারণত সনদসহ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই তথ্যটির জন্য কোন সনদ উল্লেখ করেন নি। কোথা থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানান নি বা সনদসহ প্রথম শতাব্দীর কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা করেন নি। এ জন্য অনেক গবেষক এই মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[১১] তা সত্ত্বেও পরবর্তী যুগে এই মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইবনে কাসীর উল্লেখ করেছেন যে, ২ জন সাহাবী হযরত জাবির ও হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই মতটি বর্ণিত।

৮. অন্য মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ ১৭ রবিউল আউয়াল।

---

৯. ইবনে সা'দ, *আত্-তাবাকাতুল কুবরা* (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী) ১/৪৭

১০. ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ* (মিশর, কায়রো, দারুর রাইয়ান, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮) ১/১৮৩

১১. মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, *আস্-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ*, পৃ. ১০৯

www.pathagar.com

৯. অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ২২ রবিউল আউয়াল।

১০. অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

১১. অন্য মতে তিনি রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

১২. অন্য মতে তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। ৩য় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যুবাইর ইবনে বাক্কার (২৫৬ হি.) থেকে এই মতটি বর্ণিত। তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বসম্মতভাবে রমযান মাসে নবূয়ত পেয়েছেন। তিনি ৪০ বছর পূর্তিতে নবূয়ত পেয়েছেন। তা হলে তাঁর জন্ম অবশ্যই রমযানে হবে। এছাড়া বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হজ্জের পবিত্র দিনগুলিতে মাতৃগর্ভে আসেন। সেক্ষেত্রেও তাঁর জন্ম রমযানেই হওয়া উচিত। এ মতের সপক্ষে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর থেকে একটি বর্ণনা আছে, কিন্তু বর্ণনাটি সহীহ নয় বলে আল্লামা কাসতালানী উল্লেখ করেছেন।[১২]

২. ঈদে মিলাদুন্নবী বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিবস পালন বা উদযাপন

ক. পূর্বকথা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা রাসূলে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মবার, জন্মমাস ও জন্ম তারিখ সম্পর্কে হাদীস ও ঐতিহাসিকদের মতামত জানতে পেরেছি। তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে ইসলামের প্রথম যুগগুলোর আলিম ও ঐতিহাসিকদের মতামতের বিভিন্নতা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি যে, প্রথম যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন বা উদযাপন করার প্রচলন ছিলনা। কারণ, প্রচলন থাকলে এ ধরনের মতবিরোধের কোন সুযোগ থাকত না। মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও ঐতিহাসিকদের গবেষণা আমাদের এই অনুমানকে সত্য প্রমাণিত করছে।

আমরা জানি যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন বা রবিউল আউয়াল মাসে 'ঈদে মিলাদুন্নবী' পালনে বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে আলিম সমাজে অনেক মতবিরোধ হয়েছে, তবে মিলাদুন্নবী উদযাপনের পক্ষের ও বিপক্ষের সকল আলিম ও গবেষক একমত যে, ইসলামের প্রথম শতাব্দিগুলোতে 'ঈদে মিলাদুন্নবী' বা রাসূলে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন করা বা উদযাপন করার কোন প্রচলন ছিল না। নবম হিজরী শতকের অন্যতম আলিম ও ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে হাজর আল-আসকালানী (মৃত্যু. ৮৫২ হি. ১৪৪৯ খ্রি.) লিখেছেন : 'ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন যুগের সালফে সালেহীনের কোন একজনও 'মিলাদ' বা মাওলিদ পালন করেন নি।'[১৩]

নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল খাইর মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান আস-সাখাবী (মৃত্যু. ৯০২ হি. ১৪৯৭ খ্রি.) লিখেছেন : 'ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন যুগের সালফে সালেহীনদের (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের) কোন একজন থেকেও মাওলিদ পালনের কোন ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না। মাওলিদ পালন বা উদযাপনে পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত হয়েছে। এরপর থেকে সকল দেশের ও বড় বড় শহরের মুসলিমগণ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মমাস পালন করে আসছেন। এ উপলক্ষ্যে তারা অত্যন্ত সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ

---

১২. ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা* ১/১০০-১০১, ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (বেরুত, দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬) ২/২১৫, আল-কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মদ, *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা* (বেরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) ১/৭৪-৭৫, আল-যারকানী, *শরহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়্যা* (বেরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬)১/২৪৫-২৪৮, ইবনে রাজাব, *লাতায়েফুল মা'আরিফ*, প্রাগুক্ত ১/১৫০

১৩. আস-সালেহী, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ, আস-সীরাতুশ শামিয়্যাহ* (বেরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩) ১/৩৬৬

www.pathagar.com

উৎসবময় খানাপিনার মাহফিলের আয়োজন করেন, এ মাসের রাত্রে তাঁরা বিভিন্ন রকমের দান-সদকা করেন, আনন্দ প্রকাশ করেন এবং জনকল্যাণমূলক কর্ম বেশী করে করেন। এ সময়ে তাঁরা তাঁর জীবনী পাঠ করতে মনোনিবেশ করেন।[১৪]

লাহোরের প্রখ্যাত আলিম সাইয়েদ দিলদার আলী (১৯৩৫ খ্রি.) মীলাদের সপক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন : 'মীলাদের কোন আসল বা সূত্র প্রথম তিন যুগের (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ) কোন সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয় নি বরং তাঁদের যুগের পরে এর উদ্ভাবন ঘটেছে।'[১৫]

আলেমদের এই ঐক্যমতের কারণ হলো, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সংকলিত অর্ধশতাধিক সনদভিত্তিক হাদীসের গ্রন্থ, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম, আচার-আচরণ, কথা, অনুমোদন, আকৃতি, প্রকৃতি, ইত্যাদি সংকলিত রয়েছে, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীদের মতামত ও কর্ম সংকলিত হয়েছে সে সকল গ্রন্থের একটিও সহীহ বা যঈফ হাদীসে দেখা যায় না যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বা তাঁর ইন্তেকালের পরে কোন সাহাবা সামাজিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্ম উদযাপন, জন্ম আলোচনা বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট কোন দিনে বা অনির্দিষ্টভাবে বছরের কোন সময়ে কোন অনুষ্ঠান করেছেন।

রাসূলে মুসতাফা (সা)-ই ছিলেন তাঁদের সকল আলোচনা, সকল চিন্তা চেতনার প্রাণ, সকল কর্মকাণ্ডের মূল। তাঁরা রাহমাতুল্লিল আলামীনের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের) জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করে তাঁর [নবী] প্রেমে চোখের পানিতে বুক ভিজিয়েছেন। তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি, পোশাক আশাকের কথা আলোচনা করেছেন। কিন্তু তারা কখনো তাঁর জন্মদিন পালন করেননি। এমনকি তাঁর জন্ম মুহূর্তের ঘটনাবলী আলোচনার জন্যও তাঁরা কখনো বসেন নি বা কোন দান-সাদকা, তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমেও কখনো তাঁর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করেন নি। তাঁদের পরে তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের অবস্থাও তাই ছিল।

বস্তুত কারো জন্ম বা মৃত্যুদিন পালন করার বিষয়টি আরবের মানুষের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। জন্মদিন পালন 'আ'জামী' বা অনারবীয় সংস্কৃতির অংশ। প্রথম যুগের মুসলিমগণ তা জানতেন না। পারস্যের মাজূস (অগ্নিউপাসক) ও বাইযান্টাইন খ্রিস্টানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল জন্মদিন, মৃত্যুদিন ইত্যাদি পালন করা। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া মাইনরের যে সকল মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসেন তাঁরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাহাবীদের অনুসরণ অনুকরণ করতেন এবং তাঁদের জীবনাচারণে আরবীয় রীতিনীতিরই প্রাধান্য ছিল। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে অনারব পারসিয়ান ও তুর্কী মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলন ঘটে, তন্মধ্যে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী অন্যতম।

খ. ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন : প্রথম প্রবর্তন

আমরা জানতে পারলাম প্রথম যুগগুলোর পরে মিলাদ অনুষ্ঠান বা ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন শুরু হয়েছে। কিন্তু কবে থেকে ? কে শুরু করলেন? আসুন আমরা তাদের সাথে পরিচিত হই এবং কিভাবে তাঁরা এই অনুষ্ঠান পালন করতেন তা জানার চেষ্টা করি।

ইতিহাসের আলোকে যতটুকু জানা যায়, দুই ঈদের বাইরে কোন দিবসকে সামাজিকভাবে

১৪. আস-সালেহী, *সীরাত* ১/৩৬২

১৫. সাইয়েদ দিলদার আলী, *রাসূলুল কালাম ফিল মাওলিদ ওয়াল কিরাম* (লাহোর), পৃ. ১৫

www.pathagar.com

উদযাপন শুরু হয় হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শিয়াদের উদ্যোগে। সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীতে (৯৬৩ খ্রি.) বাগদাদের আব্বাসী খলীফার প্রধান প্রশাসক ও রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক বনী বুয়াইহির শিয়া শাসক মুইজ্জুদ্দৌলা ১০ই মহর্‌রম আশুরাকে শোক দিবস ও যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ 'গাদীর খুম' দিবস উৎসব দিবস হিসাবে পালন করার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে এই দুই দিবস সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। যদিও শুধুমাত্র শিয়ারাই এই দুই দিবস পালনে অংশগ্রহণ করেন, তবুও কালক্রমে তা সামাজিক রূপ গ্রহণ করে। কারণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রথম বছরে এই উদযাপনে বাধা দিতে পারেননি। পরবর্তী যুগে যতদিন শিয়াদের প্রতিপত্তি ছিল এই দুই দিন উদযাপন করা হয়, যদিও তা মাঝে মাঝে শিয়া-সুন্নী ভয়ঙ্কর সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১৬]

ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করার ক্ষেত্রেও শিয়াগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উবাইদ বংশের রাফেযী ইসমাঈলী শিয়াগণ[১৭] ফাতেমী বংশের নামে আফ্রিকার উত্তরাংশে রাজত্ব স্থাপন করেন। ৩৫৮ হিজরীতে (৯৬৯ খ্রি.) তারা মিশর দখল করে তাকে ফাতেমী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন এবং পরবর্তী ২ শতাব্দীরও অধিককাল মিশরে তাদের শাসন ও কর্তৃত্ব বজায় থাকে। গাজী সালাহুদ্দীন আইউবীর মিশরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের মাধ্যমে ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭২ খ্রি.) মিশরের ফাতেমী শিয়া রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে।[১৮] এই দুই শতাব্দীর শাসনকালে মিশরের ইসমাঈলী শিয়া শাসকগণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দুই ঈদ ছাড়াও আরো বিভিন্ন দিন পালন করতেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল জন্মদিন। তাঁরা অত্যন্ত আনন্দ, উৎসব ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫টি জন্মদিন পালন করতেন : ১. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন, ২. হযরত আলী (রা)-এর জন্মদিন, ৩. হযরত ফাতেমা (রা)-এর জন্মদিন, ৪. হযরত হাসানের জন্মদিন ও ৫. হযরত হুসাইনের (রা) জন্মদিন। এ ছাড়াও তারা তাদের জীবিত খলীফার জন্মদিন পালন করতেন এবং 'মিলাদ' নামে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মদিন (বড়দিন বা ক্রীসমাস), যা মিশরের খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা আনন্দ প্রকাশ, মিষ্টি ও উপহার বিতরণের মধ্য দিয়ে উদযাপন করতেন।[১৯]

গ. ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন : যুগ ও প্রবর্তক পরিচিতি

হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মিশরে এই উদযাপন শুরু হয়। ঐতিহাসিকগণ এ যুগকে আব্বাসীয় খেলাফতের দুর্বলতার যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম অধ্যায় শেষ হয় ২৩২ হি. (৮৪৭ খ্রি.) ৯ম আব্বাসী খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এরপর সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবনতির সূচনা হয়। কারণ কেন্দ্রীয় প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশাল সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। এ সকল রাষ্ট্রের মধ্যে অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন এলাকায় সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তরা লুটতরাজ চালানোর সুযোগ পায়। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যাহত হয়। বিশেষ করে ৩৩৪ হি. (৯৪৫ খ্রি.) থেকে বাগদাদে শীয়া মতাবলম্বী বনূ বুয়াইহ শাসকগণ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যান, ফলে ইসলামী জ্ঞানচর্চা, হাদীস ও সুন্নাতের অনুসরণে-এর প্রভাব পড়ে। রাফেযী শিয়া মতবাদের প্রসার ঘটতে থাকে। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী জনগণ শিয়াদের বাড়াবাড়িতে

---

১৬. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত ৭/৬৪২,৬৫৩, ৮/৩,৯, ১১,১৫, ১৬, ১৭,..

১৭. আগাখানী, বুহরা, বাতেনী শিয়াদের পূর্বপুরুষ।

১৮. বিস্তারিত দেখুন; মাহমুদ শাকির, *আত-তারিখুল ইসলামী* (বৈরূত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫ ইং) ৬/১১১-১১২, ১২৩-১২৪, ১৩৬-১৩৭, ১৬৫-১৬৮, ১৮০-১৮২, ১৯৩-১৯৬, ২০৮-২০৯, ২৩৩, ২৪৮, ২৬৫, ২৮৭-২৮৯, ৩০৩-৩০৭।

১৯. আল-মাকরীযী, আহমদ বিন আলী, *আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার যিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার* (মিশর, কায়রো, মাকতাবাতুস সাকাফা আদ দীনীয়্যাহ), পৃ. ৪৯০-৪৯৫

www.pathagar.com

অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিবাদ করলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিয়া-সুন্নী সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করত। এ সকল সংঘর্ষ মূলত দেশের সার্বিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটাত। অভ্যন্তরীণ অশান্তি ও অনৈক্য বহির্শত্রুর আগ্রাসনের কারণ হয়। এশিয়া মাইনর, আর্মেনীয়া, ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন খ্রিস্টান শাসক সুযোগমত ইসলামী সম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আগ্রাসন চালাতে থাকেন। এছাড়া ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার ও উস্কানীমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে জ্ঞানচর্চা, ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকাশ ব্যহত হয়। অপরদিকে সমাজের মানুষের মধ্যে বিলাসিতা ও পাপাচারের প্রসার ঘটতে থাকে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইসলাম বিরোধী আচার আচরণ, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিকৃতি ছড়িয়ে পড়ে।[২০]

এই যুগের ইসলামী সম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন একটি বিশেষ অংশ ও ইসলামী সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র মিশরে ফাতেমী খলীফা আল-মুইজ্জু লি-দীনিল্লাহ সর্বপ্রথম ঈদে মিলাদুন্নবী অন্যান্য জন্মদিন পালন ও সে উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের সূচনা করেন। তাঁর উর্দ্ধতন পিতামহ উবাইদুল্লাহ সর্বপ্রথম মরক্কোয় নিজেকে হযরত জাফর সাদিকের প্রথম পুত্র ইসমাঈলের বংশধর বলে দাবী করেন, যদিও ঐতিহাসিকগণ প্রায় ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, তাঁর এ দাবী সঠিক ছিল না, তিনি মরক্কোর মানুষ। তাঁর পিতা ইহুদী ছিলেন বলে অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। তিনি দাবী করেন যে শিয়া মযহাবের ইমামত ইসমাঈলের মাধ্যমে তাঁর উপর এসেছে এবং তিনি নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবী করেন। হিজরী ৩য় শতকের শেষে (২৯৭ হি.) এক পর্যায়ে তিনি মরক্কোয় একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। অন্যান্য রাফেযী শিয়াদের মতই তাঁরা সাহাবীদের অবমাননা, ও হযরত আলী ও তাঁর বংশধরদের ইমামতের বিশ্বাস প্রচার করতেন। তাঁর পর তাঁর পুত্র কায়েম, এরপর কায়েমের পুত্র মানসূর এবং মানসূরের পরে তাঁর পুত্র আবু তামীম মায়াদ্দ ইবন মানসূর আল-মুইজ্জ লি দীনিল্লাহ উপাধি ধারণ করে মরক্কোর ইসমাঈলীয় রাজ্যের শাসক হন।[২১]

আল মুইজ্জ ৩১৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৪১ হিজরীতে পিতার মৃত্যুর পর তিনি মরক্কোর শিয়া রাজ্যের শাসক হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সেনাপতি জাওহারকে নির্দেশ দেন মরক্কোর বিভিন্ন অঞ্চল দখল করার জন্য। এক পর্যায়ে জাওহার ৩৫৮ হিজরীতে মিশর অধিকার করেন এবং কায়রো শহরের পত্তন করেন। তিনি সিরিয়া ও হেজাজের বিভিন্ন অঞ্চলও তাঁর অধীনে আনেন। ৩৬২ হিজরীতে (৯৭২ খ্রি.) মুইজ্জ কায়রো প্রবেশ করেন এবং কায়রোকেই তাঁর রাজধানী হিসাবে গ্রহণ করেন। ৩৬৫ হিজরীতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর শাসনামলে মিশরে শিয়া শাসকদের যে সকল উৎসবাদি প্রচলিত হয় তার অন্যতম ছিল ঈদে মিলাদুন্নবী উৎসব।

তিনি একজন জ্ঞানী, দৃঢ়চেতা ও সাহসী শাসক ছিলেন। তিনি কাব্যরসিক ও কবি ছিলেন। ঐতিহাসিক আল্লামা যাহাবী লিখেছেন : 'তিনি একজন জ্ঞানী, প্রজ্ঞাশীল, দৃঢ়চেতা, রুচীশীল, সুশিক্ষিত, মর্যাদাবান ও দয়ালু শাসক ছিলেন। মোটের উপর তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। সাহাবীদের অবমাননামূলক রাফেযী শিয়া আকীদা ও বিদ্'আত না থাকলে তাঁকে সর্বোত্তম শাসকদের মধ্যে গণ্য করা হতো।[২২]

---

২০. বিস্তারিত দেখুন; ইবনে কাসীর; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* ৭ম খণ্ড, মাহমুদ শাকির, *আত-তারিখ আল-ইসলামী,* ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড।

২১. বিস্তারিত দেখুন; যাহাবী, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে ওসমান, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'* (বেরুত, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৯ ইং) ১৫/১৪১-১৫৯, আল-শাহরাস্তানী, *আল-মিলালু ওয়ান নিহাল* (বেরুত, দারুল মা'রিফা, ১৯৮০)১/১৯১-১৯৮, ওয়ামী, আল-মাউসূয়া আল-মুয়াসসারা (রিয়াদ, ওয়ামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮), পৃ. ৪৫-৫২

২২. যাহাবী, *নুবালা,* ১৫/১৬৪। আরো দেখুন; ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আইয়ান* (ইবনে, কুম, মানশুরাতুশ শরীফ আর-রাযী, ২য় সংস্করণ) ৫/২২৪-২২৮, আল-যিরিকলী, আল-আলাম বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ৯ম সংস্করণ, ১৯৯০) ৭/২৬৫।

www.pathagar.com

আল মুইজ্জ-এর প্রচলিত এই ঈদে মিলাদুন্নবী ও অন্যান্য জন্মদিন পালন ও উদযাপন পরবর্তী প্রায় ১০০ বৎসর কায়রোতে শিয়াদের মধ্যে উৎসব হিসেবে চালু থাকে। ৪৮৭ হি. (১০৯৪ খ্রি.) ফাতেমী খলীফা আল-মুসতানসিরের মৃত্যু হলে সেনাপতি আল-আফযাল বিন বদর আল-জামালীর সহযোগিতায় মুস্তানসিরের ছোট ছেলে ২১ বৎসর বয়স্ক আল-মুস্তালী খলীফা হন। সেনাপতি আফযাল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েন। তিনি ৪৮৮ হিজরীতে ফাতেমীদের প্রচলিত ঈদে মিলাদুন্নবী উৎসব, ও অন্যান্য জন্মদিনের উৎসব বন্ধ করে দেন। পরবর্তী কোন কোন ফাতেমী শাসক পুনরায় এ সকল উৎসব সীমিত পরিসরে চালু করেন, তবে ক্রমান্বয়ে ফাতেমীদের প্রতিপত্তি সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং এ সকল উৎসব জৌলুস হারিয়ে ফেলে।[২৩]

ঘ. ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন : অনুষ্ঠান পরিচিতি

আহমদ ইবন আলী আল-কালকাশান্দী (৮২১ হি.) লিখেছেন : 'রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে ফাতেমী শাসক মিলাদুন্নবী উদযাপন করতেন। তাদের নিয়ম ছিল যে, এ উপলক্ষে বিপুল পরিমাণে উন্নতমানের মিষ্টান্ন তৈরী করা হত। এই মিষ্টান্ন ৩০০ পিতলের খাঞ্চায় ভরা হতো। মীলাদের রাত্রিতে এই মিষ্টান্ন সকল তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে বিতরণ করা হতো, যেমন প্রধান বিচারক, প্রধান শিয়ামত প্রচারক, দরবারের কারীগণ, বিভিন্ন মসজিদের খতীব ও প্রধানগণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ। এ উপলক্ষে খলীফা প্রাসাদের সামনের ব্যালকনীতে বসতেন। আসরের নামাযের পরে বিচারপতি বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সংগে আজহার মসজিদে গমন করতেন এবং সেখানে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত পরিমাণ সময় বসতেন। মসজিদ ও প্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে অভ্যাগত পদস্থ মেহমানগণ বসে খলীফাকে সালাম প্রদানের জন্য অপেক্ষা করতেন। এ সময়ে ব্যালকনীর জানালা খুলে হাত নেড়ে খলিফা তাদের সালাম গ্রহণ করতেন। এরপর কারীগণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং বক্তাগণ বক্তৃতা প্রদান করতেন। বক্তৃতা অনুষ্ঠান শেষ হলে খলীফার সচরগণ হাত নেড়ে সমবেতদের বিদায়ী সালাম জানাতেন। খিড়কী বন্ধ করা হতো এবং উপস্থিত সকলে নিজ নিজ ঘরে ফিরতেন...।'[২৪]

আহমদ ইবন আলী আল-মাকরীযী (৮৪৫ হি.) এ সকল জন্মদিন উৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—'এ সকল জন্মদিনের উৎসব ছিল তাদের খুবই বড় ও মর্যাদাময় উৎসব সময়। এ সময়ে মানুষেরা সোনা ও রূপার স্মারক তৈরী করত, বিভিন্ন ধরণের খাবার, মিষ্টান্ন ইত্যাদি তৈরী করে বিতরণ করা হতো।'[২৫]

৩. ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন : প্রকৃত প্রবর্তন ও ব্যাপক উদযাপন

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় ৬ষ্ঠ হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধ (৫৫০-৬০০) থেকেই মিশর, সিরিয়া বা ইরাকের ২/১ জন ধার্মিক মানুষ প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসের প্রথমাংশে ৮ বা ১২ তারিখে খানাপিনার মাজলিস ও আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে 'ঈদে মিলাদুন্নবী' পালন করতে শুরু করেন।[২৬]

তবে যিনি ঈদে মিলাদুন্নবীর প্রবর্তক হিসাবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং যিনি ঈদে মিলাদুন্নবীকে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম উৎসব হিসাবে প্রতিষ্ঠা দানের কৃতিত্বের দাবিদার তিনি হচ্ছেন ইরাক অঞ্চলের

---

২৩. ইজ্জত আলী আতিয়্যা, *আল-বিদ'আত* (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০) পৃ. ৪১২ ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ আল-আনসারী, *আল-কাউলুল ফাসল* (সৌদী আরব, রিয়াদ, *আর-রিয়াসা আল-আমাহ লি ইদারাতিল বুহুস*, ১৯৮৫) ৬৪-৭২

২৪. আল-কালকাশান্দী, *সুবহুল আশা* (মিশর, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়) ৩/৪৯৮-৪৯৯

২৫. আল-মাকরীযি, *আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার*, পৃ. ৪৯১

২৬. আস-সালেহী, *সীরাত*, ১/৩৬৩, ৩৬৫

www.pathagar.com

আরাবিল প্রদেশের শাসক হযরত আবু সাঈদ কুকবুরী (মৃত্যু : ৬৩০ হি.)।

ক) যুগ পরিচিতি : হিজরী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতক

৪র্থ হিজরী শতকে ইসলামী জগতের অবস্থা কি ছিল তা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। পরবর্তী সময়ে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ৭ম হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কাল ছিল মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য দুর্দিন ও মুসলিম ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। এ সময়ে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বাইরের শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় বিশাল মুসলিম রাজত্বের অধিকাংশ এলাকা।

৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল অভ্যন্তরীণ সমস্যার পাশাপাশি আরো একটি কঠিন সমস্যা মুসলিম উম্মাহর সামনে এসেছে, তা হলো বাইরের শত্রুর আক্রমণ, বিশেষ করে পশ্চিম থেকে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের আক্রমণ এবং পূর্ব থেকে তাতার ও মোগলদের আক্রমণ।

ক্রুসেড যুদ্ধের শুরু হয় হিজরী ৫ম শতাব্দীর (খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর) শেষদিকে। ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপে খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণ বিভিন্নভাবে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী প্রচারণা করতে থাকেন যে, মুসলিমগণ মূর্তিপূজা করেন, তাঁরা মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) পূজা করেন, নরমাংস ভক্ষণ করেন, যিশুখৃষ্টের অবমাননা করেন ইত্যাদি কথা সারা ইউরোপে প্রচারিত হতে থাকে। পাশাপাশি মুসলমানদের স্পেন বিজয় ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বিজয় ইউরোপের খ্রিস্টান শাসকদেরকে ভীত করে তোলে। তারা তাঁদের অভ্যন্তরের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও জাতিগত বিভেদ ও শত্রুতা ভুলে পোপের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনের পবিত্রভূমি উদ্ধারের নামে লক্ষ লক্ষ সৈনিকের ঐক্যবদ্ধ ইউরোপীয় বাহিনী নিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। ৪৯১ ও ৪৯২ হিজরী সালে (১০৯৭ ও ১০৯৮ খ্রি.) প্রথম ক্রুসেড বাহিনীর দশ লক্ষাধিক নিয়মিত সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবক এশিয়া মাইনের ও সিরিয়া এলাকায় বিভিন্ন মুসলিম দেশে হামলা করে। এই হামলায় প্রায় ২০ সহস্রাধিক মুসলিম সাধারণ নাগরিক নিহত হন। ক্রুসেড বাহিনী নির্বিচারে নারীপুরুষ ও শিশুদের হত্যা করেন। তাঁরা ক্ষেতখামার ও ফসলাদিও ধ্বংস করেন। এই হামলার মাধ্যমে এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া-প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন রাজ্য খ্রিস্টানরা দখল করে এবং কয়েকটি খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।[২৭]

পরবর্তী ২০০ বছরের ইতিহাস ইউরোপীয় খ্রিস্টান বাহিনীর উপর্যুপরি হামলা ও মুসলিম প্রতিরোধের ইতিহাস। এ সময়ে খ্রিস্টানগণ মিসর সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিধাবিভক্ত মুসলিম শাসকগণ বিভিন্নভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন এবং সর্বশেষ ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর শেষদিকে সালাহুদ্দীন আইউবী অধিকাংশ খ্রিস্টান রাজ্যের পতন ঘটান এবং প্যালেস্টাইন ও অধিকাংশ আরব এলাকা থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করেন।[২৮] এরপরেও মিশর, সিরিয়া ও লেবানন এলাকায় ক্রুসেডারদের কয়েকটি ছোট ছোট খ্রিস্টান রাজ্য রয়ে যায়। তদুপরি ইউরোপ থেকে মাঝেমাঝে ক্রুসেড বাহিনীর আগমন ও বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে আক্রমণ অব্যাহত থাকে।[২৯]

যে সময়ে মুসলিমরা দখলদার ক্রুসেড বাহিনীর কবল থেকে বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলকে মুক্ত করছেন, সে সময়ে, ৭ম হিজরী শতকের (১৩ খ্রিস্টীয় শতকের) শুরুতে মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বদিক থেকে তাতারদের বর্বর হামলা শুরু হয়। চেঙ্গিশ খানের নেতৃত্বে তাতার বাহিনী সর্বপ্রথম ৬০৬ হিজরীর দিকে (১২০৯ খ্রি.) মুসলিম রাজত্বের পূর্বাঞ্চলে হামলা চালাতে শুরু করে। শীঘ্রই তারা বিভিন্ন মুসলিম

২৭. মাহমুদ শাকির, *আত তারিখুল ইসলামী*, ৬/৩৪-৩৮, ২৫২-২৫৭

২৮. প্রাগুক্ত, ৬/২৫৯-৩৫৬

২৯. বিস্তারিত দেখুন; যাহাবী, *আল-ইবার ফী খাবারি মান গাবার* (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমীয়্যা) ৩/১২৮-৩১২

www.pathagar.com

জনপদে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করতে থাকে। মানব ইতিহাসের বর্বরতম হামলায় তারা এ সকল জনপদের সকল প্রাণীকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। বস্তুত তাতাররা মধ্য এশিয়া, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ মুসলিম জনপদ শাব্দিক অর্থেই বিরান করে দেয়। পরবর্তী শতাব্দীর ঐতিহাসিক আল্লামা যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হি.) বলেন : 'তাতাররা এসকল জনপদে কত মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে এ প্রশ্ন অবান্তর ও অর্থহীন, বরং প্রশ্ন করতে হবে ; তারা কতজনকে না মেরে বাঁচিয়ে রেখেছিল।'[৩০] ৬৫৬ হিজরীতে (১২৫৮ খৃ.) হালাকু খানের নেতৃত্বে তাতাররা মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ও রাজধানী বাগদাদ ধ্বংস করে। ৪০ দিনব্যাপী গণহত্যায় তারা বাগদাদের প্রায় ২০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে।[৩১] পরবর্তী শতাব্দীর ঐতিহাসিক আল্লামা যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হি.) লিখেছেন : 'হালাকু মৃতদেহ গণনা করতে নির্দেশ দেয়। গণনায় মৃতদেহের সংখ্যা হয় ১৮ লক্ষের কিছু বেশী। তখন (নিহতের সংখ্যায় তৃপ্ত হয়ে) হালাকু হত্যা থামানোর ও নিরাপত্তা ঘোষণার নির্দেশ দেয়।'[৩২]

বাইরের শত্রুর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ কলহ ও দুর্বলতা এ যুগে মুসলিম সমাজগুলোকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কোনো কোনো আঞ্চলিক শাসক নিজের এলাকায় কিছু শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা আনতে পারলেও সার্বিকভাবে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে।[৩৩]

পরবর্তী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.), যিনি নিকট থেকে এ যুগের ঘটনাবলী জেনেছেন, তাতারদের নারকীয় বর্বরতার বর্ণনা দেওয়ার এক পর্যায়ে লিখেন : ৬১৭ হিজরী (১২২০ খ্রি.) চেঙ্গিশ খান ও তার বাহিনীর বর্বর হামলা সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করে। ১ বৎসরের মধ্যে তারা প্রায় সমগ্র মুসলিম জনপদ দখল করে নেয় (বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বাদ ছিল)।... তারা এ বছরে বিভিন্ন বড়বড় শহরে মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রাদায়ের অগণিত মানুষকে হত্যা করে। মোটের উপর তারা যে দেশেই প্রবেশ করেছে সেখানকার সকল সক্ষম পুরুষ ও অনেক মহিলা ও শিশুকে হত্যা করেছে। গর্ভবতী মহিলাদেরকে হত্যা করে তাদের পেট ফেড়ে গর্ভস্থ শিশুকে বের করে হত্যা করেছে। যে সকল দ্রব্য তাদের প্রয়োজন তা তারা লুটপাট করেছে। আর যা তাদের দরকার নেই তা তারা পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। ঘরবাড়ি সবই তারা ধ্বংস করেছে বা পুড়িয়ে দিয়েছে।... মানব সভ্যতার শুরু থেকে এ পর্যন্ত এত ভয়াবহ বিপর্যয় ও বিপদ কখনো মানুষ দেখেনি... ইতিহাসে এতবড় বর্বরতার কোন বিবরণ আর পাওয়া যায় না।[৩৪]

এভাবে তাতারদের আগ্রাসন, ক্রুসেড হামলা, সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলার অবনতি সমগ্র মুসলিম জাহানকে এমন ভাবে গ্রাস করে যে, ৬২৮ হিজরীর (১২৩১ খ্রি.) পরে আর মুসলমানেরা ইসলামের পঞ্চম রোকন হজ্জ পালন করতে পারেন নি। ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর লিখছেন : ৬২৮ হিজরীতে মানুষেরা হজ্জ আদায় করেন। এরপরে যুদ্ধবিগ্রহ, তাতার ও ক্রুসেডারদের ভয়ে আর কেউ হজ্জে যেতে পারেন নি। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'[৩৫]

ইসলামী অনুশাসনের অবহেলা, পাপ-অনাচারের প্রসার, প্রশাসনিক দুর্বলতা, যুলুম অত্যাচারের সয়লাবের কারণে মুসলমানদের মধ্যে নেমে আসে ঈমানী দুর্বলতা। তাতারভীতি তাদেরকে গ্রাস করে। আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন : 'তাতারভীতি মানুষদেরকে এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে, একজন তাতার সৈনিক একটি বাজারে প্রবেশ করে, যেখানে শতাধিক মানুষ ছিল, তাতার সৈন্যটি একজন করে

৩০. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ৩/১৭২
৩১. মাহমুদ শাকির, *আত-তারিখুল ইসলামী*, ৬/৩৯-৪১, ৩৪৫-৩৫৬; যাহাবী, *আল-ইবার*, ৩/২৭৮
৩২. যাহাবী, *আল-ইবার*,, ৩/২৮৭
৩৩. বিস্তারিত দেখুন, যাহাবী, *আল-ইবার*, ৩/১১-২৮৫
৩৪. ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৮/৫৯৪-৫৯৫
৩৫. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, ৯/১০

www.pathagar.com

সকল মানুষকে হত্যা করে বাজারটি লুট করে, খুনের এই হোলি খেলার মধ্যে একজন পুরুষও ঐ তাতারটিকে বাধা দিতে আগিয়ে আসতে সাহস পায়নি।[৩৬]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, হিজরী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকের মুসলিম সমাজে চরম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অশান্তি বিরাজ করছিল, যা ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও স্থবিরতা ও অবক্ষয় নিয়ে আসে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অঙ্গনে স্থবিরতা আসে। মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মুসলমানগণ বিভিন্ন খ্রিস্টান ও সামাজিক আচার-আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হন। অপরদিকে পূর্বাঞ্চলীয় তাতার ও অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের মানুষেরা মুসলিম সম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা দখল করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের আচার-আচরণ ও বিশ্বাস-কুসংস্কার মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে। সর্বপোরি শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থবিরতা আসার ফলে সমাজের মধ্যে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও বিভিন্ন ধরণের কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে।

সবকিছুর মধ্যেও কিছু কিছু রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও তৎকালীন আলিম সমাজের চেষ্টায় ইলমের প্রসার ও ইসলামী মূল্যবোধের দিকে আহবানের প্রচেষ্টা অব্যহত থাকে।

খ. প্রবর্তক : ব্যক্তি ও জীবন

আমরা আগেই বলেছি যে, মিশরের শিয়া শাসকগণ প্রথম ঈদে মিলাদুন্নবীর প্রবর্তন করেন। ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের শেষ দিকে মিশরের বাইরেও কোনো কোনো ধর্মপ্রাণ মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করতে শুরু করেন। তবে আরাবিলের শাসক আবু সাঈদ কুকবুবীর মাধ্যমেই এই উৎসবকে সুন্নী জগতে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে জনপ্রিয় উৎসবে পরিণত হয়। এজন্য বিভিন্ন সীরাতুন্নবী বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকগণ তাঁকেই ঈদে মিলাদুন্নবীর প্রবর্তক হিসাবে উল্লেখ করেছেন; কারণ তিনিই প্রথম এই উৎসবকে বৃহৎ আকারে পালন করতে শুরু করেন এবং সাধারণের মধ্যে এই উৎসবের প্রচলন ঘটান। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন ইউসূফ সালেহী শামী (মৃত্যু: ৯৪২ হি. ১৫৩৬ খ্রি.) তাঁর প্রখ্যাত সীরাতুন্নবী গ্রন্থে (*সীরাহ শামীয়া*) ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের আহ্বান জানাতে যেয়ে আলোচনার প্রথম দিকে লিখছেন 'সর্বপ্রথম যে বাদশাহ এই উৎসব উদ্ভাবন করেন তিনি হলেন আরাবিলের শাসক আবু সাঈদ কুকবুবী...'[৩৭]

আল্লামা যাহাবী কুকবুরীর পরিচিতি প্রদান করতে গিয়ে লিখেছেন : 'ধার্মিক সুলতান সম্মানিত বাদশাহ মুযাফ্ফরুদ্দীন আবু সাঈদ কুকবুবী ইবনে আলী ইবনে বাকতাকীন ইবনে মুহাম্মাদ আল-তুরকমানী'[৩৮]। তাঁরা তুর্কী বংশোদ্ভূত। তাঁর নামটিও তুর্কী।

হযরত কুকবুবী অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাম যাহাবী (৭৪৮ হি.) বলেন : 'যদিও তিনি (কুকবুরী) একটি ছোট রাজ্যের রাজা ছিলেন; তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশী ধার্মিক, সবচেয়ে বেশী দানশীল, সমাজকল্যাণে নিয়োজিত ও মানবসেবী বাদশাহদের অন্যতম। প্রতি বছর ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনের জন্য তিনি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন তা সবার মুখে প্রবাদের মত উচ্চারিত হত।'[৩৯] তিনি শাসনকার্য পরিচালনার ফাঁকে আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতেন।[৪০]

যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্য শাসনের পাশাপাশি তিনি নিজ রাজ্যে এবং বিভিন্ন ইসলামী রাজ্যে মাদ্রাসা, এতিমখানা ও গণকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন করেছেন। তাঁর ছোট রাজ্যে তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক

৩৬. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, ৮/৫৯৭
৩৭. আস-সালেহী, *সীরাত*, ১/৩৬২
৩৮. যাহাবী, *নুবালা'*, ২/৩৩৪
৩৯. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ৩/২০৮
৪০. আল-যিরিকলী, *আ'লাম*, ৫/২৩৭

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তন্মধ্যে ছিল ২টি উচ্চশিক্ষাগার (মাদ্রাসা), সূফী ও মুসাফিরদের জন্য ৪টি খানকা, বিধবাদের জন্য একটি পুনর্বাসনকেন্দ্র, এতিমখানা, পিতৃমাতৃ পরিচয়হীন অনাথ শিশুদের আশ্রয় ও পুনর্বাসনকেন্দ্র, হাসপাতাল ইত্যাদি।[৪১] ৫৯৮ হিজরীতে তিনি ফিলিস্তিনে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাদ্রাসাটির পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করেন।[৪২]

আবু সাঈদ কুকবুরীর সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল্লামা ইয়াকুত আল-হামাবী (মৃত্যু ৬২৬ হি.) কুকবুরীর বর্ণনা দিকে গিয়ে লিখেছেন : 'আমীর মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকবুরী এই আরাবিল শহরের উন্নয়নমূলক প্রভূত কর্ম করেন। তিনি তার সাহস, বীরত্ব ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে এ যুগের বাদশাহদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের স্থান অধিকার করেছেন। এ কারণে বিভিন্ন দেশের মানুষেরা এসে তাঁর দেশে বসবাস শুরু করেছে এবং আরাবিল শহর এ যুগের অন্যতম বৃহৎ শহরে পরিণত হয়েছে।

কর্মময় জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রায় ৮২ বছর বয়সে হযরত কুকবুরী ৬৩০ হিজরীর ৪ঠা রমযান (১৩/৬/১২৩৩ খ্রি.) ইন্তেকাল করেন।[৪৩] তাঁর স্ত্রী গাযী সালাহুদ্দীনের বোন রাবীয়া খাতুন ১৩ বছর পরে ৬৪৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় রাবিয়া খাতুনের বয়স ৮০ এর উপরে ছিল।[৪৪] আল্লাহ তাঁদেরকে রহমত করেন এবং উত্তম পুরস্কার দান করেন।

তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অন্যতম কর্ম যা তাকে সমসাময়িক সকল শাসক থেকে পৃথক করে রেখেছে এবং ইতিহাসে তাঁকে বিশেষভাগে স্মরণীয় করে রেখেছে তা হলো ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনের প্রচলন। তিনি ৫৮৩ থেকে ৬৩০ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছরের শাসনামলের কোন্ বছরে প্রথম এই অনুষ্ঠান শুরু করেন তা সঠিক ভাবে জানা যায় নি। প্রখ্যাত বাঙালী আলেমে দীন, হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ মেদিনীপুরী উল্লেখ করেছেন যে, হিজরী ৬০৪ সাল থেকে কুকবুরী মিলাদ উদযাপন শুরু করেন।[৪৫] তিনি তাঁর এই তথ্যের কোন সূত্র প্রদান করেন নি। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ৬০৪ হিজরীর আগেই কুকবুরী মিলাদ উদযাপন শুরু করেন। ইবনে খাল্লিকান '৬০৪ হিজরীতে ইবনে দেহিয়া খোরাসান যাওয়ার পথে আরাবিলে আসেন। সেখানে তিনি দেখেন যে, বাদশাহ মুযাফ্ফরুদ্দীন কূকরূরী অতীব আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে মিলাদ উদযাপন করেন এবং এ উপলক্ষে বিশাল উৎসব করেন। তখন তিনি তাঁর জন্য এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন...।[৪৬]

এ থেকে স্পষ্ট যে, ইবনে দেহিয়া ৬০৪ হিজরীতে আরাবিলে আগমনের কিছু পূর্বেই কুকবুরী মিলাদ উদযাপন শুরু করেন, এজন্যই ইবনে দেহিয়া আরাবিলে এসে তাকে এই অনুষ্ঠান উদযাপন করতে দেখতে পান। তবে উদযাপনটি ৬০৪ হিজরীর বেশী আগে শুরু হয়নি বলেই মনে হয়, কারণ বিষয়টি ইবনে দেহিয়া আগে জানতেন না, এতে বোঝা যায় তখনো তা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এতে আমরা অনুমান করতে পারি যে, কুকবুরী ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের শেষ দিকে বা ৭ম হিজরী শতকের শুরুতে (৫৯৫-৬০৩ হি.) মিলাদ পালন শুরু করেন।

গ. প্রথম মিলাদ গ্রন্থ লেখক : ব্যক্তি ও জীবন

মিলাদ অনুষ্ঠান প্রচলন করার ক্ষেত্রে আরেক ব্যক্তিত্বের অবদান আলোচনা না করলে সম্ভবত আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি হলেন 'মিলাদুন্নবী'-র উপরে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা

---

৪১. যাহাবী, *আল-ইবার*, ৩/০৮, নুবালা, ২২/৩৩৫

৪২. ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৮/৫৩৬

৪৩. যাহাবী, *আল-ইবার* ৩/২০৮, *নুবালা* ২২/৩৩৭, ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* ৯/১৮

৪৪. যাহাবী, *আল-ইবার* ৩/২৪৫

৪৫. 'মোহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ, *হাকিকতে মোহাম্মদী ও মীলাদে আহমদী* (পর্বত্য চট্টগ্রাম, মোহাম্মদ মুশতাকুর রহমান, প্রথম সংস্করণ) ৩০১-৩০২ পৃ.

৪৬. ইবনে খাল্লিকান ৩/৪৪৯। আরো দেখুন; ১/২১১, ৪/১১৯

www.pathagar.com

আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে হাসান, ইবনে দেহিয়া আল-কালবী (৬৩৩ হি.), যার গ্রন্থ পরবর্তীতে 'মিলাদ' কেন্দ্রিক অসংখ্য গ্রন্থ রচনার উৎস ছিল।

ইবনে দেহিয়া ৫৪৪ হিজরীতে (১১৫০ খি.) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩৩ হিজরীতে (১২৩৫ খ্রি.) মিশরে ইন্তেকাল করেন। প্রায় ৯০ বছরের জীবনে তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করেন। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন এবং ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানে তাঁর অবদান রাখেন।

৬০৪ হিজরী সালে (১২০৭ খ্রি.) তিনি আরাবীল শহরে আগমন করেন। তিনি দেখতে পান যে, সেখানকার শাসক কুকবুরী মহাসমারোহে রবিউল আউয়াল মাসে 'ঈদে মিলাদুন্নবী' উৎসব উদযাপনের প্রচলন করেছেন। তখন তিনি বাদশাহ কুকবুরীর প্রেরণায় *'আত-তানবীর ফী মাওলিদিল সিরাজিল মুনীর'* নামে মিলাদুন্নবীর উপর একটি গ্রন্থ রচনা করে কুকবুরীকে প্রদান করেন, যে গ্রন্থটি মিলাদুন্নবীর উপর লিখিত প্রথম গ্রন্থ। মীলাদের উপরে লিখিত গ্রন্থের জন্য কুকবুরী তাকে একহাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পুরস্কার প্রদান করেন।[৪৭]

ইবনে দেহিয়া সে যুগের একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সততা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে নাজ্জার (৬৪৩ হি.),[৪৮] আল্লামা জিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ আল-মাকদেসী (৫৬৯-৬৪৩ হি.)[৪৯], আল্লামা যাহাবী[৫০-৭৯], ঐতিহাসিক আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল গণী, ইবনে নুকতা (৬২৯ হি.),[৫১] ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)[৫২], আল্লামা ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.),[৫৩] ইবনে খাল্লিকান (৬৮১ হি.)[৫৪] সন্দিহান ছিলেন।

মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলীয় বিভিন্ন দেশ সফর শেষে তিনি মিসরে আসেন এবং সেখানে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। এ সময়ে মিশরের বাদশাহ ও মুসলিম বিশ্বের প্রধান শাসক ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই বাদশাহ 'আল-মালিক আল-আদিল' সাইফুদ্দীন আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে নাজমুদ্দীন আইউব (শাসন কাল : ৫৯৭-৬১৫ হি./১২০০-১২১৮ খ্রি.)। তিনি ইবনে দেহিয়াকে তাঁর পুত্র যুবরাজ নাসিরুদ্দীন আবুল মায়ালী মুহাম্মাদ (আল-কামিল)-এর গৃহশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দান করেন। ৬১৫ হিজরীতে (১২১৮ খ্রি.) আল-আদিল-এর মৃত্যু হলে যুবরাজ নাসিরুদ্দীন আবুল মায়ালী মুহাম্মদ 'আল-মালিক আল-কামিল' উপাধি গ্রহণ করে মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজত্বকাল; ৬১৫-৬৩৫ হি. (১২১৮-১২৩৮ খ্রি.) তাঁর রাজত্বে তাঁর শিক্ষক ইবনে দেহিয়ার জীবনে নিয়ে আসে বিপুল গৌরব, মর্যাদা ও সৌভাগ্য। বাদশাহ কামিল তাঁর শিক্ষক ইবনে দেহিয়াকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি তাঁকে প্রভূত মর্যাদা ও সম্পত্তি দান করেন।

তবে নিঃসন্দেহে যে গ্রন্থটি তাকে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়েছে তা হলো 'মিলাদুন্নবী' যা রাসূলে আকরামের জন্মদিবসে লেখা তার বই *'আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীর আন-নাযির'*। কারণ এটিই ছিল 'মিলাদুন্নবী' বা রাসূলে আকরামের জন্মবিষয়ে লেখা প্রথম বই। ইবনে খাল্লিকানের বর্ণনা অনুসারে আমরা দেখতে পাই, ইবনে দেহিয়া ৬০৪ হিজরীতে আরাবিলে আগমন করেন। তিনি বছর দুয়েক সেখানে বাদশাহ কুকবুরীর রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসাবে অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি এই

৪৭. যাহাবী, *নুবালা* ২২/৩৩৬, আস-সালেহী, সীরাত ১/৩৬২, ইবনে কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* ৯/২৬
৪৮. যাহাবী, *নুবালা* ২২/৩৯৪-৩৯৫, আল-যিরিকলী, আল-আ'লম ৫/৪৪
৪৯. যাহাবী, *নুবালা* ২২/৩৯১
৫০. যাহাবী, *নুবালা* ২২/ ৩৯১। মিযানুল ইতিদাল ৩/১৮৬
৫১. যাহাবী, *নুবালা* ২২/৩৯২
৫২. ইবনে হাজার, *লিসানুল মিযান* (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ) ৪/২৯৫
৫৩. ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* ৯/২৬
৫৪. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়ফাইয়াতুল আইয়ান* ১/২১২, ৩/৪৪৯-৪৫০

www.pathagar.com

বইটি সংকলন করেন। ৬০৬ হিজরীতে তিনি এই বইটি লেখা সমাপ্ত হলে তা কুকবুরীকে পড়ে শোনান।[৫৫]

এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জগতে পারে যে, মহান নবীর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) মহান সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ বা তৎপরবর্তী মুসলিম সমাজের আলিমগণ ৬০০ বছর যাবৎ তাঁর জন্মকে কেন্দ্র করে কি একটি বইও লিখেন নি ? যার ফলে এই কৃতিত্ব ইবনে দেহিয়া পেলেন ? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে সেই যুগগুলোর অবস্থা বুঝতে হবে। প্রথম যুগের মুসলিমগণ, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সার্বক্ষণিক কর্ম ও ব্যস্ততা ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে। তাঁদের সকল আবেগ, ভালবাসা ও ভক্তি দিয়ে তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন ও কর্ম জানতে, বুঝতে, শেখাতে ও লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাদের কর্মকাণ্ডের যে বর্ণনা হাদীস শরীফে ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাদের যুগে লিখিত ও সংকলিত যে সকল বই পুস্তকের বর্ণনা আমরা পাই বা যে সকল বই পুস্তক বর্তমান যুগ পর্যন্ত টিকে আছে তার আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, তারা মূলত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কর্ম, চরিত্র, ব্যবহার, আকৃতি, জীবনপদ্ধতি জানতে বুঝতে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁর জীবনী সংকলনের দিকে যে যুগের মুসলিমদের মনোযোগ দেখা যায় না। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের অনুকরণীয় ও তাঁর প্রবর্তিত বিধানাবলীর দিকটায় তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বা জীবনী রচনার দিকে তারা গুরুত্ব প্রদান করেননি। ফলে আমরা দেখতে পাই যে সাহাবীগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন, জন্ম তারিখ বা জন্মমাস নিয়ে কোন আলোচনাই পাওয়া যায় না। স্বভাবতই তাঁর জন্মকেন্দ্রিক কোন গ্রন্থও তখন রচিত হয়নি। প্রথম তিন শতাব্দীতে রচিত হাদীস গ্রন্থসমূহে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্ম সংক্রান্ত যৎসামান্য কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা আগে আলোচনা করেছি। এছাড়া প্রথম শতাব্দীর শেষ থেকে সীরাতুন্নবী বা নবী জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ লেখা হতে থাকে বলে মনে হয়। তবে এ যুগে মূলত সীরাতুন্নাবীর মাগাযী বা যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ক বিষয়েই বিশেষভাবে লিখা হত।[৫৬] দ্বিতীয় হিজরী শতকের উল্লেখযোগ্য সীরাতুন্নবী গ্রন্থ হল মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (মৃত্যু ১৫১ হি./৭৬৮ খ্রি.), আবদুল মালেক ইবনে হিশাম (মৃত্যু ২১৮ হি./৮৩৪ খ্রি.) মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (২৩০ হি./৮৪৫ খ্রি.) প্রমুখের লিখা 'সীরাতুন্নবী' গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এ সকল গ্রন্থে রাসূলে আকরাম (সা)-এর জন্মসংক্রান্ত কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়া ৩য় হিজরী শতক থেকে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ লিখিত সকল ইতিহাস গ্রন্থে রাসূলে আকরাম (সা)-এর জন্মসংক্রান্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন খলীফা ইবনে খাইয়াত আল-শাব আল উসফূরী (২৪০হি./৮৫৪ খ্রি.) আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া আল বালাযুরী (২৭৯হি./৮৯২ খ্রি.) আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে জরীর (৩১০হি./৯২৩ খ্রি.) ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ। ৫ম হি. শতক থেকে রাসূলে আকরাম (সা) কর্তৃক সংঘটিত মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনাবলী পৃথকভাবে সংকলন করে '*দালাইলুন নুবুওয়াত*' নামে কয়েকটি গ্রন্থ লেখা হয়, যেমন আবু নুয়াইম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-আসফাহানী (৪৩০হি./১০৩৯ খ্রি.) ও আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বাইহাকী (৪৫৮হি./১০৬৬ খ্রি.) সংকলিত '*দালাইলুন নুবুওয়াত*' গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মকালীন অলৌকিক ঘটনাবলীর কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। সর্বাবস্থায় আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মকে নিয়ে পৃথক গ্রন্থ কেউই রচনা করেন নি। বস্তুত তাঁর জন্ম উদযাপন যেমন ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলোতে মুসলিম উম্মাহর অজানা ছিল,

৫৫. ইবনে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত ১/২১২, ৩/২৯,৪/১১৯

৫৬. ফুয়াদ সিযকিন, *তারিখুল তুরাস আল আরাবী* (সৌদী আরব, আল-ইমাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩), প্রথম খণ্ড, ২য় অংশ, পৃ. ৬৫-৮৬

www.pathagar.com

তেমনি তাঁর জন্ম বা 'মিলাদ' নিয়ে পৃথক গ্রন্থও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আগে কেউ রচনা করেন নি। তাই এই কৃতিত্ব পেলেন ইবনে দেহিয়া।

তাঁর লেখা অন্যান্য বইয়ের কথা ইতিহাস থেকে প্রায় মুছে গিয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে ইসলামী গ্রন্থাগার থেকে, কারণ ঐ ধরনের আরো অগণিত বই অন্য আরো অনেক আলিম লিখেছেন। কিন্তু মীলাদের গ্রন্থটির কথা ঐতিহাসিকগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক অনেক আলিম ও ঐতিহাসিক বইটি পড়তে পেরে আনন্দিত ও উপকৃত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান (৬৮১ হি.) লিখেছেন : 'তিনি প্রখ্যাত আলিমদের ও বিখ্যাত মর্যাদাশীল মানুষদের একজন ছিলেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অধিকার ছিল।... তাঁর লিখিত মীলাদের গ্রন্থটি ৬২৫ হিজরীতে আমরা আরাবীলের বাদশা কুকবুরীর দরবারে ৬ মাজলিসে শ্রবণ করেছিলাম।'[৫৭] ৮ম হিজরী শতাব্দীর মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.) লিখেছেন : 'মীলাদের উক্ত গ্রন্থ আমি পড়েছি এবং তা থেকে কিছু সুন্দর ও প্রয়োজনীয় বিষয় আমি লিখে নিয়েছি।'[৫৮]

ঘ. ঈদে মিলাদুন্নবী : অনুষ্ঠান পরিচিতি

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা মিলাদ প্রবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে পরিচিত হয়েছি। এখন আমরা দেখতে চাই কিভাবে তাঁরা মিলাদুন্নবী পালন করতেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খাল্লিকান কুকবুরীর মিলাদ অনুষ্ঠানের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন—

'কুকবুরীর মিলাদুন্নবী উদযাপনের বর্ণনা দিতে গেলে ভাষা অপারগ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশের মানুষের যখন এ বিষয়ে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা জানতে পারেন তখন পার্শ্ববর্তী সকল এলাকা থেকে লোকজন এসে এতে অংশ নিতে থাকে। বাগদাদ, মাউসিল, জাযিরা, সিনজার, নিসসিবীন, পারস্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক আলিম, কারী, সূফী, বক্তা, ওয়ায়েজ, কবি এসে জমায়েত হতেন। মহর্‌রম মাস থেকেই এদের আগমন শুরু হত, রবিউল আউয়ালের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আগমন অব্যাহত থাকত। খোলা প্রান্তরে ২০টি বা তারও বেশী বিশাল বিশাল কাঠের কাঠামো (প্যাণ্ডেল) তৈরী করা হতো যার একটি তাঁর নিজের জন্য নির্ধারিত থাকত, বাকীগুলোতে তার আমীর ওমরাহ, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণের জন্য নির্ধারিত হতো। সফর মাসের ১ তারিখ থেকে এ সকল কাঠামোগুলোকে খুব সুন্দরভাবে সাজানো হতো।

পুরো এলাকা আলোকসজ্জার অগণিত মোমবাতিতে ভরে যেত। মীলাদের দিন সকালে তিনি তাঁর দুর্গ থেকে বিপুল পরিমাণ হাদিয়া তোহফা এনে সূফীদের খানকায় রাখতেন। সেখানে রাষ্ট্রর গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও সমাজের সাধারণ অনেক মানুষ সমবেত হতেন। ওয়ায়েজগণের জন্য মঞ্চ তৈরী করা হতো। একদিকে সমবেত মানুষদের জন্য ওয়াজ নসীহত চলত। অপরদিকে বিশাল প্রান্তরে তার সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করতে থাকত। কুকবুরী দুর্গে বসে একবার ওয়ায়েজদের দেখতেন, একবার সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখতেন। এ সময়ে তিনি সমবেত সকল আলেম, গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মেহমানকে একে একে ডাকতেন এবং তাদেরকে মূল্যবান হাদিয়া তোহফা প্রদান করতেন। এরপর ময়দানে সাধারণ মানুষদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হতো, যেখানে বিভিন্ন রকমের খাদ্যের আয়োজন থাকত। খানকার মধ্যেও পৃথকভাবে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হতো।

এভাবে আসর পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া চলত। রাতে তিনি সেখানেই থাকতেন। সকাল পর্যন্ত সামা নাত-কাসিদার অনুষ্ঠান চলত। প্রতি বৎসর তিনি এভাবে মিলাদ পালন করতেন। অনুষ্ঠান শেষে যখন সবাই বাড়ীর পথে যাত্রা করতেন তিনি প্রত্যেককে পথখরচা প্রদান করতেন।'[৫৯]

---

৫৭. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াত* ১/২১১-২১২, ৩/৪৪৯-৪৫০; ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* ৯/২৬

৫৮. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৯/২৬

৫৯. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আইয়ান* ৪/১১৭-১১৯, যাহাবী, *নুবালা* ২২/৩৩৬

www.pathagar.com

আরেকজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইউসুফ ইবন কাযউগলী সিবত ইবনুল জাযযী (মৃত্যু. ৬৫৪ হি. ১২৫৬ খৃ.) লিখেছেন : 'তিনি ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত সূফীদের জন্য 'সামা' ভক্তিমূলক গান-এর আয়োজন করতেন এবং নিজে সূফীদের সাথে (সামা শুনে) নাচতেন।[৬০] তিনি আরো লিখেছেন : 'কুকবুরীর ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত দাওয়াতে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের একজন বলেন, তার দস্তরখানে থাকত পাঁচশত আস্ত দুম্বার রোস্ট, দশ হাজার মুরগী, এক লক্ষ খাবারের পাত্র, ত্রিশ হাজার মিষ্টির খাঞা। তাঁর দাওয়াতে উপস্থিত হতেন সমাজের গণ্যমান্য আলিমগণ এবং সূফীগণ, তিনি তাঁদেরকে মুক্ত হস্তে হাদিয়া ও উপঢৌকন প্রদান করতেন।[৬১]

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, এই যুগ ছিল মুসলিম উম্মার জন্য অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল যুগ। অভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ, অশান্তি ও বহির্শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত মুসলিম জনপদগুলোতে কুকবুরীর মিলাদ উৎসব অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেত। বিপর্যস্ত ও মানসিকভাবে উৎকণ্ঠিত বিভিন্ন মুসলিম দেশের মানুষেরা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রেরণা খুঁজে পান। ফলে দ্রুত তা অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমরা উপসংহারে এ বিষয়ে আলোচনা করব। তার আগে আসুন ১ম ও ২য় পর্যায়ের মিলাদুন্নবী উদযাপনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে সে যুগের মিলাদ উৎসবের মৌলিক দিকগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

ঙ. ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন : দ্বিতীয় পর্যায়ের তুলনা

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, কায়রোর ফাতেমী ইসমাঈলী শিয়া শাসকগণ যখন সর্বপ্রথম ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনের শুরু করেন তখন তাদের অনুষ্ঠান ছিল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড বা প্রটোকলের অংশ। এ অনুষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় কায়দায় পালন করা হতো। অনুষ্ঠানের মূল দিকগুলো ছিল :

১. অনুষ্ঠান ছিল বাৎসরিক, প্রতি বৎসর ১২ রবিউল আউয়াল এই অনুষ্ঠান করা হতো।

২. অনুষ্ঠান ছিল শুধামাত্র এক দিনের কিছু অংশে এই অনুষ্ঠান পালন করা হতো।

৩. অনুষ্ঠান একান্তভাবেই কায়রোর মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

৪. রাষ্ট্রের গণ্যমান্য, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও ইচ্ছুক সাধারণ নাগরিক সমবেত হয়ে খলীফাকে এ উপলক্ষে সালাম প্রদান করতেন।

৫. কুরআন তিলাওয়াত করা হতো।

৬. রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদেরকে বিশেষ সম্মান ও উপঢৌকন প্রদান করা হতো।

৭. বক্তৃতা প্রদান। বিভিন্ন মসজিদের খতিব, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ, প্রচারকগণ এ উপলক্ষে বক্তৃতা প্রদান করতেন।

৮. মুক্ত হস্তে দান করা। এ উপলক্ষে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের মধ্যে মুক্ত হস্তে মিষ্টি, খাবার, অর্থ ও পোষাক পরিচ্ছেদ বিতরণ করা হতো।[৬২] প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিকদের বর্ণনার আলোকে কুকবুরীর মিলাদ অনুষ্ঠানের মূল দিকগুলো নিম্নরূপ :

১. অনুষ্ঠান ছিল বাৎসরিক, কিন্তু সব বৎসর একই দিনে পালন করা হতো না। কোন বছর ৮ তারিখে কোন বছর ১২ তারিখে অনুষ্ঠান করা হতো।

২. মূল অনুষ্ঠানের আগে প্রায় দেড় মাস উৎসব পালন করা হতো।

৩. অনুষ্ঠানটি গণউৎসবের রূপ গ্রহণ করে। শুধু আরাবিলের জনগণই নয়, পার্শবর্তী সকল মুসলিম জনপদের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করত।

---

৬০. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৮/৫৩৬। আস-সালেহী, *আস-সীরাতুশ শামিয়্যা*, প্রাগুক্ত ১/৩৬২

৬১. ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৮/৫৩৬। আস-সালেহী *আস-সীরাতুশ শামিয়্যা*, প্রাগুক্ত ১/৩৬২

৬২. আল-মাকরীযী, *আল মাওয়ারিজ* , ৪৩২-৪৩৩, আল-কালকাশিন্দী, *সুবহুল আ'শা* ৩/৪৯৮-৪৯৯

www.pathagar.com

৪. খোলা প্রান্তরে গণজমায়েত ও গণউৎসবের আয়োজন করা হতো।
৫. উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল আনন্দ উৎসব।
৬. মিলাদ উদযাপনের মূল বিষয়ই ছিল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা।
৭. মীলাদের আনন্দ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো হাদীয়া তোহফা বিতরণ করা।
৮. ওয়াজ নসিহতের আয়োজন।
৯. সেনা বাহিনীর কুচকাওয়াজ
১০. সামা'র আয়োজন। মূল মিলাদ অনুষ্ঠান ৭ বা ১১ রবিউল আউয়াল দিবাগত রাতের শুরুতে সামা'র মাধ্যমে শুরু করা হত। আর পরদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরে বা ১১ রবিউল আউয়াল দিবাগত রাতে এ ধরণের সামা ও কাসিদার মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটত।

উভয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানের তুলনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান মূলত ছিল কিছু ধর্মীয় কাজ ও কিছু আনন্দ উৎসব ধরণের কাজের সমষ্টি ; একদিকে এতে কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ নসিহত, অর্থদান ও উপহার বিতরণ করা হতো। অপর দিকে মিষ্টি খাওয়া, ঘরবাড়ী সাজান, আনন্দ উল্লাস ইত্যাদি উৎসবমূলক কর্মের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করা হতো। খাওয়া-দাওয়া ও হাদীয়া বিতরণ সকল পর্যায়ে এই উৎসবের মূল বিষয় ছিল। কুকবুরীর অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সামা, যা ৪র্থ ও ৫ম শতকের মিশরীয় শিয়াদের মিলাদ অনুষ্ঠানে অপরিচিত ছিল।

উপসংহার

ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনকে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে অন্যতম উৎসবে পরিণত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান আরবিলের শাসক আবু সাঈদ কুকবুরীর। তাঁকেই আমরা মিলাদ অনুষ্ঠানের প্রকৃত প্রবর্তক বলে মনে করতে পারি। এর অন্যতম প্রমাণ হলো ৪র্থ হিজরী শতকে মিশরে এই উদযাপন শুরু হলে তার কোন প্রভাব বাইরের মুসলিম সমাজগুলোতে পড়েনি। এমনকি পরবর্তী ২০০ বছরের মধ্যেও আমরা মুসলিম বিশ্বের অন্য কোথাও এই উৎসব পালন করতে দেখতে পাই না। অথচ ৭ম হিজরী শতকের শুরুতে কুকবুরী আরাবিলে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন শুরু করলে তা তৎকালীন মুসলিম সমাজগুলোতে সাড়া জাগায়। তাঁর অনুষ্ঠানে তাঁর রাজ্যের বাইরের দূরবর্তী অঞ্চলে থেকেও মুসলমানগণ এসে যোগদান করতেন। ২০০ বছরের মধ্যে এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও সমাজে অনেক মানুষ ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করতে শুরু করেন।

অনেক আলিম প্রতি বৎসর রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী বা নবীজির (সা) জন্মদিনের ঈদ পালনকে জায়িয বলেছেন, এই যুক্তিতে যে, এই উপলক্ষে যে সকল কর্ম করা হয় তা যদি শরী'আত সঙ্গত ও ভাল কাজ হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ হতে পারে না। কাজেই কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ নসিহত, দান-খয়রাত, খানাপিনা, উপহার উপঢৌকন বিতরণ ও নির্দোষ আনন্দের মাধ্যমে বাৎসরিক ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করলে তা এদের মতে নাজায়িয বা শরী'আত বিরোধী হবে না। বরং এসকল কাজ কেউ করলে তিনি তাঁর নিয়ত, ভক্তি ও ভালবাসা অনুসারে সাওয়াব পাবেন। এ সকল আলিমদের মধ্যে রয়েছেন—সপ্তম হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা আবদুর রহমান ইবন ইসমাঈল আল-মাকদিসী আল-দিমাশকী হাফিজ আবু শামা (৬৬৫ হি.), ৯ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.), আবুল খাইর মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ, শামসুদ্দীন সাখাবী (৯০২ হি./১৪৯৭ খ্রি.), নবম ও দশম হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত আলিম আল্লামা জালালুদ্দীন ইবন আবদুর রহমান আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম।[৬৩]

৬৩. বিস্তারিত দেখুন; *আশ-শাতেবী*, আবু ইসহাক ইবরাহীম আল-ইতিসাম (সৌদী আরব, আল-খুবার, দারু ইবনে আফফান, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৫) ২/৫৪৮, আস সালেহী, *সীরাত*, ১/৩৬২-৩৭৪

www.pathagar.com

তবে আলিমগণের মতবিরোধের বাইরে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন মুসলিম দেশে এই অনুষ্ঠান ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা আগেই বলেছি যে, জন্মদিন পালনের ন্যায় মৃত্যুদিন পালনও অনারব সংস্কৃতির অংশ, যা পরবর্তী সময়ে মুসলিম সমাজেও প্রচলিত হয়ে যায়। রবিউল আউয়াল মাস যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্ম মাস, তেমনি তাঁর ইন্তিকালের মাস। বরং তাঁর জন্মের মাস সম্পর্কে হাদীস শরীফে কোন বর্ণনা আসেনি এবং এ বিষয়ে কেউ কেউ মতবিরোধ করেছেন বলে আমরা জেনেছি। কিন্তু রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার ইন্তেকাল হওয়ার বিষয়ে কারো কোন মতভেদ নেই।[৬৪] এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, ৭ম হিজরী শতকে মুসলিম বিশ্বের কোথাও রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃত্যুদিন পালন করা হতো, 'ফাতেহায়ে দুয়াযদহম' পালন করা হতো, জন্মদিন পালন করা হতো না। ভারতের প্রখ্যাত সূফী হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (৬৩১-৭২৫ হি./১৩২৫ খ্রি.) লিখেছেন যে, তাঁর মুরশিদ হযরত ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর (র) (৬০৯-৬৬৮ হি./১২১২-১২৭০ খ্রি.) রবিউল আউয়ালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তেকাল দিবস হিসাবে ফাতেহায়ে ইয়াযদহম পালন করতেন, যদিও মুসলমানদের মধ্যে ১২ রবিউল আউয়ালই জন্মদিবস হিসাবে প্রসিদ্ধ এবং মুসলমানগণ এই দিনেই মিলাদুন্নবী পালন করেন।[৬৫]

আবু সাঈদ কুকবুরীর উদ্যোগে জন্মদিন পালন বা ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন ক্রমান্বয়ে সকল মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে রবিউল আউয়াল মাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মমাস হিসাবেই পালিত হতে থাকে। ৮ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত মরক্কো দেশীয় পর্যটক ইবনে বাতুতা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (৭০৩-৭৭৯ হি./১৩০৪-১৩৭৭ খ্রি.) দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে সমস্ত মুসলিম বিশ্ব ও বেশ কিছু অমুসলিম দেশ ভ্রমণ করেন। প্রায় নয় বছর (৭৩৪-৭৪১ হি./১৩৩৩-১৩৪১ খ্রি.) তিনি ভারতে ছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বিভিন্ন মুসলিম দেশের সামাজিক উৎসবাদি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, পর্ব ও কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা দান করেছেন। তাঁর বর্ণনায় আমরা কোনো কোনো মুসলিম দেশের মানুষদের মধ্যে রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদুন্নবী উদযাপনের কথা জানতে পারি।

---

৬৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সোমবার ইন্তেকাল করেছেন তা বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের তারিখ সম্পর্কে হাদীস শরীফে কোন বর্ণনা আসেনি, তাই সে বিষয়ে মতবিরোধ আছে, কেহ বলেছেন ১লা, কেহ বলেছেন, ২রা, রবিউল আউয়াল সোমবার তিনি ইন্তিকাল করেছেন। দেখুন; খলিফাবিন খাইয়াত, তারিখ (বৈরুত, দারুল কলম, মুয়াসসাতুর রিসালা, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭) ৯৪ পৃ. ইবনে হিব্বান, *আস-সীরাতুন নাবিবিয়্যাহ* (বৈরুত, মুয়াসসাসাতুল কুতুবিল সাকাফিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৯৮৭)৪০০ পৃ. ইবনে হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী শরহ সহীহিল বুখারী* (বৈরুত, দারুল ফিকর) ৮/১২৯-১৩০, আস সালেহী, আস-সীরাতুশ শামিয়্যা, প্রাগুক্ত ১২/৩০৫-৩০৬

৬৫. *রেহলাতু ইবনে বাতুতা* (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪০হি./১৯৮৭ খৃ.)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল- জুন ২০০৩

ইসলামের প্রথম আমেরিকান আবিষ্কারক

সৈয়দ আশরাফ আলী

আমেরিকান সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন ওয়াশিংটন আরভিং। সারা বিশ্বের, এমনকি বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরাও এই সাহিত্যিকের বিভিন্ন গল্পের সঙ্গে পরিচিত। তাঁর অমর সৃষ্টি "রিপ ভ্যান উইঙ্কেল" (*Rip Van Winkle*) আমেরিকার লোক সাহিত্যের সবচেয়ে সুপরিচিত ও জননন্দিত চরিত্র। কৃষি কাজের চেয়ে শিকার করা ও মাছ ধরা ছিল এই চরিত্রের কাছে বেশী প্রিয়। সে একদিন শিকার করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তার সেই ঘুম ভাঙ্গে দীর্ঘ ২০ বছর পর। এই অকর্মণ্য সদাহাস্যময় চরিত্রটিকে লেখক যে অনুপম বর্ণনায় মূর্ত করেছেন, তা বিশ্বের আনাচে-কানাচে অগণিত পাঠককে চমৎকৃত করেছে।

কিন্তু খুব কম লোকই জানেন যে ওয়াশিংটন আরভিং কেবল একজন মহান গল্পকারই ছিলেন না, একজন বিশিষ্ট জীবনীকার ও ইতিহাসবেত্তাও ছিলেন। আমেরিকানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলামের সত্যিকারের রূপটি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। ওয়াশিংটন আরভিং রচিত হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনী গ্রন্থটি ছিল তাঁর সম্পর্কে আমেরিকায় প্রকাশিত প্রথম দরদী রচনা।

একথা সত্য যে মহান সাহিত্যিক, পণ্ডিত, দার্শনিক, কবি ও আধ্যাত্মবাদী র‍্যালফ ওয়ালডো এমারসন (Ralph Waldo Emerson) "ম্যান দি রিফর্মার" (*Man the Reformer*) শীর্ষক রচনায় হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ও খলীফা ওমর (রা)-এর প্রশস্তি গেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই প্রশস্তি রচিত হয় ওয়াশিংটন আরভিং কর্তৃক ইসলামের বিস্তৃত গৌরব ও আদর্শকে আবিষ্কার করার বহু বছর পর। ১৮৪০ সালে এডিনবার্গে "অন হিরোজ, হিরো-ওয়ার্শিপ এ্যান্ড দি হিরোইকস ইন হিষ্ট্রি দি হিরো অ্যাজ প্রফেট" (On Heroes, Hero-worship and the Heroics in History- The Hero as Prophet) শিরোনামের বক্তৃতামালায় টমাস কারলাইল ইউরোপে যে বক্তব্য পেশ করেন, তার প্রায় এক দশক আগেই আরভিং তা' আমেরিকায় বলেছেন। বস্তুত ওয়াশিংটন আরভিংই প্রথম আমেরিকান, যিনি ইসলামের অন্তর্জগতে প্রবেশ করেছিলেন। এভাবে তিনি যে কেবল ধর্ম ও জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণ গন্ডির উর্ধে উঠতে পেরেছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর অননুকরণীয় ও অমূল্য সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসিত স্পেনের তুংগস্পর্শী মহানুভবতা ও মহানবীর (দঃ) অতুলনীয় কৃতিত্বের কথাও সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন।

প্রখ্যাত গবেষক ও ইতিহাসবেত্তা ড. হ্যারল্ড জে গ্রিনবার্গ (Dr. Harold J. Greenburg) ১৯৫৯ সালে ইংল্যান্ডে ওয়াশিংটন আরভিং-এর ওপর প্রকাশিত এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, "ক্রিষ্টোফার কলম্বাস ১৪৯২ সালে গ্রানাডা থেকে যাত্রা করেন এবং মুসলিম বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নৌচালনা বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকায় নিয়ে আসেন খ্রিষ্টীয় ও মুসলিম সভ্যতার সম্মিলিত প্রজ্ঞা। এর প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর পর ওয়াশিংটন আরভিং আইবেরীয় উপদ্বীপে ভ্রমণের সময় সেই গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে পুনরাবিষ্কার করে পাশ্চাত্যের কাছে উপস্থাপন করেন।" (Christopher Columbus, departing from Granada in 1492, and employing the principles of navigation developed by Muslim scientists, had brougth to America the accumulated wisdom of both

www.pathagar.com

the Christian and Muslim civilizations. Three and a half centuies later, Washington Irving while wandering through the Iberian peninsula, was to rediscover this proud culture and present it to America and the West.—Dr. Harold J. Greenburg, *The First American to Discover Islam, The Islamic Review,* Working, England, April 1959.)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ওয়াশিংটন আরভিং যখন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম স্পেনের গৌরবগাঁথা তুলে ধরেন, আমেরিকা তখনো খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সেই সময় ইসলামকে স্পেনের ইতিহাসে জ্ঞান ও সভ্যতা বিকাশের একটি উপাদান হিসাবে ব্যাখ্যা করা নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসী এবং প্রায় ধর্মবিরোধী কাজ ছিল।

ওয়াশিংটন আরভিং ১৭৮৩ সালের ৩রা এপ্রিল নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। তখন নিউ ইয়র্ক ছিল ২৩ হাজার অধিবাসীর একটি ছোট্ট শহর। তরুণ ও প্রাণ-প্রাচুর্য ভরা আরভিং-এর কাছে প্রথম জীবনে আমেরিকাই ছিল গোটা পৃথিবী। কিন্তু ইতিহাস পড়তে গিয়ে তিনি অনিবার্যভাবেই পা বাড়ালেন পুরনো পৃথিবীর দিকে। পুরনো পৃথিবীকে চাক্ষুষ দেখার এক উদগ্র বাসনা, তরুণ মনে দেশ ভ্রমণের তীব্র আকাঙ্খা এবং অজানাকে জানার দুর্নিবার অনুসন্ধিৎসা তাঁকে ইউরোপের প্রত্যন্ত এলাকায় টেনে নিয়ে যায়। ১৮০৪ সালে তিনি প্রথম বিদেশ ভ্রমণে যান এবং প্রায় দুই বছর ধরে সমগ্র ইংল্যান্ড ও ইউরোপ মহাদেশের কিয়দংশে ঘুরে বেড়ান। তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন টিকা-টিপ্পনি লেখা রাশিরাশি খাতা ও বিপুল ধ্যান-ধারণা নিয়ে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, সাহিত্য-কর্মে নিয়োজিত না হয়ে তিনি আইনের পরিমণ্ডলে এক অসম্ভব ও নিরস পেশা গ্রহণের চেষ্টা করেন। এতে মনে হয় ইতিহাসবেত্তা যেন আপন ক্ষমতা সম্পর্কে তখনো পুরোপুরি সচেতন হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু সাহিত্য জগতের আকর্ষণ ছিল আরো অনেক বেশী যাদুকরী। আর সেই আকর্ষণে ওয়াশিংটন আরভিং শীঘ্রই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করলেন 'সালমাগুন্ডি' (*Salmagundi)* নামে একটি সাময়িকী সম্পাদনার মধ্য দিয়ে। দু'বছর পরে তিনি "নিউ ইয়র্কের ঘটনাপঞ্জী" (New York's Chronicle) শিরোনামে ব্যঙ্গরসাত্মক ভাষায় প্রতিভাদীপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী একটি সাপ্তাহিক ঘটনাপঞ্জী রচনা করে বিশ্বকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করলেন।

কিন্তু সাহিত্যের বুনো ঘোড়াকে সাময়িকী সম্পাদনার গতানুগতিক লাগামে আটকে রাখা গেল না। তিনি ছিলেন স্বাধীন ইচ্ছায় বিচরণের পক্ষপাতী। তিনি আবার পাড়ি জমালেন ইংল্যান্ডে। সেখানে গোটা দেশটি চষে বেড়ানোর সময় এই তরুণ প্রতিভা যে কয়েকটি রচনা উপহার দিলেন, তা তাঁকে ইংল্যান্ডের পাঠকদের কাছে বিপুলভাবে পরিচিত করে তুললো। তিনিই ছিলেন প্রথম আমেরিকান লেখক যাকে ইংরেজি ভাষী 'মাতৃভূমি' সাদরে বরণ করে। এটি বিশেষ করে এমন এক সময়ে ঘটলো, যখন ইংল্যান্ডে প্রচলিত ধারণা ছিল যে কোন আমেরিকানই শুদ্ধ ইংরেজিতে সাহিত্যকর্ম তো দূরে থাক, চোস্ত ইংরেজিতে বাক্যালাপ করা বা লেখার কথাও আশা করতে পারে না।

১৮২৫ সালে ব্রিটেনবাসীর ভাষায় "মৃদুভাষী, কৌতুকপ্রিয় ও সংস্কৃতিমনা" (min l, witty and cultured) এই আমেরিকান আকস্মিকভাবে মাদ্রিদে আমেরিকান লিগেশনে (American Legation) একটি নিম্নপদে যোগ দেন। চাকুরীর অবসরে তিনি "লাইফ অব কলম্বাস" (*Life of Columbus*) শিরোনামে একটি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করতে সমর্থ হন। ১৮২৮ সালে প্রকাশিত এই জীবনী গ্রন্থটি লেখককে স্পেনীয় ইতিহাসের আরো গভীরে টেনে নিয়ে যায়। সে সময় আইবেরিয়ান (Iberian Peninsula) নেপোলিয়ন-যুগের যুদ্ধের ক্ষত থেকে সবে সেরে উঠছিল। তখনো এই অঞ্চলটি এমনকি তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর কাছেও প্রায় অচেনা ছিল। পিরিনিজ (Pyrenees) পর্বতমালা এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে। এমনকি অনেক সংস্কৃতিমনা ব্যক্তির মনেও স্পেন সম্পর্কে ভ্রান্ত

www.pathagar.com

ধারণা বিরাজ করতো এবং তাঁরা স্পেনকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতেন না। মুসলিম স্পেনের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য ছিল ঘৃণা, অজ্ঞতা ও রহস্যের আবরণে ঢাকা।

একজন প্রতিভাবান গবেষক হিসেবে তিনি বিস্মৃত স্পেনের লুপ্ত গৌরবকে উন্মোচিত করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। কিন্তু মাদ্রিদে অবস্থানকালে তিনি স্পেনের প্রাচীন ভুবন সম্পর্কে সামান্যই জানতে পেরেছিলেন। আন্দালুসিয়াতেই (Andalusia) দেশটির সোনালী ইতিহাস তার যথার্থরূপে তার সামনে প্রতিভাত হলো।

১৮২৯ সালের মে মাসে আরভিং স্পেনে মুসলিম রাজশক্তির সর্বশেষ অধিষ্ঠান 'রোমান্টিক' নগরী গ্রানাডায় পৌঁছেন। বসন্তের উজ্জীবিত প্রকৃতির মাঝে 'ভেগার' (Vega) বৈভব আর তুষার কিরিট শোভিত সিয়েরা নেভাদা (Sierra Nevada) প্রতিভাবান তরুণ মনকে চমৎকৃত করে। এই পরিবেশেই তাঁর কল্পনাশক্তি পূর্ণতা লাভ করে এবং এখানেই তাঁর বিশ্বখ্যাত সাহিত্যকর্মগুলো রচিত হয়। এসব সাহিত্যকর্ম কেবল স্পেনের নয়, ইসলাম ও সমগ্র বিশ্বের জন্যেও একেকটি অতুলনীয় উপহার।

গভর্নরের আমন্ত্রণে আরভিং আলহামরা (Alhambra) প্রাসাদে বাস করার অনুমতি পেলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবজ্ঞা, অবহেলা ও ঘৃণায় প্রাসাদটি তখন প্রায় ধ্বংসের পথে। কিন্তু সেই জীর্ণ, ধ্বংসোন্মুখ প্রাসাদটি এই মহৎ ইতিহাসবেত্তাকে এমনভাবে মুগ্ধ করলো যে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, "জীবনে কখনো এমন চিত্তাকর্ষক নিবাসে বসবাস করিনি এবং আর কখনো করবোও বলে আশা করি না।" ("Never in my life have I had so delicious an abode, and never can I expect to meet with such another.")

প্রাসাদটি তখন বস্তুত তার মূল আদলের কংকালে পরিণত। এককালে সৌন্দর্য ও আড়ম্বরের জন্যে বিশ্বখ্যাত ছিল যে প্রাসাদটি, সেটি তখন তার শোচনীয় প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জিপসি ও কৃষকদের দখলে ছিল প্রাসাদটি। এমনকি নানা ধরনের পোষা ও বন্য প্রাণীও সেখানে বাসা বেঁধেছিল। নেপোলিয়নের সৈন্যরা প্রসাদের একটি মিনারের ক্ষতি সাধন করে। এর আগে অত্যুৎসাহী রাজা পঞ্চম চার্লস একটি কিম্ভূতকিমাকার সৌধ নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রসাদের কিয়দংশ বিনষ্ট করেন। ঐ সৌধটিও তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। আলহামরা প্রাসাদ গাত্রের লাল পলেস্তারা তখন খসে খসে পড়ছিল এবং সেই সঙ্গে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল এর স্বপ্নের ভুবন।

কীটস (Keats) বলেছেন, "শ্রুত সংগীত মধুর, কিন্তু অশ্রুত সংগীত মধুরতর" (Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter)। আরভিং এই কথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি আলহামরাকে অভিহিত করেছিলেন, প্রাসাদের গাত্রালংকারে অনুরণিত সুর-মূর্ছনা রূপে। এর অবহেলিত ও অনাদ্রিত সৌন্দর্যে মুগ্ধ লেখক রচনা করলেন, "টেলস অব আলহামরা" (*Tales of Alhambra*)। অক্লান্ত প্রয়াসের ফল এই অনুপম গবেষণা-কর্মে তিনি তার মরমী ভাষায় কেবল আলহামরা নয়, মুসলিম স্পেনের বিস্মৃত গৌরব ও ঐতিহ্য বর্ণনা করেছেন। ড. গ্রিনবার্গ যথার্থই বলেছেন, "বাগদাদকে বিশ্ব মাঝে তুলে ধরার কৃতিত্ব যেমন আরব্য উপন্যাস 'এক হাজার এক রাত্রি'-এর, তেমনি স্পেনকেও বিশ্ব-সভায় তুলে ধরার সকল কৃতিত্ব ওয়াশিংটন আরভিং-এর। কয়েক শতাব্দী আগে আরবীয় কবি ইবনে সাঈদ আন্দালুসিয়ার যশোগাথা গাইলেও ওয়াশিংটন আরভিংই (স্পেনীয়) ইসলামের লুপ্ত ভুবনকে পুনরায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।" ('Not since the *Thousand and One Nights* had the glory and traditions of Islam been so splendidly narrated. Irving accomplished for Spain what the *Thousand and One Nights* had done for Baghdad. The Arabian poet Ibn Said had sung of the charms of Andalusia centuries ago ; now Washington Irving was to reintroduce the lost world of Islam"-Harold J. Greenburg, ibid, Woking, 1959.)

www.pathagar.com

"টেলস অব আলহামরা"য় জীবন-চরিত, ইতিহাস, স্থাপত্যকলা বিষয়ক গবেষণার সমন্বয় ঘটেছে। আর সব কিছুই চিত্রিত হয়েছে স্পেনের মুসলিম সভ্যতার যথার্থ প্রেক্ষাপট থেকে। আরভিং বলেছেন, "এই মূরীয় ধ্বংসাবশেষের ওপর দিনের বিলীয়মান আলোর খেলা যখন আমি প্রত্যক্ষ করি, তখন আমি এর অন্তর-স্থাপত্যের লঘু অথচ সৌষ্ঠবপূর্ণ ও জাঁকজমকপূর্ণ চরিত্রে মুগ্ধ হই। এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধজয়ী স্পেনীয়দের নির্মিত বিশাল অথচ ম্রিয়মান হর্ম্যরাজির সঙ্গে এর সুস্পষ্ট পার্থক্য আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এই উপদ্বীপটির ওপর প্রভুত্ব করার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করেছে যে দুই যুদ্ধলিপ্সু জাতি, তাদের মধ্যকার বিপরীতমুখী ও দ্বান্দ্বিক চরিত্রটি মূর্ত হয়ে ওঠে এই স্থাপত্যেই।"

"আরবীয় বা মূরীয় স্পেনের এই একটি কীর্তি দেখে আমি ক্রমেই ভাবপ্রবণ হয়ে উঠি। এটি এমন একটি জাতির কীর্তি, যাদের গোটা অস্তিত্বই হচ্ছে একটি কাহিনী, যা বলা হয়ে গেছে। তবু ইতিহাসের যে কালপর্বে তাদের অস্তিত্ব, তা যেমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ তেমনি দীপ্তিময়।"

তাঁর অনুপম ভাষায় :"As I sat watching the effect of the declining daylight upon this Moorish pile, I was led into a consideration of the light, elegant and voluptuous character prevalent throughout its internal architecture, and to contrast it with the grand but gloomy solemnity of the Gothic edifices reared by the Spanish conquerors. The very architecture thus be speaks the opposite and irreconcilable natures of the two warlike people who so long battled here for the mastery of the peninsula."

"By degrees I fell into a course of musing upon the singular fortunes of the Arabian or Morisco - Spaniads, whose whole existence is a tale that is told, and certainly forms one of the most anomalous yet splendid episodes in history."

আরভিং-এর কাছে আলহামরা ছিল স্পেনে মুসলিম প্রভাবের প্রতীক। কলম্বাসের ওপর গবেষণা-কর্ম তাঁকে সেভিলে (Seville) নিয়ে যায়। আর হাজার স্মৃতি ও স্বপ্নভারাক্রান্ত আলহামরা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে আরো দু'টি ক্লাসিক গ্রন্থ রচনায়। এ দু'টি গ্রন্থ হলো "লিজেন্ডস অব দি কনকোয়েষ্ট অব স্পেন" (*Legends of the Conquest of Spain*) এবং "দি কনকোয়েষ্ট অব গ্রানাডা" (*The Conquest of Granada*)। আইবেরিয়ান উপদ্বীপে মুসলিম সভ্যতাকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রিত করে রচিত পাশ্চাত্যের প্রথম গ্রন্থ হলো এ দু'টিই।

"টেলস অব আলহামরা" গ্রন্থটির প্রভাব ছিল অত্যন্ত জোরালো। এই অনুপম গবেষণা-কর্মটির প্রতি পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে তারা সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। এর ফলে এতদিনের বিস্মৃত আলহামরার পুনরুদ্ধার ও সংস্কার সম্ভব হয়। এর পর পরই সেভিল (Seville), আলকাজার (Alcazar), টলেভো (Toledo) এবং কর্ডোভার (Cordova) গ্রান্ড মস্ক-এর (Grand Mosque) সংস্কারের ব্যাপারেও আগ্রহ ও সহানুভূতি দেখা যায়।

"দি কনকোয়েষ্ট অব গ্রানাডা" ও "লিজেন্ডস অব দি কনকোয়েষ্ট অব স্পেন"-এর অবদান "দি টেলস অব আলহামরা"র চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। ড. গ্রিনবার্গ ব্যাখ্যা করে বলেন, "এর আগে আরব-খ্রিস্টান যুদ্ধ সম্পর্কে প্রতীচ্যে কোন পক্ষপাতহীন মূল্যায়ন হয়নি। মুসলমানদের অনিবার্যভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে বিধর্মী পৌত্তলিক হিসেবে আর খ্রিস্টানদের চিত্রিত করা হয়েছে ঈশ্বর ও যীশুর যথার্থ অনুসারী হিসেবে। আরভিংই শেষ পর্যন্ত এই "দুই জাতির" মধ্যকার বিরাট ব্যবধানটি ঘুচালেন। সেই সময় স্পেনে যে বিশাল ট্রাজিক নাটকের অভিনয় চলছিল, তিনি তার সকল কুশীলবকে একেকজন বীর নায়ক হিসেবে চিত্রিত করেন। এই ট্রাজেডির মধ্য দিয়েই স্পেনীয় রেনেসাঁর দীপ-শিখা নির্বাপিত হয়ে যায়।" ("Until this time, the Arab-Christian wars had received no fair treatment in the Occident. The Muslims were invariably dismissed as pagans, the Christians

www.pathagar.com

portrayed as staunch upholders of the Cross and the holy faith. And Irving was at last to bridge the wide abyss between them, characterizing them all as heroic actors in the great tragic drama which was to bring the age of enlightenment to an end in Spain and darken the light of the Spanish Renaissance.")

"দি কনকোয়েষ্ট অব গ্রানাডা" গ্রন্থটি বস্তুত একটি লুপ্ত সভ্যতার বিলাপ। তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ইতিহাসকে এমন নাটকীয়ভাবে আগে কখনো তুলে ধরা হয়নি। আরভিং-এর লেখনীতে বর্ণাঢ্য ও চমকপ্রদ একটি যুগ জীবন্ত হয়ে উঠেছে।" ("*To read The Conquest of Granada* is to weep with the tragedy of a lost civilization. Rarely has history been so dramatically presented, with an insight and ingenuity which brings to life a most colourful and splendid era.")

ইসলামের পরিমণ্ডলে জ্ঞান আহরণের উদগ্র বাসনাই আরভিংকে মানব সভ্যতার সংকটে গগণচুম্বী ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (দ:)-এর প্রতি আকৃষ্ট করলো। যে অসাধারণ উদ্দীপনা নিয়ে তিনি আলহামরা, গ্রানাডা ও কর্ডোভার ওপর ভিত্তি করে অনুপম সাহিত্য উপহার দিয়েছেন, সেই একই উদ্দীপনা নিয়ে তিনি ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (দ:)-এর একটি নিরাপদ জীবন-চরিত্র উপহার দেয়ার অধিকতর দুরূহ ও ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগে ব্রতী হলেন। এর ফল হলো ঐতিহাসিক। 'লাইফ অব ম্যাহোমেট' *(Life of Mahomet)* শিরোনামে রচিত তাঁর অনন্য কীর্তি বস্তুত আমেরিকা মহাদেশে প্রকাশিত হযরত মুহাম্মদ (দ:) সম্পর্কে প্রথম দরদী জীবন-চরিত। আরভিং তাঁর শক্তিশালী লেখনীতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর গতিময় ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ও সমৃদ্ধ চিত্র তুলে ধরেন। তিনি লিখেছেন : "তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলী ছিল নিঃসন্দেহে অসাধারণ মানের। তিনি ছিলেন প্রবল স্মৃতিশক্তি, সুস্পষ্ট কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী। নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তীক্ষ্ণ ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি নিজের মন ও মানসকে গড়ে তুলেছিলেন। সেই সময়ে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও অনাদিকাল থেকে চলে আসা ঐতিহ্য সম্পর্কে নিজের জ্ঞান ভান্ডারকে তিনি সমৃদ্ধ করেন। সাধারণ আলাপচারিতায় তিনি ছিলেন রাশভারী। আরবদের মুখে মুখে প্রচলিত নীতিকথা ও প্রবচন তিনি তাঁর কথার মাঝে মাঝে উল্লেখ করতেন। আবেগতাড়িত হলে তাঁর কণ্ঠ হতো সুললিত। তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনি মনে হতো সংগীতময় ও উচ্চনাদী।"

"তিনি ছিলেন মিতাহারি, উপবাস পালনে কঠোর নিয়মনিষ্ঠ। ক্ষুদ্র মনের অহমিকার পরিচায়ক জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক তিনি কখনো পরিধান করতেন না। তিনি কখনো পশমী কাপড়, কখনো ইয়েমেনের ডোরাকাটা সূতি কাপড় পরতেন। তাঁর পোষাকে প্রায়ই তালি মারা থাকতো।"

"অহংবোধকে অস্বীকার এবং সেই সঙ্গে কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁর সমগ্র জীবনের বিভিন্ন পর্যায় জুড়ে উপস্থিত ছিল। তাঁর আত্মগত আশা-আকাঙ্খা তাঁকে সব রকম জাগতিক বিষয়ের উর্ধে তুলে ধরেছে। ইসলামের অবশ্য পালনীয় এবং আত্মাশুদ্ধিকারী প্রার্থনায় রত থাকতেন তিনি সর্বক্ষণ।"

"মহান আল্লাহ তা'আলার ক্ষমাশীলতার উপরই তিনি ন্যস্ত করতেন সকল অতিপ্রাকৃত সুখ-শান্তির আশা। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি নবী করিম (দ:)-কে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে নবী! আল্লাহ তা'আলার রহমত ব্যতীত কোন ব্যক্তিই কি বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না?' 'কেউ না, কেউ না, কেউ না', উত্তর দেন নবী করীম (দ:) আন্তরিক ও আবেগময় পুনরাবৃত্তি মাধ্যমে। "কিন্তু আপনি, হে নবী? আপনি নিজেও কি তাঁর রহমত ব্যতীত বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারেন না?" "নবী (দ:) তখন তাঁর নিজের মাথায় হাত রাখলেন, এবং তিনবার পরম গুরুত্বের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর রহমতে আমাকে আবৃত না করেন, তাহলে আমিও বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারব না।"

"যখন তিনি তাঁর শিশু-পুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যু-শয্যার উপরে ঝুঁকে পড়লেন, তখনও এই চরম বিপদময় পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্পণ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

শীঘ্রই বেহেস্তে পুত্রের সাথে পুনর্মিলনের আশাই ছিল তখন তাঁর সান্ত্বনা। পুত্রের মৃতদেহ অনুসরণ করে তিনি তার সমাধিতে পৌঁছে তার রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং কবরের বেদনাদীর্ণ দুর্বিসহ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়েও তিনি সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রাখেন নিজেকে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের এবং নবী হিসাবে তাঁর আল্লাহ্-নির্দেশিত দায়িত্বের প্রতি।"

("His intellectual qualities were undoubtedly of an extraordinary kind. He had quick apprehension, a retentive memory, a vivid imagination, and an inventive genius. Owing but little to education, he had quickened and informed his mind by close observation, and storied it with a great variety of knowledge concerning the systems of religion current in his day, or handed down by tradition from antiquity. His ordinary discourse was grave and sententious, abounding with those aphorisms and apologues so popular among the Arabs; at times he was excited and eloquent, and his eloquence was aided by a voice musical and sonorous."

"He was sober and abstemious in his diet, and a rigorous observer of fasts. He indulged in no magnificence of apparel, the ostentation of a petty mind ; neither was his simplicity in dress affected, but the result of a real disregard to distinction from so trivial a source. His garments were sometimes of wool; sometimes of the striped cotton of Yemen ; and were often patched."

"It is this perfect abnegation of self, connected with this heartfelt piety, running throughout the various phases of his fortune. .... The early aspirations of his spirit continually returned and bore him above all earthly things. Prayer, that vital duty of Islam, and that infallible purifier of the soul, was his constant practice."

"On the clemencey of God, we are told, he reposed all his hopes of supernatural happiness. Ayesha related that on one occasion she inquired of him, 'Oh, Prophet, do none enter paradise but through God's mercy?' 'None-none-none!' replied he, with earnest and emphatic repetition. 'But you, oh Prophet, will not you enter excepting through his compassion?' Then Mahomet put his hand upon his head, and replied three times, with great solemnity, 'Neither shall I enter paradise unless God cover me with His Mercy!'

"When he hung over the death-bed of his infant son Ibrahim, resignation to the Will of God was exhibited in his conduct under this keenest of afflictions ; and the hope of soon rejoining his child in paradise was his consolation. When he followed him to the grave, he invoked his spirit, in the awful examination of the tomb, to hold fast to the foundations of the faith, the unity of God, and his own mission as a Prophet."

মুসলিম স্পেন সম্পর্কে আরভিং যেসব সাহিত্য রচনা করেছেন, "লাইফ অব ম্যাহোমেট" ছিল তার সর্বশেষ। কিন্তু তিনি যা রচনা করে গেছেন তা ছিল আমেরিকানদের কাছে ইসলামকে তার যথার্থ প্রেক্ষাপটে চিত্রিত করার জন্য যথেষ্ট। কলম্বাস স্পেনের জন্যে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। আরভিং সেই স্পেনকে, বিশেষ করে মুসলিম স্পেনকে পুনরাবিষ্কার করেন আমেরিকানদের জন্যে। হ্যারল্ড গ্রীনবার্গ-এর ভাষায় :

"Irving had been the first American to penetrate the soul of Islam, and in that had superseded the bounds of religion and nationality. In himself he had found true peace, Islam, and had brought back to his own people his inimitable and invaluable literary portraits of the greatness of Muslim Spain and the achievements of the Prophet Muhammad."

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৩

ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান*

আধুনিক বিশ্বে মানবাধিকার একটি বহুল আলোচিত বিষয়। মানবাধিকার বলতে সরলার্থে মানুষের অধিকার বোঝায়। যেসব মানবিক অধিকার ব্যতীত মানুষ পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে মানবিক মর্যাদাসহ জীবনধারণ করতে পারে না এবং মানবিক স্বাভাবিক গুণাবলী ও বৃত্তির প্রকাশ ও বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় না, সাধারণভাবে সে সবই মানবাধিকার হিসাবে চিহ্নিত। এ অধিকারসমূহ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক এ তিনভাবে বিভক্ত। অর্থনৈতিকভাবে ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা, জীবিকার্জন, সম্পত্তির মালিকানা লাভ ও তা সংরক্ষণের অধিকার অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও নিজের যোগ্যতানুযায়ী কর্মসংস্থানের অবাধ অধিকার ইত্যাদি মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে গণ্য।

সামাজিকভাবেমানবাধিকার বলতে বোঝায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ, গোত্র-লিঙ্গ-পেশা নির্বিশেষে সম অধিকার, মতামত প্রকাশ, জানমালের নিরাপত্তা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক তথা নাগরিক অধিকার, সভা-সমিতি-সংগঠন ও জনমত গঠনের অধিকার অবাধে নিজ ধর্ম-কর্ম করার অধিকার, আইনের শাসন ও বিচার লাভের অধিকার, বিবাহ-তালাক ইত্যাদি বিষয় মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

নৈতিকভাবে মাবাধিকার বলতে বুঝায় অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, শ্লীলতার প্রসার ও অশ্লীলতা প্রতিরোধ, সৎকর্মের প্রসার ও অসৎ কর্মের প্রতিরোধ, পিতা-মাতা ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি আদর-স্নেহ-যত্ন প্রদর্শন ও তাদের প্রতিপালন, যথাযথ লালন-পালন, সমাজের দরিদ্র অসহায়, বিধবা, ইয়াতীম, অধিকার বঞ্চিত, মজলুম মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, মেহমান-মুসাফিরদের আপ্যায়ন, সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি শালীনতা ও সৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি নৈতিক অধিকারের শামিল।

এভাবে মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও পরিব্যাপ্তি সভ্যতার ক্রমাগ্রগতির সাথে সাথে বেড়ে যাচ্ছে। এসব অধিকার প্রত্যেক দেশের সংবিধানে কম-বেশি সন্নিবদ্ধ আছে। এ সকল অধিকার নির্ভর করে নির্দিষ্ট সমাজের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা, সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি, বিধি-বিধান-প্রথা, রীতি-নীতি,-মূল্যবোধ এবং দেশের প্রচলিত আইন-প্রশাসন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর। ফলে এর সংজ্ঞা, স্বরূপ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেশে-দেশে, কালে-কালে, স্বভাবতই পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

জাতিসংঘ ও মানবাধিকার

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সনের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩০ ধারা সংবলিত মহাসনদ ঘোষণা করে। জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রের জন্য এ সনদ অনুসরণ বাধ্যতামূলক করেনি। জাতিসংঘ চায় তার সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ যথাসাধ্য এটা অনুসরণ করুক। কোনো দেশ মানবাধিকারের ঘোষিত সনদ কতটা অনুসরণ করছে অথবা লংঘন করছে তা পর্যবেক্ষণ করা ও এ সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য জাতিসংঘ একটি স্থায়ী মানবাধিকার কমিশন গঠন করেছে। বিভিন্ন দেশে এ কমিশনের শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার মাধ্যমে সদস্য-রাষ্ট্রসমূহে মানবাধিকার সম্পর্কিত অবস্থার যাবতীয় রিপোর্ট জাতিসংঘ তথা বিশ্ববাসী যথাসময়ে অবগত হতে পারে।

---

* বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, লেখক ও গবেষক।

www.pathagar.com

জাতিসংঘের ঘোষণা-পত্রের মুখবন্ধে মানবাধিকারের সাধারণ সংজ্ঞা, ব্যাপ্তি প্রয়োগ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করার পর বিভিন্ন প্রকার ও ধরনের মানবাধিকার ৩০টি ধারা ও ৩২টি উপ-ধারায় সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত অধিকারসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দু'টি সূচি প্রস্তুত করা হয়েছে। একটিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ এবং অন্যটিতে নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৬৬ সনে এ দু'টি দলিল অনুমোদন করে এবং সদস্য-রাষ্ট্রসমূহকে স্বেচ্ছামূলকভাবে এতে স্বাক্ষর দান ও তা নিজ নিজ দেশে যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানায়।

ইসলামে মানবাধিকার

আধুনিক সভ্য জগত মাত্র বিগত শতকের মধ্যভাগ থেকে মানবাধিকার সম্পর্কে যে সচেতনতা অনুভব করে ও জাতিসংঘের মাধ্যমে তা সমুন্নত রাখার প্রয়াস পায়, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে প্রায় চৌদ্দশো বছর পূর্বে সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ, সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সুষম মানবাধিকারের ঘোষণা দিয়েছে। সংক্ষেপে তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

জীবন ধারণের অধিকার

জীবনের নিরাপত্তা তথা স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে। মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার এবং নিরাপদ জীবন যাপন সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ

"আল্লাহ্ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৩)

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا

'নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সব মানুষকে হত্যা করলো।" (সূরা মায়িদা : ৩২)।

শরী'আতে কেবল বিচারকের রায়ের মাধ্যমে কারো জীবন নিধন স্বীকৃত। বিচার কার্যক্রমে এ ন্যায়নীতি অনুসরণের ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ :

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

"তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে তা করবে।" (সূরা নিসা : ৫৮)

গোপনে বিচারানুষ্ঠানের বিধান ইসলাম অনুমোদন করে না। সব ধরনের বিচারকার্যই প্রকাশ্যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থন করার পূর্ণ সুযোগ দানের মাধ্যমে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হতে হবে।

সম্পদের অধিকার

ইসলাম সকল মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের তাগিদ দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না" (সূরা বাকারা : ১৮৮)।

রাসূলে করীম (সা) তাঁর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি তোমাদের পরস্পরের নিকট পবিত্র।' সম্পদের অধিকার রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন :

www.pathagar.com

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

'যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।' (বুখারী)

মর্যাদা রক্ষার অধিকার

প্রত্যেক নাগরিকের ইজ্জত-আবরুর হেফাজতের নিশ্চয়তা বিধান করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মানুষের মর্যাদাহানি, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নিন্দা, কুৎসা রটনা, বিদ্রূপও উপহাস করা, নাম ও উপাধি বিকৃত করাকে নিষিদ্ধ করে আল কুরআনের ঘোষণা :

لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ

'তোমাদের কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যেন বিদ্রূপ বা ঠাট্টা না করে।' (সূরা হুযরাত : ১১)

রাসূল করীম (সা) কোন মানুষের মর্যাদাহানিকে ঘৃণ্যতম জুলুম বলে উল্লেখ করেছেন। ইসলামে যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও নারীর মর্যাদা হরণ, যিনা-ব্যভিচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, নৈতিকতার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ প্রদানকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং স্বাধীনতা আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকার। যে কোন ধরনের জোর-জবরদস্তি ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামী নীতি অনুযায়ী কোন উপযুক্ত আদালতে আইননুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে কোনরূপ দণ্ড দেয়া যাবে না। আইনের সুস্পষ্ট বিধান ছাড়া কাউকে গ্রেফতার, আটক বা বলপ্রয়োগ করা যাবে না। ইমাম মালিক (র) বলেন, 'বিনা বিচারে শাস্তি প্রদান ইসলাম অনুমোদন করে না।' ইসলাম সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার বা দোষী সাব্যস্ত করাকে অন্যায় মনে করে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়ার কথা বলে। ইসলাম মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করে। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া ইসলাম সমর্থন করে না। সত্য গোপন করা জুলুম। স্বাধীন মত প্রকাশে ইসলাম বাধা দেয় না বরং উৎসাহ প্রদান করে।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার

ইসলাম ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়। এ ব্যাপারে আল কুরআনের নির্দেশ :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের বাড়ি ছাড়া অন্যের বাড়িতে মালিকের অনুমতি না নিয়ে, সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না।' (সূরা আন্ নূর : ২৭)।

আল-কুরআনের আরো ঘোষণা : وَلَا تَجَسَّسُوْا

'তোমরা একে অপরের গোপন ত্রুটি অনুসন্ধান করো না।' (সূরা হুযরাত : ১২)

বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা) বলেন : 'তোমাদের অনুমতি ছাড়া যেন তোমাদের অপছন্দনীয় কেউ তোমাদের ঘরে প্রবেশ না করে।'

বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। আল কুরআনের ঘোষণা :

www.pathagar.com

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ

'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা।' (সূরা বাকারা : ২৫৬)

উপরোক্ত আয়াতের প্রথম অংশে বিশ্বাসের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয় অংশে বিবেকের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আর্থিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার

ইসলাম ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের বিভিন্নতার জন্য কাউকে তার মৌলিক অর্থনৈতিক চাহিদা যেমন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে না। চাকরি ও জীবিকার্জনের জন্য রয়েছে সকলের সমান সুবিধা। তাছাড়া, বেকার, ইয়াতীম এবং শারীরিকভাবে অক্ষমদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থ-সাহায্য করার বিধান রয়েছে। হযরত উমর (রা) জাতীয় সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গে নিজের জিম্মাদারীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন : 'আল্লাহ্‌র শপথ ! আমার খেলাফত কালে সানআর পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত মেষ বালকও স্বস্থানে বসে তার অংশ পেয়ে যাবে তার চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ পড়ার আগেই।' (কিতাবুল খারাজ, পৃ. ২১২)। হযরত উমর (রা)-এর আরো ঘোষণা : 'ফোরাতের কূলে একটি কুকুরও না খেয়ে মারা গেলে কাল কিয়ামতের ময়দানে সে জন্য উমরকেই দোষারোপ করা হতে পারে।'

বসবাস, যাতায়াত ও স্থানান্তরের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক তার পছন্দমাফিক যে কোন স্থানে বসবাস করার, রাষ্ট্রীয় সীমানার ভিতরে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের বাইরে যে কোন অঞ্চলে যাতায়াত করার স্বাধীনতা ভোগ করে। কোন নাগরিককে তার ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করাকে ইসলাম চরম জুলুম মনে করে। একইভাবে নাগরিকদের ইচ্ছা মাফিক বাসস্থান ত্যাগ ও স্থানান্তরের স্বাধীনতা দিয়েছে ইসলাম।

গণতান্ত্রিক অধিকার

মত প্রকাশের অধিকার, প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার, ন্যায়সঙ্গতভাবে সরকারের সমালোচনা করার অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে একটি মশহুর ঘটনার রবাত দেয়া যায়। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে খলীফা জু'আর খুতবা দিতে মিম্বরে দাঁড়ানোর সাথে সাথে এক মুসল্লী জানতে চাইলেন খলীফার জামা অত লম্বা হলো কীভাবে ? কারণ বায়তুল মাল থেকে সকলকে যে কাপড় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা দিয়ে অত লম্বা জামা বানানো যায় না। প্রশ্নকর্তা যখন জানলেন, খলীফার ছেলের ভাগে যে কাপড় পাওয়া গেছে সেটা খলীফাকে দেয়ার ফলেই তাঁর পক্ষে লম্বা জামা বানানো সম্ভব হয়েছে তখন প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হাঁ এখন খুতবা শুরু করুন ? আমরা শুনবো। খলীফা বললেন, যদি সন্তোষজনক জবাব না পেতে তাহলে কী করতে ? তখন প্রশ্নকর্তা বললেন : তখন আমার এই তলোয়ার এর সমাধান দিতো। একথা শুনে খুশী হয়ে খলীফা বললেন : ইয়া আল্লাহ্! যতদিন পর্যন্ত এরূপ সাচ্চা ঈমানদার বান্দা জীবিত থাকবে ততদিন ইসলাম ও মুসলমানের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।

পারিশ্রমিক লাভের অধিকার

ইসলাম শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত সকল অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে বিনা পারিশ্রমিকে অথবা কম মজুরীতে কারো শ্রম নেয়া অবৈধ। মজুরের আর্থিক কিংবা দৈহিক যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া, সামর্থ্যের বাইরে কারো ওপর কাজের বোঝা না চাপানো, মজুরের সাথে সাধারণ মানবিক আচরণ করা, শ্রমিককে ত্বরিৎ তার মজুরী পরিশোধ করার তাগিদ দিয়েছে ইসলাম। নবী করীম (সা) বলেন : "শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরী দিয়ে দাও।" (বায়হাকী, ইবনে মাজাহ)। রাসূল

www.pathagar.com

করীম (সা) শ্রমিককে কাজের লভ্যাংশও দেয়ার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "কর্মচারীদেরকে তাদের কাজের লভ্যাংশ দাও। কেননা আল্লাহ্‌র শ্রমিকদের বঞ্চিত করা যায় না।" (মুসনাদে আহমদ)। লক্ষণীয় যে, শ্রমিকদেরকে এখানে আল্লাহ্‌র আপন লোক বলে সম্বোধন করে শ্রমিকের প্রতি মমত্ববোধ ও তার মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন সৎ ও দক্ষ মুচি, একজন অসৎ ও অদক্ষ সুলতান হতেও উত্তম। ইসলামে সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তি মহানবী (সা) তাঁর আচরণের মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদাকে অতি উচ্চে স্থান দিয়েছেন। তিনি নিজে পানি বহন করেছেন, নিজের জুতা নিজে মেরামত করেছেন। রাসূল (সা) পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহকারী ব্যক্তিকে 'আল্লাহ্‌র বন্ধু' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, "শ্রমজীবীর উপার্জনই উৎকৃষ্টতর যদি সে সৎ উপার্জনশীল হয়।" তিনি আরো বলেছেন, "আল্লাহ্ তাঁর ঐ বান্দাকে দেখতে অপছন্দ করেন, যে ইহকালের ও পরকালের কর্ম থেকে বিমুখ।" (মিশকাত)। আল্লাহ্‌র নবী ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা প্রসঙ্গে বলেছেন, "ইসলামের সকল নবীই শ্রমিক তথা পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হযরত দাউদ (আ) কর্মকারের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেচেন। হযরত আদম (আ) কৃষিকাজ করেছেন, হযরত নূহ (আ) সুতারের কাজ করেছেন, হযরত ইদ্রিস (আ) দর্জি ছিলেন এবং হযরত মূসা (আ) ছাগল চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।" এ থেকেই প্রমাণিত হয়, ইসলামে শ্রমের মর্যাদা কতটুকু।

নারীর অধিকার

নারীদের অধিকারের ব্যাপারে ইসলামই সর্বপ্রথম বাস্তব ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান, বিবাহে সম্মতি গ্রহণ, স্ত্রীর মোহরানা, সম্পত্তি ও ব্যবসায়ে মালিকানা স্বত্ব লাভের অধিকার প্রভৃতি দ্বারা নারীর যথাযথ অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকার-কুরআনী অংশীদারের ১২ জনের মধ্যে ৮ জন মহিলা। অথচ ইসলাম-পূর্ব যুগে তাদের কোন উত্তরাধিকারিত্ব ছিল না। হিন্দুধর্মসহ পৃথিবীর বহু ধর্মে নারীর উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার করা হয়নি। স্ত্রীর প্রতি আচরণ সম্পর্কে পুরুষের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে :

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ

'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না।' (সূরা আত্ ত্বালাক : ৬)।

ইসলাম 'মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত' বলে নারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। মহানবী (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর দৃষ্টিতে ভাল সেই প্রকৃত ভাল মানুষ।' শরী'আতের সীমার মধ্য থেকে নারীর উপার্জনের অধিকারেরও স্বীকৃতি দিয়েছে ইসলাম।

ইসলাম নারীর উপার্জিত ধন-সম্পদে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব দান করেছে। নরীরা যা উপার্জন করবে তারাই তার মালিক হবে। তাদের অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত তাদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার পুরুষের নেই। তবে সামাজিক অনাচার রোধে নারী-পুরুষের আলাদা কর্মক্ষেত্রের কথা বলেছে ইসলাম। নারীদেরকে আধুনিক বিশ্ব যেভাবে পণ্যের মতো ব্যবহার করছে ও পশুর মতো খাটাচ্ছে ইসলাম তা সমর্থন করে না। পর্দার মধ্যে থেকে নারী তার সকল মানবিক অধিকার স্বাধীনভাবে ভোগ করতে পারে। পর্দা আল্লাহ্-নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় বিধান। পর্দার অর্থ শুধু বিশেষ ধারনের পোশাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর একটা গভীর তাৎপর্য রয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়ের সম্ভ্রমরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও শালীনতা বিধান ও সুস্থ-বিকাশমান মানব সমাজ পরিগঠনে পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম। সর্বোপরি, পর্দার অর্থ নারীকে অবরুদ্ধ করা নয়, নারী ও পুরুষ উভয়ের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধকে সমুন্নত করা।

www.pathagar.com

সংখ্যালঘুদের অধিকার

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার অধিকার দিয়ে মহানবী (সা) বলেছেন : "অমুসলিমদের জীবন আমাদের জীবনের এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতোই।" তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, জীবনের নিরাপত্তা, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি অধিকার ইসলাম স্বীকার করে। মদীনা সনদ অমুসলিমদের মদীনায় বসবাসের অধিকার দিয়েছিল। এমনকি, তাদের একটি অংশ বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও বাকী অংশের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়নি। ইসলাম একজন অমুসলিম শ্রমিককে একজন মুসলিম শ্রমিকের মতই সুযোগ-সুবিধা দেয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, "সতর্ক থাক, সে ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তি অমুসলিমদের উপর যুলুম করে অথবা তাদের হক নষ্ট করে অথবা তাদের সামর্থ্যের চাইতে বেশী কাজের বোঝা চাপাতে চেষ্টা করে অথবা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের থেকে কিছু জোরপূর্বক নেয়, আমি কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়ব।" (আবূ দাউদ)।

অমুসলিমদের ধর্মীয় উপাস্যদের নিন্দাবাদ ও গালমন্দকে কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ্ বলেন :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

"আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনা যারা করে তাদের উপাস্যদের তোমরা গালি দিয়ো না।" (সূরা আন'আম : ১০৮)

আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও দাস-প্রথার উচ্ছেদ

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান এবং পৃথিবীর 'সকল মানুষ একই সম্প্রদায়ভুক্ত', আল কুরআনের ভাষায় :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً

'সমগ্র মানব জাতি একই উম্মাহভুক্ত।'

ঘৃণ্য দাসপ্রথাকে বিলুপ্ত করে দাসদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম বিপ্লবাত্মক ভূমিকা রেখেছে। মহানবী (সা) ঘৃণ্য দাসপ্রথাকে নিষিদ্ধ করে ঘোষণা দিয়েছিলেন, "তিন ধরনের লোক আছে তাদের বিরুদ্ধে আমি শেষ বিচারের দিন অভিযোগ উত্থাপন করব। একজন সে ব্যক্তি, যে মুক্ত মানুষকে দাসে পরিণত করে, আরেকজন সে ব্যক্তি, যে তাকে (মুক্ত মানুষকে) বিক্রয় করে এবং অন্যজন সে ব্যক্তি, যে দাস বিক্রির অর্থ খায়।"

দাসপ্রথার বিলোপ সাধনে মহানবী (সা) সাহাবীদেরকে উৎসাহিত করেছেন। কিছু কিছু পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপায় হিসেবে মহানবী (সা) দাস মুক্তি দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। দাসমুক্তিকে মহাপুণ্যের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং ৬৩জন দাসকে মুক্তি দেন। তাঁর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) ৬৭জন দাসকে মুক্তি দেন। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারূক (রা) এক হাজার দাস ক্রয় করে তাদের মুক্ত করে দেন। বিত্তবান সাহাবী হযরত আবদুর রহমান (রা) ত্রিশ হাজার দাস ক্রয় করে তাদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং অন্যান্য সাহাবীও সাধ্যমত নিজেদের এবং তাঁদের ক্রয়কৃত দাসদের মুক্তি দানের ব্যবস্থা করেন। এভাবে ইসলাম প্রচারের ৩০/৪০ বছরের মধ্যে আরবের মারাত্মক দাস সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু সকল মানুষের মধ্যে সমতার বাণী প্রচার করে ক্ষান্ত হননি তিনি আবেসিনিয়ার ক্রীতদাস হযরত বিলালকে মসজিদে নব্বীর সম্মানিত 'মুয়ায্যিন' বানিয়েছিলেন ও ক্রীতদাস যায়েদকে আপন ফুফাত বোন হযরত যয়নব (রা)-এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম তাঁর দাসকে মুক্ত করেন এবং দাস মুক্ত করাকে বিশেষ সাওয়াবের কাজ

www.pathagar.com

বলে ঘোষণা দেন। ফলে দাস মুক্তি দানে সাহাবীরা প্রতিযোগিতা শুরু করেন। এছাড়া, মহানবী (সা) ঘোষণা করেন : 'তোমরা যা খাবে তোমাদের দাস-দাসীদেরকেও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে তোমাদের দাস-দাসীদেরকেও তাই পরতে দেবে।' এভাবে ইসলাম মানুষে মানুষে প্রভু-ভৃত্যের কৃত্রিম বিভেদ দূর করে সকল মানুষকে সমান মানবিক অধিকার প্রদান করেছে।

মানুষে মানুষে এই সমতা বিধানের মহত্তম আদর্শ দেখে মুগ্ধ হয়ে Dr. Ahmad Golwash তাঁর *"The Religion of Islam"* গ্রন্থে বলেন, "Equality of right - was the distinguishing feature of the Islamic Commonwealth. A convert from an humble clan enjoyed the same rights and privileges as one who belonged to the noblest Koraish."

বর্তমানে দাসত্ব তথা দাসপ্রথা উচ্ছেদ করার কথা তথাকথিত সভ্য সমাজ মুখে বললেও এটিকে তারা বাস্তবে জিইয়ে রেখেছে। আমেরিকা তার সভ্যতা বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে, বহুতলবিশিষ্ট অট্টলিকা, সুরম্য জনপদ, প্রশস্ত সড়ক, বিশালাকার শিল্প-কারখানা ইত্যাদি নির্মাণে আফ্রিকা থেকে বহুসংখ্যক দাস আমদানি করে। সে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এখনো কিছুটা ভিন্ন আকারে। ১৭৭৬ সনের ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলতে গিয়ে Claude M. Lightfood বলেন :

"Black remained slaves until about 80 years later, women did not recieve the right to vote until 112 years later and the working class did not get the legal right to organise and collectively bargain until 150 years later."

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ Bosworth Smith তাঁর *"Mohammed and Mohamadanism"* গ্রন্থে বলেন :

"It recognised individual and public liberty, secured the person and property of the subjects and postered the growth of all civic virtues. It communicated all the privileges of the conquering class to those of the conquered who conformed of its religion, and all the protection of citizenship to those who did not. It put an end to old customs that were of immoral and criminal character. It abolished the inhuman custom of burying the infant daughters alive, and took effective measures for the suppression of the slave-traffic."

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) উৎপাদিত পণ্যে শ্রমিকের অংশীদারিত্বের কথা বলেছেন। দুনিয়ার কোথাও যখন শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে মানুষের কোনই সচেতনতা ছিল না সেই অন্ধকার যুগে বিশ্ব-মানবতার মুক্তিদূত মহানবী (সা)-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনার নগর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ইসলামী সমাজে নারী, পুরুষ, শ্রমিক, সাধারণ জনতা নির্বিশেষে সকল মানুষ মৌলিক অধিকার পরিপূর্ণরূপে ভোগ করে। আধুনিক মানবাধিকারের ধারণা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে ১৯৪৫ সনে প্রণীত জাতিসংঘ চার্টারে। কিন্তু এর ১৩০০ বছর পূর্বে সমগ্র পৃথিবী যখন জাহিলিয়াতের ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত, সে সময় মহানবী (সা) মানবাধিকারের সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আদর্শ মানব সমাজ গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র নবী (সা) নিজেও শ্রমিক ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি কয়েক কীরাত মজুরিতে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম" (বুখারী)। মদীনার শাসক হওয়ার পরও সারা জীবন তিনি শ্রমজীবী মানুষের মতো জীবন অতিবাহিত করেছেন।

শ্রমিকের পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা

ইসলাম কায়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় প্রকার শ্রমের মর্যাদা দিয়েছে এবং শ্রমিকের পেশা গ্রহণের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। মহানবী (সা) ফরমান, "সমস্ত পৃথিবী ও জমিন আল্লাহ্‌র, আর সমস্ত মানুষ আল্লাহ্‌র বান্দা। তাই যেখানেই তুমি মঙ্গলজনক মনে কর সেখানেই বাস কর।" (আল-হাদীস)।

www.pathagar.com

ইসলামে ভিক্ষাবৃত্তির স্থান নেই

মহানবী (সা) ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছের। মহানবী (সা) বলতেন, "যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, সে কোনদিন ভিক্ষা করবে না তার জান্নাত লাভের দায়িত্ব আমি নিলাম।" (আবূ দাউদ)।

ইসলামে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক

আমাদের শ্রম আইনে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক হচ্ছে প্রভু-ভৃত্যের সমতুল্য। কিন্তু মহানবী (সা)-এর আদর্শে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা ও পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে রাসূল করীম (সা) বলেছেন, "তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ যে ভাইকে যে ভাইয়ের অধীন করে দিয়েছেন, তাকে তাই খাওয়াতে হবে - যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরতে দিতে হবে যা সে নিজে পরিধান করে।" (বুখারী-মুসলিম)।

শ্রমিকের প্রতিও আল-কুরআনের নির্দেশ :

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ

'সর্বোত্তম শ্রমিক সে, যে দৈহিক দিক দিয়ে শক্ত-সমর্থ ও আমানতদার।' (সূরা কাসাস : ২৬)।

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَىْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذَالِكَ غَدًا

"আর মনে রাখবে কোন নিজিস সম্পর্কে কখনো একথা বলবে না যে, আমি কাল এ কাজ করব" (সূরা কাহাফ : ২৩)।

মালিক-শ্রমিক উভয়ের প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ :

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً

"ওয়াদা পূর্ণ কর। 'ওয়াদা সম্পর্কে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।' (সূরা ইসরার : ৩৪)।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا

"আল্লাহ্ কারো উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেন না।' (সূরা বাকারা : ২৮৬)।

রাসূল (সা) বলেছেন, "শক্তি সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ শ্রমিকের উপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ তাকে দাও তাহলে সে কাজে তাকে সাহায্য কর।" (বুখারী-মুসলিম)। 'কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ না জানিয়ে কাউকে কাজে নিয়োগ করা ঠিক নয়।' (আল-হাদীস)।

সাধ্যানুযায়ী ও রুচি অনুযায়ী কাজ করার অধিকার ইসলাম দিয়েছে মানুষের জন্মগত অধিকার হিসেবে। শ্রমিককে এক কাজের জন্য নিয়োগ দিয়ে অন্য কাজ করানো যাবে না যা হয়ত তার জন্য অধিক কষ্টকর। এ প্রসঙ্গে শ্রমিকের স্বাধীন সম্মতি নিতে হবে। এটাই ইসলামী শ্রমনীতির মূলনীতি।

ইসলামে শিশুশ্রম

ইসলাম শিশুশ্রম সমর্থন করে না। ছোটদের প্রতি দয়া, তাদের শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করাসহ তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ইসলাম জাতীয় ও ঈমানী দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করে। মহানবী (সা) বলেছেন : "যারা ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (আবূ দাউদ)।

হযরত ওজলী ইবনে আতার (রা) বর্ণনা মতে, মদীনায় তিনজন শিক্ষিত মুসলমান ছিলেন, তারা মদীনার শিশুদেরকে শিক্ষা দিতেন। আর হযরত উমর (রা) তাদেরকে রাষ্ট্রীয় তহবিল (বায়তুল মাল) থেকে মাসোহারা (বেতন) দিতেন।'

www.pathagar.com

মজুরি নির্ধারণ

নবী করীম (সা) বলেছেন, "মজুরি নির্ধারণ ব্যতীত কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা অনুচিত।" (বায়হাকী)। ইসলাম যে কোনো লেনদেনের চুক্তি লিখিতভাবে করার নির্দেশ দিয়েছে। কোনো শ্রমিকের দ্বারা অতিরিক্ত কাজ করানো হলে অবশ্যই তাকে অতিরিক্ত মজুরি দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা)-এর নির্দেশ : "তোমরা তাদের উপর বাড়তি দায়িত্ব চাপালে সে হিসাবে তাদেরকে বাড়তি মজুরি দিয়ে দাও।"

রাসূলে পাক (সা) পারিশ্রমিক নির্ধারণ ছাড়া শ্রমিকদের থেকে কাজ করিয়ে নেয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক কাজ করা মাত্রই পারিশ্রমিক দাবী করতে পারে। চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক শ্রমিককে যথাসময়ে পূর্ণ বেতন পরিশোধ করে দিতে হবে। ত্বরিত মজুরি পরিশোধের তাগিদ দিয়ে মহানবী (সা) বলেন : "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরি আদায় করে দাও।" (ইবনে মাজাহ)। নবী করীম (সা) আরো বলেছেন : "তিন ধরনের ব্যক্তি আছে কিয়ামতের দিন আমি যাদের দুশমন হবো। আর আমি যাদের দুশমন হবো তাকে আমি লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত করে ছাড়ব। উক্ত তিনজনের মধ্যে একজন সে, যে কোনো শ্রমিককে খাটিয়ে নিজের পুরোপুরি কাজ আদায় করে নেয় ; কিন্তু তার উচিত মজুরি দেয় না।" (বুখারী)।

উৎপাদিত পণ্যে শ্রমিকের অংশীদারিত্ব

উৎপাদিত পণ্যে তথা মুনাফায় শ্রমিকের অংশীদারিত্ব ইসলামী শ্রমনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেননা, পুঁজি তথা মুনাফা শ্রমিকের সমন্বয়ের ফলেই উৎপাদন হয়। মহানবী (সা) বহুদিন পর্যন্ত মুদারাবাতের ভিত্তিতে নিজের শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভের অংশীদার হিসেবে হযরত খাদিজার (রা) ব্যবসায় শ্রম দিয়েছেন। ইসলাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিককে লভ্যাংশের অধিকার প্রদান করে। নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ : 'মজুর ও শ্রমিককে তার শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য হতেও অংশ প্রদান কর। কারণ আল্লাহ্‌র মজুরকে কিছুতেই বঞ্চিত করা যায় না।' (১৭৩, মসনদে আহমদ)।

আল-কুরআনের ঘোষণা :

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

'বিত্তবানদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।' সূরা জারিয়াত : ১৯)।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

'যেন তারা তার ফল পেতে পারে যা তাদের হাত দ্বারা করা হয়েছে।' (সূরা ইয়াসিন : ৬৫)।

ইসলামী শ্রমনীতির মূলনীতি

স্বয়ং আল্লাহ্‌র নির্দেশ :

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

'তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মুতাবিক মীমাংসা করে নাও।' (সূরা নিসা : ৫৯)।

পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে পারস্পরিক মতদ্বৈধতা মীমাংসার ক্ষেত্রে ইসলাম-প্রদত্ত শাশ্বত মূলনীতি সম্পর্কে উপরে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। শ্রমিক-মালিকের দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার ও পাওনা সম্পর্কে মতদ্বৈধতা নিরসনের ক্ষেত্রেও এ মূলনীতি অনুসরণ করে সুফল পাওয়া সম্ভব। একমাত্র এ মূলনীতি অনুসরণের মাধ্যমেই যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান সম্ভব এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল মানব জাতি কাঙ্খিত শান্তি ও কল্যাণ লাভ করতে পারে।

www.pathagar.com

উপরে মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনামূলক মাত্র কয়েকটি বিষয় আলোচিত হলো। ইসলাম মহান স্রষ্টা-প্রদত্ত পরিপূর্ণ, নির্ভুল ও শাশ্বত জীবন-ব্যবস্থা। মানব-রচিত বিধান যতই সদুদ্দেশ্য প্রণোনিদত হোক না কেন, মানবিক সীমাবদ্ধতার কারণেই তা কখনো নির্ভুল ও চিরন্তন হতে পারে না। তাই বর্তমান অশান্তিপূর্ণ, হিংসা-বিদ্বেষ-বিভেদ ও সংঘর্ষপূর্ণ পৃথিবীতে ইসলাম-প্রদত্ত মাবাধিকার বিষয়ক বিধান তথা স্রষ্টা-প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থা অনুসরণের মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি, কল্যাণ ও সুষম মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ বিষয়ে সুধিজনকে গভীর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৩

শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরিবারের ভূমিকা : ইসলামী চিন্তাধারা

মুহম্মদ শফিকুর রহমান*

ইসলাম কল্যাণময় জীবন বিধান। মানব জীবনের সকল স্তর ও সকল বয়সের জন্য শান্তি ও কল্যাণের পথনির্দেশ ইসলামে রয়েছে। মানব জীবনের মূল ভিত্তি হচ্ছে শৈশবকাল। তাই ইসলাম শৈশবকালের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কেননা, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত। ইসলাম শিশুর প্রতিপালনের জন্য পরিবারের ভূমিকাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। পরিবারেই মানব শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার ভিত রচিত হয়। শিশু সর্বপ্রথম প্রভাবান্বিত হয় তার পিতামাতার দ্বারা। কেননা, শিশু তার আচার-আচারণে পিতা-মাতাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই শিশুরা বড় হয়ে যেন নিজেদেরকে সমাজের আদর্শ হিসেবে নিজেকে পেশ করতে পারে সেজন্য পিতা-মাতার কর্তব্য শিশুর সামনে উত্তম আচার-আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে সুন্দর আচরণে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা। তাহলেই সে সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে সুন্দর আদর্শ মানুষ হিসেবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। আধুনিক বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থা পারিবারিক প্রথার বিরুদ্ধে যত কথাই বলুক না কেন, বস্তুত পক্ষে একটি মানব শিশু প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য তার পরিবারই হচ্ছে মূল কেন্দ্র।

পারিবারিক জীবন ব্যতীত যেমন মানব সভ্যতার বিকাশ অচিন্তনীয়, তেমনি শিশু কিশোরদের চরিত্র গঠনে পারিবারিক জীবনের বিকল্প নেই। তাই ইসলাম পারিবারিক জীবনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বলা হয়েছে :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً

"আর আল্লাহ্ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন।"[১]

মানব শিশুই পারে সমাজে তার পিতা-মাতাকে মর্যাদার আসনে আসীন করাতে। শুধু তাই নয়, মানুষ পরকালীন জীবনেও লাভবান হতে পারে এমন একটি সম্পদ হচ্ছে তার সন্তান, মৃত্যু পরবর্তী জীবনে সে তার জন্য মোনাজাত করবে। মহানবী (সা) বলেন :

اذا مات ابن ادم انقطع عمله الامن ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله

"মানুষ যখন মারা যায় তার সমস্ত নেক আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমলের সওয়াব তার জন্য জারী থাকে–১. সদকায়ে জারিয়া ২. এমন ইলম (জ্ঞান) যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয় ৩. এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"[২]

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আল-কুরআন, ১৬ : ৭২

২. ইমাম মহি আল দীন ইয়াহ্য়া আল নববী, *রিয়াদ আল সালেহীন*, (অনুবাদ : আঃ মন্নান তালিব এম. এম. ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, জানু. ৯৬).৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৫

www.pathagar.com

শিশুকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সম্পদরূপে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং ইসলাম নির্দেশিত শিশুর অধিকারসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা। মানব শিশুর জন্ম হয়ত বা পারিবারিক জীবন ব্যতীতও সম্ভব, কিন্তু তার পবিত্রতা বিধান, সুষ্ঠু লালন-পালন, সঠিক পরিচর্যা, এবং ভবিষ্যতে সমাজের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা পারিবারিক জীবন ব্যতীত আদৌ সম্ভব নয়। মানব জাতির সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনায় পবিত্র কুরআনে প্রথম নর-নারীর, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পারিবারিক জীবন যাপনের প্রতিই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের একব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।"[৩]

শিশু সন্তানকে পবিত্র কুরআনে সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"ধন-ঐশ্বর্য ও শিশু সন্তান পার্থিব জীবনের শোভা।"[৪]

শিশুকে সত্যিকার অর্থে সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইসলাম শিশুর পিতা-মাতা তথা পরিবারের প্রতি বহুবিধ অধিকার আদায়ের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেছে। শিশুর লালন-পালনের ক্ষেত্রে ইসলাম নির্দেশিত অধিকারসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১. মানব শিশুকে প্রকৃত সম্পদ, সমাজের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ ও মানব কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিতভাবে শিশুর জন্ম প্রক্রিয়া সম্পন্ন, লালন-পালন, এবং শিশুর অধিকারসমূহ যথাযথভাবে আদায়ের মাধ্যমে তার সঠিক পরিচর্যা। শিশু প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য ইসলাম তার পরিবারের উপর বহুসংখ্যক মানবিক অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে, যাতে সে উপযুক্ত পরিবেশে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। জাতিসংঘ সনদে শিশু-অধিকার সম্বলিত বিশেষ ধারা সংযোজনের বহুকাল পূর্বে ইসলাম শিশুর বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আসছে এবং শিশু-সন্তানের পরিচর্যার ইসলামের মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। ইসলাম যে শিশুর জন্ম মুহূর্ত থেকেই তার অধিকারসমূহ চিহ্নিত করেছে তা নয় বরং শিশুর জন্মের পূর্ব থেকেই ইসলাম তার অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে যথাযথভাবে আদায় করার প্রতিও নির্দেশ আরোপ করেছে।[৫] যে কোন উপায়েই হোক শিশুর ন্যায্য অধিকার সঠিকভাবে আদায়ের প্রতি ইসলাম অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। পিতা-মাতার উপর আল্লাহ্ প্রদত্ত শিশুর অধিকারসমূহ সংরক্ষণের স্বার্থে গর্ভধারণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করারও অনুমতি ইসলামে রয়েছে।[৬]

শিশুকে মানব জাতির জন্য কল্যাণকর সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পিতা-মাতাকে হাতে গুণে কয়েকটি দায়িত্ব পালন করলে হবে না, বরং সময়, কাল ও পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োজনীয় সার্বিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। মহানবী (সা) বলেছেন :

---

৩. আল-কুরআন, ৪ : ১

৪. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৬

৫. *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, সম্পাদনা (ঢাকা, ই. ফা. বা. প্রকাশনা- ১৯৮৭), পৃ. ১৯

৬. (....and right that should make parents think of adjusting their procreation patterns to their `religious' obligations to their children). Abdel Rahim Omran, *Family planning in the Legacy of Islam*, Routledge, London and New York-1992 p. 32

www.pathagar.com

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الرجل فى بيته راع ومسئول عن رعيته والمراة فى بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها

"তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। তোমরা সকলেই ব্যক্তিগতভাবে অধীনস্তদের জন্য দায়ী হবে। পিতা তার সংসারে সকলের জন্য দায়ী এবং আওতাধীন যারা আছে তাদের সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের জন্য দায়ী। তার সংসারের সকলের বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৭]

ইসলাম শিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে পিতা-মাতার প্রতি জোরালো নির্দেশ প্রদান করেছে এবং এ ক্ষেত্রে কোনরূপ শৈথিল্যের অবকাশ রাখেনি। নবী করীম (সা) ঘোষণা করেন :

كفى بالمرء اثما أن يحبس عمن يملك قوته

"যাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে এ কাজই তার গুনাহ্ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"[৮] অন্য কথায়, এ গুনাহ্ই তার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। কেননা তারা তারই বংশধর ও পরিবার-পরিজন। তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অর্থই তার নিজের ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

পরিবার তথা পিতা-মাতা শিশু সন্তানের কোন্ কোন্ দায়িত্ব, কতদিন যাবত পালন করবেন এমন প্রশ্নের জবাবে বলা যায় শিশু পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সার্বিক দায়িত্ব পিতামাতাকেই বহন করতে হয়। একটি শিশুর গর্ভ অবস্থা হতে শুরু করে পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সময়টুকুই হচ্ছে মানব জীবনের অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে একটি শিশু পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, অভিভাবক, সমাজ ও পরিবেশের ছোঁয়াতে প্রকৃত মানুষ হয়ে সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে, অথবা অমানুষ হয়ে সমাজের জন্য বিষফোঁড়া হিসেবে প্রকাশ পায়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা)-এর মুখ নিঃসৃত নিচের হাদীসটি উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি বলেন :

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

"প্রত্যেক শিশুই ফিত্রাত (স্বভাব)–এর উপর জন্মগ্রহণ করে, পরবর্তীতে তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা বা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে।"[৯]

বস্তুত পরবর্তীতে শুধু খাওয়া-পরা দিয়ে লালন-পালন করলেই দায়িত্ব পালন হবে না, বরং উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবেশ দিয়ে শিশুকে প্রকৃত মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সকল আয়োজন করতে হবে। শিশু হচ্ছে পিতামাতার নিকট আল্লাহ্র আমানত স্বরূপ। তাদের আকীদা-বিশ্বাস, মন-মগজ, চরিত্র-অভ্যাস, জীবন যাত্রার ধারা ইত্যাদিকে সঠিকরূপে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা পিতামাতাসহ পরিবারের সকলের কর্তব্য। মোটকথা পিতামাতা শিশু-সন্তানকে এমন গুণের অধিকারী করে গড়ে তুলবেন, যেন সে সমাজের বোঝা বা ক্রীড়নক না হয়ে আশীর্বাদ হয়। এ বিষয়ের প্রতিই ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। শিশুকে নেক ও আদর্শবান করে গড়ে তোলার জন্য বহুবিধ অধিকার যথাযথভাবে পালনের প্রতি ইসলাম জোরালো নির্দেশ দিয়েছে। একটি শিশুর পূর্ণ যৌবনে পৌঁছা পর্যন্ত অন্যকথায় তাকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার সময় পর্যন্ত ইসলাম নির্দেশিত অধিকারসমূহ নিম্নে আলোচিত হলো :

---

৭ ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী,* (কলিকাতা, রশিদ হোসাইন এণ্ড সন্স-১৯৭৩) কিতাব আল-জুমুয়া, পৃ. ১২২

৮. ইমাম মহি আল-দীন ইয়াহ্য়া আল নব্বী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৯৪, পৃ. ২০৫

৯. মুসলিম ইবনে আল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম,* (করাচী, আসাহ্হাল মাতাবী, ১৯৩০ খ্রি.) ২য় খণ্ড, কিতাব আল-কদর, পৃ. ৩৩৬

www.pathagar.com

১.১. ইসলাম শুধু জন্মের পর থেকেই শিশুর প্রতি গুরুত্ব দেয় না জন্মের পূর্ব থেকেই ইসলাম তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। শিশু একটি পবিত্র বংশধারায় জন্মগ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে। মহানবী (সা)-এ প্রসঙ্গে বলেন :

تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس او نزاع

"কোথায় তোমার বীর্য স্থাপন করবে তা চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করে নাও। বংশধারা যেন সঠিক থাকে।"[১০]

মহানবীর (সা) আরো বলেন :

فاظفر بذات الدين تربت يداك

"এদের মধ্যে যে ধর্মভীরু তাকেই যেন অগ্রাধিকার দাও, তোমার হাতে মাটি পড়ুক।"[১১]

অর্থাৎ বিয়ের ক্ষেত্রে মহিলার রূপ বা সম্পদ যেন সব কিছু বলে বিবেচিত না হয়, বরং এর যে কোন একটির সাথে ধর্মপরায়ণতার গুণটি যেন যুক্ত হয়। আর সে যেন মার্জিত পরিবারের সদস্য হয়। কেননা, তার সন্তানেরা তার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও আচরণ ইত্যাদি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হবে। অপরদিকে ইসলাম নিষেধ করেছে ঐ মহিলার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে যার আচার-আচরণ ও চারিত্রিক মূল্যবোধ সুমার্জিত নয়। বলা হয়েছে :

إياكم وخضراء الدمن

"তোমরা ময়লার স্তূপে উৎপন্ন শ্যামলিকা অর্থাৎ নিকৃষ্ট বংশের সুন্দরী রমণী থেকে বেঁচে থাক।"[১২]

অনুরূপভাবে মহানবী (সা) প্রস্তাবিত মহিলার অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা যেন পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্মপরায়ণ, চরিত্রবান এবং দায়িত্বশীল পাত্রকে অগ্রাধিকার দেন। তিনি বলেন :

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنه في الأرض وفساد عريض

যদি তোমার নিকট এমন কোন প্রস্তাব আসে যার ধর্মপরায়ণতা ও চরিত্র তোমাদের পছন্দের হয়, তাহলে তার সাথেই বিবাহ দেবে। যদি তোমরা এ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হও তাহলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়।"[১৩]

ইসলাম নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে বিয়ে করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছে। কেননা, রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বারবার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে জন্মগত অক্ষমতার সৃষ্টি হতে পারে। তাদের দেহ ক্ষীণকায় এবং মেধা নিম্নমানের হতে পারে।[১৪] পবিত্র কুরআনেও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এ কথার প্রতি যে, শিশুকে মা-বাবার মিশ্রিত বীর্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

---

১০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাজভীনী, *সুনান ইবনি মাযাহ*, (কলিকাতা, বশীর হোসাইন এণ্ড সন্স-১৯৭৩) কিতাব আল-নিকাহ, পৃ. ১৪২

১১. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাব আল-নিকাহ্, আল-ইক্ফা-ফী আল দীন আনুচ্ছেদ, পৃ. ৭৬২

১২. ডক্টর আবদেল রহীম উমরান, *তানজিম আল উসরাত ফি-আল-তিরাস-আল ইসলামী*, (মিশর, কায়রো জামে'য়া আল আজহার আল ইসলামী, ১৯৯৪) পৃ. ৩৪

১৩. আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে মাযাহ আল-কাজভীনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

১৪. প্রফেসর আবদেল রহিম উমরান, *ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা*, (অনুবাদ : শামসুল আলম, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৫) পৃ. ৫১

www.pathagar.com

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে।"[১৫]

সন্তানকে পিতামাতার ভিন্ন ভিন্ন বীর্যের একত্রিতকরণে এবং উভয় পরিবারের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়ে থাকে। এর তাৎপর্য হচ্ছে, সন্তান পিতামাতার বংশ সম্পর্কীয় হলে শিশু বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে অধিকতর উর্বর হবে, চিন্তাশক্তির দিক দিয়ে হবে তীক্ষ্ণ এবং শারীরিক গঠন ও আকৃতির দিক দিয়ে হবে অধিকতর শক্তিশালী।

আরবের আল সাঈব গোত্রের লোকেরা ক্ষীণকায় দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল দেখে হযরত উমর ফারুক (রা) বলেছিলেন :

يا آل السائب قد أضويتم، فانكحوا فى الترائع

"হে সা'ইব গোত্রের লোকজন। তোমাদের সন্তান-সন্ততি দুর্বল ও ক্ষীণকায় হয়ে যাচ্ছে, তোমাদের উচিত স্বীয় গোত্রের বাইরে বিয়ে করা।"[১৬]

প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাযালী (র) (১০৫৮-১১১১ খ্রি.) অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, অতি নিকট আত্মীয়দের (First Cousin) মধ্য থেকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা সংগত নয়। কারণ, সন্তান ক্ষীণকায় ও মেধাহীন হতে পারে।[১৭] আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বহু গবেষণার পর উপলব্ধি করেছে যে, ক্রমাগত নিকট আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পৌনঃপুনিক বিবাহ সম্পাদিত হলে সন্তান, দুর্বল, কায়ক্লিষ্ট ছাড়াও বংশধারায় নানাবিধ রোগের প্রকোপ দেখা দিতে পারে।[১৮] উল্লিখিত বিষয়ে ইসলাম কয়েক শতাব্দী পূর্বেই জোরালো ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, যদি স্বামী-স্ত্রীর নির্বাচন সুষ্ঠু ভিত্তির উপর সম্পন্ন হয় তখন সন্তানেরা হবে আল্লাহ্‌র বিশেষ দান ও জীবনের সৌন্দর্য বিশেষ।[১৯]

১.২ ইসলাম শুধু শিশু কেন, গোটা মানব গোষ্ঠীর জীবনে নিরাপত্তা বিধানে সামান্যতম শৈথিল্য প্রদর্শন করেনি। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"আল্লাহ্ যে প্রাণ হত্যা করা অবৈধ করে দিয়েছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না।"[২০] এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ মানবজাতির জীবনের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন–কোন কারণ ব্যতীত মানুষ একে অপরকে কোন অবস্থায়ই হত্যা করবে না। প্রচলিত এ সাধারণ নীতির সাথে সাথে শিশুদের জীবন ও পরিবর্ধন বিষয়ের সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

১৫. আল-কুরআন, ৭৬ : ২

১৬. প্রফেসর আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১৭. ইমাম-গায্যালী, *ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন*, (অনুঃ মাওলানা ফজলুল করীম, ঢাকা-১৯৬১), পৃ. ৭১০

১৮. These include sickle cell anaemia, cystic fibrosis (of the lung and pancreas), thalassemia (a blood disease), and phanylketonuria (PKU) (a dcficiency of an essential liver enzyme). Abdel Rahim Omran, Op. cit. p. 23

১৯. *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২০. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১

www.pathagar.com

"নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা ব্যতীত কেহ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেহ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।"[২১]

অন্ধকার যুগের লোকেরা শিশু-সন্তানদের হত্যা করত, বিশেষ করে তারা কন্যা সন্তান জন্ম নিলে ক্ষোভে, দুঃখে এবং লজ্জায় জীবন্ত কবর দিত। ইসলাম এ ঘৃণ্য প্রথাকে নিষিদ্ধ করে এবং মহাপাপ বলে ঘোষণা দেয়। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَا كَظِيْمٌ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَابُشِّرَبِهٖ أَيُمْسِكُهُ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِى التُّرَابِ اَلَا سَاءَ يَحْكُمُوْنَ

"তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয় তাদের চেহারা কালো হয়ে যায় এবং তারা অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তা সে এত গ্লানিকর মনে করে যে, সে আত্মীয়-স্বজন থেকেও আত্মগোপন করে। সে তখন চিন্তা করতে থাকে এ অপমান সত্ত্বেও সে কি তাকে জীবিত রাখবে না জীবন্ত পুঁতে ফেলবে। সাবধান! এ ধরনের চিন্তা ও সিদ্ধান্ত অতি জঘন্য এবং নিকৃষ্ট।"[২২] সন্তান পুত্র কিংবা কন্যা হোক পারিবারিক সম্মানহানির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে অথবা দারিদ্রের ভয়ে অজ্ঞতা যুগের যে কোন কারণেই তাকে হত্যা করা যাবে না। এ ধরনের অমানবিক প্রথা ইসলামে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

لَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادِكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

"দারিদ্রের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি।"[২৩] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلَاتَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا

"দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। ওদেরকে এবং তোমাদের আমি রিযিক দিয়ে থাকি। সন্তান হত্যা করা মহাপাপ।"[২৪]

মহান আল্লাহ্ সন্তান হত্যার পরিণাম বলতে গিয়ে অন্য আয়াতে ঘোষণা করেন :

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلَادَهُمْ

'যারা নিজেদের সন্তানদের হত্যা করলো তারা খুবই ক্ষতিগ্রস্থ।"[২৫]

বস্তুত ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসে শিশু হচ্ছে পিতামাতার নিকট রক্ষিত আমানত। যে আমানত সম্পর্কে পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে শেষ দিবসের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"ঐ দিন যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে (স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে), কি অপরাধে উহাকে হত্যা করা হয়েছিল।"[২৬]

---

২১. আল-কুরআন, ৫ : ৩২
২২. আল-কুরআন, ১৬ : ৫৮-৫৯
২৩. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১
২৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৩১
২৫. আল-কুরআন, ৬ : ১৪০
২৬. আল-কুরআন, ৮১ : ৮-৯

www.pathagar.com

১.৩ জন্মের বৈধতা ইসলামে পরিবার গঠনের মৌলিক ভিত্তি। ইসলামপূর্ব অন্ধকার যুগের ন্যায় বর্তমানেও তথাকথিত উন্নত সমাজে বহু শিশু জন্মদাতার পরিচয় ছাড়াই হতভাগ্যের ন্যায় বেঁচে থাকে। আর এটা যে সভ্য সমাজ গঠনের অন্তরায় তা সর্বজনবিদিত। অন্ধকার যুগে একাধিক ব্যক্তি একই শিশুর পিতা বলে দাবী করলে মহানবী (সা) অত্যন্ত ব্যথিত হন। ইসলাম এ বিষয়ে একটি সাধারণ নিয়ম করে দেয় الولد للفرش। "শিশু বৈবাহিক বিছানার।"[২৭] অর্থাৎ সন্তানের বৈধতার পূর্বশর্ত হচ্ছে বিবাহ প্রথা। বিবাহ হচ্ছে নারী পুরুষের বৈধ মিলন ও বৈধভাবে শিশু জন্মদানের একটি প্রক্রিয়া। আর বিয়ের মাধ্যমে পরিবারের অস্তিত্ব না থাকলে মানবজাতি বর্তমান উন্নত পর্যায়ে হয়তো পৌঁছতে পারত না।[২৮]

১.৪. ইসলামে শিশুর নাম অতীব গুরত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক মুসলিম শিশুর শরী'আতসম্মত, সহজ, সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা একান্ত প্রয়োজন। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

"আল্লাহ্‌র সুন্দরতম নাম আছে, সে নামে তাঁকে ডাকো।"[২৯] এ প্রসংগে মহানবী (সা) বলেন :

من حق الولدعلى الوالدين يحسن أدبه ويحسن اسمه

"পিতার উপর শিশুর অধিকার হচ্ছে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং সুন্দর একটি নাম রাখা।"[৩০]

এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার বহু গুণবাচক নাম রয়েছে, ঐসমস্ত নামের সাথে 'আবদ' শব্দ যোগ করে নাম রাখা উত্তম। মহানবী (সা) বলেন :

أحب الأسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হল আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।"[৩১] কল্যাণ ও বরকতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র নাম 'মুহাম্মদ' নামে নামকরণের মধ্যে বহু ফযীলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "মুহাম্মদ নামে বরকত নিহিত আছে, যে ঘরে মুহাম্মদ নামের লোক থাকবে সে ঘরে বরকত হবে, যে সমাবেশে মুহাম্মদ নামের লোক থাকবে সে সমাবেশে বরকত হবে।"[৩২]

অবশ্য সে সুন্দর নামের বিন্যাস হতে হবে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের (রা) সুন্নাহ অনুযায়ী। আমাদের এ উপমহাদেশে প্রচলন না থাকলেও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, মুসলমানদের নামের সাথে পিতার নাম সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্‌র বাণী কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস এ দু'য়ের মধ্যেই এ সম্বন্ধে তাগিদ এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন : اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ "তাদের পিতাদের নামেই তাদেরকে ডাকো, সেটাই আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত ন্যায়সংগত।"[৩৩] শেষ বিচারের দিনেও মানুষ তাদের নাম ও পিতার নামে পরিচিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) সে সংবাদ জানিয়ে বলেছেন :

---

২৭ ইমাম তিরমিযী, *তিরমিযী, জামে,* (করাচী, মাতাব-ই-সাঈদী, ১৩৮০ খৃ.) কিতাব-আল-ওয়াসায়া, পৃ. ৪২

২৮. মোহাম্মদ আবুল কাসেম ভূইয়া, *যুগ-জিজ্ঞাসা ও পরিবার,* (ঢাকা, ই ফা বা, জুলাই- ১৯৮৭) পৃ. ১

২৯. আল-কুরআন, ৭ : ১৮০

৩০. বাশীর বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল হামীদ আল্-মা'সুমী, *ইসলামে নামকরণের পদ্ধতি,* ২য় সংস্করণ (ঢাকা- ১৯৯০) পৃ. ৩২ ; (হাদীসটি দুর্বল)

৩১. *কানযুল উম্মাল,* পৃ. ৪১৭, সূত্র : *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* (ইফাবা ঢাকা-২০০০) পৃ. ১৩৮

৩২. *কানযুল উম্মাল,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৩৩. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫

www.pathagar.com

أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبائكم فأحسنوا أسمائكم

"কিয়ামতের দিনে তোমাদেরকে ডাকা হবে তোমাদের নামে এবং তোমাদের পিতাদের নামে, তাই তোমাদের নামগুলো সুন্দর রাখো।"[৩৪]

অজ্ঞাতসারে বা অবহেলাবশত কোন অর্থহীন বা বিদঘুটে নাম রেখে ফেললে তা পরিবর্তন করে একটি সুন্দর নাম রাখা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সাহাবীর ইসলাম পূর্ববর্তী যুগের রাখা এ ধরনের নাম শুনতে পেলে সাথে সাথে তা পরিবর্তন করে একটি সুন্দর অর্থবোধক ও শ্রুতিমধুর নাম রেখে দিতেন। হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে :

عن عباس رضى الله عنه قال كانت جويرية اسمها برة فحول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية

"হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত জুওয়ারিয়া (রা)-এর পূর্ব নাম ছিল 'বাররাহ্'। রাসূলুল্লাহ (সা) তার নাম পরিবর্তন করে জুওয়ারিয়া রাখলেন"।[৩৫]

এখানে উল্লেখ্য যে, মানব শিশুর নাম শুধু যে শেষ বিচারের দিনেই আবশ্যক তা নয়, মানব জীবনের পুরো সময় এমনকি একটি সন্তানের জন্মলগ্ন থেকেই নামের একান্ত প্রয়োজন। আজকাল সারা পৃথিবীতে শিশুর 'জন্মনিবন্ধন'-এর প্রচলন হয়েছে। জন্ম নিবন্ধন আজকের শিশুদের একটি সামাজিক অধিকার। আর এর জন্য প্রয়োজন শিশুর জন্মের সাথে সাথেই একটি সুন্দর নাম রাখা।

১.৫. শিশু জন্মের পর তার জন্য আকীকাহ[৩৬] করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। মহানবী (সা) এ প্রসঙ্গে বলেন :

كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم السابع ويحلق رأسه

"প্রতিটি সদ্যজাত শিশু তার আকীকার সাথে বন্দী। জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে পশু জবাই করতে হয় এবং তার মাথা কামিয়ে ময়লা দূর করতে হয়।"[৩৭] "নবজাত সন্তান তার আকীকার কাছে বন্দী", কথাটির ব্যাখ্যায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (১৬৪ : ২৪১ হি.) বলেন :

إنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه

"শিশু অবস্থায় কোন সন্তান মারা গেলে এবং তার জন্য যদি আকীকাহ না করা হয়, তবে সে তার পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ্র কাছে শাফায়াত করবে না।"[৩৮] প্রকৃত কথা হচ্ছে আকীকাহ করা অপরিহার্য। প্রাচীন আরব সমাজেও আকীকাহ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এর মধ্যে নিহিত ছিল সামাজিক, নাগরিক, মনস্তাত্ত্বিক-সর্বপ্রকারের কল্যাণবোধ। রাসূলুল্লাহ (সা)ও নিজে আকীকাহ দিয়েছেন, অন্যকে আকীকাহর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সালমান বিন আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি :

مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى

---

৩৪. আবূ দাউদ আল-সাজিসতানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, *কিতাব আল আদাব*, পৃ. ৩৩৬

৩৫. মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশাইরী প্রাগুক্ত, (২য় খণ্ড), পৃ. ২০৮

৩৬. (আকীকাহ্ বলা হয় সে জন্তুকে যা নবজাত সন্তানের নামে যবাই করা হয়)। শিশুর জন্মের পর কর্তিত চুলকেও আকিকাহ বলা হয়। তবে আকীকাহ হচ্ছে শিশু জন্মের পর সপ্তম দিবসে যে পশু যবাই করা হয়। *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকা, ইফাবা- ১৯৮৬) পৃ. ৩৬

৩৭. আবূ দাউদ আল-সাজিস্তানী, *সুনান আবী দাউদ*, (করাচী, এম. এম. সাঈদ কোঃ ১৮৮৭ খৃ.), ২য় খণ্ড, আকীকাহ, পৃ. ৩৬

৩৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ইফাবা ১৯৮৩) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

www.pathagar.com

"প্রত্যেক নবজাত সন্তানের সঙ্গেই আকীকাহ কার্যটি জড়িত, অতএব তোমরা তার নামে জন্তু যবাই করে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার মাথা মুণ্ডন করে চুল ফেলে দাও।"[৩৯]

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকীকাহ করার কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, জন্ম ও তার আকীকার মাঝে সময়ের কিছুটা ব্যবধান হলে জন্মের ব্যস্ততা কেটে উঠে আকীকার প্রস্তুতি গ্রহণের সুবিধা হয়। আর সপ্তম দিনেও যদি আকীকাহ করা সম্ভব না হয় তাহলে দ্বিতীয় সপ্তাহে করা যেতে পারে। তাও সম্ভব না হলে জীবনে যে কোন সময়ে করে নিতে হবে। আকীকার জন্তু ছাগল হলে ছেলে শিশুর জন্য দু'টি আর কন্যা শিশুর জন্য একটি যবেহ করতে হয়। মহানবী (সা) বলেন :

عن الغلام شاتان مكافتان و عن الجارية شاة

"পুরুষ শিশুর জন্য দু'টি ছাগল এবং মেয়ে শিশুর জন্য একটি ছাগল যবাই করাই যথেষ্ট।"[৪০]

১.৬. মুসলিম শিশুর উপযুক্ত বয়সে খাৎনা করা ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক আমল। খাৎনা সুন্নাতে ইব্‌রাহিমী এবং 'ফিৎরাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। মহানবী (সা) বলেন : الفرة خمس الختان "ফিৎরাত তথা স্বভাবজাত কাজ পাঁচটি। তন্মধ্যে একটি খাৎনা করা।"[৪১] সুন্নাতে খাৎনা প্রাচীনকাল থেকেই একটি অত্যাবশ্যকীয় বিধানরূপে প্রচলিত। খাৎনার মধ্যে বহু উপকারিতা নিহিত রয়েছে। শিশু অবস্থায় খাৎনা না করালে ত্বকের ভিতর জমে থাকা ময়লা বিষাক্ত হয়ে 'ফাইমাসিস' (Phimasis) বা 'প্যারাফাইমাসিস' (Paraphimasis) রোগ হতে পারে। এ রোগ হলে চামড়ায় পচন ধরে ক্যান্সারের মত মারাত্মক ব্যাধিও হতে পারে।

অধিকাংশ মুসলিম মনীষীর মতে, শৈশবকালে খাৎনা করা সুন্নাত। কেননা কিছুকাল পরেই তাকে শরী'আতের বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়। খাৎনা না করালে চামড়ার ভাজে প্রশ্রাব ও বীর্য প্রভৃতি আটকে থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।[৪২] খাৎনা যেহেতু ইসলামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং তার পরিচয়জ্ঞাপক আমল, তাই খাৎনাকে কোন অবস্থাতেই এড়িয়ে চলার অবকাশ নেই। কোন অনিবার্য কারণে অধিক বয়স হয়ে গেলেও খাৎনা করিয়ে নিতে হবে। এ ব্যাপারে মহানবী (সা) বলেন :

من اسلم فليختن وان كان كبيرا

"কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সে যেন অবশ্যই খাৎনা করিয়ে নেয়, যদিও সে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।"[৪৩]

১.৭. 'মায়ের দুধের বিকল্প নেই'-এ কথাটি সর্বজনবিদিত। চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্রমাগত গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, শিশুর জন্য মায়ের দুধই সর্বোত্তম ও নিরাপদ খাবার। মায়ের দুধে রয়েছে এমন সব উপাদান যা যে কোন ধরনের সংক্রমণ থেকে শিশুকে রক্ষা করতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি ছাড়াও মায়ের দুধ শিশুর সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। পবিত্র কুরআনে শিশুকে পূর্ণ দু'বছর পর্যন্ত দুধ খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। বলা হয়েছে :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ

৩৯. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, *কিতাব আল-আকীকাহ্*, পৃ. ৮২২
৪০. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
৪১. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড. পৃ. ৮৭৪
৪২. ইমাম-গায্‌যালী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪ ; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৯ম খণ্ড. পৃ. ৪৬১
৪৩. *তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম*, উদ্ধৃত: *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, (ইফাবা, ঢাকা- ২০০০) পৃ. ১৪৯

www.pathagar.com

"জননীগণ তাদের শিশু সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর স্তন্য দান করাবে, যদি তারা দুধ পানের সময়সীমা পূর্ণ করতে চায়।"[৪৪]

এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফ্তি মুহাম্মদ শফী (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'মা'আরেফুল কুরআন' এ উল্লেখ করেছেন, এ আয়াত থেকে বোঝা যায় প্রথমত, শিশুদের স্তন্য দান মায়ের উপর ওয়াজীব। কোন অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির কারণে স্তন্য দান বন্ধ করলে পাপ হবে। দ্বিতীয়ত, স্তন্য দানের জন্য স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে কোন প্রকার পারিশ্রমিক বা বিনিময় পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান থাকে। কেননা, এটা স্বীয় দায়িত্ব। তৃতীয়ত, পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, স্তন্য দানের সময় পূর্ণ দু'বছর। যদি কোন যুক্তিসংগত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা শিশুর অধিকার। এতে আরো বোঝা যাচ্ছে যে, স্তন্য দানের সময়সীমা দু'বছর, এরপর স্তন্য দান করানো যাবে না। তবে কুরআনের অপর আয়াতের[৪৫] আলোকে ইমাম আবূ হানিফা (র) (৮০-১৫০ হি.) শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ৩০ মাস (আড়াই বছর) পর্যন্ত এ সময়সীমাকে বর্ধিত করেছেন। আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করানো সকল ইমামের মতে হারাম।[৪৬]

মাতৃদুগ্ধ পানের গুরুত্বের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্তন্য দানকালে মহিলাদের গর্ভবতী হওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করেছেন–যাকে শরী'আত 'আল ঘায়লাহ', 'ঘায়ল' বা 'ঘেয়াল' (শিশুর প্রতি আঘাত) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসংগে নবী করীম (সা) বলেন :

لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيه عشرة

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের গোপন পন্থায় ধ্বংস করবে না। কেননা, দুগ্ধপায়ী শিশুর বর্তমানে স্ত্রী সঙ্গম করলে শিশুর ক্ষতি হতে পারে।[৪৭] নবী করীম (সা) শিশুদের অধিকারের কথা চিন্তা করে দুধপান কালে স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় :

لقد هممت ان انهى عن الغيلة حتى ذمرت أن الروم فارس سصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم

"দুগ্ধপায়ী শিশুর মায়ের সাথে সঙ্গম করতে আমি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারস্য ও রোমকদের সম্পর্কে জানানো হল যে, তারা এ কাজ করে। তবে তাতে তাদের সন্তানদের তেমন কোন ক্ষতি হয় নি।"[৪৮] তাছাড়া শিশুকে দুধ খাওয়ানোর সময়কাল দু'বছর এত লম্বা সময় পর্যন্ত স্ত্রী মিলন চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করা হলে স্বামীদের তাতে কষ্ট হত এবং এতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল।[৪৯] এতদ্বিধ কারণে মহানবী (সা) শিশুর দুধপানকালে এ কাজকে নিষিদ্ধ না করে এ কাজ থেকে মানুষকে নিরুৎসাহিত করেছেন। গর্ভবতী ও দুগ্ধ দানকারিনী মায়ের খাদ্য ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ইসলামে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে : আল্লাহ তা'আলা গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারি মায়ের জন্য রমযানের রোযা রাখার বাধ্যবাধকতা শীথিল করে দিয়েছেন।"[৫০]

---

৪৪. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩

৪৫. (حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) "তার দুধ পান এবং দুধ ছাড়ানোর সময় হল ত্রিশ মাস/ (আড়াই বছর)-আল-কুরআন, ৪৬ : ১৫

৪৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) *তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন*, (ঢাকা ইফাবা, জুন-১৯৮০) ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯

৪৭. ইমাম আবূ দাউদ আল সাজিসতানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাব আত্-তিব, পৃ. ১৯৪

৪৮. মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, (দেওবন্দ, ভারত, কুতুবখানা রাহিমীয়া) ১ম খণ্ড, *কিতাব আল-নিকাহ্* পৃ. ৪৬৬

৪৯. আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী, *ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান* (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইফাবা ১৯) পৃ. ২৬৪

৫০. ইমাম আলী আল দীন মুহাম্মদ, *মিশকাত আল মাসাবীহ্* (কলিকাতা : এম বশির হাসান এণ্ড সন্স, তা. বি.), পৃ. ১৭৮

www.pathagar.com

বস্তুত মায়ের দুধ শিশুর জন্য নিয়ামত স্বরূপ যা শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বেই মহান আল্লাহ মায়ের স্তনে শিশুর উপযুক্ত খাদ্য হিসেবে সৃষ্টি করে দেন। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে একদিকে শিশুর পরিমিত পরিমাণে পুষ্টি পেয়ে স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠে, অপরদিকে মা ও সন্তানের মাঝে এক অকৃত্রিম ও মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে যার প্রভাব শিশুর শৈশব পরবর্তী সামাজিক জীবনেও কাজ করে।

১.৮. পিতামাতার উপর শিশুর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট বয়সে তার জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করা। মহানবী (সা) এরশাদ করেন :

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন ৭ বছর হয় তখন তাদেরকে নামাযের জন্য আদেশ কর। ১০ বছর বয়সে তাদেরকে নামাযের জন্য হালকা মার দাও এবং তাদের শয্যা আলাদা করে দাও।"[৫১]

ইমাম গায্যালী (র) (১০৫৮-১১১১ খ্রি.) বলেন, "ছয় বছর বয়স হলে তাকে আদব শিখাবে, নয় বছর বয়সে তার বিছানা পৃথক করে দিবে এবং তের বছর বয়সে তাকে নামাযের জন্য প্রহার করবে।"[৫২] আলাদা শয্যার ব্যবস্থা পৃথক কক্ষে হতে পারে, একই কক্ষের বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে, তবে প্রত্যেকের শয্যা পৃথক হতে হবে।

১.৯. শিশুর ভবিষ্যতে নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম মাতাপিতার ও পরিবারের প্রতি আরোপ করেছে বিশেষ দায়িত্ব। সন্তান হচ্ছে মাতা-পিতার নিকট মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র আমানত। যদি মাতা-পিতা অজ্ঞতা বা অক্ষমতার কারণে শিশুদের দেখা-শুনায় মনোযোগী না হয়, তবে অবশ্যই তাদের জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ

"ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের এবং আপন পরিবার পরিজনকে ঐ আগুনের হাত থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর।"[৫৩] নিজেদের পরিবার-পরিজনকে ধ্বংস ও আগুনের হাত থেকে বাঁচানোর বিষয়টি নিজেকে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর মতই সমান গুরুত্ব রাখে। আর এ ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ বিষয়টি পরকালের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তদ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ পার্থিব জীবনেও। সন্তানকে যাতে পার্থিব জীবনে আর্থিক অসুবিধায় পড়তে না হয় সে বিষয়ে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বলা হয়েছে :

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

"নিজের সন্তানকে অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর ফেলে যাওয়ার চেয়ে অভাবমুক্ত রেখে যাওয়াই ভাল।"[৫৪]

১.১০. আমরা পূর্বেই বলেছি, শিশুরা হচ্ছে জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার। তাই শিশুদেরকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং আদর্শবান করে গড়ে তুলতে না পারলে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। কাজেই শিশুর চরিত্র গঠনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সদা সজাগ থাকা আবশ্যক। চরিত্র গঠন

৫১. আবূ দাউদ আল সাজিসতানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, *কিতাব আল সালাত*, পৃ. ৮৬
৫২. ইমাম গায্যালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১৪
৫৩. আল-কুরআন, ৬৬ : ৬
৫৪. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, *কিতাব আল-ওয়াসায়া*, পৃ. ৪১

www.pathagar.com

বলতে তাদের মধ্যে দুষ্টু চরিত্রের (আখলাকে যামীমা) প্রতি ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি করা এবং উন্নত চরিত্র (আখলাকে হামীদা) দ্বারা তাদেরকে বিভূষিত করা বোঝায়। যেমন অহংকার, মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, গীবত, চোগলখোরী, মূর্খতা, উদাসীনতা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদির প্রতি তাদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে সাথে সাথে তাদের মাঝে আল্লাহ, রাসূল, ফিরিশতা, আসমানী কিতাব, কুরআন-হাদীস ইত্যাদির প্রতি অগাধ বিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং সততা, আমানতদারী, অঙ্গীকার পূরণ করা, দানশীলতা, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করার মত মহৎ গুণাবলী শিক্ষা দিতে হবে। মহানবী (সা) বলেন : من ولد له فليحسن اسمه وادبه "কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যেন একটি সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তমরূপে তাকে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়।"[৫৫]

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় শিশুর উত্তম চরিত্র গঠনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে পিতামাতা তথা পারিবারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কেননা, সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার মত যোগ্যতা নিয়েই প্রত্যেক্ষটি শিশু জন্মগ্রহণ করে থাকে। যদি শিশুর পিতামাতা এ ব্যাপারে যত্নবান হন এবং পারিবারিক পরিবেশ সুন্দর চরিত্র গঠনের অনুকূল হয়, তবে শিশুর মধ্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ঘটে। আর যদি পিতা মাতা এ বিষয়ে যত্নবান না হন এবং পারিবারিক পরিবেশও উল্টো হয় তাহলে শিশুর চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়টি মহানবী (সা) বলেছেন :

ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

"প্রতিটি শিশুই ফিতরাত তথা ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতাসহ জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।"[৫৬] সুতরাং শিশুর চরিত্র গঠনে পিতামাতা তথা পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম।

মানুষ সামাজিক জীব। মানব শিশু শৈশবেই যেন সমাজের অন্যান্যদের সাথে চলা-ফেরায়, উঠা-বসায়, কথা-বার্তা, আচার-আচরণে উন্নত ও শালীন হয়, সে শিক্ষা দিতে হবে। হয়রত লুকমান তাঁর পুত্রকে যেভাবে শিখিয়ে ছিলেন পবিত্র কুরআন এভাবে তা উল্লেখ করেছে :

وَلَاتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ

"অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে না। এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করবে না। কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করবে সংযতভাবে। এবং তুমি তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে, স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর"।[৫৭]

পিতামাতাসহ পরিবারের বড়দের দায়িত্ব শিশুকে ভদ্রতা-নম্রতা শিক্ষা দেওয়া এবং তাদেরকে গর্ব ও অহংকার করতে না দেয়া। ভাল কাজের জন্য শিশুকে বাহবা দেওয়া, সম্ভব হলে কিছু উপহার দেওয়া প্রয়োজন। এতে ভাল কাজের প্রতি শিশুর আগ্রহ বাড়বে। আর মন্দ কাজের জন্য সাথে সাথে তিরস্কার না করে বোঝিয়ে দেয়া আবশ্যক। তাহলে শিশুর মধ্যে খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে।

১.১১. ইসলাম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে হলে দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় এবং

৫৫. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
৫৬. মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬
৫৭. আল-কুরআন, ৩১ : ১৮-১৯

www.pathagar.com

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাত্র থেকে খাবার গ্রহণ করতে হয়। মনঃদৈহিক রোগ থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি পবিত্র মন। মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"অবশ্যই আল্লাহ্ তাওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন।"[৫৮] মহানবী (সা) বলেন, "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"[৫৯]

আধুনিক বিজ্ঞান—পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করে। বর্তমান বিজ্ঞান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। বিশেষত রোগ প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভূমিকা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং শিশুকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে পরিবারের। শিশুর দৈহিক পরিচ্ছন্নতা এবং পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা পুরোটাই নির্ভর করে পরিবারের উপর। যেমন :

ক. শিশুর হাত পরিষ্কার রাখা

হাত পরিষ্কার রাখা একান্ত প্রয়োজন এবং শৈশব থেকেই মানব শিশুর মধ্যে এ অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। কেননা, মানুষ হাত দিয়ে আহার গ্রহণ করে, চোখ, মুখ মুছে এবং প্রয়োজনে মুখের ভিতরে হাত দেয়। আবার এ হাত দ্বারাই মানুষ ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে। তাই হাত পরিষ্কার করা না হলে খাদ্য দূষিত হয়ে মারাত্মক রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন : "তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে হাত তিনবার না ধুয়ে যেন কোনো পাত্রে তা না ঢুকায়।"[৬০] তিনি আরো বলেছেন, "নখ কাটা ফিতরাত তথা নবীগণের সুন্নাত।"[৬১]

খ. শিশুর মুখ পরিষ্কার রাখা

মুখকে বলা হয় দেহের ফটক। মুখের ভিতর দিয়ে খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় দেহে প্রবেশ করে। সেজন্য মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা খুবই জরুরী। মুখের ভিতর কোন সংক্রমণ হলে তা খাদ্যনালীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে ইসলামের চিন্তাধারা অত্যন্ত পরিষ্কার। দিনে পাঁচবার ওযুর জন্য ১৫ বার মুখ ধুতে হয়। শুধু তাই নয় এ সময় মিসওয়াক করা হয় বলে দাঁত পরিষ্কার থাকে, দাঁতের গোড়ায় পাথর জমে না। মিস্ওয়াক করার গুরুত্ব বোঝতে গিয়ে মহানবী (সা) বলেন : "আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টদায়ক মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক নামাযের ওযুর সাথে মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"[৬২]

মুখ ও হাতের ন্যায় শিশুর নাক, চোখ ও মাথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গই হচ্ছে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত। এগুলো যাতে রোগ-ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত না হয় সে দিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। নাক, চোখ ও মাথা পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে ইসলামের দিক নির্দেশনা রয়েছে। দিনে পাঁচবার ওযু করতে প্রতিটি অঙ্গ পনের বার ধুয়ে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। ওযু করার সময় মাথা মাসেহ্ করতে হয় যা মাথাকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। যারা লম্বা চুল রাখে তাদের চুল পরিচর্যা করার প্রতি মহানবী (সা)-এর নির্দেশ রয়েছে। তিনি বলেন, "যার মাথায় চুল রয়েছে সে যেন তার পরিচর্যা করে।"[৬৩]

---

৫৮. আল-কুরআন, ২ : ২২২
৫৯. ইমাম আলী আল দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯
৬০. ইমাম আলী আল দীন মুহাম্মদ. পৃ. ৪৫
৬১. প্রাগুক্ত. পৃ. ৪৪
৬২. প্রাগুক্ত. পৃ. ৪৪
৬৩. প্রাগুক্ত. পৃ. ৩৮২

www.pathagar.com

গ. শিশুর পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা

শিশুর শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও মানসিক পবিত্রতার সাথে সাথে পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতার একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃত অর্থে সুস্থ মন ও সুস্থ শরীরের জন্য পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে নির্দেশ হয়েছে : خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করবে।"[৬৪] অন্য আয়াতে এরশাদ করছে : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (হে নবী) আপনার পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখুন।"[৬৫]

১.১২. ইসলাম জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি শুধু উৎসাহ-ই যোগায়নি, বরং প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞানার্জনকে ফরয করে দিয়েছে। বলা হয়েছে : طلب العلم فريضة على كل مسلم "জ্ঞান অন্বেষণ সকল মুসলিমের (নারী-পুরুষ) জন্য ফরয"।[৬৬] এ ফরয কোন বিশেষ শ্রেণী, দল বা গোষ্ঠীর জন্য নয়, বরং এ হচ্ছে এমন একটি সার্বজনীন অধিকার ও স্বার্থ, যা প্রত্যেক ব্যাক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যারা জীবনে আলো পেতে চায়। এক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই লক্ষ্য অভিন্ন। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

"পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎকর্ম করে এমতাবস্থায় যে, সে মু'মিন, তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।"[৬৭] মহান আল্লাহ আরো বলেন :

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

"নারী বা পুরুষ কেহ সৎকাজ করলে ও মু'মিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাঁদের প্রতি এক অণু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।"[৬৮] স্বামীর পূণ্য বা পাপের কারণে স্ত্রী পুরস্কৃত বা শাস্তি প্রাপ্ত হবে না, প্রত্যেকে নিজের কৃতকর্মের জন্যই পুরস্কৃত হবে অথবা শাস্তি পাবে। তাই ইসলাম শুধু পুরুষ সন্তানের জন্য শিক্ষাকে আবশ্যক করেনি, বরং জ্ঞানচর্চা ছেলেমেয়ে সকলের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছে।

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি শিশুদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা ও আখলাক উন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগী করে তোলা ইসলামের মৌলিক নীতি। শিশুর মধ্যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এবং সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা পিতামাতার নৈতিক দায়িত্ব। অন্যায়, মিথ্যাচার, নেশা, সন্ত্রাস ও বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচারে সন্তান যাতে লিপ্ত না হয় সেদিকে পিতামাতাকে নজর রাখতে হবে। এছাড়া নিজেদের ইতিহাস,-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান দান করা পিতামাতার দায়িত্ব। হযরত লোকমান, স্বীয় পুত্রের প্রতি যে উপদেশ দিয়েছিলেন পবিত্র কুরআনে তা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্র বাণী :

---

৬৪. আল-কুরআন, ৭ : ৩১
৬৫. আল-কুরআন, ৭৪ : ৪
৬৬. ইমাম আলী আল দীন মুহাম্মদ, *মিশকাত আল-মাসাবিহ্* (কলিকাতা : এম. বশীর হাসান এণ্ড সন্স, তারিখ বিহীন) কিতাব আল-ইলম, পৃ. ৩৪
৬৭. আল-কুরআন, ১৬ : ৯৭
৬৮. আল-কুরআন, ৪ : ১২৪

www.pathagar.com

يَابُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

"হে বৎস, নামায কায়েম কর এবং বিপদে-আপদে সবর কর। নিশ্চয়ই এটি সাহসিকতার কাজ।"[৬৯]

মোটকথা ইসলাম সর্বদাই শিশুকে শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-গরিমায় প্রকৃত মানুষ এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার নির্দেশ প্রদান করে থাকে। মহানবী (সা) বলেন :

علموا اولادكم فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم

"তোমাদের শিশুদের জ্ঞান দান কর। কেননা, তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।"[৭০] বস্তুত শিশু জাতির ভবিষ্যৎ। একটি জাতি তার ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব ভরে পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হওয়া। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন :

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

"এবং যাকে হিকমত (যাবতীয় বিষয়বস্তুর সঠিক জ্ঞান) প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়।"[৭১] মানব জাতির কাঙ্খিত উন্নতি এবং পার্থিব ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির পাশাপাশি মানব শিশুকে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে হয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান মানব আত্মাকে যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি থেকে পরিত্রাণ করে কলুষমুক্ত রাখে।

পিতামাতাকে অবশ্য তাদের শিশুকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাশাপাশি নৈতিকতা ও মানবতার মৌলিক উপাদানগুলো সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে হবে। একথা আজ অনস্বীকার্য যে, বর্তমান বিশ্বের ভয়ানক ও বহুল আলোচিত বিষয় এইড্স, পরিবেশ দূষণ, নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি দারিদ্র ও মানবাধিকার লংঘন, ইত্যাদি নৈতিকতাবিহীন শিক্ষার কারণে ছড়াচ্ছে। এগুলো থেকে পরিত্রাণের মূল চাবিকাঠী হলো নৈতিক মূল্যবোধের উন্নতি সাধন এবং সত্যিকারভাবে তার অনুসরণ। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ধরাধামে যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যও ছিল মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মানব জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধন করা। মহান আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

"তিনিই উম্মীদিগের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতোপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।"[৭২] প্রকৃতপক্ষে ইসলাম উন্নয়নের যে ধারণা প্রদান করেছে তাতে মানবাত্মার পবিত্রতা (তাজকিয়া)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা, ইসলামের ধারণা অনেক ব্যাপক, যাতে পার্থিব ও পরকালীন উভয়বিধ উন্নয়ন রয়েছে।[৭৩]

পরিশেষে বলা যায় আমাদের শিশু সন্তানদেরকে মানব জাতির উন্নয়নের সহায়ক করে গড়ে তোলার জন্য পিতামাতাসহ গোটা সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার নির্দেশিত যাবতীয়

---

৬৯. আল-কুরআন, ৩১ : ১৭

৭০. অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস সিকদার, *ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা* (ঢাকা, প্যাথ পাইণ্ডার ইন্টাঃ ১৯৯৬) পৃ. ২৩

৭১. আল-কুরআন, ২ : ২৬৯

৭২. আল-কুরআন, ৬২ : ২

৭৩. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, M. Asaduzzaman, *Dhaka University Journal of Business studies*, vol. -XVIII. No.-2. (December-1997). p. 10

www.pathagar.com

অধিকার আদায়ের মাধ্যমে শিশুর সঠিক পরিচর্যার ব্যবস্থা করা। যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম প্রকৃত মানুষ হিসাবে বেড়ে উঠার পরিবেশ পায়। শিশু সন্তানের গর্ভপূর্বাবস্থা থেকে পূর্ণ যৌবনে পৌছা পর্যন্ত সর্ববিষয়ে যথোপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে সুনাগরিক করে গড়ে তোলা এবং শিশুকে দৈহিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, সবল ও সচেতন করে তোলা।

মোটকথা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পিতামাতার অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় শিশু সন্তানদেরকে নৈতিক ও আদর্শ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করো। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শাসন-প্রশাসন, বিচার, বাণিজ্য, যোগাযোগসহ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবকল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার যোগ্য করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা। যাতে শিশু বড় হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শকে নিজ জীবনে পাথেয় করে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মহান আল্লাহ্র নিরঙ্কুশ আনুগত্যের মাধ্যমে বস্তুজগতে মানবিক বৃত্তিগুলোর সুষ্ঠু ও পূর্ণবিকাশ প্রক্রিয়ায় বিশ্ব মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন মুক্তি লাভে সক্ষম হয়। এরূপ কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করার প্রতিই মহান আল্লাহ মানব শিশুকে শিক্ষা দিয়েছেন। বলেছেন :

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নিযন্ত্রণা হতে রক্ষা কর।"[৭৪]

৭৪. আল-কুরআন, ২ : ২০১

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল- জুন ২০০৩

মুসলিম বিশ্বে শ্রমিক উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি এলাকা

ইসমাইল আর আল-ফারুকী*
অনুবাদ ঃ এম রুহুল আমিন**

[ইসলাম সমস্ত মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও মানব সমাজের কল্যাণ কামনা করে। মুসলিম উম্মাহ্‌র কোথাও কোন মুসলিম কর্মহীন ও অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় জীবন যাপন করুক তা কামনা করেনা। সেজন্য উম্মাহর সার্বিক কল্যাণে মুসলিম উম্মাহ্‌র উদ্বৃত্ত এলাকা হতে ঘাটতি এলাকায় শ্রমিক চলাচলের তাকিদ দেওয়া হয়েছে। ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার ওপর ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে জেনেভায় একটি আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। সে সিম্পোজিয়ামে প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ইসমাইল আর আল-ফারুকী'র Islam and Labour শিরোনামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। পরবর্তীতে প্রবন্ধটি International Institute for labour studies, Zeneva কর্তৃক প্রকাশিত এবং Islam and a New International Economic Order—Social Dimension গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। পাঠকদের সুবিধার্থে উক্ত প্রবন্ধের প্রথম দিকের কিছু অংশ "মুসলিম বিশ্বে শ্রমিক উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি এলাকা" শিরোনামে প্রকাশ করা হলো। এটি অনুবাদ করেছেন এম রুহুল আমিন—নির্বাহী সম্পাদক]

মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি শ্রমিক এলাকায় বিভক্ত। একটি দেশে এ অবস্থা অনেক শহর বা স্থানে পরিলক্ষিত হবে। কোন শহর, প্রদেশ ও দেশে শ্রমিকদের কেন্দ্রীভূত হওয়ার দু'টো কারণ থাকতে পারে ১. দেশান্তরগমন ও ২. শিশুমৃত্যু হারের হ্রাস। দেশের অভ্যন্তরে দেশান্তর গমনই শ্রমিক কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রাথমিক কারণ। এক দেশ থেকে অন্য দেশে শ্রমিক কেন্দ্রীভূত হওযার কারণ হলো জনসংখ্যার প্রাকৃতিক বৃদ্ধি, এক দেশের সাথে অন্য দেশের সীমান্ত সংলগ্নতা, দেশান্তর গমন ও অভিবাসন। প্রথম প্রথম উপনিবেশবাদী শাসন কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অস্তিত্বহীন সীমানা সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রত্যক্ষভাবে কায়েমী স্বার্থবাদীদের বা উপনিবেশিকদের স্বার্থ রক্ষা হোক বা না হোক জাতীয় সরকারগুলো এ পন্থা অবলম্বন করে। মিসর, নাইজেরিয়া, মরক্কো, তুরস্ক, ইরান, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়া শ্রমিক উদ্বৃত্ত দেশ। অন্যান্য সব মুসলিম দেশ শ্রমিক ঘাটতির দেশ। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মিসর ও ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যা বন্টনে যেমন ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তেমনি আলজিরিয়া, তুরস্ক. ইরান ও পাকিস্তানে জনসংখ্যা বন্টনে এ সমস্যা আরও কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে।

সম্পদ ও সংগঠনের সমস্যা

ক. উদ্বৃত্ত শ্রমিক এলাকা

১. শত শত বছর ধরে দুনিয়ায় সামন্তবাদীদের শাসনই কায়েম ছিল। ফলে ভূমিতে উদ্বৃত্ত কৃষি-শ্রমিকদের বিনিয়োগের সুযোগ তেমন একটা ছিলনা। বস্তুত তাদের অবস্থা ছিল দিন এনে দিন খাওয়া থেকেও নিম্ন পর্যায়ের। খুব কম ক্ষেত্রেই তারা ছিল তাদের চাষকৃত জমির মালিক। সামন্তপ্রভূ ও ফটকা ব্যবসায়ীরা বাৎসরিক চাষাবাদে মূলধন জোগাতে আর তাদের ধার্যকৃত মূল্যে বা অন্য ফটকা ব্যবসায়ীদের

* ড. ইসমাইল আর আল-ফারুকী-টেম্পল ইউনির্ভাসিটি, ফিলাডেলফিয়া, আমেরিকা।
** বিশিষ্ট অনুবাদক, লেখক ও গবেষক।

www.pathagar.com

দ্বারা নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের ফসল এবং অন্যান্য মূলধন ক্রয় করে নিত। বেশীর ভাগ শ্রমিকই ছিল কিশোর। তখন মেশিনের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। শ্রমিকরাই ছিল সম্পদ। তাদেরকে ক্ষণস্থায়ী ভিত্তিতে শহরাঞ্চলে চাকরি দেবার কথা বলে প্রলুব্ধ করা হতো। এতদ্সত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহে সামান্য খয়রাতের জন্য প্রাচুর্যের স্থানে পৌর এলাকায় তারা পাড়ি জমাতো।

২. কৃষি শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন কোনদিন হবে না যে পর্যন্ত সামন্তবাদীদের ভূসম্পত্তিকে ব্যবস্থাপনাযোগ্য আকারে না আনা হবে এবং শ্রমিকরা জমির মালিক না হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এটাই খুব উত্তম পন্থা। দ্বিতীয় উপায় কৃষি কাজকে এমনভাবে পুনঃসংগঠিত করতে হবে, যাতে (সমবায় পদ্ধতি) উৎপাদন, মজুদ, বিপণন, পরিবহণ ইত্যাদি ব্যবস্থাই ফটকা ব্যবসায়ীদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে। এসব কাজ করতে গেলে যে মেধার প্রয়োজন তা এখন গ্রামাঞ্চলে নেই। সুতরাং শহরবাসীদের গ্রামে পাঠানোর জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যথাসময়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও পেশাগত) সংস্কার গ্রামদেশে পর্যাপ্ত জনশক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম হবে।

৩. পৌর এলাকার শ্রমিকদের অবস্থা কৃষি শ্রমিকদের চেয়ে মোটেও ভাল নয়। কেননা উপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশিক আমলের শ্রমিক সংগঠনগুলোকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল। শ্রমিক সংগঠনগুলো ক্ষমতাসীনদের নিকট রীতিমত হুমকিস্বরূপ ছিল। তবে সবচেয়ে খারাপ কথা এই যে, সব শ্রমিক সংগঠন (মিসর, লিবিয়া, ইরাক, ইত্যাদি) সোস্যালিস্ট ইউনিয়নে পরিণত হয়েছিল। সোস্যালিস্ট ইউনিয়নে রূপান্তরিত হওয়ার পর শ্রমিকদের মঙ্গল সাধনের পরিবর্তে দু'টো কারণে এদের অবস্থা আরো অবণতির দিকে যেতে থাকে। প্রথমত, সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে শ্রমিক সংগঠনে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, ইউনিয়নগুলোকে বাধ্য করা হয়েছিলো যেন উচ্চতর বেতন ও উন্নততর সেবার জন্য আন্দোলন করা হয়। এতে এমন পরিস্থিতি হয়েছিল যে, মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিএনপি) কোন তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। শহরতলীর শ্রমিক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার নিম্নমান শহুরে জীবনকে দূষিত করে তুলেছিল। বিশেষ করে এর প্রভাবে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাদিসহ সকল সেবামূলক কাজ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। এর পরিণামে লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্যদ্রব্যের আমদানী, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণের জন্য শহুরে নিয়মের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিলো। এসব নিয়ম কখনো পর্যাপ্ত ছিল না এবং আরো অধিক মাত্রায় মানুষ শহরে চলে যাওয়ার দরুণ অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। ফলে আজকের মুসলিম বিশ্বে কোন দেশ বা শহরের লাখো জনতা জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের রাজনীতির শিকারে পরিণত হয়েছিলো। যাদের নিকট থেকে এসব মুসলিম দেশ খাদ্য আমদানী করে থাকে এমন বিদেশী শক্তি তাদের নব্য উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে তাদেরকে শোষণ করতে থাকে।

৪. এসব দেশের উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকরা তাদের দেশের অবণতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থায় কষ্টভোগ করছে। উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এসব দেশের জনগণের মঙ্গল ও অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি। কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ জনবিস্ফোরণ ও অশিক্ষিত গ্রাম্য জনগণের শহরে প্রবেশের দরুণ শ্রমিকদের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা এবং সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের অভাবের দরুণ সব দেশের অবস্থা ক্রমেই অধঃপতনের দিকে যাচ্ছিল। হতাশা যতই বাড়ছিল অবস্থা ততই মন্দ থেকে মন্দের দিকে যাচ্ছিল। জাতীয় রাজনীতির সফলতার বিনিময়ে শিক্ষিত শ্রমিকগণ তাদের আশা আকাঙ্খার উন্নয়ন ঘটাতে পারতো। কিন্ত দুর্নীতিবাজ নেতৃত্ব, প্রশাসনিক রাজনীতিকরণে অসততা, অপেক্ষাকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিরুৎসাহিতকরণ, কল্পণাপ্রবণ নাগরিক ও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিরুৎসাহিত করার ফলে তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটেনি। মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ হতাশার দরুণ দেশ ছাড়ার পথ খুঁজছিল। উচ্চ শিক্ষিত লোক যারা দেশের টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রচলিত পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতম ফসল, তারা অন্যত্র উন্নত ভাগ্যের সন্ধান করছিল। উদ্বৃত্ত শ্রমিকের দেশের প্রত্যেকটিতেই এ অবস্থা বিরাজ করছে। এ হীন অবস্থা জনগণকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

৫. একথা ঠিক যে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ব্যতীত এসব উদ্বৃত্ত শ্রমিক অধ্যুষিত দেশের ভাগ্যে কোন পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। আমাদের দরিদ্র মুসলিম বিশ্বকে এটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, অভ্যন্তরীণভাবে স্বল্পব্যয়ে শিল্প কারখানার উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাতে পারবো কিনা। মিসর, বাংলাদেশ ও জাভার মতো দেশে উদ্বৃত্ত শ্রম-জনশক্তিকে এভাবে শিল্পখাতে নিয়োগ করা যায় কিনা সে ব্যাপারে এখনো সন্দেহ রয়েছে। তবে এসব দেশে কিছু অগ্রগতি অবশই সম্ভব যদি একটি দূরদর্শী ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা যায়।

উদ্বৃত্ত শ্রমকে শ্রম শক্তিতে রূপান্তরিত করে উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো নির্মাণে প্রয়োগ করা যেতে পারে। শ্রমিক জনগণের অল্প অংশই মাত্র এসব দেশের অবকাঠমো নির্মাণে প্রয়োজন হতে পারে যা দেশের জন্মগত সম্পদ প্রাপ্তির সুলভ অবস্থার ওপরই নির্ভরশীল। এ অবকাঠামো নির্মাণের দ্বারা দেশের কৃষি, শিল্প ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির বেশ কিছু অংশকে কাজে লাগানো সম্ভব। এর ফলে যে অর্থ উপার্জিত হবে তা পুঁজিঘন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত শ্রম শক্তিকে অধিকতর কর্মে নিয়োগ সম্ভব হবে। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, মিসরের মতো দেশে গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট এখনো কোন ব্যবস্থা না হওয়া এবং গ্রামগুলো ভেঙে আবার নতুন করে পুনর্গঠন প্রয়োজনীয়তা। বেকারদের বাধ্যতামূলক কর্মে নিয়োগেই রয়েছে এর সমাধান। ইসলামী আইন এর জন্য প্রশংসার দাবীদার যা আমাদেরকে ফেরাউন ও মেসোপটেমীয় সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্পদের যেখানে স্বল্পতা বেগার খাটা শ্রমিকের মাধ্যমে সেখানে উদ্বৃত্ত শ্রম সমস্যার সমাধান সম্ভব।

খ. ঘাটতি শ্রমিকের এলাকা

সুদূর অতীতে মুসলিম বিশ্বের যেসব দেশে শ্রমিকের অভাব ছিল, স্বল্প আয় ও স্বল্প জনসংখ্যা ছিল সেসব দেশের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অতীতের মতো এসব দেশের জনগণও শুধুমাত্র কোন প্রকারে বেঁচে থাকতো। আরব উপদ্বীপে ইউরোপের উপনিবেশ কায়েম হওয়ার ফলে এসব দেশের জনগণ দারিদ্র ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। আর এসব দেশে কোথাও জনগণের অভিবাসনের অধিকার ছিল না। আবাদযোগ্য যেসব জমি ছিল তাতে সত্যিকারভাবে কোন চাষাবাদ করা হতো না এবং এসব জমির উৎপাদনই ছিল দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড। এসব দেশের ভেতরে বা বাইরে কদাচিৎ আন্দোলন হতো। খনিজ সম্পদের আবিষ্কার অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। এ থেকে অর্জিত উপার্জন দ্বারা এসব দেশ মান্ধাতার আমলের অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব হলো সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পূর্ত কর্মসূচীর মতো সম্প্রসারিত কর্ম ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ শক্তির ব্যবস্থা করা। তবে মজার ব্যাপার এই যে, আয় বাড়ার সাথে সাথে তাদের দেশগুলো শ্রমিক ঘাটতির দেশে পরিণত হয়। তাদের দেশীয় জনগণ এতই অপ্রতুল হয়ে উঠে যে, শিল্পায়ণ, পুনর্গঠন, পূর্ত কর্মসূচী, কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার, প্রশাসনের মতো বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে তাদের বর্ধিত আয় তাদেরকে তেমন সুবিধা প্রদান করতে পারেনি। বলা যায় যে, তাদের বর্ধিত আয়ই তাদের "শ্রমিক ঘাটতির" মূল কারণ। তাদের নতুন অর্জিত আয় তাদেরকে "বিদেশী খেদাও"-এর মতো ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেছিল। দেশের সরকারকেও সংবিধানের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে এভাবে জনসমাগম রোধ করে নিজস্ব সম্পদ রক্ষায় ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সম্পদ প্রাপ্তির পূর্বে তাদের নাগরিকত্ব আইন নামে কোন আইন ছিল না। ধন সম্পত্তির মালিক হলেই তখন যে কেউ চাইলেই নাগরিত্ব পেয়ে যেত। শুধু তাই নয় বিদেশী হিসেবে নাগরিক অধিকারও (Naturalization Law) আদায় করে নিত। তবে এটা যে কোন দেশ, যারা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মনে করে থাকে, তারা তাদের চাইতেও বেশী "বিদেশী খেদাও"-এর অনুসারী হয়ে উঠেছিল।

www.pathagar.com

১. উল্লিখিত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার প্রত্যেক ক্ষেত্রে ছিল শ্রমিক ঘাটতি। তাদের জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বিদেশ থেকে লোক আমদানী করা হত আর কিছু কিছু প্রতিশ্রুতিশীল জনশক্তিকে অধ্যয়নের জন্য বিদেশে পাঠানো হত। দুর্ভাগ্যবশত এসব দেশের বিভিন্ন কর্মসূচী বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তখন মিসরেরই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি ছিল, যদিও ১৯৫২ সালের বিপ্লবের পর মিসরের শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। এর শিক্ষা ব্যবস্থায় কতকগুলো সুপ্ত দুর্বলতা ছিল। তার সাথে রাজনৈতিক নির্যাতন তাদেরকে অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে বাধ্য করেছিল। দারিদ্রের কারণে মানুষের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। দেশের এহেন অবস্থা অভিবাসীদের জন্য দুর্নামের কারণ ঘটায়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বিরাজমান পরিস্থিতিতে একজন মিসরবাসী একটি ধর্মপ্রচারক দলের সাথে মহৎ উদ্দেশে হলেও দেশ ত্যাগ করতে পারতনা। ব্যক্তি হিসেবে এটা ছিল তার দুর্ভাগ্য। দ্বিতীয়ত, চাকরিতে বিনিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের যেমন উচ্চ প্রশিক্ষণ ছিল না, তেমনি দক্ষতারও যথেষ্ট অভাব ছিল। সিনিয়রদের চাপের মুখে চাকরিতে লোক নিয়োগের ভালমন্দের ব্যাপারে অন্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল। শীগ্‌গীরই ঘাটতির দেশগুলোতে অন্য দেশ থেকে দক্ষতা ও বেশ আনুগত্যসম্পন্ন শ্রমিকদের আগমনের ফলে ঘাটতি পূরণ হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয়ত, দেশীয় বা বিদেশী অযোগ্য কর্মচারীদের নির্দেশনার ফলে দেশীয় কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে ক্যাডার সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হয়েছিল, খামখেয়ালির ফলে তা ভেস্তে যায়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীর অভাব দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। যতদিন অনুপযুক্ত কর্মচারীরা কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নিজেদেরকেই যোগ্য মনে করে, অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে ততদিন। পরিণামে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে অযোগ্যতাই বৃদ্ধি পায়।

২. অন্যভাবে দেখলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শ্রমিক ঘাটতির দেশগুলোতে ওপরে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো থাকা সত্ত্বেও সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ভেস্তে যায়। কারণ এসব দেশের লোকদের মাথাপিছু আয় যতটা হওয়া উচিত তাদের অর্জিত আয়ের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশী। এ বিপুল পরিমাণ আয় থাকায় সে দেশ সব সময়ই বিভিন্ন কর্মসূচী শুরু করতে থাকে। যেসব কর্মসূচীতে বিদেশী শ্রমিক আমদানীর চাহিদা রয়েছে সেসব কর্মসূচীতে উৎসাহ দিতে হয়, যতক্ষণ না এসব দেশের সর্বশেষ লোকটি পূর্ণভাবে কর্মে নিয়োজিত হয়। প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও লিবিয়া, সউদী আরব, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমীরাত কিংবা ওমানের মতো দেশে বিদ্যমান সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যদি একযোগে প্রশিক্ষণে নিয়োজিত হয়, তবুও এসব দেশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের চাহিদা মেটাতে পারবে না। শুধু যদি লিবিয়া, সুদান ও কুয়েতেই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চালু করা হয় এবং সব দেশের লোকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তাহলেও কি ঐ সব দেশের বিপুল চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে ? অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন কর্মসূচীর কোন আলামতও দেখা যাচ্ছে না।

৩. শ্রমিক ঘাটতির দেশগুলোতে কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ও কৃষিকাজের জন্য কিছু নতুন জমি উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও এসব দেশে কৃষিশিল্পে অগ্রগতির জন্য জাতীয় ভিত্তিতে কিছু উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। কৃষির উন্নয়নে যেসব কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত সামান্য ও গৌণ। এর কারণ শুষ্ক আবহাওয়ার দরুণ নব আবিষ্কৃত সম্পদ খাদ্য ও দ্রব্য আমদানীতে ব্যবহার সহজ ছিল না। আবার ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর ন্যায় যোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়নি। ফলে একটা হীনমন্যতা জন্মে এবং কৃষ্টির উন্নয়নে কর্মসূচীগুলো ক্ষুদ্র ও নগণ্য হতে থাকে। অতিরিক্ত আয়ের বাইরে কোন শ্রমিক-ঘাটতির দেশই জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য অর্থনীতি, জনসংখ্যা বা দেশের সার্বিক কৌশলগত দিক থেকে কোন পরিকল্পনা দাঁড় করাতে পারে নি।

৪. এসব দেশের মৌলিক ত্রুটির একটি হলো দূরদৃষ্টির অভাব। ফলে তারা জাতি গঠনে এ পর্যন্ত কোন শক্তিশালী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়নি। তাদের অর্জিত অধিক পরিমাণ উদ্বৃত্ত আয় পশ্চিমা

www.pathagar.com

দেশগুলোর উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের অনুন্নয়নের এটাই হল কারণ। বিপুল পরিমাণের প্রাকৃতিক সম্পদ শূন্য করা হচ্ছে। বিনিময়ে তাদেরকে দেয়া হচ্ছে কাগজী মুদ্রা। তা আবার অর্থ প্রদানকারী দেশকেই একটি চেক বা হুন্ডির মাধ্যমে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর চেয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে সরকারীভাবে নীরব প্রতারণা ও জাতীয় সম্পদের অপচয়ের মতো উদাহরণ দ্বিতীয়টি থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

৫. তবে সব শ্রমিক ঘাটতি দেশই যে উপর্যুক্ত সীমাবদ্ধতার জন্য দায়ী তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কিছু কিছু দেশের (ইরান, ইরাক, আলজিরিয়া, সুদান, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া) বিপুল জনসংখ্যা রয়েছে যারা যথোপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে শ্রমিক ভারসাম্যের জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এরূপ বিশেষ জাতীয় সংগতির জন্য কর্মচারী প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন করতে হবে। দুঃখের বিষয় যে, দূরদর্শিতা ও যোগ্যতার অভাবে উল্লিখিত দেশগুলোর কোনটিই গণভিত্তিক কর্মসূচী প্রণয়নে সক্ষম হয়নি। এসবের প্রত্যেকটি কারণ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও নব্য উপনিবেশবাদী শক্তিচক্রের ষড়যন্ত্রের ফলে সৃষ্ট আরো জটিল অবস্থা সৃষ্টি করে। এসব দেশ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সংহতির ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

রাজনৈতিক সমস্যা

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসিলিম বিশ্বের ঘাটতি শ্রমিক ও উদ্বৃত্ত দেশের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। জাতি-গঠনের সার্বিক অসুবিধা থেকে প্রত্যেকটি দেশের সমান অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রই উপনিবেশিক আমলের নেতৃত্বে দেশ শাসন করা হচ্ছিল অথবা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মধ্যপন্থী অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের শাসনের মুলোৎপাটন করা হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক নেতাই মিসরের আবদুন নাসের, পাকিস্তানের আইয়ুব খান, ইন্দোনেশিয়ার সুয়েকর্ন ছাড়া উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু জাতিগঠনে তাদের ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথে (১৯৫৬ সালে সিরিয়া থেকে মিসরের বিচ্ছিন্নকরণ, আইয়ুব খানের ১৯৬২ সালের সংবিধান ঘোষণা) তাদের জনপ্রিয়তাও ম্লান হয়ে আসছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যত মুসলিম দেশ রয়েছে প্রত্যেকটির রাজনৈতিক দুর্বলতা হল প্রতিটি সরকারই পুতুল সরকারের মতো। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনুপযুক্ততা, দূরদর্শিতার অভাব এবং নেতৃত্বের দুর্বলতা-এসবই ঐসব দেশের সরকারের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বলতে গেলে মুসলিম দেশগুলোর দুর্বলতা তাদের মধ্যেকার অনৈক্য, অভ্যন্তরীণ জাতীয় অসংগতি এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের মধ্যেই নিহিত। এসব বিষয়ের অনুপস্থিতির দরুণ কোন সরকারই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। সেজন্য প্রতিটি মুসলিম সরকারই মসনদ থেকে বিতাড়ন ও প্রথম সুযোগেই জনগণের রোষের মুখে পতিত হওয়ার ভয়ে তাদের সকল শক্তি গদিতে টিকে থাকার পেছনে ব্যয় করেছে। সব মুসলিম দেশেরই নীলনকশা তৈরী হয়েছে লন্ডন বা প্যারিসে। আর প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরেই এক বা একাধিক ভিন্ন মতাবলম্বী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশের বাইরে এক দেশের সাথে অন্য দেশের সীমান্ত বিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে সব সময়ের জন্য জনগণকে এসব ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। এভাবে গুপ্ত পুলিশের দমনমূলক নীতি, প্রতারণাপূর্ণ নির্বাচন এবং পররাষ্ট্রের হাত থেকে নিরাপত্তার জন্য দেশের সকল জাতীয় শক্তি ব্যবহারে চাপ প্রয়োগই এসব মুসলিম দেশের শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা। এখন দেখতে হবে দেশের এমন রাজনৈতিক পরিবেশ শ্রমিক অবস্থার ওপর কেমন প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

১. উদ্বৃত্ত শ্রমিকের দেশগুলো প্রধানত বেকারত্বের জন্য শ্রমিক অভিবাসনের বিপক্ষে। তাদের এ যুক্তি সত্য হলেও একেবারে যৌক্তিক নয়। কেননা বেকারত্বকে বেগার খাটানো পদ্ধতিতে দূর করা সম্ভব।

www.pathagar.com

শ্রমিক ঘাটতির দেশগুলোতে অভিবাসিত শ্রমিকদের নেচারালাইজেশন পদ্ধতি নাগরিকত্ব পাওয়াকে কঠিন করে রেখেছে। অভিবাসিত পিতামাতার শিশু ও নাতি-নাতনী কোন অধিকার ছাড়া "বিদেশী" হিসেবেই থেকে যায়। অভিবাসিত পিতামাতা যেমন সংশ্লিষ্ট সমাজে সেবার কোন সুবিধা পায় না, তেমনি অভিবাসিত পিতামাতার সন্তান সন্ততিরাও উচ্চমূল্য বা বিনামূল্যে কোনভাবেই ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ছাড়া সাধারণ শিক্ষার সুবিধা পায় না। শ্রমিক উদ্বৃত্ত দেশগুলো অভিবাসিত নাগরিকদের নিকট থেকে উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক সুবিধা, যোগ্য ও দক্ষ ক্যাডার ভিত্তিক সহায়তার মতো কোন সুবিধা পায়না। আবার শ্রম উদ্বৃত্ত দেশগুলো স্থায়ীভাবে নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক কিংবা ডাক্তার ও নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানীর ন্যায় কোন সেবা অভিবাসিত শ্রমিকদের নিকট থেকে আশা করে না।

২. শ্রমিক ঘাটতির দেশগুলো অভিবাসিত শ্রমিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রদত্ত সেবা ভোগ করে থাকে। অভিবাসনদারকারী দেশ অভিবাসিত শ্রমিকের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করে তাতে অভিবাসিত শ্রমিকদের মনে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়। এতে সে চাকরির জন্য অবস্থানের সময় নিয়োগকারীর প্রতি ও অভিবাসিত দেশের প্রতি শত্রু হয়ে পড়ে। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাজে খামখেয়ালী প্রদর্শন করতে সে মোটেও তোয়াক্কা করে না। সুযোগ পেলেই অলসতা প্রদর্শন করে কাজে বিলম্ব ঘটায়। অভিবাসিত দেশের বিরুদ্ধে সব সময়ে সে সদা প্রস্তুত অস্ত্র হিসেবে নিয়োজিত থাকে। অন্তর্ঘাতমূলক কাজে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী হিসেবে তাকে সহজে নিজ তালিকাভুক্ত করতে পারে ও সব সময় সহযোগী হিসেবে পায়। বিশেষ করে কোন আগ্রাসনকারীর জন্য সে যোগ্য দোসর হয়। সে আগ্রাসনকারী বিদেশী হলে তো কথাই নেই। বিশেষ করে আরব উপসাগরীয় দেশগুলোতে খৃস্টান মিশনারী ও অভিবাসিত শ্রমিকদের মধ্যেই এরূপ স্পষ্ট আলামত পরিলক্ষিত হয়। এভাবে নিজ দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাবোধ অভিবাসিত শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে আনা ছাড়াও দেশের জন্য হয় জঞ্জালস্বরূপ। আর দেশের অস্থির রাজনীতি তাকে করে তোলে রাষ্ট্রের নিশ্চিত শত্রু।

৩. যেহেতু অভিবাসিত কর্মচারীদের বিপুল সংখ্যক একই ভাষাভাষী মুসলিম দেশের মধ্যে চলাচল করে থাকে, সেহেতু মুসলমানদের বিভিন্ন রাজনৈতিক সত্তার মধ্যে মাইগ্রেশন নীতি, উত্তম ক্রসফার্টিলাইজেশন সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শ পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। এসব মুসলিম ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্বের ঝাণ্ডাতলে অপর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবেলা করতে পারবে। তবে এর প্রতিক্রিয়াও থাকতে পারে এবং এসব কর্মচারী বিশ্ব ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদের মধ্যে আবার বিচ্ছিন্নতা বোধ ও ছাড়াছাড়ির ধারা সূচিত করবে।

৪. রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবেই সুদান ও লিবিয়ার সাথে মিসরের ; মরক্কোর সাথে আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া ও মৌরিতানিয়ার, সিরিয়ার সাথে লেবানন, জর্দান ও প্যালেস্টাইনের এবং ইরাকের সাথে সিরিয়ার সংযুক্তি সম্ভব হয়নি। শ্রমিক উদ্বৃত্ত ও শ্রমিক ঘাটতি দু'টির মধ্যে ঐক্য সাধনই উৎকৃষ্ট সমাধান। মিসরের সেচযোগ্য ভূ-ভাগ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। তবুও সুদানের সাথে ইউনিয়ন গঠন করলে নীল উপত্যকা ছয়গুণ জনসংখ্যার খাদ্যের সংস্থান করতে পারতো। এছাড়া সমস্ত মুসলিম বিশ্বের জন্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করতে পারতো। সার্বিকভাবে ধরতে গেলে দেখা যাবে মুসলিম বিশ্বে শ্রমিক ঘাটতি বিরাজমান। সার্বিকভাবে বা আঞ্চলিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে এবং এর অবিশ্বাস্য পরিমাণ সম্পদরাজি পুরোপুরি ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে পারলে দেখা যাবে মুসলিম বিশ্বের সম্পদ ভারত, চীন ও আফ্রিকার মতো দেশের উদ্বৃত্ত শ্রমিকের পুরোটাই আত্মস্থ করতে পারছে। ইসলাম বিশ্বজনীন, এর মধ্যে কোন কালো-ধলোর প্রশ্ন নেই। সুতরাং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ভিনদেশী সভ্যতার মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দু'তিন প্রজন্মেই কোটি কোটি আদম সন্তানের জন্য একটি বিশ্বরাষ্ট্র সৃষ্টি করা যাবে, যেখানে সবাই একই 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনির অধীনে উৎপাদন থেকে শুরু করে জীবনের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল- জুন ২০০৩

আল-কুরআনে পার্থিব জগৎ ও জীবনের তাৎপর্য

আ খ ম ইউনুস*

এ জগতে নানা বৈচিত্র্য, পরিবর্তন ও জটিলতার মধ্যে মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়। এ জটিলতার মধ্যেও জগৎ সম্পর্কে মানুষের মনে কিছু মৌলিক প্রশ্নের উদয় হয়। স্বভাবতই তার মনে প্রশ্ন জাগে—সে কোথেকে এসেছে, কোথায় যাবে, কী তার কর্তব্য, জীবনের অর্থ ও লক্ষ্য কী, মৃত্যুতেই কি জীবনের অবসান, নাকি মৃত্যুর পরেও জীবন আছে, যদি থাকে তাহলে সে জীবনের প্রকৃতি কী, দৃশ্যমান এ জগতের অর্থ ও প্রকৃতি কী, এ জগতের শুরু ও শেষ কোথায়, কিভাবে এর উৎপত্তি হয়েছে, এর কি কোনো স্রষ্টা আছে, নাকি এটি স্বয়ম্ভু, নশ্বর না চিরন্তন, সসীম না অসীম এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন তার চিন্তার রাজ্যে ভিড় করে অহরহ।

এসব চিন্তার মধ্যে মানুষের স্বাধীন, বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক চিন্তার সূচনায় জগতের উৎপত্তি, উপাদান, গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলিই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাচীন পাশ্চাত্য দর্শনের জনক থেলিস (খ্রি. পূর্ব ৬২৪-৫৪৬) জগতের উপাদান সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে খ্যাত হয়েছেন। একইভাবে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এন্যাক্সিম্যান্ডার, এন্যাক্সিমিনিস, পিথাগোরাস, হিরাক্লিটাস, জেনোফ্যানিস, পারমেনাইদিস প্রমুখ বিশ্বতাত্ত্বিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রেখেছেন। তবে এ কথা সত্য যে, তাঁরা জগৎ সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বাধীন চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করলেও তাদের বহু পূর্বে বিভিন্ন ধর্মে জগতের উৎপত্তি, গঠন প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ঋগবেদের বহুসংখ্যক স্তুতি বিশ্বতাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যাপৃত। এ ছাড়া টাওবাদ (Taoism), কনফুসীয়ধর্ম (Confucianism), জরথুস্ত্রবাদ (Zoroastrianism) প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মে বিশ্বতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য আলোচনা রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রচলিত ধর্মসমূহের প্রত্যেকটিতেই জগতের উৎপত্তি, প্রকৃতি, গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মত রয়েছে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম এবং হিন্দু সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শন ব্যতীত প্রায় সব ধর্মেই মনে করা হয় যে, জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত। এ সত্ত্বেও জগতের উৎপত্তি, প্রকৃতি, মূল্য প্রভৃতি সম্পর্কে ধর্মসমূহের পারস্পরিক বক্তব্যে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য প্রচুর। এমনকি একই ধর্মের ব্যাখ্যাতা ও দার্শনিকদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মত পরিলক্ষিত হয়। আবার এসব ধর্মে বিজ্ঞান ও দর্শনেরও অনেক মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো ধর্মে 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' (big bang theory), কোনোটিতে স্টিডি স্টেট তত্ত্ব (steady state theory), কোনোটিতে আকস্মিক সৃষ্টিবাদ, আবার কোনোটিতে বিবর্তনবাদের প্রচার ও সমর্থন রয়েছে। এমনকি একই ধর্মে ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সৃষ্টিবাদ ও বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়।

জগৎ-জীবনের উৎপত্তি, উপাদান, প্রকৃতি, ধ্বংস বা প্রলয় সম্পর্কে আল কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স)ও তাঁর বাণীতে, উপমা-উদাহরণের সাহায্যে জগৎ-জীবনের ধারণা দিয়েছেন। এ ছাড়া মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহও জগৎ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে পার্থিব জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

জগতের সৃষ্টি ও বিকাশ সম্পর্কে আল কুরআন

কুরআন অনুযায়ী আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা। আল্লাহই সব কারণের কারণ। আল্লাহই একমাত্র চিরন্তন ও শাশ্বত সত্তা। "তিনিই আদি এবং তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্ত।"[১] তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তাঁর ইচ্ছার দ্বারা এ নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেছেন। "তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোনো কার্য সম্পাদন করতে চান, তখন এ কথা বলেন, 'কুন'—হয়ে যাও 'ফাইয়াকুন'—তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।"[২] এক কথায় জগৎ হচ্ছে আল্লাহর ঐচ্ছিক প্রকাশ। আর তাঁর ইচ্ছাই সমস্ত কার্যকারণের মূল।

আল্লাহ জগতের উপাদান কারণ নয়। আবার এমন নয় যে আল্লাহ পূর্বস্থিত উপাদান থেকে জগৎকে সৃষ্টি করেছেন বা তিনি বিক্ষিপ্ত কোনো আকারহীন বস্তুকে আকার দিয়েছেন। বরং আল্লাহ শূন্য হতে জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি শূন্য হতে জগৎ এবং জাগতিক বস্তুরাজি অস্তিত্বে এনেছেন। আর এ সৃষ্টি তিনি সম্পন্ন করেছেন স্বীয় শক্তি দিয়ে। তিনি বলেন, "আমি স্বীয় শক্তি দিয়ে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক শক্তিশালী। আমি পৃথিবীকে বিছিয়েছি, আমি কত সুন্দরভাবেইনা বিছাতে সক্ষম।"[৩] আল্লাহর কোনো কিছু করার ইচ্ছা হলেই তা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাঁর ইচ্ছার মধ্যে এমন শক্তি নিহিত থাকে, যা ঐ বস্তু সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত হয়। তাঁর ইচ্ছার মধ্যে মূলত তাঁর অসীম শক্তিই কার্যকর হয়।

বিজ্ঞানের সমর্থন

বিজ্ঞানও আজ এ কথা বলে যে, শক্তি হতেই জগতের উদ্ভব। এক প্রচণ্ড শক্তির মহাবিস্ফোরণে জগতের উদ্ভব হয়েছে। এ মতকে আমরা 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' বলে জানি। এ তত্ত্ব অনুসারে আদি অগ্নিগোলক বা 'primordial fire-ball' এ শক্তিপুঞ্জের সমাবেশের ফলে যে বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয় তা হতেই জগতের অস্তিত্বের সূচনা হয়। কিন্তু এই আদিগোলক কোত্থেকে এলো ? ডেভিড আতকাজ (David Atkaz) এবং হেইনজ প্যাজেল (Heinz Pazel) বলেন, "বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কেবল হতাশার বাণী শোনায় এবং বলে এটা এমন প্রশ্ন যার উত্তর আমাদের জানা নেই।"[৪] কেউ কেউ এ হতাশার বিষয়টিকে এক অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকারের মাধ্যমে বোধগম্য করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন জন গ্রিবিন (John Gribbin) তাঁর *To the Edge of Eternity* গ্রন্থে বলেন—"এ সূচনার পশ্চাতে ঈশ্বরকে ধরে নিয়েই কেবল এর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব।"[৫] 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' অনুযায়ী এক মহাবিস্ফোরণের সাথে সাথে সৃষ্টির সূচনা হয়। শূন্য সময় আকস্মিকভাবেই এই বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণের আগে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। তাই কেউ কেউ মনে করেন যে, মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের দ্বারা দুটো সত্য প্রকাশিত হয়েছে। (১) আদিবস্তু মূলত শূন্য হতে সৃষ্টি হয়েছে, (২) শূন্য হতে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যা অতীন্দ্রিয় কোনো মহাশক্তিশালী মহাবিজ্ঞতাকে কারণস্থলে দাঁড় করিয়েই কেবল সম্ভবপর।[৬]

শক্তিকে পদার্থ হিসেবে রূপান্তর সম্ভব—এটা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এটা প্রমাণিত হয়েছে গামারশ্মি থেকে পজিট্রন-ইলেকট্রন জোড় উৎপত্তির ঘটনায়। আলো, এক্স-রে ইত্যাদির ন্যায় গামারশ্মি এক ধরনের শক্তি। পদার্থের সঙ্গে গামারশ্মির সংঘাত ঘটিয়ে দেখা গিয়েছে যে, গামারশ্মির শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে, আর একই সাথে ইলেকট্রন-পজিট্রনের জোড় জন্ম নিয়েছে। এ ছাড়া শক্তি হতে প্রোটন,

---

১. আল কুরআন, ৫৭ : ৩

২. ঐ, ২ : ১১৭, দ্রষ্টব্য, ৬ : ৭৩, ১৬ : ৪০, ৩৬ : ৮২, ৪০ : ৬৮ প্রভৃতি।

৩. ঐ, ৫১ : ৪৭ - ৪৮, অনুবাদ, প্রাগুক্ত

৪. Alan Mac Robert, '*Sky Telescope*', March, 1983 ; কাজী জাহান মিয়া, *আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ* (মহাকাশ পর্ব-১) ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭, পৃ. ২৮৩ থেকে উদ্ধৃত।

৫. কাজী জাহান মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

www.pathagar.com

এন্টিপ্রোটন, ডয়টেরণ-এন্টিডয়টেরণ জোড় উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, শক্তি হতে বস্তুর উদ্ভব সম্ভব। আর এ কারণেই কুরআনের ঘোষণা—"আমি শক্তি দিয়ে আকাশ নির্মাণ করেছি ... ।" (৫১ : ৪৭-৪৮) যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক হওয়ার দাবি রাখে। কুরআনের দাবি হচ্ছে বস্তুগত অস্তিত্ব হিসেবে শূন্য এবং শক্তিগত অস্তিত্ব হিসেবে বিপুল শক্তি হতে জগতের উদ্ভব। "তিনি ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।"[৭] তিনি শূন্য হতে তাঁর শক্তি দিয়ে এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরাক্রমশালী ও শক্তিমান। এ জগতের সবকিছুর স্রষ্টা তিনি কিন্তু তাঁর কোনো স্রষ্টা নেই।[৮] তিনি জগতের কারণ, কিন্তু তিনি কোনো কারণের কার্য নয়।

জগৎ সৃষ্টির পর্যায়কাল

আল্লাহ এ বিশাল জগৎ ৬টি পর্যায়কালে সৃষ্টি করেছেন। "তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এই উভয়ের অন্তরবর্তী সবকিছু ৬টি পর্যায়কালে বা দিবসে সৃষ্টি করেছেন।"[৯] উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো হাদীসে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং উভয়ের মধ্যবর্তী আসবাবনিচয়ের সৃষ্টি ৭দিনে বা পর্যায়কালে করা হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে।[১০] এসব বর্ণনাকে *ইবনে কাসীর, মাযহারী,* প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে গরীব (দুর্বল সূত্র পরম্পরা) ও ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বলে অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং কুরআনের বক্তব্যকেই নিশ্চিত ও অকাট্য বলে প্রচার করা হয়েছে।

আদি উপাদান

আল্লাহ এ বিশাল জগৎ এবং এর বস্তুনিচয়কে বিভিন্ন উপাদানে সৃষ্টি করেছেন। "আর আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি।"[১১] "আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।"[১২] এভাবে বিভিন্ন উপাদানে বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হলেও সকল বস্তুর পশ্চাতে রয়েছে নূরে মুহাম্মদী। হাদীস শরীফে আছে যে, "... অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নূরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন ... অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সে নূরে মুহাম্মদী (স)-এর দিকে তাকালেন। ফলে সে নূর লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। সর্বশরীর হতে অজস্র ঘাম বের হয়। অতঃপর আল্লাহ তার মাথার ঘাম হতে ফেরেশতা জাতিকে সৃষ্টি করেন এবং তার চেহারার ঘাম হতে আরশ, কুরসী, লৌহ, কলম, চন্দ্র, সূর্য, পর্দা, নক্ষত্ররাজি এবং আকাশে যতকিছু আছে তা সৃষ্টি করেন। ...আর উভয় পায়ের ঘাম হতে সৃষ্টি করেছেন পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত ভূমণ্ডলও এতে অবস্থিত সবকিছু।"[১৩] হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সব বস্তুর আদি উপাদান হচ্ছে নূর। মুহাম্মদ (স)-এর নূর।

জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন

মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনে জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দার্শনিকের ব্যাখ্যায় ভিন্নতা রয়েছে। এসব সম্প্রদায় ও দর্শন অনেক সময় কুরআন ও হাদীসের প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়েছে। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায় গ্রিক দর্শনের বিশেষ করে এরিস্টটলের দর্শনের সাথে কুরআনের মতের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা যায়। মু'তাজিলারা কুরআনের সঙ্গে এরিস্টটলীয় মতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের

---

৭. আল কুরআন, ৩০ : ৫৪
৮. ঐ, ১১২ : ১-৪
৯. ঐ, ২৫ : ৫৯
১০. Brandon, S.G.F, ed., *A Dictionary of Comparative Relegion*, London, 1971, p. 209
১১ আল কুরআন, ২৩ : ১২
১২. ঐ, ২৪ : ৪৫
১৩. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, *দাকায়েকুল হাকায়েক*. অনুবাদ, মোহাম্মাদ আবদুস সোবহান, ঢাকা, আল এছহাক প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ১৩ -১৪ থেকে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

মতে, জগৎ অনন্ত ও সৃষ্ট উভয়। অনন্তকাল ধরে জগৎ সারসত্তা (essence) হিসেবে অপূর্ণ অবস্থায় ছিল। এক সময়ে আল্লাহ যখন তাতে গতি সঞ্চালন করেন, তখন তাতে দেহ ও প্রাণের উদ্ভব ঘটে। কুরআনে যখন সৃষ্টির কথা বলা হয়, তখন সেই অনাদি স্থবির সারসত্তায় গতিসঞ্চালনের কথাই বলা হয়। আবার যখন এরিস্টটলের মতে জগতের অনাদিত্বের কথা বলা হয়, তখন আল্লাহ কর্তৃক গতিসঞ্চালনের পূর্ববর্তী অবস্থারই নির্দেশ করা হয়। সুতরাং কুরআনের ভাষ্য ও এরিস্টটলের বক্তব্য উভয়ই সঠিক, দুটিই একই জগৎ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের নির্দেশক।[১৪] ফালাসিফা সম্প্রদায় বিশেষ করে আল ফারাবি (৮৭০-৯৫০), ইবনে সিনা (৯০০-১০৩৭) প্রমুখ মনে করেন যে, বিশ্বজগৎ একটি ক্রমধারায় নির্গত হয়েছে। তাঁদের মতে, জগতের সৃষ্টি একটি অনন্ত বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া। আল্লাহ নিজের সৃজনী শক্তি সম্পর্কে চিন্তা করে প্রথম চিদাত্মা বা বিশ্বাত্মা সৃষ্টি করেন। এই বিশ্বাত্মাই বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের কারণ। বিশ্বাত্মা নিজের কারণ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে সৃষ্টি করলো এমন এক তৃতীয় চিদাত্মার যা গোটা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পরিচালক। এই তৃতীয় চিদাত্মা স্বীয় কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে সৃষ্টি হয় আত্মা। এভাবে সৃষ্টি প্রক্রিয়া জড়জগৎ পর্যন্ত চলতে থাকে। তবে জগতের সবকিছু কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। প্রতিটা ঘটনার পশ্চাতে কোনো-না-কোনো কারণ রয়েছে। অনিবার্যভাবেই কারণ থেকে কার্য উদ্ভূত হয়। তবে আদি কারণ হচ্ছে আল্লাহ। আল্লাহ অনিবার্য সত্তা এবং তাঁর কোনো কারণ নেই।

গ্রিক প্রভাবিত মুসলিম দার্শনিকদের অসারতা

ইমাম গাযালী (১০৫৮-১১১১) তাঁর '*তহাফুতুল ফালাসিফা*' গ্রন্থে মু'তাজিলা ও দার্শনিকদের উক্ত মত অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মুসলিম দার্শনিকেরা মূলত এরিস্টটলের মতকে গ্রহণ করেছেন। এরিস্টটল পরমাত্মা বা আল্লাহকে চিন্তন হিসেবে দেখেছেন, যিনি নিজের সম্বন্ধে নিজেই চিন্তা করেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন চিন্তার চিন্তা। আল কুরআন 'আল্লাহর চিন্তা থেকে জগতের সৃষ্টি' এ মতকে অনুমোদন করে না। বরং জগৎ হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছার পরিণতি। তিনি যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন : 'হও' তখনই তা হয়ে যায়।[১৫] কুরআনের এ ভাবধারাটি আশারিয়া সম্প্রদায় গ্রহণ করেছে। এ সম্প্রদায় মনে করে যে, জগৎ আল্লাহর ইচ্ছার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। আর জগতের উপাদান হচ্ছে পরমাণু। আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে নতুন পরমাণু সৃষ্টি করেন। এতে জগতে রূপান্তর সাধিত হয়। তবে আল্লাহ জাগতিক ঘটনাকে বিশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করেন না। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তিনি জগৎকে উপস্থাপন করেন। ফলে প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতা নীতির উদ্ভব ঘটে। আর কার্যকারণ ঘটনার পারম্পর্য বৈ কিছু নয়। দার্শনিকদের বিরোধিতা করে ইমাম গাযালী বলেন : কার্যকারণের মধ্যে কোনো বাধ্যতামূলক অনিবার্য সম্পর্ক নেই।[১৬] অগ্নির দহন, পানির তৃষ্ণা নিবারণ ইত্যাদি অনিবার্য নয়। বরং আল্লাহর ইচ্ছার উপরই এদের ক্রিয়া নির্ভরশীল। আল্লাহ বললেন : " হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।"[১৭] অগ্নি, শীতল ও নিরাপদ হয়ে গেল। "আমি ইচ্ছা করলে তাকে [পানিকে] লোহা করে দিতে পারি।"[১৮] সুতরাং কারণ-কার্য সম্পর্ক অনিবার্য নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছা কার্য সৃষ্টির আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত কারণ।

---

১৪ . সাইদুর রহমান, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ২য় সংস্করণ, অনুবাদ ও সম্পাদনা, আমিনুল ইসলাম, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১, পৃ. ১২১

১৫ . আল কুরআন, ৩৬ : ৮২

১৬ . Imam Ghazali, *Tahafut al-Falasifa*, tr., S.A Kemali, Lahore, 1958, p. 185

১৭ . আল কুরআন, ২১ : ৬৯, অনুবাদ, প্রাগুক্ত

১৮ . ঐ, ৫৬ : ৭০

www.pathagar.com

জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে আল কুরআন

এ বিশাল জগৎ সৃষ্ট—আল্লাহ এ জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ এ জগতের স্বয়ম্ভুতা নেই। জগৎ তার অস্তিত্বের জন্য অন্য সত্তার উপর নির্ভরশীল। "আমরা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এই উভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু যথাযথভাবে এবং নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছি।"[১৯]

এর সৃষ্টিকর্তা নির্দিষ্ট সময় পরে এর ধ্বংস সাধন করবেন। "কুল্লু শাইয়িন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহাহু" অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস বা নিঃশেষ হয়ে যাবে।[২০]

আল্লাহ এ জগৎকে বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত করেছেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রয়েছে সাতটি স্তর। "আল্লাহ সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।"[২১] এখন সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী কোথায়-কীভাবে আছে, উপরে নীচে স্তরে স্তরে আছে, না প্রত্যেক আকাশ বা পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে, আবার একটি অপরটির চেয়ে ছোট বড় কি-না ইত্যাদি ব্যাপারে কুরআন নিরব। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে হয়ত এ সপ্ত স্তর ব্যাখ্যাত হয়ে থাকবে।

কোনো বস্তু নির্মাণের পশ্চাতে নির্মাতার যেমন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে, ঠিক তেমনি এ জগৎ সৃষ্টির পশ্চাতে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য রয়েছে। "আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এই উভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি ; আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি।"[২২] এখানে কুরআন যন্ত্রবাদের (Mechanism) বিরোধিতা করে। যন্ত্রবাদ যেখানে জগতের পশ্চাতে কোনো বুদ্ধিমান কর্তাকে অস্বীকার করে, কুরআন সেখানে এক বুদ্ধিমান কর্তা ও চেতন শক্তিকে স্বীকার করে। যন্ত্রবাদ যেখানে জড়, শক্তি, গতি, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, কার্য-কারণ, প্রাকৃতিক নিয়ম প্রভৃতির সাহায্যে জাগতিক ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করে, কুরআন সেখানে এক বুদ্ধিময় ও অধ্যাত্মশক্তির পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে।

এ বিশ্বজগৎ স্থির না চলমান, জগৎ আকার-আয়তনের দিক থেকে আদিতে যে রকম ছিল আজ সে রকম আছে কি-না, এর পরিণতি কী ইত্যাদি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিভিন্ন সময়ে এর উত্তর দেয়া হয়েছে। বিংশ শতাব্দির বিশ দশক পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ জগৎ স্থির বলেই মনে করতেন। আবার ১৯৪৮ সালে থমাস গোল্ড, হরম্যান বন্ডি প্রমুখের প্রস্তাবিত ' স্টেডি স্টেট তত্ত্বে' দাবি করা হয় যে, এ জগতের কোনো আরম্ভ নেই। এ জগৎ অনাদিকাল হতে অস্তিত্ববান থেকে আসছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে এর আকৃতি - আয়তনে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভের পর 'স্টেডি স্টেট তত্ত্ব' প্রত্যাখ্যাত হয়। এক মহাবিস্ফোরণের ফলে বিশ্বজগতের উদ্ভব এবং তখন থেকে জগৎ প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এটা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের মূল কথা। শূন্য সময়ে যে আদি ক্ষুদে বিশ্বের জন্ম হয় তা ছিল সূক্ষ্মতর পরমাণুর মধ্যস্থিত সূক্ষ্মতম প্রোটন কণার চেয়ে শত সহস্র মহাপদ্ম গুণ ক্ষুদ্র। এ সময় বিশ্বের ব্যাস ছিল 10^{-33}cm, মতান্তরে 10^{-28}cm, অস্তিত্ববান হতে সময় লেগেছিল 10^{-43}sec, এবং এ সময় সৃষ্টি হয়েছিল প্রচণ্ড উত্তাপ যার পরিমাপ ছিল 10^{32}k, বা ১০,০০০ কোটি কোটি কোটি কোটি ডিগ্রী কেলভিন।[২৩] এ সময় থেকেই সম্প্রসারণ শুরু হয়। এবং সম্প্রসারণ অনবরত চলমান রয়েছে। কুরআন এ সম্প্রসারণের কথা ব্যক্ত করেছে এভাবে "আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি শক্তি বলে ; আমি উহাকে সম্প্রসারিত করতেছি।"[২৪] এ সম্প্রসারণের গতিবেগ খুবই প্রবল। এ গতি এতই দ্রুত যে তা দেখা যায় না। "(তাদের শপথ) যারা প্রবাহমান হয়

১৯. আল-কুরআন, ৪৬ : ৩
২০. ঐ, ২৮ : ৮৮
২১. ঐ, ৬৫ : ১২
২২. ঐ, ৪৪ : ৩৮-৩৯, (দ্রষ্টব্য ১৫ : ৮৫, ২১ : ১৬, ৩৮ : ২৭)
২৩. কাজী জাহান মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
২৪. আল কুরআন, ৫১ : ৪৭, অনুবাদ, প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

এবং অদৃশ্য হয়ে যায়।"[২৫] প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ইডুইন হাবেল এ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। তিনি ১৯২৯ সালে বর্ণালীবীক্ষণের (Spectroscopy) সাহায্যে কয়েকটি গ্যালাক্সির "রেড ও ব্লু শিফট" পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখতে পেলেন যে, প্রত্যেক দূরবর্তী গ্যালাক্সি অপ্রত্যাশিতভাবে রেড শিফট প্রদর্শন করে যাচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে দূরবর্তী অঞ্চলের দিকে গ্যালাক্সিসমূহ ক্রমাগত সরে যাচ্ছে। তিনি আরো দেখতে পেলেন যে, অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী গ্যালাক্সি অধিকতর দ্রুতগতির সাথে উড়ে যাচ্ছে। এ সম্পর্কিত হাবেলের তত্ত্বটি 'হাবেলের আইন' (Habble's law) নামে পরিচিত। এ আইনটির মূল কথা হলো : "যত দূরে সরে যায়, গ্যালাক্সিগুলোর গতি ততই বৃদ্ধি পায়।" হাবেল দেখান যে, ১ মেগাপারসেক দূরত্বের (৩.২৬ মিলিয়ন আলোক বর্ষ) পর প্রতি সেকেন্ডে গ্যালাক্সিসমূহের গতিবেগ ৫০ মাইল হারে বৃদ্ধি পায়। সে সূত্র ধরে ২,৭০০ মিলিয়ন আলোক বছর দূরের কোনো গ্যালাক্সি প্রতি সেকেণ্ডে ৪৫,০০০ মাইল গতিতে ছুটে চলে। 3c-295 গ্যালাক্সিটি প্রতি মুহূর্তে ৯০,০০০ মাইল গতিতে সরে যাচ্ছে।[২৬] এভাবে মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত প্রবাহমান হয় এবং অদৃশ্য হয়।

আল্লাহ এ বিশ্বজগতের সৃষ্টি, বিকাশ, প্রবাহমানতা ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট আকার, সঠিক পরিমাপ ও ধর্ম দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণেই বিশ্বের গতিপ্রকৃতি সুশৃঙ্খলভাবে বজায় থাকে। "আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এই উভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন যথাযথ পরিমাপে সঠিক অনুপাতে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।"[২৭] জগতের বিকাশের সঠিকতাকে অনেক বিজ্ঞানী তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করেছেন। স্টিফেন হকিং তাঁর বিখ্যাত *"A Brief History of Time"* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, আদি অগ্নিগোলকের সম্প্রসারণ যদি অযুত কোটি ভাগের একভাগ বেশি হতো, তবে মহাবিশ্বের সমুদয় বস্তু এতদিনে অদৃশ্য হয়ে যেতো। আর বৃহৎ বিস্ফোরণের এক সেকেণ্ড পর যদি সম্প্রসারণের হার এক লক্ষ মিলিয়ন মিলিয়ন (১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০) ভাগও কম হতো তাহলে মহাবিশ্ব বর্তমান আয়তনে পৌঁছানোর আগেই চুপসে যেতো।[২৮]

আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বিশ্বজগতে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। অগ্নি, পানি, বায়ু, উদ্ভিদ, ফল, শস্য, বাগান, সূর্য, চন্দ্র, পাহাড়-পর্বত, দিন-রাত্রি প্রভৃতিতে আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে।[২৯] এ জগৎ আল্লাহর প্রকাশ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে রয়েছে আল্লাহর নূর বা জ্যোতি।[৩০] অতএব জগৎ, জড়, প্রকৃতি, বস্তু, ব্যক্তি বা চেতনশক্তি প্রভৃতিতে আল কুরআন আধ্যাত্মিকতা দাবি করে।

জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন

মুসলিম দর্শন ও ধর্মতত্ত্বেও জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। মু'তাজিলাদের মতে, জগৎ অনন্ত ও সৃষ্টি উভয়ই। এদের ন্যায় ফালাসিফা সম্প্রদায় বিশেষ করে আল ফারাবী, ইবনে সিনা প্রমুখ জগৎকে চিরন্তন ও সৃষ্ট মনে করেন। ইমাম গাযালী তাঁর *'তহাফুতুল ফালাসিফা'* গ্রন্থে মু'তাজিলা ও দার্শনিকদের উক্ত মত অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে খণ্ডন করেছেন। উক্ত মতের একটি সহজ উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, জগৎ সৃষ্ট ও চিরন্তন বা অনাদি এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। কারণ চিরন্তন ও সৃষ্টির ধারণা হচ্ছে স্ববিরোধী ধারণা। 'এখন বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে এবং হচ্ছে না'—এ বচনটি বিরোধ নিয়মে (law of

---

২৫. আল-কুরআন, ৮১ : ১৬

২৬. কাজী জাহান মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

২৭. আল কুরআন, ৩০ ঃ ৮

২৮. ডব্লু, স্টিফেনহকিং, *কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* অনুবাদ, শক্রজিৎ দাশগুপ্ত, কলকাতা, বাউলমন প্রকাশন, ১৯৯৩, পৃ. ১৩২

২৯. আল কুরআন, ৫৬ : ৭১-৭৪, ৬ : ৯৯, ১৪১ ; ১৩ : ৩-৪ ; ১৬ : ১০-১১ ; ২৩ : ১৮-২০ ; ২৬ : ৭-৯

৩০. ঐ, ২৪ : ৩৫

www.pathagar.com

contradiction) যেভাবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, তেমনিভাবে যা চিরন্তন, যা শাশ্বত তাকে আবার সৃষ্ট বলা —ভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হয়। জগৎ সম্পর্কে দার্শনিকদের কুরআন বিরোধী আরেকটি বক্তব্য হচ্ছে যে, জগতের ঘটনাবলি অনিবার্যভাবে কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আজ যে ঘটনাকে কোনো কারণ হতে সৃষ্টি হতে দেখা যায় ভবিষ্যতে সে কারণ হতে অনুরূপ কার্য অনিবার্যভাবে উৎপন্ন হতে দেখা যাবে। কুরআন এ মত স্বীকার করে না। কুরআন মতে আল্লাহ যে কোনো ঘটনায় যে কোনো ব্যতিক্রম সাধন করতে সক্ষম। আল্লাহর আদেশেই কার্য সম্পাদিত হয়। ইমাম গাযালী এবং ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬) কার্যকারণ সম্পর্কের অনিবার্যতা অস্বীকার করেন। কার্য-কারণের অনিবার্য সম্পর্কের ধারণাকে তাঁরা মনস্তাত্ত্বিক বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য তাঁদের যুক্তি-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

আশারিয়াদের মতে, জগৎ আল্লাহর ইচ্ছার প্রকাশ। তাই এ জগৎ নিশ্চল ও চিরন্তন নয়, বরং জগৎ পরিবর্তন ও ধ্বংসের অধীন। প্রতি মুহূর্তে নিত্যনতুন পরমাণুর জন্ম হচ্ছে। ফলে বস্তুর মধ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আর এ পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। আল্লাহ যখন যেভাবে খুশি, সেভাবে এ জগতে পরমাণুর মধ্যে পরিবর্তন ঘটান। সূফী-দর্শনে জগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে এ বিষয়ে সূফীরা একমত যে, জগৎ অবাস্তব এবং জগৎ হচ্ছে একটি অধ্যাস (illusion)। একমাত্র আল্লাহরই বাস্তব সত্তা রয়েছে এবং অস্তিত্ব বলতে একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বকেই বোঝায়। জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। এখানে সূফীদের সাথে দার্শনিক ইকবালের মতের বিরোধিতা রয়েছে। আল্লামা ইকবাল জগৎকে অনস্তিত্ব, অবাস্তব ও অসত্য মনে করেন না। তাঁর মতে, জগতের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে।[৩১] বাহ্যজগতের সত্তা সম্পর্কে সূফীদের মধ্যে তিনটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা ঃ ক. ইজালিয়া খ. শুহুদিয়া এবং গ. ওজুদিয়া সম্প্রদায়। ইজালিয়া মতবাদ অনুসারে বাহ্যজগতের সত্তা আল্লাহর সত্তা বহির্ভূত বা আল্লাহ থেকে ভিন্ন। তবে বাহ্যজগতের সত্তা আল্লাহর সত্তা হতেই উদ্ভূত হয়েছে। আবার, পরিসমাপ্তিতে এ জগৎ আল্লাহর সত্তায় মিলে যাবে। শুহুদিয়া মতবাদ অনুসারে আল্লাহ মূল সত্তা আর জগৎ তাঁর প্রতিচ্ছবি বা অবভাস (appearence)। জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এ মতবাদ আল্লাহ ও জগতের দ্বৈততা প্রচার করে। একজন মরমী সাধক সাধনার উচ্চতর স্তরে এ দ্বৈততা উপলব্ধি করেন। এ মতবাদের প্রবর্তক মুজাদ্দিদ আলফেসানী শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (১৫৬৩-১৬২৪) মনে করেন, মরমী অভিজ্ঞতার প্রথম স্তরে আল্লাহ ও জগৎকে অভিন্ন বলে ভুল হতে পারে। তাঁর মতে, ওয়াহ্দাতুল ওজুদ মতবাদ এ ভুলটি প্রচার করে থাকে। ওজুদিয়া মতবাদানুসারে আল্লাহ একমাত্র প্রকৃত সত্তা, বিশ্বজগৎ তাঁর নাম ও গুণাবলির প্রকাশ। আল্লাহ ও জগতের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। আল্লাহ ও জগৎ অভিন্ন। এ মতবাদ অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ নামে পরিচিত। স্পেনের বিখ্যাত সূফী দার্শনিক ইবনুল আরাবী (১১৬৫-১২৪৩) এ মতবাদের প্রবর্তক। শুহুদিয়া ও ওজুদিয়া মতবাদে আল্লাহ ও জগতের মধ্যে দ্বৈততা ও অদ্বৈততার যে বিরোধ, তা শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (১৫৯২-১৬৫৮) '*ফায়সালাতু ওয়াহদাতুল ওজুদ ওয়া ওয়াহদাতুশ শুহুদ*' গ্রন্থে নিরসনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে এ দুটি মতবাদ একই সত্যের দুটি দিকের প্রকাশ করে। তিনি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। মোম দিয়া একটি ঘোড়া, গাধা ও মানুষ তৈরী করা হলো। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই মোম আছে। এই দিক দিয়ে তারা অভিন্ন কিন্তু তাদের আকৃতি একেকটির একেক রকম। তাই তারা ভিন্ন। অর্থাৎ আল্লাহ ও জগৎ সত্তাগতভাবে অভিন্ন, আকৃতিগত দিক থেকে ভিন্ন। এ উদাহরণটির একটি দুর্বলতা রয়েছে। এটা আল্লাহ ও জগৎকে উপাদানগতভাবে অভিন্ন হওয়ার দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ ও জগতের মধ্যে পার্থক্য আছে। শিল্পী ও তার শিল্পকর্মের মধ্যে ভিন্নতা আছে যদিও শিল্পকর্মের মধ্যে শিল্পী তার ছাঁপ বা নিদর্শন বা তার অন্তরাবস্থার প্রকাশ ঘটাতে পারেন। শিল্পকর্মের মধ্যে শিল্পীকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে,

৩১ . Saiyed Abdul Hai, *Iqbal the Philosopher*, Dhaka : Islamic Foundation, 1980, p. 21

www.pathagar.com

তার নিপুণতা ধরা পড়তে পারে, ভক্ত এর মধ্যে অভিন্নতা খুঁজে পেলেও বিষয় দুটিই। শিল্পীর তুলিতে শিল্পকর্ম জন্ম নেয়ার পর সেখানে দুটো বস্তুরই অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়। নির্মাতা ও নির্মিত বস্তু। অতএব, স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টবস্তু হিসেবে জগৎ দুটো ভিন্ন সত্তা।

কিয়ামত (মহাপ্রলয়)

এ জগৎ শূন্য হতে সৃষ্টি হয়ে নিতান্ত ক্ষুদ্রতর অবস্থা হতে সম্প্রসারিত হয়ে এ বিশালাকৃতি লাভ করেছে। এ বিশ্ব আজও সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু একদিন এ জগৎ এবং তার মধ্যস্থিত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, বিশাল আকাশ ধ্বংস হয়ে যাবে। ভূমণ্ডল অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। তেজোদীপ্ত সূর্য, জ্যোতির্ময় চন্দ্র ম্লান হয়ে যাবে। সুদৃঢ় পর্বতরাজি, প্রবাহমান মহাসমুদ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মানুষ হারাবে তার জৈবিক ও বৌদ্ধিক অস্তিত্ব। বৃহত্তম প্রাণী থেকে ক্ষুদ্রতম কীট পর্যন্ত বিলীন হয়ে যাবে। সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়। কেবল আল্লাহর সত্তা অবশিষ্ট থাকবে।[৩২] কুরআনে এ ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা রয়েছে। কুরআন এ ধ্বংসযজ্ঞকে 'কিয়ামত' বলে অভিহিত করেছে। কিয়ামত বা ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে নিম্নে কুরআনের কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হলো :

"সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র।" (২১ : ১০৮)

"সেদিন আকাশ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতমালা চলমান হবে।" (৫২ : ৯-১০)

"সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মত এবং পর্বতসমূহ হবে রঙিন পশমের মত।" (৭০ : ৯-১০)

"চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে।" (৭৫ : ৮-৯)

"এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত।" (১০১ : ৫)

"যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে একটিমাত্র ফুৎকার। এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে।" ৬৯ : ১৩-১৫)

কিয়ামত শুরু হওয়ার পর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ধ্বংস হতে থাকবে মানুষ নিদারুণ কষ্ট- ক্লেশের সম্মুখীন হবে। পরিশেষে মানুষেরও বিলুপ্তি ঘটবে। এ অবস্থা কুরআনে বিবৃত হয়েছে এভাবে ঃ

"হে লোক সকল : তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবর্তী গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল।" (২২ : ১-২)

"যেদিন বালককে বৃদ্ধে পরিণত করবে।" (৭৩ : ১৭)

"তখন তারা ওসিয়ত করতেও সক্ষম হবে না। এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না।" [যে যেখানে থাকবে সেখানেই তার মৃত্যু হবে] (৩৬ : ৫০)

ইবনে আরাবীর মতে, শিঙ্গার তিনটি ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকার হবে ত্রাসের ফুৎকার। এ ফুৎকারে আকাশ ও পৃথিবীর ভাঙন শুরু হবে এবং সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুৎকার হবে বজ্রের ফুৎকার। এ ফুৎকারে অন্যান্য সবকিছুর সাথে মানুষ মারা যাবে এবং এ বিশ্ব সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুৎকার হবে পুনরুত্থানের ফুৎকার। এতে মৃত মানুষেরা জীবিত হয়ে উত্থিত হবে।[৩৩]

আল কুরআনে কিয়ামত দিবসের স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে এক আয়াতে এক হাজার বছর (৩২ : ৫) এবং আরেক আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছর (৭০ : ৪) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীরবিদদের মতে, এ আয়াতদ্বয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। মূলত কিয়ামত দিবসের স্থায়িত্ব আপেক্ষিক হবে। কাফেরদের নিকট ঐদিন কঠোরতা ও ভয়াবহতার কারণে খুবই দীর্ঘ মনে হবে। আর মু'মিনদের নিকট

---

৩২. আল কুরআন, ৫৫ : ২৭

৩৩. মাওলানা মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন*, অনুবাদ, মাওলানা মুহিউদ্দিন, সউদী আরব : বাদশাহ ফাহাদ মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৮৯২।

www.pathagar.com

কাফেরদের চেয়ে কম দীর্ঘ মনে হবে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, সাহাবারা মুহাম্মদ (স) কে কিয়ামত দিবসের স্থায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : "আমার প্রাণ যে সত্তার করায়ত্ত, তাঁর শপথ করে বলছি, ঐ দিনটির স্থায়িত্ব মু'মিনের জন্য একটি ফরয নামায পড়ার চেয়েও কম হবে।"[৩৪]

কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে—এ ব্যাপারে আল কুরআন নির্দিষ্ট কোন সময়ের উল্লেখ করেনি। এ বিষয়টি সম্পর্কে কেবল আল্লাহর জ্ঞান রয়েছে। "এর জ্ঞানতো আপনার পালনকর্তার নিকটই রয়েছে। তিনি তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। নভোমণ্ডল ও ভূণ্ডলের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। তোমাদের অজান্তেই তা উপস্থিত হবে।"[৩৫] কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স) একটি হাদিসে বলেন : "মানুষ নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থাকবে। বিক্রেতা ক্রেতাকে কাপড়ের থান খুলে দেখাবে, ক্রেতা এ বিষয়টি সাব্যস্ত করতে পারবে না। এর মধ্যে কিয়ামত এসে যাবে। এক লোক তার উটনীর দুধ দোহন করে নিয়ে যেতে থাকবে, কিন্তু তা ব্যবহার করতে পারবে না এর মধ্যেই কিয়ামত এসে যাবে। কেউ নিজের ঘর মেরামত করতে থাকবে, তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কিয়ামত এসে যাবে। কেউ খাবার লোকমা হাতে তুলে নিবে, তা মুখে দেবার পূর্বেই কিয়ামত এসে যাবে।" (বুখারী ও মুসলিম) তবে কুরআন এবং হাদীসে কিয়ামতকে নিকটবর্তী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। "কিয়ামতের ব্যাপারটিতো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী।"[৩৬] "কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।"[৩৭] চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এরূপ— আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, "আমরা নবী (স)-এর সঙ্গে মিনায় অবস্থান করতে ছিলাম। এ সময় চন্দ্র বিদীর্ণ হলো এবং তার একটি টুকরা পর্বতের দিকে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন : তোমরা দেখ এবং সাক্ষী থাক।" (বুখারী ও মুসলিম) হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আঙ্গুলের ইঙ্গিতে মু'জিযাস্বরূপ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে বলে মুসলমানদের বিশ্বাস রয়েছে।

হযরত মুহাম্মাদ (স)ও কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ সম্পর্কে কিছু বলেননি। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তাঁকেও আল্লাহ এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান প্রদান করেননি। তবে কিয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি তাঁর সামনে প্রকাশ করা অস্বাভাবিক নয়। এ লক্ষণ থেকে হযরত মুহাম্মাদ (স) মন্তব্য করেছেন যে, "আমার আবির্ভাব এবং কিয়ামত এমনভাবে মিশে আছে যেমন মিশে থাকে হাতের দুটি আঙ্গুল।" (তিরমিযী)

এক কথায় ইসলামের বিশ্বাস হচ্ছে কিয়ামত আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হবে। সেদিন জগতের সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। এবং আল্লাহ এ জগতের অবসান ঘটিয়ে আরেকটি জগতের উন্মোচন ঘটাবেন।

পার্থিব জীবন সম্পর্কে আল কুরআন

মানবজীবন অত্যন্ত দীর্ঘ একটি পথ-পরিক্রমা। বিভিন্ন স্তর ও অবস্থার মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার মধ্য দিয়ে একজন মানবের অস্তিত্বের সূচনা হলো তা নয় বরং তার অস্তিত্বের সূত্রপাত বহু বছর পূর্বে। ভূমিষ্ঠের মধ্য দিয়ে একটা স্তরে উপনীত হলো মাত্র। ইসলাম অনুসারে, আল্লাহ তাবৎ আত্মাকে একই সময়ে সৃষ্টি করেছেন। এবং এ পৃথিবীতে কোনো মানব প্রেরণের পূর্বে এ সকল আত্মার নিকট থেকে তাঁর প্রভুত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। সকল আত্মা 'আলমে আরওয়াহ' বা রূহের জগতে অবস্থান করে। এসব আত্মাকে আল্লাহ পর্যায়ক্রমে মাতৃগর্ভে ভ্রূণে প্রেরণ করেন।[৩৮] পরে ভূমিষ্ঠের

৩৪ . *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০২
৩৫ . আল কুরআন, ৭ : ১৮৭
৩৬ . ঐ, ১৬ : ৭৭
৩৭ . ঐ, ৫৪ : ১
৩৮ . ঐ ৭ : ১৭২ ; ৩২ : ৯

www.pathagar.com

মধ্য দিয়ে সে এ পার্থিব জীবন লাভ করে। এরপর মৃত্যুতে এ পার্থিব জীবনের অবসান ঘটিয়ে জীবনের নতুন আরেকটি স্তরে সে উপনীত হয়।

রূহের জগতের জীবনে মানবের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। সেটা ঐশী জীবন। সেখানে পছন্দ, নির্বাচন, কর্ম বা সুখ-দুঃখের বালাই নেই। কিন্তু পার্থিব জীবন মানবের কর্মতৎপরতার জীবন। এ জীবনে তার কর্মের জন্য তার নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। এবং তার কর্মের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ জীবনের কর্মের উপর তার পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে। পরকালীন জীবনে তার কোনো কর্মতৎপরতা, দায়-দায়িত্ব থাকবে না। সেখানে সে কেবল পার্থিব কর্মের ফলভোগ করবে।

পার্থিব জীবনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে

মূলত ইসলাম মরণোত্তর জীবনকেই প্রাধান্য দেয়। ইহ-জীবন ক্ষণস্থায়ী, মরণাত্তর জীবন স্থায়ী ও অনন্ত। তবে মরণোত্তর বা পরকালীন জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে ইহ-জীবনের কর্মের উপর। পার্থিব জীবনে যে পুণ্য-কর্ম করবে তার পরিণতি শুভ হবে, আর যে পাপাচার করবে তার পরিণতি অশুভ হবে। পুণ্য ও পাপাচারের মানদণ্ড হচ্ছে আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সুন্নাহ। তাই জীবন পরিচালিত হওয়া চাই কুরআন নির্দেশিত মত ও রাসূলুল্লাহ্ (স) প্রদর্শিত ও অনুমোদিত পথে। ইসলাম আল্লাহর প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য দাবি করে। আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে—"ওয়া'বুদু রাব্বাকুমুল্লাজি খালাকাকুম"— তোমরা সে প্রতিপালকের দাসত্ব কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর দাসত্বের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ মানব ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।[৩৯] তাই ইসলাম অনুসারে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের মধ্য দিয়ে জীবন সার্থক হয়ে ওঠে।

জীবন কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। এমন নয় যে, প্রকৃতির নিয়মে জীবনের উদ্ভব ঘটে, আবার প্রকৃতির নিয়মে জীবনের অবসান ঘটে। জীবন প্রকৃতির ক্রীড়নক মাত্র নয়। জীবনের সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। অসংখ্য বিকল্পের মধ্যে সে যে কোনোটিকে বেছে নিতে পারে। কোনটি ভাল বা মন্দ, উচিত-অনুচিত, সঠিক-ভ্রান্ত তা তার সামনে সুস্পষ্ট। গ্রহণ-বর্জনের ক্ষমতা তার রয়েছে। এ কারণে তাকে তার কর্মের জন্য দায়ী করা যুক্তিসঙ্গত এবং ইসলাম দায়িত্বের ধারণাকে অত্যন্ত জোরালোভাবে উপস্থাপন করে। ইসলাম অনুসারে বয়োঃপ্রাপ্তির পর মানুষকে প্রতিটা সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করা হবে এবং অসৎকর্মের জন্য শাস্তি দেয়া হবে। এমনকি জীবনব্যাপী আয়-ব্যয়ের জন্যও তাকে জবাবদিহি করতে হবে। প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-কাণ্ডেরও হিসাব দিতে হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ তার জীবনকে নিরঙ্কুশভাবে ভোগ করতে পারে না, এবং জীবনের উপর তার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নেই। তার প্রভুর আদেশ-নিষেধ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সন্তুষ্টি ক্রোধ ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে জীবনাচরণ করতে হয়। এ দিক থেকে সে পরাধীন। সে যা খুশি তাই করতে পারে না, যেদিকে খুশি সেদিকে জীবনকে প্রধাবিত করতে পারে না। তাকে যাপন করতে হয় শৃঙ্খলিত ও সংযত জীবন। এ শৃঙ্খলিত ও সংযত জীবনের মধ্যেই তার সার্থকতা নিহিত।

মানুষ বৈষয়িকতা ও জাগতিকতাকে অস্বীকার করতে পারে না। নানা প্রয়োজনে ও স্বভাবগতভাবে তাকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-যাপন করতে হয়। এসবের মাঝেও তার নানা প্রশ্ন জাগে সে কোত্থেকে এসেছে, কোথায় যাবে, এ জীবনে কী তার করণীয়, কিসে তার মঙ্গল, কিসে তার স্থায়িত্ব বা অমরতা প্রভৃতি। এসব প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে বেড়ায়। এর উত্তর না পেলে সে চরম তৃপ্তিহীনতায় ভোগে। এসব সম্পর্কে প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও উত্তর রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে, এ পৃথিবীতে চেষ্টা-তদবির ব্যতীত কিছুই হয় না। কিন্তু মানুষ স্বীয় চেষ্টা-তদবির ব্যতীত এ পৃথিবীতে এসেছে এবং সে যে স্থান ও কালে এসেছে সে স্থান ও কাল নির্বাচনেও তার কোনো হাত ছিল

৩৯. আল-কুরআন, ২ : ২১ ; ৫১ : ৫৬।

www.pathagar.com

না। আবার তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। কবে সে ইহলোক ত্যাগ করবে তাও সে জানে না। এতেও তার কোনো হাত নেই। অন্যদের থেকে তার বৈচিত্র্য, স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। বহু চেষ্টা করেও সে অন্যের মধ্যে বিদ্যমান একটি অসাধারণ গুণ আয়ত্ত করতে পারে না। আবার অনায়াসে সে জটিল কর্ম সম্পাদনের বিস্ময়কর ক্ষমতা রাখে। এসবের পশ্চাতে সে এক পরম সত্তার অস্তিত্ব খুঁজে পায়। জগতের সবকিছুতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, পরিকল্পনা এবং সুনিপুণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অণু থেকে সুবিশাল পর্বতরাজি, ক্ষুদ্র কীট থেকে বিশালদেহী প্রাণী সবকিছুই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করছে। কিন্তু জড় বা প্রাণী কিংবা তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন মানুষ কেউই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, প্রত্যেকের অন্যের প্রতি কম-বেশী নির্ভরতা রয়েছে। এরা নিজেরা যেমন নিজেদেরকে অস্তিত্ববান করতে পারে না তেমনি এরা নিজেদেরকে রক্ষাও করতে পারে না। এমনিভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান তাদের পশ্চাতে এক বুদ্ধিময়, জ্ঞানী ও পরিকল্পনাকারী সত্তার অস্তিত্ব নির্দেশ করে। এ সত্তার নিকট মানুষ অবনত হয়, নিজেকে সমর্পণ করে এবং এ সত্তার আনুগত্যের মধ্য দিয়ে জীবনকে সার্থক করে তোলে।

ইসলাম কর্মকুশল জীবনের কথা বলে। সংগ্রাম, শ্রম ও সাধনার মধ্য দিয়ে জীবনের উৎকর্ষ সাধনের দীক্ষা দেয় ইসলাম। তবে ইসলাম জাগতিক উৎকর্ষের চেয়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকে অধিক গুরুত্ব দেয়। ইসলাম জৈবিক ও মানসিক সকল যৌক্তিক প্রয়োজনকে অনুমোদন করে। তবে ইসলাম সীমালঙ্ঘনকে নিরুৎসাহিত করে এবং অবৈধ ও অনাধিকার ভোগকে কঠোরভাবে নিষেধ করে। সংগ্রাম, শ্রম ও সাধনা দিয়ে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সার্থক করতে হয়। আল্লাহ বলেন, "লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি কাবাদ"—আমরা মানুষকে শ্রম নির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।[৪০]

পার্থিব জীবন পরীক্ষার স্থান

মৃত্যুপরবর্তী জীবনে মানুষের জন্য রয়েছে বেহশত অথবা দোজখ। পার্থিব জীবনে যারা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে পারবে তারা পরজীবনে বেহশতের অনন্ত সুখরাজি ভোগ করবে। আর যারা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা পরজীবনে দোযখের নির্মম যন্ত্রণা ভোগ করবে। তাই ইসলামের অনুসারীদের মতে মানবজীবনের লক্ষ্য হচ্ছে দোযখের শাস্তিভোগ থেকে নিস্তার লাভ এবং বেহশত প্রাপ্তির সাধনা করা। অবশ্য সূফীদের মতে মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর প্রেম অর্জন করা। এবং মরণোত্তর জীবনে আল্লাহর সান্নিধ্য ও মিলন লাভের জন্য সাধনার মধ্যেই পার্থিব জীবনের সার্থকতা নিহিত।

মানুষ তার বুদ্ধিমত্তা ও ধীশক্তি দিয়ে এ জগতে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। প্রকৃতির সবকিছুই সে নিজের কাজে লাগিয়ে যাচ্ছে। নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, পাহাড়, সাগর, ভূমণ্ডল এবং তার অন্তস্থ খনিজ সবকিছুই যেন মানুষের সেবাদাস। সাপের বিষকেও সে নিজের কল্যাণে ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছে। আল কুরআন এ সত্যটিকে ধারণ করেছে এভাবে : "ওয়া খালাকা লাকুম মাফিল আরদি জামিয়া" অর্থাৎ ভূমণ্ডলের সমস্ত কিছুকে তোমাদের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এ জগতে মানুষের স্থায়ী হওয়ার উপায় নেই। কারণ স্রষ্টা তাকে এ জগৎ ত্যাগ করতে বাধ্য করবেন। স্রষ্টা তাঁর কিতাবে মানুষকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন "কুল্লু নাফছিন জায়িকাতুল মাউত"—প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আবার হাদীসে কুদসীতে বলে দেয়া হয়েছে : "ইন্নাদ্দুনিয়া খুলেকা লাকুম, ওয়া আনতুম খুলেকতুম লিল আখিরাহ" অর্থাৎ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরকালের জন্য। তাই ইসলাম অনুসারে মানবের লক্ষ্য হচ্ছে পরজীবন। তাই বলে পার্থিব জীবন মানুষের নিকট তাৎপর্যহীন নয়। এ জগতের আবশ্যকীয় বিষয়াবলিকে গ্রহণ করে এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলিকে ত্যাগ করে তার পরজীবনকে সার্থক করতে হয়। তাই পার্থিব জীবন তার নিকট সংগ্রামের, নিয়মতান্ত্রিক ও শৃঙ্খলের।

জগতের সবকিছুতে আল্লাহর পরিকল্পনা রয়েছে। জগৎ আল্লাহ স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করেছেন আবার এক সময় এর ধ্বংস সাধন করবেন। এ জগতের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে চান। তাই

৪০. আল কুরআন, ৯১ : ৪

www.pathagar.com

প্রতিটা বস্তু সৃষ্টিতেই তাঁর উদ্দেশ্য রয়েছে। "নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এই উভয়ের মধ্যে যা আছে তা আমি ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য সৃষ্টি করিনি।"[৪১] এ জগৎ এবং তার বস্তুসমূহকে আল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। এ সবের মধ্য দিয়ে তিনি তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন করতে চান।

এ সত্ত্বেও পার্থিব জগতে ছলনা, প্রতারণা, মোহ ও লালসার নানা উপায়-উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। এসব বস্তুতে মানুষের মোহগ্রস্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কুরআন বলছে : "মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু।"[৪২] স্বীয় প্রবৃত্তি ও ভোগ্যবস্তু সম্বন্ধে মানুষের সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। জগতের স্রষ্টা স্বয়ং একে ছলনাময় বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছু নয়। আর পার্থিব জীবনে প্রাচুর্য্যের প্রতিযোগিতাই মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।"[৪৩] কিন্তু কেন ? কেন আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি বস্তুজগৎকে ছলনাময় করেছেন ? কেন এমন করে সৃষ্টি করেছেন যা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে ? এর মধ্যে স্রষ্টার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। এ উদ্দেশ্যের কথা কুরআন বিবৃত করেছে এভাবে : "আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পার্থিব জীবনের জন্য সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি, যাতে মানবকুলকে পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে কে উত্তম কাজ করে।"[৪৪] "পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ ?"[৪৫] আল্লাহ পার্থিব জগতে ভাল ও মন্দ উভয় উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন অসংখ্য বিকল্প। এ বিকল্প থেকে পছন্দ, নির্বাচন ও কর্মের স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে। আর ইচ্ছা, চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে বলেই মানুষকে তার কর্মের জন্য দায়ী করা চলে। পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করা যায়।

অতএব, ইসলাম মতে, পার্থিব জীবন মানুষের জন্য পরীক্ষার স্থল। মুহাম্মদ (স) বলেন : "আদ্দুনিয়া মাজরি'আতুল আখিরাহ" অর্থাৎ পার্থিব জীবন হচ্ছে পরজীবনের শস্যক্ষেত্র। মানুষ এ জীবনে যে রকম কর্ম করবে পরজীবনে সে রকম ফলভোগ করবে। মানুষের কাজ হচ্ছে সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য অবলম্বন করা। আল্লাহর আনুগত্য করার জন্যই মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪৬] পার্থিব জীবন এ আনুগত্যের পরীক্ষা ক্ষেত্র। এ আনুগত্যের সফলতা ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে পরকালীন সুখ-দুঃখ। পরজীবনই প্রকৃত জীবন। "আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরজীবনের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং পার্থিব জীবন থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়োনা।"[৪৭] পরজীবনের সার্থকতা অর্জনের উপায় হিসেবে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের গ্রহণ দূষণীয় নয়।

উপসংহার

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পরজীবনের সম্বল সংগ্রহের জন্যই পার্থিব জগৎ ও জীবনের আবশ্যকতা। তবে পার্থিব জগৎ ও জীবনের প্রতি উদাসীন হতেও ইসলাম শিক্ষা দেয় না। মুহাম্মদ (স)-এর উক্তি "লা রাহবানিয়াতা ফিল ইসলাম"—ইসলামে বৈরাগ্য নেই। বিবাহ, পানাহার, পরিচ্ছদ, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা পরিমাণমত ও পরজীবনের আবশ্যক অনুযায়ী ব্যবহার ইসলাম অনুমোদন করে। তবে এসবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর অনুগত্য বজায় রেখে পার্থিব জগৎ ও জীবনকে পরজীবনের জন্য অর্থবহ করার কথা ইসলাম শিক্ষা দেয়।

---

৪১ . আল-কুরআন, ২১ : ১৬
৪২ . ঐ, ৩ : ১৪
৪৩ . ঐ, ৩ : ১৮৫ ; ১৩ : ২৬ ; ১০২ : ১
৪৪ . ঐ, ১৮ : ৭
৪৫ . ঐ, ৬৭ : ১-২
৪৬ . ঐ, ৫১ : ৫৬
৪৭ . ঐ, ২৮ : ৭৭

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৩

আল কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অলিগণ : পরিচিতি ও মর্যাদা

ড. মুহাম্মদ মুজাম্মিল আলী*
ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম**

এ নশ্বর জগত সকল মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র। মহান আল্লাহ্ জীবন-মৃত্যু দিয়ে আমাদেরকে সৃষ্টি করে দেখতে চান—আমাদের মাঝে কারা সৎকর্মের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। কে কত উত্তম পরীক্ষা দিতে পারে। নবী, রাসূল, অলি ও দরবেশ সকলের ক্ষেত্রে এ পরীক্ষা সমানভাবে প্রযোজ্য। এটি এমন একটি পরীক্ষা যে, এর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী আল্লাহরই দেয়া। তিনি নিজেই এর প্রশ্নকর্তা, পরিদর্শক ও পরীক্ষক। কারো পক্ষে এ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির বাইরে গিয়ে কিছু করার যেমন কোনো বৈধ অধিকার নেই, তেমনি কেউ গিয়ে থাকলেও এর দ্বারা তার পক্ষে ভাল ফলাফল অর্জনের আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই। অনুরূপভাবে এর পরীক্ষক তিনি নিজেই হওয়াতে ফলাফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কারো কোনো প্রকার অবিচারের শিকার হওয়ারও কোনো সম্ভবনা নেই। সবাই এ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রাপ্ত হবে পরকালের এক ভয়াবহ দিনে। তবে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনানুযায়ী বোঝা যায় যে প্রত্যেক মানুষই মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী পুনঃরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ বরযখী জীবনে তার এ পরীক্ষার ভাল-মন্দের আংশিক ফলাফল ভোগ করতে আরম্ভ করে। বরযখী জীবনটি অনেকটা জেলখানায় অবস্থানরত বিচারাধীন বিভিন্ন ধরণের আসামীর জীবনের ন্যায়। সেখানে যারা প্রারম্ভে বা বিলম্বে জান্নাতের শান্তি ভোগ করবে, পরকালেও তারা চূড়ান্ত ফলাফল আশানুরূপ পাবে। কিন্তু কিয়ামত দিবসের দীর্ঘ সময়ের ভয়াবহ পরিবেশ পরিস্থিতি অবলোকন করে রাসূল (সা) ব্যতীত অন্যান্য নবী-রাসূল নির্বিশেষে সকল মানুষই সেদিন আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। আল-কুরআনের বর্ণনামতে সেদিন নবীগণ—

"আল্লাহর ভয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মাঝে পতিত হবেন।"[১]

আর অলি ও দরবেশসহ অন্যান্য সকল মানুষ—

"সেদিন নিজেদের মাতাপিতা, ভাই, স্ত্রী ও সন্তানাদি থেকে পালিয়ে বেড়াবে, প্রত্যেকেই সেদিন আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকবে।"[২]

নবী-রাসূলসহ কারো পক্ষে আল্লাহর দরবারে তাঁর আগাম অনুমতি ব্যতীত আপন বা পর কারো জন্যে কিছু আবদার করার সাহস থাকবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন :

"এমন কে আছে যে (সেদিন) তাঁর (আল্লাহ্‌র) অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট (কোনো কিছুর জন্যে) শাফা'আত করতে পারে।"[৩]

বস্তুত আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে এমন দুঃসাহসী কেউ নেই। পরকালের ভয়াবহ দুর্দিনে মানুষের ভয়-ভীতির কথা উপরোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়ে থাকলেও অন্যান্য কিছু সংখ্যক বিশেষ গুণাবলী

* সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্বাবদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
**সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্বাবদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. আল কুরআন, সূরা আম্বিয়া : ২৮
২. আল কুরআন, সূরা আবাসা : ৩৪
৩. আল কুরআন, সূরা বাকারা : ২৫৫

www.pathagar.com

সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে অভয়েরও আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। বাহ্যত উভয় ধরণের আয়াতসমূহের মাঝে বিরোধ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এ দু'য়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। তবে সাধারণ জনগণের মাঝে অভয় সংক্রান্ত আয়াতগুলোর প্রকৃত অর্থ না বোঝার ফলে মারাত্মক একটি ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে বলেই মনে হয়। সাধারণ জনগণ মনে করেন, এ সব আয়াতে যাদেরকে পরকালে অভয় দান করা হয়েছে তারা সেদিন আদৌ কোনো ভয় ভীতির শিকার হবে না। এসব অভয় প্রাপ্তদের মাঝে আল্লাহ্‌র আলিগণ থাকায় তাদের ভুল বোঝাবুঝির মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা মনে করেন আলিমগণের যখন সে দিন কোনো ভয় নেই, তা হলে সে দিন তাঁরা তাঁদের ভক্তদের মুক্তির চিন্তায়ই ব্যস্ত থাকবেন এবং শাফা'আতের মাধ্যমে বিপদগ্রস্থ ভক্তদেরকে দোযখে প্রবেশের পূর্বেই আগাম মুক্ত করে নেবেন। সাধারণ জনসমাজে এ জাতীয় ধারণা বহুল প্রচলিত হওয়ার ফলে ভারত উপমহাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম অমুসলিম দেশসমূহের সাধারণ মুসলিমগণকে হযরত আবদুল কাদির জিলানী, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী, হযরত শাহজালাল (র) ও অন্যান্য আউলিয়াদের মাযারে গমনাগমন করতে দেখা যায়। কারো দ্বারা কোনো অলৌকিক বা অস্বাভাবিক কর্ম প্রকাশিত হতে দেখলেই তাকে আল্লাহর অলি মনে করে তার নিকট বায়'আত গ্রহণ করতে দেখা যায়। এমনকি অনেকে নেংটা ফকিরদেরকেও আল্লাহর অলি বলে মনে করেন। এবং মনস্কামনা পূরণের জন্যে তাদের নিকট থেকে তাবিজ, পানি পড়া, তেল পড়া ইত্যাদিও নিয়ে থাকেন। আউলিয়াগণের শাফা'আতে মুক্তির আশায় অনেককে নামায, রোযার মত ফরজ ইবাদতগুলোকেও নির্দ্বিধায়, অকপটে ত্যাগ করতে দেখা যায়। তাদের পীর বাবার শিক্ষার বাইরে করো কোনো কথা শুনতেও তারা রাজী নয়। ঈমান ও আকীদায় ঘুণে ধরা এসব বিপথগামী মুসলিমদেরকে অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে উদ্ধারের জন্যেই এ প্রবন্ধের অবতারণা। এ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যক :

ক. পরকালে যারা অভয় পেলেন।
খ. আল্লাহর অলিগণের সংজ্ঞা।
গ. পরকালে অলিগণের অভয় পাওয়ার তাৎপর্য।
ঘ. শাফা'আতের মূলকথা।

এবার তাহলে আসুন এক এক করে এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

ক. পরকালে যারা অভয় পেলেন

পরকাল তথা কিয়ামত দিবস একটি মহাপ্রলয়ংকারী দিবস। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ দিবসের ভয়ংকর অবস্থার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা পড়লে ভয়ে শরীর শিউরে উঠে এবং শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়। সেজন্যে সর্বদাই আল্লাহর অলিগণ এ দিনের চিন্তায় মুহ্যমান থাকেন। যে কাজ করলে সে দিন আল্লাহর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সে সব সম্ভাব্য কাজে তাঁরা সর্বদাই একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করে থাকেন। সে দিনে কারো আঁচল ধরে মুক্তি পাবার অলীক স্বপ্নে বিভোর হয়ে তাঁরা সময় ক্ষেপণ করেন না। বরং আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত অনুসরণ করার মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চান। বস্তুত এ জাতীয় মানসিকতা পোষণকারী মু'মিন, মুত্তাকী ও সৎকর্মশীলদের জন্যে রয়েছে পরকালে জান্নাত লাভের অভয়বাণী। পবিত্র কুরআনের যে সকল আয়াতে তাঁদের জন্যে এ অভয়বাণী উচ্চারিত হয়েছে, সেই আয়াতগুলো নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন :

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"পরে যখন তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নোই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।।" (আল কুরআন, সূরা বাকারা : ৩৮।)

www.pathagar.com

২. মহান আল্লাহ বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصَّبِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহুদী হয়েছে এবং খৃস্টান ও সাবিঈন—যারাই আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার আছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (আল কুরআন, সূরা বাকারা: ৬২।)

৩. মহান আল্লাহ বলেন :

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَايُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"যারা আল্লাহ্র পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে অতঃপর যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (আল কুরআন, সূরা বাকারা : ২৬২।)

৪. মহান আল্লাহ বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"যারা ঈমান আনে, সৎকার্য করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"(আল কুরআন, সূরা বাকারা : ২৭৭।)

৫. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, এজন্য যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ১৬৯-১৭০।)

৬. মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"আমি রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি। কেউ ঈমান আনলে ও নিজকে সংশোধন করলে তার কোনো ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না।" (আল কুরআন, সূরা আল আন'আম : ৪৮।)

www.pathagar.com

৭. মহান আল্লাহ বলেন :

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِيْ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"হে বনী আদম ! যদি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রাসূল তোমাদের নিকট এসে আমার নিদর্শন বিবৃত করে তখন যারা সাবধান হবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে, তা হলে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (আল কুরআন, সূরা আল আরাফ : ৩৫।)

৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ، يٰعِبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ.

"বন্ধুরা সে দিন হবে একে অপরের শত্রু, মুত্তাকীরা ব্যতীত। হে আমার বন্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।"(আল কুরআন, সূরা যুখরুফ : ৬৭।)

৯. মহান আল্লাহ বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্', অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (আল কুরআন, সূরা আহ্কাফ : ১৩।)

১০. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ، اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْ وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ.

"জেনে রাখ ! আল্লাহ্র বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ঈমান আনে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে।" (আল কুরআন, সূরা ইউনুস : ৬২-৬৩।)

উপরোক্ত দশটি আয়াতের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, পরকালে ভয়হীন ও চিন্তামুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় ঈমান, তাক্ওয়া অর্জন ও সৎকর্ম। ঈমানের ছয়টি রুকনের প্রতি যথাযথভাবে ঈমান আনয়নের পর তাক্ওয়া অর্জন ও সৎকর্ম করলেই যে কেউ এই অভয় ও চিন্তমুক্ত থাকার আশ্বাস লাভ করতে পারে। এভাবে যে কেউই আল্লাহর একজন হিদায়াতের অনুসরণকারী, মুত্তাকী ও অলি হয়ে যেতে পারে। আরো দেখা যায় যে, যে সকল মু'মিন-মুত্তাকী ও অলিদের জন্যে উপরোক্ত আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে তাঁরা আসলে ভিন্ন ভিন্ন গুণের অধিকারী নন, বরং এ তিনটি একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন গুণবাচক নাম। যিনি মু'মিন তিনি মুত্তাকী ও অলিও বটে। আবার অলি তিনি মু'মিন ও মুত্তাকীও বটে। যাঁরা প্রকৃত অর্থে মু'মিন ও মুত্তাকী তাঁরাই আল্লাহর অলি। যারা এর ব্যতিক্রম তারা আল্লাহর অলি নয়, তাদের জন্যে পরকালে ভয়হীন ও চিন্তাহীন থাকারও কোনো আশ্বাস নেই।

খ. আল্লাহ্র অলিগণের সংজ্ঞা

উপরোক্ত আয়াতসমূহ এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে আমরা উপরে যা আলোচনা করেছি, এতে আমাদের নিকট আল্লাহর অলিগণের পরিচিতি অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তবে যেহেতু সমাজে তাঁদের নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি চলছে, তাই তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে আরো কিছু কথা না বললেই নয়। আমরা যদি সব আয়াত বাদ দিয়ে শুধু অলিদেরকে কেন্দ্র করে যে আয়াতটি উপরে বর্ণিত হয়েছে সে আয়াতের দিকে লক্ষ্য করি, তবে একজন আল্লাহর অলির সঠিক পরিচয় জানতে পারি। কারণ উক্ত

www.pathagar.com

আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই অলিদের সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন : "অলি তাঁরাই যাঁরা ঈমান এনেছে এবং তাঁকে ভয় করতে রয়েছে।" আল্লাহকে ভয় করতে থাকার অর্থ হচ্ছে : জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা তাকওয়ার পথ অনুসরণ করতে রয়েছে। তাকওয়ার অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) হযরত ওমর (রা)-কে বলেন :

"أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى! قال : فما عملت؟ قال : شمرت و اجتهدت، قال " فذلك التقوى"

"তুমি কি কখনও কাটাপূর্ণ রাস্তায় চলেছ, হযরত ওমর ফারূক (রা) বললেন : হ্যাঁ, চলেছি, হযরত উবাই বললেন : তখন কি করলে ? তিনি বললেন : নিজেকে খুব সামলিয়ে কষ্ট করে চলেছি। হযরত উবাই বললেন : এটাই তাকওয়া।"[৪]

ইমাম বায়দাভী (র) 'মুত্তাকী' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন : মুত্তাকী হলো সেই ব্যক্তির নাম যিনি স্বীয় আত্মাকে পরকালীন যে কোনো ক্ষতিকর বস্তু থেকে রক্ষা করেন। তাক্ওয়ার রয়েছে তিনটি স্তর ঃ এক. শিরক থেকে মুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া। দুই. যে কাজ করলে অপরাধ হয় তা থেকে বিরত থাকা এবং যা না করলে অপরাধ হয়, সে সকল যত্নের সাথে করা এমনকি কারো কারো মতে সগীরা গুনাহ থেকেও বিরত থাকা। শরয়ী পরিভাষায় এটাই 'তাকওয়া' নামে খ্যাত। তিন. যে বস্তু অন্তরকে আল্লাহর ধ্যান থেকে বিমোহিত করে এমন সব বস্তুর ধ্যান থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা এবং আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। এটাই হচ্ছে প্রকৃত তাক্ওয়া। আল কুরআনে وَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ 'আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর'[৫] এই আয়াতে এই তাকওয়া অর্জন করার কথাই বলা হয়েছে।[৬] তৃতীয় স্তরের তাকওয়া প্রসংগে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

"لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لابأس به حذرا مما به بأس"

কোনো মানুষই মুত্তাকী হতে পারবে না যতক্ষণ সে যা করলে গুনাহ হবে সে কাজের ভয়ে যা করলে কোনো গুনাহ নেই তা পরিত্যাগ করবে।[৭]

এই তৃতীয় স্তর এর বর্ণনা প্রসংগে অপর কোনো মনীষী বলেছেন :

"التقوى أن لايراك لله حيث نهاك لايفقدك حيث أمرك"

"তাকওয়া হচ্ছে : যে কাজ থেকে আল্লাহ্ তোমাকে বারণ করেছেন সেখানে যেন তিনি তোমাকে না দেখেন, আর যা করতে তিনি আদেশ করেছেন সেখানে যেন তোমাকে অনুপস্থিত না দেখেন।"[৮]

তাকওয়া বা মুত্তাকী সম্পর্কে এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত কথা। আল কুরআন ও মনীষীদের বক্তব্য দ্বারা এটাই বোঝা গেল যে, কাউকে যথার্থভাবে অলি হতে হলে আল্লাহ্র হিদায়াত তথা তাঁর আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত শরী'আতের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করতে হবে। যার পক্ষে তা সম্ভব হয় তার ব্যাপারে একজন খাঁটি মু'মিন মুত্তাকী বা অলি হওয়ার সুধারণা পোষণ করা যেতে পারে। শরী'আতের বিধান জানার জন্যে তাঁর নিকট যাওয়া যেতে পারে। এমনই ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসতে হবে। সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে তাঁর ব্যাপারে উপরোক্ত ধারণা করা সঠিক হয়ে থাকলেও তাঁর নিজের পক্ষে এ ধরণের কোনো মন্তব্য করার বৈধতা নেই। কারণ তাঁর তাকওয়ার পথ অবলম্বন করার

৪. সাইয়্যিদ কুত্বব, *ফি জিলালিল কুরআন'* ১ম খণ্ড, সংস্করণ ১০, (দারুশ শুরুক, ১৯৮২ ইং) পৃ. ৮২
৫. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ১০২
৬. কাযী বায়দাভী, *তফসীরে বায়দাভী'* (বৈরূত, দারুল ফিকর, তা. বি.) পৃ. ৭
৭ আল্লামা আলূসী : *রুহুল মা'আনী'* ১ম খণ্ড, সংস্ক : ৪, (বৈরূত, দার এহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা. বি.) পৃ. ১০৮। তিরমিযী থেকে এই হাদীসটি উদ্বৃত করেছেন।
৮. পূর্বোক্ত

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি। দুনিয়ার মানুষ তাকে অলি বলে সম্বোধন করুক ও জানতে পারুক —এটা তাঁর কর্মের উদ্দেশ্য নয়। এ ছাড়া তিনি আল্লাহর নিকট বাস্তবে অলি কি না তা আল্লাহই সঠিক জানেন। বাস্তবে তাঁর অলি হওয়ার বিষয়টি তিনি পরকালে হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে জান্নাত লাভের পর অবগত হবেন। এর পূর্বে নয়।

যারা সত্যিকার অর্থে মু'মিন ও মুত্তাকী নয় তারা অলিও নয়। যদিও সমাজের মূর্খ মানুষেরা তাদেরকে অলির আসনে বসাতে পারে। বা তারা নিজেরাও নিজেদেরকে এ সনদ দিতে পারেন। এ জাতীয় সনদ দিয়ে যেমন অলি হওয়া যাবে না, তেমনি পরকালে অভয়ও পাওয়া যাবে না। বরং পরকালে এদের এই সনদই তাদের গলায় ফাঁস হয়ে দাঁড়াবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে স্মর্তব্য যে, কারো দ্বারা কোনো অলৌকিক কর্ম প্রদর্শিত হওয়া তার আল্লাহর অলি হওয়ার পরিচায়ক নয়। কেনো তা অলিকে পরিচয় করার শর'য়ী মানদণ্ড নয়। যদি কারো দ্বারা এমন অলৌকিক কর্ম প্রদর্শিত হয় তবে তার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করার পূর্বেই সে ব্যক্তির ধর্মীয় অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা বাঞ্ছনীয়। এ প্রসংগে ইমাম শাফিঈ (র)-এর একটি বাণী সরণযোগ্য। তিনি বলেন :

"أذا رأيتم أحدا يمشى فى أو يطير على الهواء فلاتغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة"

"কাউকে পানিতে চলতে বা বাতাসে উড়তে দেখলে কুরআন ও হাদীসের সাথে তার অবস্থা মিলিয়ে না দেখা পর্যন্ত প্রতারিত হয়ো না।"[৯]

আসলে যারা সত্যিকার অর্থে অলি বা মু'মিন, তারা কি তা হলে বাস্তবেই পরকালে ভয়হীন ও চিন্তাহীন থাকবেন ? যদি তা-ই হয়, তবে ভূমিকায় বর্ণিত সূরা 'আম্বিয়া'-এর ২৮ এবং সূরা 'আবাছা'-এর ৩৪ নং আয়াতের সাথে এ সকল ভয়হীন থাকা সংক্রান্ত আয়াতের সামঞ্জস্য কোথায় ?

গ. পরকালে অলিগণের অভয় প্রাপ্ত হওয়ার তাৎপর্য

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

এই আয়াত সমূহের দ্বারা যদিও বাহ্যিকভাবে পরকালে মু'মিন মুত্তাকী বা অলিগণের কোনো প্রকার ভয় ও চিন্তা না থাকার কথাই বোঝা যায়। তবে এর দ্বারা প্রকৃত পক্ষে এই বাহ্যিক অর্থ বোঝানোই আল্লাহর মূল উদ্দেশ্য নয়। আল্লামা আলূসী (র) এই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

"فالمنفى عن الأولياء خوف حلول المكروه والحزن فى الاخرة، وفيه إشارة ألى أنه يدخلهم الجنة التى هى دار السرور والأمن، لا خوف فيها ولاحزن."

উক্ত আয়াতে অলিদের থেকে পরকালে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু পতিত হওয়ার ভয় ও চিন্তা দূর করা হয়েছে, আর এই অযাচিত বিষয় দূর করার আশ্বাসের মাঝে এ কথারও ইংগিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভয়হীন, চিন্তাহীন, আনন্দকর ও নিরাপদ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১০]

ইমাম আলূসী (র)-এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয় :

এক. উক্ত আয়াতের আউলিয়াগণের ভাগ্যে কোনো অযাচিত ব্যাপার সংঘটিত না হওয়ার বিষয়ে তাঁদেরকে আশ্বস্থ করা হয়েছে। তবে ভয় না থাকলেও আশানুরূপ পুরস্কার না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের অন্তরে কোনো প্রকার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা থাকবে না—উক্ত আয়াতে এ কথার কোনো অস্বীকৃতি জ্ঞাপন

৯. আল্লামা ইবনুল ইয্ আল-হানাফী : *শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাবিয়াহ'* ৫ম সংস্ক, (বৈরূত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৯ হি.) পৃ. ৫৭৩

১০. আল্লামা আলূসী : প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯

www.pathagar.com

করা হয়নি। এখানে স্মর্তব্য যে, خـــوف "শব্দের পর আধিপত্যের অর্থ প্রদানকারী" على অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা প্রকারন্তরে এ কথারই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের অন্তরেও ভয় থাকবে। তবে তাঁদের অন্তরকে অন্যান্যদের অন্তরের ন্যায় তা গ্রাস করে ফেলবে না।[১১]

দুই. ভয়হীন থাকবে এ আশ্বসের দ্বারা মূলত অনাবিল শান্তির জান্নাত প্রদান করার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ হাশরের মাঠে ভয়-ভীতি যা-ই থাকুক না কেন, সে দিন তাঁরা পরিশেষে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। এ ব্যাপারে তাঁদের কোনো ভয় নেই। আর মহান আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাঁদেরকে যে পুরস্কার দান করবেন তা পেয়ে তাঁরা মন খারাপ করবেন না এই ভেবে যে, এ পুরস্কারতো দুনিয়ার যে সম্পদ রেখে এসেছি তার চেয়ে কম বা যা পেয়েছি তা আশানুরূপ হয়নি। যেমনটি অনেক সময় পার্থিব কোনো পুরস্কারের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

আমাদের মনে হয় ইমাম আলূসী (র)-এর আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা পড়ার পর এ বিষয় নিয়ে কারো মনে কোনো সংশয় থাকার কথা নয়। তবে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আউলিয়াদের ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার দ্বারা আয়াতের বাহ্যিক অর্থেরই সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসের মর্ম নিম্নরূপ : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন অলিগণকে আল্লাহ নূরের মিম্বরে অবস্থান করাবেন। যখন লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না।[১২]

আমাদের দৃষ্টিতে এই হাদীসটি উপরোক্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থের আদৌ কোনো সহায়ক নয়। এ হাদীসে পরকালের বিশেষ একটি পর্যায়ে অলিগণের অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পরকালে বিচার- পর্ব আরম্ভ হওয়ার পর অলিগণের অবস্থা কি হবে, তা-ই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, বিচার-পর্ব শুরু হওয়ার পূর্বে তাঁরাও সাধারণ মানুষের ন্যায় ভয়-ভীতির মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে থাকবেন। আর সকলের এ ভয়-ভীতির কথাইতো সূরা 'আম্বিয়া'-এর ২৮ এবং সূরা 'আবাসা'-এর ৩৪ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে অলিগণের ভয়হীন হওয়া সংক্রান্ত আয়াতের পূর্ণ সহায়ক নয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে হাশরের মাঠে একমাত্র আমাদের রাসূল (সা) ব্যতীত সকল নবী-রাসূল ও অলি এবং সাধারণ মু'মিন ভয়-ভীতির মাঝে সময় অতিবাহিত করবেন। আল্লাহর প্রতি আস্থার ক্ষেত্রে তাঁদের তারতম্য থাকাতে ভয়-ভীতির ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে তারতম্য হবে। নবী-রাসূলগণের আস্থা বেশি থাকায় হাশরের মাঠে আল্লাহর তাণ্ডবলীলা দেখে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবেন। হযরত আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আ) এদের মত বড় বড় নবীগণ নিজেদের কোনো কোনো কাজকে পাপ গণ্য করে আল্লাহর ভয়ে হাশরের মাঠের ভীতিকর দীর্ঘ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যেও আল্লাহর কাছে শাফা'আত করার সাহস পাবেন না। সেখানে অলি আর দরবেশগণের আস্থা আল্লাহর প্রতি যতই থাকুক না কেন তা নবীদের আস্থার মত না হওয়ায় তাঁরা নবীগণের চেয়ে অধিক ভয়-ভীতির মাঝে সময় অতিবাহিত করবেন। আর সে জন্যে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে অলি-দরবেশ নির্বিশেষে সকল মানুষই নবীদের শাফা'আত কামনা করবেন। তবে হ্যাঁ, সব সময় সাধারণ মানুষ আর অলিগণের অবস্থা এক হতে পারে না। তাই বিচারপর্ব শুরু করার পর মহান আল্লাহ তাঁর অলিগণের নূরের মিম্বরে স্থান দেবেন। এ মর্যাদা লাভের মধ্য দিয়ে তাঁদের পূর্বের ভয়-ভীতি আর হতাশা অনেকাংশে কেটে যাবে ঠিকই; কিন্তু তাদেরও যেহেতু হিসাব-নিকাশ রয়েছে, (যদিও হয়তো তা খুব সহজই হবে) তা শেষ হয়ে জান্নাতবাসী হবার ঘোষণা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের অন্তরে কিছুটা হলেও ভয়-ভীতি বিরাজমান করবে। পৃথিবীতে থাকতে যদিও তাঁরা 'অলিদের কোনো ভয় নেই চিন্তা নেই' এ কথার দ্বারা জান্নাত লাভের আশ্বাস পেয়েছেন ; কিন্তু তা না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ

১১. পূর্বোক্ত। তিনি البحر المحيط। তাফসীর গ্রন্থ থেকে এই সূক্ষ্ম কথাটির উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

www.pathagar.com

হিসাবে তাঁদের মনের মধ্যে এ ভয় থাকাই স্বাভাবিক যে, না জানি আল্লাহ কোন্ প্রশ্ন করে আমাকে আটকিয়ে ফেলেন, না জানি আমার দ্বারা কোনো ত্রুটি হয়ে গেছে ? কাজেই "لاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ" এ বাক্যের দ্বারা অলিগণের কোনো অবস্থাতেই ভয় থাকবে না, এ কথা বলার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। বরং এ কথার দ্বারা যে তাঁদেরকে কেবলমাত্র জান্নাত প্রদানের আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে তা অত্যন্ত জোর দিয়েই বলা যায়।

এ ছাড়াও "لاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ" এই আয়াতে যে অলিগণের ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থাকার কথা বলা হয়নি তা আমরা অপর আয়াতের দ্বারাও বুঝতে পারি। পবিত্র কুরআনে প্রকৃত মু'মিনদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ.

"যারা দান করে সেই সম্পদ থেকে যা তাঁদেরকে দান করা হয়েছে এতমাবস্থায় যে, তাঁদের অন্তরগুলো আল্লাহর দরবারে ফিরে যাবার ভয়ে আতংকিত থাকে।"[১৩]

ইমাম ইবনে কাছীর বলেন : তাঁদের এ দান শরয়ী বিধান অনুযায়ী হলো কিনা, এ বিষয়ে তাঁদের সংশয় থাকায় আল্লাহর দরবারে তা গৃহীত হলো কি-না, সে ব্যাপারে তাঁরা আতংকিত থাকেন।[১৪] এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রকৃত মু'মিন তাদের কোনো কর্মের উপর নির্ভরশীল হয়ে নির্ভীক হয়ে বসে থাকেন না। কারণ ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহর দরবারে গৃহীত হলো কি-না তা হিসাব-নিকাশের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা অবগত হতে পারবেন না, আর সে জন্যে তাঁরা সে পর্যন্ত আতংকের মধ্যেই সময় অতিবাহিত করবেন।

অপর আয়াতে মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ، اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرَ مَاْمُوْنٍ.

"আর যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভর্তি সন্ত্রস্ত। নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি হতে নিঃশংক থাকা যায় না।"[১৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাছীর (র) বলেন :

لايأمن أحد من عقل عن اللّه أمره

"যে আল্লাহর ধর-পাকড় সম্পর্কে অবগত হয়েছে সে কোনো সময় নিজেকে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ ভাবতে পারে না।"[১৬]

এতো হলো মু'মিনদের মানসিক অবস্থার কথা। আল্লাহর শাস্তির ভয় শুধু তারাই করেন না, স্বয়ং আমাদের রাসূল (সা)ও কিয়ামতের দিনে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করবেন। যেমন হাদীসে রয়েছে তিনি বলতেন :

اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك

"হে আল্লাহ! যে দিন তোমার বান্দাদেরকে পুনঃরুত্থান করাবেন সে দিন তুমি আমাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা কর।"[১৭]

---

১৩. আল কুরআন, সূরা মু'মিনূন : ৬০

১৪. ইবনে কাছীর : প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৮

১৫. আল কুরআন, সূরা মা'আরিজ : ২৭-২৮

১৬. ইবনে কাছীর : প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫০

১৭. মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী : *সহীহ মুসলিম* : ১ম খণ্ড, সংস্ক. বি. (দার ইহইয়াউল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা. বি.) পৃ. ৪৯২-৪৯৩। এ দু'আটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ফরয নামাযান্তে মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসে পড়তে সাহাবীগণ শুনেছেন।

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে মু'মিনদের মানসিক অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। এতে তিনটি বিষয় প্রমাণিত হয় :

এক. মু'মিনগণ যে সকল সৎ কাজ করেন তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হচ্ছে কি-না তা তাঁরা নিশ্চিত করে জানেন না। আর সে জন্য পরকালে যেয়ে কি পাব, সে চিন্তায় তাঁরা ভীত থাকেন।

দুই. মু'মিনগণ কোনো সময়ই নিজেদের সৎকর্মের উপর ভরসা করে নিজেদেরকে খাঁটি মু'মিন বা অলি হিসাবে গণ্য করেন না ; বরং সর্বদাই তাঁদের অন্তরগুলো আল্লাহর শাস্তির ভয়ে আতংকিত থাকে। বাহ্যত : পরকালের হিসাব-নিকাশের পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের এ আতংক দূর হয় না।

তিন. আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মু'মিনদের মানসিক অবস্থা উপরোক্ত মু'মিনদের মত হওয়াই বাঞ্ছনীয়—যারা সৎকর্ম করে আত্মতৃপ্তি বোধ করে, নিজেদেরকে আল্লাহর অলি হওয়ার কথা সমাজে প্রচার করে, আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে — তারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর অলি বা মু'মিন নয়। পরকালে এদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অভয়েরও কোনো আশ্বাস বাণী নেই।

ইহ-পরকালে আল্লাহর খাঁটি মু'মিন বা অলিগণের মানসিক অবস্থা দৃশ্যে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের জন্যে পরকালে যে অভয়ের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে মূলত জান্নাত প্রদানের আশ্বাস। হাশরের ময়দানে নির্ভয়ে থাকার আশ্বাস নয়। সে দিন বিচারপর্ব শুরু হওয়ার পর যদিও তারা নূরের তৈরী মিম্বরে অবস্থান করবেন; তথাপি সেখানেও তাঁরা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মাঝে সময় অতিবাহিত করবেন। নিজেদের মুক্তির চিন্তায়-ই তাঁরা ব্যস্ত থাকবেন।

এ ছাড়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন : "আল্লাহর রহমত ছাড়া তোমাদের কাউকেই তার সৎকর্ম তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না; এমনকি স্বয়ং রাসূল (সা)ও তাঁর আমল দ্বারা পারবেন না, যদি আল্লাহ তাঁর রহমত দ্বারা তাঁকেও বেষ্টন না করেন।"[১৮]

পরকালে রাসূল (সা) যেখানে স্বীয় রবের করুণার উপর নির্ভরশীল, সেখানে এমন কে আছে যে তার নিজের কর্মের উপর নির্ভরশীল হতে পারে এবং নিজেকে অলি হওয়ার সনদ দিয়ে নির্বিঘ্নে বসে থেকে অন্যের চিন্তায় ব্যস্ত থাকতে পারে ? যে দিন আমাদের নবী ব্যতীত সকল নবীগণ নাফ্সী নাফ্সী করে ঊর্ধশ্বাস নিক্ষেপ করবেন, সে দিন কি করে অলিগণ কেবল নিজ ভক্তদের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবেন ? বাস্তব কথা হচ্ছে, কাউকে চূড়ান্তভাবে অলি হওয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা যেমন আমাদের কাজ নয়; তেমনি কোনো সৎকর্মশীলের পক্ষেও নিজের জন্যে এমন সনদ প্রদান করার বৈধ কোনো ইখতিয়ার নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ জ্ঞাত। তিনি যাদেরকে তাঁর অলি বা বন্ধু হিসাবে গণ্য করেন, তাদেরকে তিনি জান্নাতের আশ্বাস প্রদান করেছেন। জান্নাত প্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁরা নির্ভয়ে থাকতে পারেন। এ ব্যাপারে তাদের ভয়ের কোনো কারণ থাকতে পারে না। আর এ আশ্বাস হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়েই বাস্তবে রূপ নেবে এবং কে আল্লাহর প্রকৃত বন্ধু বা অলি, তা সঠিক করে তখনই জানা যাবে।

ঘ. অলিগণের শাফা'আতের মূল কথা

শাফা'আত শব্দের অভিধানিক অর্থ : দু'আ করা বা চাওয়া। পারিভাষিক অর্থ : কারো কোনো কল্যাণ অর্জন বা অকল্যাণ দূরিকরণের জন্য মধ্যস্থতা করা। পার্থিব ক্ষেত্রে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার এ ধরণের শাফা'আত খুবই প্রশংসনীয় কাজ। আল কুরআনে মহান আল্লাহ এ জাতীয় শাফা'আতকে পরস্পর সহযোগিতা হিসাবে গণ্য করে এর প্রতি নির্দেশ করে বলেছেন :

"تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى"

১৮. মোহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী ঃ *সহীহ*, ৭ম খণ্ড, ৮ম অংশ, (বৈরূত, আলামুল কুতুব, তা. বি.) পৃ. ১৪

www.pathagar.com

"তোমরা সৎ এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর, অন্যায় এবং সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না।" (আল কুরআন) পার্থিব ক্ষেত্রে যেমন অনেকেই অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। তবে এই দুই স্থানের শাফা'আতের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ মানুষের কাছে শাফা'আত করে, তাই সৎ অসৎ নির্বিশেষে যে কেউই অপরের কাছে শাফা'আত করতে পারে এবং যার কাছে শাফা'আত শাফা'আতকারীর মন রক্ষার্থে অথবা নিজের ক্ষতির ভয়ে তার শাফা'আত গ্রহণ করেন। কিন্তু পরকালের ব্যাপারটি এ থেকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র। সেখানে যে কেউ শাফা'আত করতে পারবে না এবং যারা পারবে তারাও যে কারো জন্য যে কোনো সময় তা পারবে না। বরং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। সেখানে যে কারো পক্ষে যে কারো জন্যে যে কোনো সময় শাফা'আত করার কোনো অনুমতি থাকবে না। হাশরের মাঠে যেহেতু আমাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত সবাই আপন চিন্তায় ব্যস্ত থাকবেন, সেহেতু সেখানে রাসূল (সা) ব্যতীত কারো পক্ষে অন্যের জন্যে শাফা'আত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বাস্তব ব্যাপারও তাই। বুখারী মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থাদিতে হযরত আনাস ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে শাফা'আত সংক্রান্ত যে বিশদ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১৯] এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এ কথাই বোঝা যায়, যে হাদীসদ্বয়ে যদিও মু'মিন, শহীদ এবং ফেরেশতাদের শাফা'আতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে তা হাশরের মাঠে নয় ; বরং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে দোযখে প্রবেশের দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধিদেরকে দোযখ থেকে বের করে আনার জন্যে। দোযখে প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্তে কারো জন্যে তাঁদের শাফা'আতের কোনো অস্তিত্ব কুরআন ও হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কাজেই যারা অলিগণের শাফা'আত লাভের আশায় তাঁদের দুয়ারে বা দরবারে হন্যে হয়ে ঘুরছেন, তাদেরকে জানতে হবে যে, তারা যাকে অলি ভাবছেন তিনি বাস্তবে অলি নাও হতে পারেন। আবার হয়ে থাকলেও হাশরের মাঠে তিনি তাদের জন্যে শাফা'আত করার অনুমতি না-ও পেতে পারেন। তাদের শাফা'আত হবে কেবলমাত্র শিরক ব্যতীত অন্যান্য অপরাধে দোযখে প্রবেশকারীদেরকে দোযখ থেকে পর্যায়ক্রমে বের করে আনার জন্যে। তাও আবার যাদেরকে আল্লাহ বের করে আনতে বলবেন, কেবল তাদের জন্যেই। এমতাবস্থায় কারো পক্ষে কোনো অলির শাফা'আতের উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকা কি কোনো জ্ঞানের পরিচায়ক হবে ?

এ ছাড়া যারা এ আশায় অলিদের কবরে ঘুরা-ফেরা করেন, একশ ভাগ গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় যে, তাদের কেউই কোনো অলিদের শাফা'আত পাবে না। কারণ এ সব মূর্খ ভক্তদের দল তাঁদেরকে কেন্দ্র করে নানা রকম শিরক গুনাহে লিপ্ত রয়েছে। অলিদেরকে ভাগ্যনিয়ন্তা বানিয়ে দিয়ে আল্লাহর অধিকারভুক্ত নানান বিষয়াদিকে অলিদের অধিকারভুক্ত করে দিয়ে তাঁদেরকে আল্লাহর সমতুল্য করে ফেলেছে। আর সে জন্যেই তারা মাজারে যেয়ে রুটি-রোজগার অন্ন-বস্ত্র, সকল রকমের কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণ কামনা করে। ফলে এই মূর্খরা দুনিয়াতে তাঁদের লা'নত প্রাপ্ত হচ্ছে, আর পরকালেতো তাঁরা এদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে। তাদের এ সব শিরকী কর্ম-কাণ্ডকে তাঁরা সে দিন অস্বীকার করবেন। আল কুরআনের নিম্নোক্ত বাণী থেকে এ সত্যই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ، اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَائَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَااسْتَجَبُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ.

১৯. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, আল বুখারী : সহীহ্ ৩য়, ৬ষ্ঠ অংশ, (বৈরূত : আলামুল কুতুব, তা. বি.) পৃ. ৪৩ ; *মুসলিম* ইবনুল হাজ্জাজ : পূর্বোক্ত ; ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮২-১৮৩

www.pathagar.com

"এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খর্জুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে।" (আল-কুরআন : সূরা ফাতির, ১৩-১৪।) তাঁরা বলবে রাব্বুল আলামীন, এদের আমরা এ সব করতে বলিনি, আমরা তাদের এ সব শিরকের উপর সন্তুষ্ট ছিলাম না। আমাদের বিরুদ্ধে তারা অপপ্রচার করেছে। তাই এর সুষ্ঠু বিচার আপনার দরবারে ইলাহীতে কামনা করছি। বস্তুত যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোনো মৃত দরবেশের নিকট নিজের পার্থিব ও পরকালীন যে কোনো কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণ কামনা করে, তাদেরকে ভয় করে এবং নজর-নিয়াজ দ্বারা তাঁদের সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা লাঞ্ছিত শয়তানকেই আহবান করে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন :

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا.

'তাঁর পরিবর্তে তারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে।' (আল কুরআন : সূরা নিসা, ১১৭।)

সুতরাং পরকালে যদি কারো পরিত্রাণ লাভের সদিচ্ছা থাকে তবে আউলিয়াদের উপর থেকে সকল নির্ভরশীলতা বাদ দিয়ে অতীতের সকল শিরক থেকে তৌবা করতে হবে। অতঃপর ঈমানের দাবী অনুযায়ী সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আল্লাহর যাবতীয় অধিকার আল্লাহকেই দিতে হবে। মানুষের সকল অধিকার মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে হবে, অপরকেও সেদিকে ডাকতে হবে। এ পথে চলার পথে বিপদ মুহূর্তে পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিতে হবে। সমগ্র জীবন এভাবে কাটাতে পারলে যে কেউই একজন অভয়প্রাপ্ত অলিতে পরিণত হতে পারে। যদিও সমাজে অলি হিসাবে তার কোনো পরিচিতি অর্জন নাও হতে পারে।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ বিষয়টি অবগত হলাম যে, যারা আল্লাহর অলি বা বন্ধু তাঁরা প্রত্যেকেই একজন যথার্থ মু'মিন-মুত্তাকী। মু'মিন-মুত্তাকী বা অলি হওয়ার জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় ঈমান, তাকওয়া ও সৎকর্ম। যারা এ তিনটি গুণে গুণান্বিত—পরকালে তাঁদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টির প্রমাণস্বরূপ জান্নাত প্রদানের অঙ্গীকার রয়েছে। তাঁদের জন্যে এ অঙ্গীকার থাকলেও এর বাস্তবতা প্রমাণিত হবে হিসাব-নিকাশের পর্ব অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে এ পর্ব শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ব্যতীত অন্যান্য নবী-রাসূলসহ সকল মানুষ نفسى نفسى বলে নিজেদের মুক্তির চিন্তায় মগ্ন থাকবেন এবং সকলেই আল্লাহর শাস্তির ভয়ে আতংকিত থাকবেন। যদিও নবী-রাসূলগণ আর সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ক্ষেত্রে ব্যবধান থাকবে। বিচার পর্ব শুরু হলে পরে কর্মের ভিত্তিতে যখন আল্লাহ হাশরবাসীদেরকে ভাগ করে নেবেন, তখন তাঁর অলি বা বন্ধুদেরকে নূরের মিম্বরে স্থান দেবেন। এ সময় তাঁদের পূর্বের ভয়-ভীতি অনেকটা লাগব হলেও জান্নাত প্রাপ্তির ঘোষণাপত্র হাতে প্রাপ্তি বা শ্রবণ না করা পর্যন্ত তা পরিপূর্ণভাবে দূর হবে না। একজন খাঁটি মু'মিন বা অলির পরিচয় হচ্ছে — তিনি সর্বদাই আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করবেন। নিজের কর্মের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সর্বদাই আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভরশীল হবেন। কখনও নিজেকে একজন খাঁটি মু'মিন বা অলি হওয়ার কথা মনে মনে ভাববেন না এবং সমাজে তা প্রচারও করবেন না। আল্লাহর অলি হওয়ার জন্যে কারো দ্বারা কোনো অলৌকিক কর্ম প্রদর্শিত হওয়া শর্ত নয়। যারাই শরী'আতের আদেশ ও নিষেধের বিধান পূর্ণভাবে মেনে চলবেন তাঁরা সকলেই আল্লাহর একেকজন অলিতে পরিণত হবেন। যদিও পেশাগত দিকে থেকে তাঁরা একেকজন আলিম, যাহিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, কৃষক, দিনমজুর

www.pathagar.com

ইত্যাদি হয়ে থাকেন। সমাজে তাঁদের অলি হওয়ার পরিচিতি না থাকলেও আল্লাহর দৃষ্টিতে তাঁরা অলি হতে পারেন। 'আল্লাহর অলিগণের পরকালে কোনো ভয় নেই'—এ কথাটি সাধারণ মানুষের বানানো বৈ আর কিছুই নয়। বস্তুত এ ধারণা আল্লাহর অলিগণের মন মানসিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা ইহ-পরকাল সর্ব সময়ই আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করেন। পরকালে তাঁরা নিজেদের মুক্তির চিন্তায় ব্যস্ত থাকবেন। নিজেরা জান্নাতে যাওয়ার পর এবং দোযখীরা দোযখে যাওয়ার পর আসবে তাঁদের শাফা'আতের পালা। তবে তা হবে কেবল তাদের জন্যেই যারা শিরক ব্যতীত অন্যান্য কবীরা গুনাহের অপরাধে দোযখবাসী হয়েছে। কাজেই যাদের জান্নাত পাবার সদিচ্ছা রয়েছে তাদেরকে অবশ্যই শরী'আত অনুযায়ী কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেই তা পাবার আশা করতে হবে।

যারা পীর-দরবেশদেরকে হাশরের ময়দানে বিচারপ্রর্ব চলার সময় শাফা'আতের ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে, তারা মারাত্মক ভুলের মাঝে নিমজ্জিত রয়েছে। বস্তুত শাফা'আত হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর মালিকানাধীন বিষয়। পৃথিবীর মত সেখানে যে কেউ যে কারো জন্যে শাফা'আত করতে পারবে না। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শাফা'আতের মুখাপেক্ষী, তবে আমরা তা আল্লাহর নিকট কামনা করবো। মনে রাখতে হবে যে, পরকাল একটি অকল্পনীয় বিপদের দিন।

يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَّلاَ بَنُوْنَ، اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসিবে না ; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহ্র কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।" (আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ৮৮-৮৯।) এ দিনের ব্যাপারে মু'মিনদেরকে আগাম সতর্ক করে বলা হয়েছে :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَّلاَ شَفَاعَةٌ.

"হে মু'মিনগণ! আমি যা তোমাদিগকে দিয়েছি তা হতে তোমরা ব্যয় কর। সেদিন আসবার পূর্বেই, যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপরিশ থাকবে না এবং কাফিররাই যালিম। (আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২৫৪।)

অপর স্থানে বলা হয়েছে :

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خِلٰلٌ.

"আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মু'মিন তাদেরকে তুমি বল সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে সে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে—দিনের পূর্বেই যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না।" (আল কুরআন : সূরা ইবরাহীম, ৩১।)

পরকালের ব্যাপারে আল কুরআনের এ জাতীয় হুশিয়ারী পাওয়ার পর কোনো মু'মিনের পক্ষে কারো উপকারের আশায় বসে থাকা ঠিক হবে না। বরং সকল জল্পনা-কল্পনা বাদ দিয়ে তাকে সঠিক আত্মা (কালবে সালিম) গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। অন্তরে তৌহিদ তথা কালেমায়ে তায়্যিবার বৃক্ষরোপন করতে হবে। তাতেই একজন মু'মিনের জীবন সার্থক হবে।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সত্য জানার ও বোঝার এবং সে অনুযায়ী চলার তৌফিক দেন।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল -জুন ২০০৩

ইমাম বুখারী (রহ) : জীবন ও কর্ম

আ. ম. কাজী মুহাম্মদ হারুন-উর রশীদ*

হাদীস শাস্ত্রে অবদানের জন্যে যে কয়জন মহামনীষী ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস, কিংবদন্তীর প্রাণপুরুষ মহানবী (সা)-এর আদর্শের এক জ্বলন্ত নমুনা ইমাম বুখারী (রহ) অন্যতম। তাঁর অসাধারণ মেধা, প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রমের ফসল যে জগদ্বিখ্যাত অমর গ্রন্থ 'সহীহ আল-বুখারী' সংকলন করেছেন তাতে তিনি আজো চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে রয়েছেন।

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম : মুহাম্মদ, উপনাম : আবূ আবদুল্লাহ, উপাধি : আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ও যাহিদুদ্ দুনিয়া, পিতার নাম : ইসমাঈল, পুরো বংশানুক্রমিক তালিকা হচ্ছে–মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরা ইব্ন বারদিযবা আল-জু'ফী আল-বুখারী।[১] তাঁর পিতা ইসমাঈল ছিলেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং মা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিকও পরহেযগার।

ইমাম বুখারীকে জু'ফী বলার কারণ

ইমাম বুখারীর পূর্বপুরুষ ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত। তাঁর পূর্বপুরুষ বারদিযবাহ্ ছিলেন অগ্নিপূজারী। তিনি এ অবস্থাতেই মারা যান। তাঁর পিতামহ মুগীরা তৎকালীন বুখারার শাসক য়ামান আল-জু'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁকে জু'ফী বলা হয়। প্রাচীন যুগে এমনই প্রচলন ছিল যাঁর হাতে যিনি ইসলাম গ্রহণ করতেন তিনি ও তাঁর বংশধরগণ পরবর্তীতে তাঁর দিকেই সম্পৃক্ত হয়ে সেই নামেই পরিচিতি হয়ে উঠতেন।[২]

অবয়ব গঠন

ইমাম বুখারী (রহ) উচ্চতায় মধ্যম মানের ছিলেন। স্বাস্থ্যগতভাবে ছিলেন অত্যন্ত হালকা ও ছিপছিপে।

জন্ম

ইমাম বুখারী (রহ) উজবেকিস্তানের অন্তর্গত মুসলিম অধ্যুষিত এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বুখারা নগরে ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল শুক্রবার বাদ জুমা জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

বাল্যকাল

শৈশবকালেই ইমাম বুখারী (রহ)-এর পিতা ইন্তিকাল করেন। তিনি পিতৃহারা হয়ে মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে লালিত-পালিত হন। অতি অল্প বয়সেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। এতে তাঁর মা দারুণভাবে ব্যথিত হলেন এবং ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পাওয়ার আশায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে অশ্রুশিক্ত নয়নে কায়মনেবাক্যে দু'আ করতে থাকেন। হঠাৎ এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন ইবরাহীম (আ) এসে তাঁর মাকে বলছেন, তোমার ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। ভোরে ঘুম থেকে ওঠে দেখতে

---

*. কলামিষ্ট, লেখক, গবেষক ও টিভি উপস্থাপক।

১. আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, *হায়াতে ইমাম বুখারী (রহ)*, ঢাকা : সাউদিয়া কুতুবখানা, তারিখবিহীন, পৃ. ৪

২. আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

৩. হযরত মাওলানা হানীফ গংগুহী, *যফরুল মুহাস্সিলীন বি-আহওয়ালুল মুসান্নিফীন*, ইউ. পি. হানীফ বুক ডিপু. তারিখবিহীন, পৃ. ১০১

www.pathagar.com

পেলেন সত্যিই শিশু পুত্র মুহাম্মদ (ইমাম বুখারী) সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে।[৪] তিনি যে একদিন ইল্‌মে হাদীসের সম্রাট হবেন এর ইঙ্গিত তাঁর চরিত্রে শৈশবেই ফুটে ওঠেছে।

শিক্ষাজীবন

ইমাম বুখারী (রহ) ছয় বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন হেফজ করেন। তিনি যখন মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভে রত ছিলেন সে সময়েই তাঁর মনে হাদীস শিক্ষার আগ্রহ জন্মে। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী নিজেই বলেছেন—

أُلْهِمْتُ حِفْظَ الْحَدِيْثِ وَأَنَا فِى الْكُتَّابِ

"মক্তবে প্রাথমিক লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকার সময়ই হাদীস মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার মনে ইলহাম হয়।"[৫] এ সময় তাঁর বয়স কত ছিল জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, দশ বছর কিংবা এরও কম।[৬]

ইমাম বুখারী (রহ) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর দশ বছর বয়সে ইল্‌মে হাদীসের জ্ঞান আহরণের জন্যে প্রবল আগ্রহ জন্মে। এ সময় তিনি শুনতে পেলেন বুখারা নগরীতে খ্যাতনামা মুহাদ্দিস আল্লামা দাখেলী (রহ) হাদীস শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছেন। তাঁর খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে ইমাম বুখারী তাঁর দারবারে যাতায়াত শুরু করেন। একদিন ইমাম বুখারীসহ অপরাপর শাগরিদ আল্লামা দাখেলীর দরবারে বসে হাদীসের পাঠ নিচ্ছিলেন। এসময় আল্লামা দাখেলী একটি হাদীসের সনদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى زُبَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ

"সুফিয়ান আবূ যুবায়র থেকে এবং আবূ যুবায়র ইবরাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।" দাখেলীর এ কথা শুনে বুখারী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠলেন–এ সূত্র ঠিক নয়।

اِنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ لَمْ يَرْوِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ

"আবূ যুবায়র ইবরাহীমের কাছ থেকে কোনো হাদীস আদৌ বর্ণনা করেননি।"

মুহাদ্দিস দাখেলী একাদশ বছরের এ বালকের স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি অভিমত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে ইমাম বুখারী বললেন–

اِرْجِعْ اِلَى الْاَصْلِ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ

"আপনার কাছে মূল গ্রন্থ বর্তমান থাকলে একবার তা খুলে দেখুন।"

ইমাম বুখারী বললেন–এখানে এ সূত্রে আবূ যুবায়র ভুল বলা হচ্ছে, আসলে বর্ণনার সূত্র হবে সুফিয়ান যুবায়র ইব্‌ন আদী থেকে তিনি ইবরাহীম থেকে–এভাবে। এরপর মুহাদ্দিস দাখেলী মূল গ্রন্থ খুলে দেখলেন, বালক বুখারীর কথাই সত্য। মূলগ্রন্থে অনুরূপই লেখা রয়েছে।[৭]

ইমাম বুখারী ষোল বছর বয়স পর্যন্ত স্বীয় আবাসভূমি বুখারায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক ও ইমাম ওয়াকী'র সংকলিত হাদীসগ্রন্থ সম্পূর্ণ মুখস্থ করে নেন।[৮]

হজ্জ সমাপন

ইমাম বুখারী (রহ) ২১০ হিজরী সনে ষোল বছর বয়সে তাঁর মা ও বড় ভাই আহমদের সাথে হজ্জ পালন করতে মক্কায় গমন করেন। হজ্জ শেষে মা ও বড় ভাই ফিরে এলেন; কিন্তু তিনি মক্কায় রয়ে

৪. আল্লামা গোলাম রাসূল সায়ীদী, *তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, লাহোর, ফরিদ বুক স্টল, ১৯৭৭. পৃ. ১৭২
৫. মুহাম্মদ আবূ যাহূ, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, বৈরুত, দারু আল-কিতাব আল আরবী, ১৯৮৪, পৃ. ৩৫৩
৬. মুহাম্মদ আবূ যাহূ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩
৭. মাওলানা আল্লামা গোলাম রাসূল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-৭৩
৮. মুহাম্মদ আবূ যাহূ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩

www.pathagar.com

গেলেন পবিত্র হাদীস শাস্ত্রে অধিক জ্ঞান লাভের মানসে। আঠার বছর বয়সে তিনি মদীনা শরীফে চলে যান এবং রাসূলে করীম (সা)-এর রওজা পাকের পাশে বসে রাতের বেলা চাঁদের আলোতে বসে 'কাযায়া আল-সাহাবা ওয়াল তাবিয়ীন' (قَضَايَا الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ) ও 'আল-তারীখ আল-কবীর' (اَلتَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ) গ্রন্থ দু'টি রচনা করেন।[৯]

শিক্ষা সফর

ইমাম বুখারী (রহ) ২১০ হিজরী সনে সফর শুরু করেন। তিনি অনেক দূর-দূরান্তের বিপদ-সংকুল পথ অতিক্রম করে জ্ঞান আহরণের মানসে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং যুগ সেরা মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। এক একটি শহরে উপস্থিত হয়ে সম্ভাব্য সকল হাদীস তিনি আয়ত্ত করতেন। তারপর তিনি অন্য শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন। এভাবে বিশাল ইসলামী রাজ্যের উল্লেখযোগ্য এমন কোনো শহর ছিল না, যেখানে তিনি উপস্থিত হয়ে হাদীস সংগ্রহ করেন নি। আল্লামা যাহবী এ প্রসঙ্গে মক্কা, কূফা, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, খুরাসান প্রভৃতি শহরের নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লামা খতীব বাগদাদী বলেছেন–

رَحَلَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ اِلٰى سَائِرِ مُحَدِّثِى الْاَمْصَارِ.

"ইল্‌মে হাদীসের সন্ধানে সব ক'টি শহরের সকল মুহাদ্দিসের কাছেই উপস্থিত হয়েছেন।[১০]

তাঁর এ পরিভ্রমণ সম্পর্কে একটি ব্যাপক ধারণার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই বলেছেন–

دَخَلْتُ اِلَى الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْجَزِيْرَةَ مَرَّتَيْنِ وَاِلَى الْبَصْرَةِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَاَقَمْتُ بِالْحِجَازِ سِتَّةَ اَعْوَامٍ وَلَا اُحْصِى كَمْ دَخَلْتُ اِلَى الْكُوْفَةِ وَبَغْدَادَ مَعَ الْمُحَدِّثِيْنَ

"আমি সিরিয়া, মিসর ও জযীরায় দু'দুবার করে উপস্থিত হয়েছি। বসরা গিয়েছি চারবার। হিজাযে ক্রমাগত ছয় বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছি। আর কূফা ও বাগদাদে যে কতবার গমন করেছি ও মুহাদ্দিসগণের খিদমতে উপস্থিত হয়েছি তা আমি গণনা করতে পারব না"।[১১]

ইমাম বুখারী শায়খ নির্বাচন ও হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এক সময় তিনি জনৈক হাদীস বিশারদের কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন, লোকটির হাত থেকে তার ঘোড়াটি ছুটে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও সেটি ধরতে না পেরে লোকটি কৌশলের আশ্রয় নিলেন। নিজের চাদরটি তিনি ঘোড়ার সামনে এমনভাবে ধরলেন যেন তাতে খাবার আছে। ঘোড়াটি খাবারের আশায় চাদরের কাছে আসলে তিনি ঘোড়াটি ধরে ফেললেন। তা দেখে ইমাম বুখারী তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ না করে ফিরে আসলেন এবং বললেন–

لَا اٰخُذُ الْحَدِيْثَ عَمَّنْ يَكْذِبُ عَلَى الْبَهَائِمِ.

"আমি এমন ব্যক্তির কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করবো না যে চতুষ্পদ জন্তুকে ধোঁকা দেয়।"[১২]

স্মৃতিশক্তি

ইমাম বুখারী (রহ) অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি একবার যা শ্রবণ করতেন তা আর কখনো ভুলতেন না। তাঁর তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

---

৯. শায়খ আবদুল আযীয দেহলভী, *বুস্তান আল-মুহাদ্দিসীন*, করাচী, আদব মঞ্জিল, ১৯৮৪, পৃ. ২৬৮-৬৯ ; আল-ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন উসমান আল-যাহব, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ*, বৈরুত, দারু আল-কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৯৯৮, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪

১০. খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখে বাগদাদ*, মদীনা, আল-মাকতাবা আল-সালাফিয়্যাহ, তারিখবিহীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪-৫

১১. মুহাম্মদ আবূ যাহূ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

১২. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গংগুহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

www.pathagar.com

اِنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِى الْكِتَابِ فَيَحْفَظُهُ مِنْ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ

"তিনি একবার মাত্র কিতাব পড়তেন এবং একবার দেখেই সমস্ত কিতাব মুখস্থ করে ফেলতেন।"

ইমাম বুখারী শায়খদের কাছে হাদীস শুনতে যেতেন; কিন্তু কোনোদিন কাগজ-কলম নিয়ে যেতেন না এবং লিখতেন না। বন্ধুরা বলতো আপনি খালি হাতে বসে থাকেন কেন ? এতে কি উপকার ? শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন। প্রথম প্রথম তিনি কোনো উত্তর দেননি। তারপর যখন অন্যান্য ছাত্ররা এ ব্যাপারে বেশি তাগিদ দিতে লাগল তখন তিনি বলে উঠলেন–ঠিক আছে। আপনারা সমস্ত হাদীস নিয়ে আসুন। তারা হাদীসসমূহ নিয়ে এল। তিনি পর্যায়ক্রমে তাদের সে হাদীসসমূহ মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। সেখানে ১৫,০০০ হাদীস লেখা হয়েছিল। ইমাম বুখারীর এ স্মরণশক্তি সেদিন সকলকে হতবাক করে দিয়েছিল।[১৩]

ইমাম বুখারীর স্মৃতিশক্তির কথা নিজেই বলেছেন যে, তাঁর এক লাখ শুদ্ধ (صَحِيْح) ও দু'লাখ অশুদ্ধ। (غَيْر صَحِيْح) হাদীস মুখস্থ ছিল। তিনি একবার সমরকন্দে উপস্থিত হলেন। তখন প্রায় চারশ' মুহাদ্দিস তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাঁরা ইমাম বুখারীর হাদীস সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক খ্যাতি আগেই শুনেছেন। এ কারণে তাঁরা ইমাম বুখারীকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। তাঁরা এ উদ্দেশ্যে কতগুলো হাদীসের মূল অংশ (مَتن) -এর সনদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অপর কতগুলো হাদীসের সনদের সাথে জুড়ে দেন এবং সনদগুলোও এলোমেলো করে দিয়ে তা ইমাম বুখারী (রহ)-এর সম্মুখে পাঠ করেন এবং এর সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করেন। ইমাম বুখারী (রহ)-এর নিকট এ সমস্ত হাদীস ছিল দর্পণের মতো উজ্জ্বল। কাজেই মূলকথা ও সনদে এলোমেলো করা হয়েছে তা তাঁর বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হল না, এতটুকু সময়ও লাগল না। তিনি এক একটি হাদীস পাঠ করে এর দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি হাদীসকে তিনি আসল রূপে এর নিজস্ব সনদসহ সজ্জিত করে সমাগত মুহাদ্দিসগণের সম্মুখে পেশ করলেন। মুহাদ্দিসগণ ইমাম বুখারী (রহ)-এর এ জবাবকে একান্ত সত্য বলে গ্রহণ না করে পারলেন না। এভাবে তিনি সকলকে হতবাক করে দেন।[১৪] এসব ঘটনা থেকে ইমাম বুখারীর প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম বুখারী (রহ)-এর শিক্ষকগণের সংখ্যা অনেক। তিনি নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছেন ১০৮০ জন মুহাদ্দিসের কাছ থেকে তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন-

كَتَبْتُ عَنْ اَلْفٍ وَثَمَانِيْنَ نَفْسًا لَيْسَ فِيْهِمْ اِلاَّ صَاحِبُ حَدِيْثٍ

"আমি এক হাজার আশি জন সাহেবে হাদীস থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি।"[১৫]

ইমাম বুখারী (রহ)-এর শিক্ষক নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য একটি দিক হচ্ছে, যে মুহাদ্দিসগণ মুখে স্বীকৃতি এবং কার্যের মাধ্যমে তার যথার্থ বাস্তবায়নকে ঈমান বলে বিশ্বাস করেন, তিনি শুধুমাত্র তাঁদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাঁর কথাটি 'যফরুল মুহাস্‌সিলীন' গ্রন্থে এসেছে এভাবে-

لَمْ اَكْتُبْ اِلاَّ عَمَّنْ قَالَ الاِيْمَانُ قَوْلٌ وَّعَمَلٌ

"যাঁরা মনে করেন যে, ঈমান হচ্ছে মুখে স্বীকৃতি এবং কার্যের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন, আমি শুধু তাঁদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করবো।"[১৬]

---

১৩. গোলাম রসূল সায়ীদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

১৪. মুহাম্মদ আবূ যাহূ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

১৫. হাফেজ আহমদ বিন আলী বিন হাজার আল-আসকালানী, *ফতহুল বারী শরহে সহীহ্ আল-বুখারী* (মুকাদ্দামা), কায়রো, ১৩৮০ হি. পৃ. ৪৭৯

১৬. হানীফ গংগুহী, প্রাগুক্ত. পৃ. ১০৪

www.pathagar.com

ইব্ন হাজর আল-আসকালানী ইমাম বুখারী (রহ)-এর শায়খদের পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

১. তাবিঈন : এ স্তরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন–মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী, আবূ আসিম আল-নাবীল, মক্কী ইবন ইবরাহীম, আবদুল্লাহ ইবন মূসা, আবূ নঈম খালাদ ইবন ইয়াহ্য়া, আলী ইবন আয়াশ, এসাম ইবন খালিদ, ইসমাঈল ইবন আবু খালিদ প্রমুখ।

২. তাবি' তাবিঈন : এ স্তরে ঐসব তাবি'তাবি ঈনগণের নাম উল্লেখযোগ্য যাঁরা কোনো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাবিঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। যেমন–আদম ইবন আবু আয়াস, আবূ মিসহার, আবদুল আলা ইবন মিসহার, সাঈদ ইবন আবু মরিয়ম, আইয়ূব ইবন সুলায়মান ইবন বেলাল প্রমুখ।

৩. সাধারণ শিক্ষকগণ : এ স্তরে ঐসব মুহাদ্দিসগণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা তাবি তাবিঈনের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন। যেমন–কুতাইবা ইবন সাঈদ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ্, সুলায়মান ইবন হারব, নঈম ইবন হাম্মাদ, আলী ইবন আল-মাদায়নী, য়াহ্য়া ইবন মঈন, আবূ বকর ইবন আবু শায়বাহ্ প্রমুখ।

৪. সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধব : ইমাম বুখারী (রহ) সমসাময়িক যে সব বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন–মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্য়া যুহলী, আবূ খাতিম রাযী, মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম সায়িকাহ্, আবদ ইবন হুমায়দ ও আহমদ ইবন আল-নযর প্রমুখ।

৫. সমসাময়িক ছাত্র : বুখারী (রহ) ঐসব সমসাময়িক মুহাদ্দিসের কাছ থেকেও হাদীস গ্রহণ করেছেন, যাঁরা তাঁর ছাত্রের অন্তর্ভুক্ত। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন–আবদুল্লাহ্ ইবন হাম্মাদ আমেলী, আবদুল্লাহ ইবন আবুল আস খাওয়ারিযিমী, হুসাইন ইবন মুহাম্মদ কুবানী প্রমুখ।

ইমাম বুখারী (রহ) এ সব শাগরেদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে হযরত ওয়াকী'র কথার প্রতি বিশেষভাবে আমল করেছেন। ওয়াকী বলেছেন–

لَايَكُوْنُ الرَّجُلُ عَالِمًا حَتّٰى يُحَدِّثَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ وَعَمَّنْ هُوَ مِثْلَهُ وَعَمَّنْ هُوَ دُوْنَهُ.

"কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ জ্ঞানী হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার শিক্ষকগণ, সমসাময়িক স্তর এবং নিম্নস্তরের (ছাত্রদের) কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা না করবে।"[১৭]

স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহ)-এর কথা হচ্ছে–

لَايَكُوْنَ الْمُحَدِّثُ كَامِلاً حَتّٰى يَكْتُبُ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ وَعَمَّنْ هُوَ مِثْلَهُ وَعَمَّنْ هُوَ دُوْنَهُ.

"কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুহাদ্দিস হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার শিক্ষকবৃন্দ, সমসাময়িক স্তর এবং তার নিম্নস্তরের কাছ থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ না করবে।"[১৮]

মোট কথা-মক্কা, মদীনা, ইরাক, মিসর, বাগদাদ, সিরিয়া ও খোরাসানের এমন কোনো হাদীস বিশারদ অবশিষ্ট ছিল না যার কাছ থেকে ইমাম বুখারী (রহ) হাদীস গ্রহণ করেন নি।

শিক্ষাদান

ইমাম বুখারী (রহ) ১৮ বছর বয়সে শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্ণতা লাভ করলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সবদিকে ছড়িয়ে পড়লে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন তাঁর কাছে হাদীস গ্রহণের জন্য এসে ভিড় করতে থাকে। প্রথমে তিনি মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (রহ)-এর বাড়িতে হাদীস শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত নিলেন। পরবর্তীতে তিনি যেখানে যান সেখানেই লোকজন হাদীস জানার জন্যে জড়ো হয়ে যায়। তিনি নিশাপুরে গিয়ে

১৭. ইব্ন হাজর আল-আসকালানী, *তাহযীব আল-তাহযীব*, হায়দরাবাদ, ১৩২৫ হি. ৮ম খণ্ড. পৃ. ১৫০

www.pathagar.com

শিক্ষাদানে নিয়োজিত হলে সেখানে খ্যাতিমান আলেমগণও তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষার জন্যে আসতে থাকেন। ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (রহ)ও তাঁর কাছে নিয়মিত এসে হাদীস গ্রহণের চেষ্টা করতেন।[১৯] একদিন ইমাম মুসলিম (রহ) ইমাম বুখারী (রহ)-এর হাদীসের গভীর জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কপালে চুমু খেলেন এবং আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন-

دَعْنِى اُقَبِّلْ رِجْلَيْكَ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْحَدِيْثِ

"হে হাদীস শাস্ত্রে মু'মিন সম্প্রদায়ের বাদশা! আমাকে আপনার পদযুগল চুমু খেতে দিন।"[২০]

নিশাপুরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ইমাম মুসলিম (রহ)-এর শিক্ষক ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া যুহলী তাঁর সকল ছাত্রকে ইমাম বুখারীর দরবারে উপস্থিত হয়ে হাদীস শিক্ষার জন্যে অনুমতি দিলেন। ইমাম বুখারী (রহ)-এর হাদীসে গভীর জ্ঞান ও উত্তম চরিত্র দেখে ছাত্ররা তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এতে নিশাপুরের মুহাদ্দিসের দরবার খালি হয়ে গিয়েছেল।

'যফরুল মুহাস্সিলীন' গ্রন্থে এসেছে, ইউসুফ ইবন মূসা বর্ণনা করেছেন-একদিন বসরার গলিতে জনৈক ব্যক্তি আক্ষেপ করে বলতে শুনেছি– হে জ্ঞান পিপাসুগণ! আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী বর্তমানে বসরায় তাশরীফ এনেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে চায় সে যেন বসরার জামে মসজিদে উপস্থিত হয়। তা শুনে আমি বসরার জামে মসজিদে উপস্থিত হলাম। উপস্থিত হয়ে দেখি বসরার অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ইমাম সাহেবের সাক্ষাতের জন্যে মসজিদে অপেক্ষায় আছেন। অন্যদিকে দেখি একজন যুবক মসজিদের খুঁটির পেছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন। লোকজন থেকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ইনিই মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী। তিনি নামায শেষ করার পর সকলে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে কিছু লোক তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনার আবেদন জানালে তিনি তা কবুল করলেন। এরপর মসজিদে ঘোষণা দেয়া হল–মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (রহ.) বসরায় এসেছেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে কিছু হাদীসের জ্ঞান আহরণের আবেদন জানিয়েছিলাম, তিনি তা গ্রহণ করেছেন। আগামীকাল অমুক জায়গায় ইমাম সাহেব হাদীস লেখানোর জন্যে উপস্থিত হবেন। সুতরাং হাদীস পিপাসুগণকে উক্ত স্থানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে অনুরোধ রইল। পরদিন নির্ধারিত স্থানে হাজার হাজার মুহাদ্দিস, ফকীহ ও জ্ঞান পিপাসু একত্রিত হয়ে গেল। তখন ইমাম সাহেব উপস্থিত লোকজনকে সম্বোধন করে বললেন– হে বসরার জ্ঞানীগণ! তোমরা আমার কাছে হাদীস লেখানোর জন্যে আবেদন করেছ এবং আমি তা কবুল করেছি। আজ আমি তোমাদের কাছে ঐ হাদীসগুলো বর্ণনা করবো যে হাদীসগুলোর বর্ণনাকারী এ বসরা শহরের অধিবাসী অথচ, তোমরা তাদের সম্পর্কে খবরও রাখ না— একথা বলার পর তিনি সত্যিই বসরার অধিবাসী বর্ণনাকারীর হাদীসই বর্ণনা করলেন।[২১] ইমাম বুখারীর জ্ঞানের গভীরতা দেখে উপস্থিত লোকজন হতবাক হয়ে যান।

শাগরিদবৃন্দ

ইমাম বুখারী (রহ)-এর ছাত্র সংখ্যা প্রচুর। আল্লামা তকী উদ্দীন নদভী বলেছেন–ইমাম বুখারী (রহ) থেকে বুখারী শরীফ শ্রবণকারীর সংখ্যা নব্বই হাজারেও অধিক।[২২] পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বড় বড় মুহাদ্দিস ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ এসে তাঁর দরবারে ভিড় জমাত। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হচ্ছে–হাফেয আবূ ঈসা তিরমিযী, আবূ আবদুর রহমান নাসাঈ, মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, আবূ যুর'আহ, আবূ হাতিম, ইব্ন হুযায়মা, মুহাম্মদ ইবন নসর মরূযী, আবূ আবদুল্লাহ ফারবারী প্রমুখ।[২৩]

১৯. হানীফ গংগুহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
২০. সৈয়দ সুলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
২১. মুহাম্মদ হানীফ গংগুহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-৬
২২. তকী উদ্দীন নদভী, *মুহাদ্দেসীনে এজাম আউর উনকে এলমী কারনামে,* করাচী, মজলিশে নশরিয়াতে ইসলাম, ১৩৮৬ হি., পৃ. ১৩৯।
২৩. মুহাম্মদ হানীফ গংগুহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

www.pathagar.com

ইমাম বুখারী (র)-এর চরিত্র

ইমাম বুখারী (রহ) মহৎ চরিত্রের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। বদান্যতা তাঁর চরিত্রের ভূষণ। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি অনেক সম্পদ পেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি তা গরীব, অসহায় ও হাদীস শিক্ষার্থীদের মধ্যে দান করে দিয়েছিলেন। তিনি স্বল্প আহারে অভ্যস্ত ছিলেন। কোনো সময় তিনি মাত্র দু'তিনটি বাদাম খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী বলেছেন–

كَانَ قَلِيْلَ الاَكْلِ جِدًا مُفْرِدًا فِى الْجُوْدِ وَقَالَ كَانَ يَقْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ بِلُوْزَتَيْنِ اَوْ ثَلاَث.

"তিনি খুব কম খেতেন এবং দান-দক্ষিণায় ছিলেন তুলনাহীন। তিনি দিনে মাত্র দু'তিনটি বাদাম খেয়ে কাটিয়েছেন।"[২৪]

আদম ইবন আবু আয়াসের দরবারে গেলে তাঁর করুণ অবস্থার কথা তিনি নিজেই বলেছেন–"আমি আদম ইবন আবু আয়াসের খেদমতে উপস্থিত হলে আমার সমুদয় সম্পদ ফুরিয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমাকে দু'দিন ঘাস খেয়ে দিন যাপন করতে হয়ছিল।"[২৫]

ইউসুফ ইবন আবু যর বর্ণনা করেছেন–একদিন ইমাম বুখারী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন–সম্ভবত খাবারের সাথে মোটেও তরী-তরকারী খাননি। ইমাম বুখারী বললেন–বিগত চল্লিশ বছর যাবত আমার তরী-তরকারী খাওয়ার সুযোগ হয়নি।[২৬]

উমর বিন হাফস আশতার বলেছেন–বসরায় আমি ও ইমাম বুখারী একই সাথে অধ্যয়ন করতাম। একদিন ইমাম বুখারী ক্লাসে অনুপস্থিত ছিলেন। তখন অনুসন্ধান করে জানা গেল পরিধানের কাপড়ের অভাবে তিনি অনুপস্থিত রয়েছেন। তবে তিনি এ বিষয়টি কোনো বন্ধু-বান্ধবকে জানতে দেননি। এরপর তাঁর জন্যে কাপড়ের ব্যবস্থা করা হলে তিনি পুনরায় যথারীতি ক্লাসে উপস্থিত হতে লাগলেন।[২৭]

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন–আশা করি গীবতের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ পাকের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কারণ, আমি যখন থেকে জানতে পারলাম যে, গীবত হারাম তখন থেকে আমি কারো কোনো দিন গীবত করিনি।

একদিন ইমাম বুখারী (রহ) আবূ মা'শারকে বললেন–তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও। আবূ মা'শার আশ্চর্য হয়ে বললেন–কি অপরাধ ? তখন ইমাম বললেন–একদিন হাদীস বর্ণনাকালে আমি দেখলাম যে, তুমি অপ্রকৃতস্থ হয়ে হাত এবং মাথা ঝুলিয়ে রেখেছ, এতে আমার হাসি এসেছিল। এ জন্যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আবূ মাশার বললেন–আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম।[২৮]

ইমাম বুখারী (রহ)-এর তীরন্দাজের প্রতি খুবই আকর্ষণ ছিল। একদিন আবদুল্লাহ সাহরানীর সাথে বের হয়ে তীরান্দাজের সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটি তীর কাঠের খুঁটিতে বিদ্ধ হয়ে যায়। এতে খুঁটিটির যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। ইমাম সাহেব খুঁটি থেকে তীরটি বের করে বললেন–আবদুল্লাহ তুমি খুঁটির মালিকের কাছে গিয়ে বল–আমার দ্বারা তার খুঁটির ক্ষতি হয়েছে। সুতরাং তিনি যেন আমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে অনুমতি দেন। আবদুল্লাহ খুঁটির মালিক হুমাইদ ইবন আখযরকে তা জানালে তিনি বললেন–আমি ইমাম সাহেবের জন্যে আমার সমস্ত সম্পদ কুরবানী করে দিতে প্রস্তুত। আপনি গিয়ে বলুন–আমি তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আবদুল্লাহ সাহরানী গিয়ে তা জানালে ইমাম বুখারী খুবই খুশী

২৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী, *ফী মা য়ায়েজু হেফজুহু লিল নাযের*, পৃ. ৩
২৫. মুহাম্মদ হানীফ গংগুহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

www.pathagar.com

হন এবং তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায়। ঐদিন ইমাম বাড়ি পৌছে শুকরিয়া স্বরূপ দু'শত দেরহাম খায়রাত করে দিলেন।[২৯]

আল্লামা আলজুনী ইমাম বুখারীর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন–ইমাম সাহেবের ছাত্র অবস্থায় একবার সামুদ্রিক সফর হয়। এ সময় তাঁর কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। জাহাজে জনৈক ব্যক্তির সাথে তাঁর সম্পর্ক হয়। লোকটি জাহাজে সবসময় তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতো। তাঁরা উভয়ে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তাও বলতেন। কথায় কথায় ইমাম সাহেব লোকটিকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার কথা বলে দেন। একদিন রাতে লোকটি ঘুম থেকে ওঠে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। আশপাশের লোকজন তার কান্নার কারণ জানতে চাইলে সে বলল–আমার এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার একটি থলে হারিয়ে গেছে। তখন লোকজন তার দুঃখের সাথে সমবেদনা প্রকাশ করলো এবং জাহাজের লোকজনের দেহ তল্লাশি আরম্ভ করল। ইমাম বুখারী এ অবস্থা বুঝে নিজের এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নদীতে ফেলে দিলেন। একে একে সকলের দেহ তল্লাশির পর ইমাম সাহেবেরও দেহ তল্লাশি করা হল। কিন্তু কোনো ব্যক্তির কাছে কিছুই পাওয়া গেল না। তখন জাহাজের যাত্রী সকলে জনৈক ব্যক্তিকে তিরস্কার করে নিজ আসনে চলে গেল। জাহাজ থেকে নামার সময় লোকটি ইমাম সাহেবকে একাকী পেলে ইমাম সাহেবের স্বর্ণমুদ্রার থলেটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তখন ইমাম সাহেব বললেন–স্বর্ণমুদ্রার থলেটি তো আমি নদীতে ফেলে দিয়েছি। একথা শুনে লোকটি আশ্চর্য হেয় বলল–আপনি এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা নদীতে ফেলে দিলেন, অথচ, আপনার দুঃখ লাগলো না ? ইমাম বুখারী (রহ) বললেন–আমার জীবনটা অতিবাহিত হচ্ছে রাসূলে করীম (সা)-এর হাদীস শিক্ষা ও অন্বেষণের মাধ্যমে। আমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সকলে জানেন। সুতরাং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা চুরির অভিযোগে আমি অভিযুক্ত হতে চাই নি।[৩০]

ইমাম বুখারী (রহ) যখন ধনী ছিলেন তখন অনেক সময় দিনে দু'শত দেরহাম সাদ্কা করে দিতেন। ওয়াররাক বলেছেন–ইমাম বুখারীর মাসিক আয় পাঁচশ' দেরহাম ছিল এবং তা পুরোটাই হাদীস শিক্ষার্থীদের ব্যয় করে দিতেন।[৩১]

খোদাভীতি

ইমাম বুখারী (রহ) সবসময় আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকতেন। আর সবসময় ইবাদত বন্দেগী ও শববেদারী এবং রোযার মাধ্যমে দিন অতিবাহিত করতেন। তিনি প্রতি রমযান মাসের দিবাভাগে এক খতম এবং রাতে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর তারাবীহ্র মধ্যে খতমে কুরআন আদায় করতেন। এভাবে তাক্ওয়া-পরহেযগারী, ইবাদত-বন্দেগী, দান-খায়রাত ইত্যাদি সৎগুণাবলীর এক অপূর্ব সমাহার ছিল তাঁর জীবনে।

একবার ইমাম বুখারী (রহ) যোহরের নামায শেষে নফ্ল নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ করে জামার আস্তিন উল্টিয়ে লোকজনকে বললেন– দেখ এর ভিতরে কি আছে ? তখন লোকজন দেখলেন এর ভিতরে একটি ভিমরুল (অন্য বর্ণনায় বিচ্ছু) জামার আস্তিনের ভিতরে ষোল সতের স্থানে দংশন করেছে। লোকজন বললো–হযরত আপনি নামাযের নিয়ত ছেড়ে দেননি কেন ? নফল নামায তা পরে আদায় করতেন। তখন বুখারী (রহ) বললেন–আমি নামাযে যে সূরা তিলাওয়াত শুরু করছিলাম তাতে এত মজা পাচ্ছিলাম ফলে নামাযের মধ্যে একটু কষ্টও অনুভব করিনি।[৩২]

ইমাম বুখারী (রহ) ছিলেন দুনিয়া ত্যাগী মানুষ। এ ক্ষণস্থায়ী জগতের প্রতি তাঁর কোনো লোভ-লালসা ছিল না। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্র খাঁটি অনুসারী এবং আল্লাহ্ প্রেমিক। উত্তরাধিকারসূত্রে

২৯. হানীফ গংগুহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

www.pathagar.com

যাবতীয় সম্পদ তিনি জ্ঞান আহরণে আল্লাহ্‌র পথে বিলীন করে দিয়েছেন। এ কারণে তাঁকে কোনো কোনো সময় চরম দারিদ্রের সম্মুখীন হতে হয়েছে; কিন্তু কোনো কষ্টই তাঁকে তাঁর সাধনার পথ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। পরহেজগারী ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং দুনিয়া ত্যাগ ছিল তাঁর আদর্শ।

একবার একটি জিনিসের মূল্য ক্রেতার পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার দেরহাম বলা হল। তখন ইমাম বুখারী (রহ) কোনো কথা দিলেন না। বললেন–আমি চিন্তা করে দেখব। আপনি আগামিকাল আসুন। একটু পরে আরেকজন ব্যবসায়ী এসে বলল–আমি দশ হাজার দিরহাম আদায় করব। ইমাম বুখারী (রহ) বললেন– না আপনাকে দেয়া সম্ভব হবে না। কেননা, আমি মনে মনে চিন্তা করেছিলাম ইতোপূর্বে যিনি পাঁচ হাজার দেরহাম বলেছেন তাঁকেই দেবো। লোকটি বলল–হুজুর! আপনি তো তাকে কোনো কথা দেননি। ইমাম সাহেব বললেন–ঠিকই আমি তাকে কথা দেইনি; কিন্তু আমি মনে মনে ভেবেছিলাম যে, তাঁকেই এ জিনিসটি দেবো। আর মনের মালিক আল্লাহ জানেন আমার নিয়তের খবর। তাই ইমাম সাহেব পাঁচ হাজার দেরহাম ক্ষতি স্বীকার করলেন এবং আগের ব্যবসায়ীর কাছে পাঁচ হাজার দেরহামে জিনিসটি বিক্রি করলেন।

হাদীসে ইমাম বুখারী (রহ)-এর গভীর জ্ঞানের স্বীকৃতি

ইমাম বুখারী (রহ)-এর সমসাময়িক আলিমগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গরা হাদীসে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান গরিমার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক খুযায়মা বলেছেন–

مَارَأَيْتُ تَحْتَ اَدِيمِ السَّمَاءِ اَعْلَمَ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اَحْفَظَ لَهُ مِنْ مُحَمَّدِبْنِ اِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيِّ.

"পৃথিবীর বুকে রাসূলের হাদীসের বড় আলিম এবং এর বড় হাফেয মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী অপেক্ষা আর কাউকে আমি দেখি নি।"[৩৩]

একদিন তৎকালীন প্রসিদ্ধ হাদীস শাস্ত্রবিদ আমর ইব্‌ন জুররাহ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে ইমাম বুখারীর কাছে হাদীস শাস্ত্রের দোষত্রুটি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি তার যথার্থ জবাব দেন। বিদায় বেলায় ইব্‌ন যুররাহ বললেন–

أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَفْقَهُ مِنَّا وَاَعْلَمَ وَاَبْصَرُ .

"ইমাম আবূ আবদুল্লাহ বুখারী আমার চেয়েও অধিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির অধিকারী।"[৩৪]

আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারিমী বলেছেন–"আমি মক্কা, মদীনা, হিজায, সিরিয়া ও ইরাকে অসংখ্য আলিমদেরকে দেখেছি; কিন্তু বুখারীর মতো অন্য কাউকে দেখে নি।"[৩৫]

মুহাম্মদ ইবন সালাম বাইকান্দী একবার ইমাম বুখারীকে বললেন–আমার গ্রন্থটি এক নজর দেখার এবং ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে সংশোধন করে দেয়ার অনুরোধ রইল আপনার কাছে। এ সময় ইমাম বায়কান্দীর একজন সাথী উপস্থিত ছিলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন–আপনি এ যুবককে বলছেন ? তখন বায়কান্দী বললেন–এ যুবক হচ্ছে এমন ব্যক্তি যাঁর কোনো তুলনা নেই।[৩৬]

কুতাইবা ইবন সাঈদ বলেছেন–আমি অনেক ফকীহ, আবিদ ও যাহেদের দরবারে বসেছি ; কিন্তু ইমাম বুখারীর মতো অন্য কাউকে দেখিনি। ইনি হচ্ছেন আমাদের যামানায় এমন এক ব্যক্তি—যেমনি সাহাবায়ে কিরামের যুগে উমর ফারূক (রা) ছিলেন।[৩৭]

৩৩. মুহাম্মদ আবূ যাহূ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪
৩৪. তকী উদ্দীন নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-৪৩
৩৫. হানীফ গংগুহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
৩৭. হানীফ গংগুহী প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

www.pathagar.com

ইমাম মুসলিম (রহ) ইমাম বুখারী (রহ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেছেন–

اَشْهَدُ اَنَّهُ لَيْسَ فِى الدُّنْيَا مِثْلَكَ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই।"

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেছেন–

مَا اَخْرَجَتْ خُرَاسَانُ مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ اسْمَاعِيْلَ

"খোরাসানে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈলের মতো অন্য কোনো ব্যক্তি জন্ম নেয়নি।"

ইমাম তিরমিযী (রহ) বলেছেন–"হাদীসের সনদ ও ইলাল (সূক্ষ্ম দোষত্রুটি) সম্পর্কে ইমাম বুখারীর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি।"

ইমাম য়াহ্য়া বিন জা'ফর বাইকান্দী বলেছেন–আমার জীবন থেকে যদি কিছু সময় ইমাম বুখারীর জীবনে সংযোজন করা যেতো তাহলে অবশ্যই আমি তা করতাম। কেননা, আমার মৃত্যু ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যু আর ইমাম বুখারীর মৃত্যু জ্ঞানের জগত শেষ হয়ে যাওয়ার মৃত্যু।

শায়খ বান্দার মুহাম্মদ বিন বাশ্শার বলেছেন- "আমাদের যামানায় ইমাম বুখারীই সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন।"[৩৮]

নিশাপুরে ইমাম বুখারীর সাথে যুহলীর মতবিরোধ

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন য়াহ্য়া যুহলী ছিলেন নিশাপুরের একজন অন্যতম প্রসিদ্ধ আলিম ও হাদীসবিদ। ইমাম বুখারী ২৫০ হিজরী সালে আগমনের পর যুহলীর দরবারে হাদীস শিক্ষার ছাত্র ক্রমশ হ্রাস পায়। তারপরও যুহলী ইমাম বুখারীকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। একদিন ইমাম যুহলী মজলিশের মধ্যে বললেন–"আগামিকাল আমি ইমাম বুখারীর সাক্ষাতে যাবো। যে আমার সাথে যেতে চায় যেতে পারবে।" তবে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মতবিরোধপূর্ণ কোনো বিষয়ে তাঁকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না। যদি কেউ তা কর তাহলে আমাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। আর খোরাসানের লোকজন আমাদের নিয়ে বিদ্রুপ করবে এবং আহলে সুন্নাত বিরোধীরা হাসি ঠাট্টা করার সুযোগ পাবে।

পরদিন ইমাম যুহলী জামা'আত সহকারে লোকজন নিয়ে ইমাম বুখারীর কাছে পৌছলেন। এরপর উভয়ের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে কথোপকথন চলছিল। এ সময় জনৈক ব্যক্তি ইমাম বুখারীকে প্রশ্ন করলো–

مَاتَقُوْلُ فِى اللَّفْظِ بِالْقُرْاٰنِ مَخْلُوْقٌ اَوْ غَيْرَ مَخْلُوْقٍ

"আপনি কুরআনের শব্দ সম্পর্কে কি বলেন ? কুরআনের শব্দ কি মাখলূক (সৃষ্ট) ? নাকি মাখলূক নয় ?

এটি কোনো সাধারণ প্রশ্ন নয়। এটি ছিল কুরআন সম্পর্কিত একটি জটিল মাস'আলা। এ মাস'আলা নিয়ে মুতাযিলা ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী আলেম সমাজ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ঐ ব্যক্তি ইমাম বুখারীকে বারবার প্রশ্নটি করতে থাকলে ইমাম বুখারী বাধ্য হয়ে বললেন–

اَلْقُرْاٰنُ كَلَامُ اللّٰهِ غَيْرَ مَخْلُوْقٍ وَلَفْظِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْفَاظُنَا مِنْ اَفْعَالِنَا وَاَفْعَالُنَا مَخْلُوْقَةٌ.

"আল-কুরআন আল্লাহর কালাম যা মাখলূক বা সৃষ্ট নয়। আল-কুরআনের যে শব্দ আমাদের মুখ থেকে বের হয় তা আমাদের শব্দ। আমাদের শব্দ আমাদের কর্ম দ্বারা নির্গত হয়। আর আমাদের কর্ম হল মাখলূক বা সৃষ্ট।"[৩৯]

---

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৩৯. সৈয়দ সুলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

www.pathagar.com

ইমাম বুখারীর এ সংক্ষিপ্ত বাখ্যাটিতে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর হয়েই গেছে। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বোঝার চেষ্টা করেনি। এতে বিষয়টি দীর্ঘ হয়ে গেলো। এতে ইমাম বুখারীর ভক্তদের মাঝেও বিভেদ সৃষ্টি হল। তখন ইমাম যুহলী সুযোগ বুঝে ফতোয়া দিলেন–"যে ব্যক্তি কুরআনের শব্দসমূহ সৃষ্ট হওয়ার প্রবক্তা সে যেন আমাদের মজলিসে না আসে।" ইমাম যুহলীর এ ফতোয়ার পর ইমাম বুখারীর শিক্ষায়তনে লোকজন কমে যায়। শেষ পর্যন্ত ইমাম মুসলিম (রহ)-ই ছিলেন। এ নাজুক পরিস্থিতিতে ইমাম বুখারী নিশাপুর থেকে বিদায় নিয়ে স্বীয় মাতৃভূমি বুখারার পথে রওয়ানা করেন। বুখারার জনগণ তাঁর আগমনের খবর পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় এবং তাঁকে অভ্যর্থনার সময় অনেক স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা উপহার দিয়ে শহরে বরণ করে নেন।

ইমাম বুখারী (রহ)-এর পুনরায় বুখারা গমন

নিজ বাসভূমি বুখারায় এসে ইমাম বুখারী কিছু দিন সময় অতিবাহিত হতে না হতেই বিরোধীরা শত্রুতা আরম্ভ করে দিল। তখনকার বুখারার শাসক ছিলেন খালেদ ইব্ন আহমাদ যুহ্লী। এক সময় খালেদ ইব্ন আহমাদ ইমাম বুখারীকে তাঁর 'জামে বুখারী' ও 'তারিখ আল-কাবীর' গ্রন্থদ্বয় নিয়ে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হতে বললেন। যাতে করে শাসকের পুত্রগণ এর থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। কিন্তু ইমাম বুখারী তাঁর এ প্রস্তাবে রাজী হন নি এবং বাহক মারফত জানিয়ে দিলেন যে, তিনি রাজ প্রাসাদে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে জ্ঞানের অবমাননা করতে চান না। যদি তিনি পুত্রগণকে শিক্ষা দিতে চান তাহলে যেন পুত্রগণকে অপরাপর ছাত্রের সাথে হাদীস শিক্ষার মজলিসে পাঠিয়ে দেন। কেননা, জ্ঞান হলো মহানবী (সা) থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার। এর মর্যাদা অপরিসীম। বুখারার শাসক ইমাম বুখারীর এ উত্তর শুনে ক্ষুব্ধ হন এবং এর প্রতিশোধ নেয়ার ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি কৌশলে এ অপবাদ শুরু করেন যে, ইমাম বুখারীর ধর্মীয় আকীদা শুদ্ধ নয়। অবশেষে বুখারার শাসক ইমাম বুখারীকে বুখারা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেন। তখন ইমাম বুখারী বুখারা ছেড়ে সমরকন্দে খরতংক নামক একটি শহরে চলে যান।[৪০]

ইমাম বুখারীর মাযহাব

ইমাম বুখারী (রহ) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। দামেশকের প্রখ্যাত গবেষক ও লেখক আল্লামা তাজ উদ্দীন সুবকী তাঁর (طبقات الشافية الكبرى) 'তাবকাত আল-শাফিয়ীয়্যাহ আল-কুবরা' গ্রন্থে বলেছেন–ইমাম বুখারী (রহ) শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

বুখারার অন্যতম লেখক নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান তাঁর 'আবজাদ আল-উলূম' (ابجد العلوم) গ্রন্থেও ইমাম বুখারী শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইব্ন হাজার আল-আসকালানীর মতে, ইমাম বুখারী (রহ)-এর ফিক্হী সম্পর্কিত প্রায় আলোচনায় ইমাম শাফি'ঈ (রহ)-এর মাযহাবের সমর্থন পাওয়া যায়।

দামেশকের খ্যাতিমান আলিম আল্লামা ইব্ন কায়্যিম বলেছেন–ইমাম বুখারী (রহ) হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

দামেশকের খ্যাতিমান আরবী ভাষাবিদ ও আলিম আল্লামা তাহের জাযায়িরী বলেছেন–ইমাম বুখারী (রহ) ছিলেন একজন মুজতাহিদ (গবেষক)।

আল্লামা আন্ওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ) বলেছেন–ইমাম বুখারী (রহ) কোন্ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন।[৪১]

---

৪০. মুহাম্মদ হানীফ গংগুহী, পৃ. ১২০-১২১

৪১. গোলাম রসূল সায়ীদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

www.pathagar.com

আমাদের মতে, ইমাম বুখারী (রহ) অনেক জায়গায় ইমাম শাফেঈ (রহ)-এর মতের অনুসরণ করলেও তিনি শাফিঈ (রহ)-এর অনুসরণকারী ছিলেন না ; বরং তিনি ছিলেন একজন গবেষক।

ইমাম বুখারী (রহ)-এর রচনাবলী

ইমাম বুখারী (রহ)-এর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে হাদীসের সাধনা ও শিক্ষাদানে। এর পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাতে তিনি আজও প্রতিটি মানুষের অন্তরে গেঁথে আছেন।

তাঁর সর্বশেষ খ্যাতিসম্পন্ন, মর্যাদাবান, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অনবদ্য গ্রন্থ হচ্ছে–

১. আল-জামে আল-সহীহ আল-বুখারী (اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ الْبُخَارِىُّ)

বুখারী শরীফের পুরো নাম—

اَلْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَر مِنْ اُمُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُنَنِهٖ وَاَيَّامِهٖ.

(আল্-জামি আল-মুসনাদ আল-সহীহ আল-মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিন সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহি।)

অর্থাৎ-মহানবী (সা)-এর আচার-আচরণ, আদর্শাবলী ও জীবনকালের (আটটি বিষয়ের) বিশদ আলোচনা সম্বলিত পূর্ণ সনদযুক্ত বিশুদ্ধ হাদীসের সংক্ষিপ্ত কিতাব।

ইমাম বুখারী (রহ) ২১৭ হিজরী সালে এ গ্রন্থের কাজ শুরু করেন এবং ২৩৩ হিজরী সালে শেষ করেন। দীর্ঘ ১৬ বছর পরিশ্রম করে তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেন।

২. কাযায়া আল-সাহাবা ওয়াল তাবিঈন (قَضَايَا الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ)

ইমাম বুখারী (রহ) মদীনায় ২১২ হিজরী সালে আঠার বছর বয়সে এ গ্রন্থ রচনা করেন।

৩. আল-আদব আল-মুফরাদ (اَلْاَدَبُ الْمُفْرَدُ)

এটি রাসূলে করীম (সা)-এর চারিত্রিক জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে একটি প্রখ্যাত গ্রন্থ। এতে ৬৪৪টি শিরোনামে ১৩২২টি হাদীস রয়েছে। আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-জলীল আল-বাজ্জারের বর্ণনায় এটি বর্ণিত। এর ফার্সী অনুবাদ করেন নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান এবং উর্দূ অনুবাদ করেন মরহুম মাওলানা আবদুল গাফ্‌ফার। আর বাংলা অনুবাদ করেন মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। বাংলা অনুবাদটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকেই প্রকাশিত হয়েছে।

৪. আল-তারীখ আল-কবীর (اَلتَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ)

ইমাম বুখারী (রহ) মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রওজা মুবারকের পাশে বসে চাঁদের আলোতে গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি আট খণ্ডে সমাপ্ত। এটি আরবী বর্ণমালা অনুসারে রচিত হয়েছে। আবূ আহমদ মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান ইবন ফারিস এবং আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবন সাহাল নব্বীর বর্ণনায় বর্ণিত। এ গ্রন্থের রচনা শেষ হলে ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই গ্রন্থটি নিয়ে খুরাসানের শাসক আবদুল্লাহ ইবন তাহিরের কাছে হাজির হয়ে গ্রন্থটি দেখিয়ে বললেন– (الا اراك سحرا) আমি আপনাকে একটি যাদু দেখাচ্ছি। গ্রন্থটির সংস্করণ দাক্ষিণাত্যের হায়দাবারাদের 'দায়িরা আল-মা'আরিফ উসমানিয়া' থেকে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছে।[৪২]

৫. আল-তারীখ আল-আওসাত (اَلتَّارِيْخُ الْاَوْسَطُ)

এ গ্রন্থটি এখনো প্রকাশিত হয়নি। এর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি জার্মানীতে রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন আবদুস সালাম আল-খাফ্‌ফাফের বর্ণনায় বর্ণিত।[৪৩]

৪২. গোলাম রসূল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

www.pathagar.com

৬. আল-তারীখ আল-সগীর (اَلتَّارِيْخُ الصَّغِيْرُ)

এ গ্রন্থের ধারাবাহিকতা সুনানের আলোকে এবং গ্রন্থটি খুবই সংক্ষিপ্ত। ভারতের এলাহাবাদ থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান আল-আশকার এর বর্ণনাকারী।

৭. আল-জামে আল-কবীর (اَلْجَامِعُ الْكَبِيْرُ)

ইব্ন তাহির এ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

৮. খালক আফয়াল আল-ইবাদ (خَلْقَ اَفْعَا ل الْعِبَاد)

এ গ্রন্থটিতে আকাঈদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে খালকে কুরআন এবং অন্যান্য মাসআলা সম্পর্কে ইমাম যুহলীর জবাব দেয়া হয়েছে। ইউসুফ ইবন রায়হান ইবন আবদুস·সালাদ এবং ফারবাবী এ গ্রন্থের রাবী।[৪৪]

৯. আল-মুসনাদ আল-কবীর (اَلْمُسْنَدُ الْكَبِيْرُ)

১০. আসামী আল-সাহাবা (اَسَامِيُ الصَّحَابَة)

সাহাবায়ে কিরামের জীবন চরিত সম্পর্কে রচিত একটি অন্যতম গ্রন্থ। 'মু'জাম আল-সাহাবা' (معجم الصحابة) গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

১১. কিতাব আল-ইলাল (كِتَابُ الْعِلَل)

হাফেজ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মান্দাহ এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এতে হাদীসের সনদের সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা হয়েছে।

১২. কিতাব আল-ফাওয়ায়িদ (كِتَابُ الْفَوَائِد)

ইমাম তিরমিযী (রহ) 'কিতাব আল-মানাকিব' গ্রন্থে এবং হয়রত তালহার মানাকিবের মধ্যে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩. কিতাব আল-উহদান (كِتَابُ الْوُحْدَنِ)

এ গ্রন্থটিতে ঐসব সাহাবা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যাঁদের কাছ থেকে মাত্র একটি একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন এটি ইমাম বুখারী (রহ)-এর নয়; বরং ইমাম মুসলিম (রহ)-এর।[৪৫]

১৪. কিতাব আল-দু'আফা আস-সাগীর (كِتَابُ الضُّعَفَاءُ الصَّغِيْرِ)

গ্রন্থটিতে দুর্বল বর্ণনাকারীদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এর বর্ণনাকারী হচ্ছে আবূ বিশর মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন হাম্মাদ আল-দূলাবী।

১৫. কিতাব আল-মাবসূত (كِتَابُ الْمَبْسُوْط)

আল্লামা খলীলী 'আল-ইরশাদ' গ্রন্থে কিতাব আল-মাবসূত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১৬. আল-জামি আল-সগীর (اَلْجَامِعُ الْصَّغِيْرِ)

১৭. কিতাব আল-রিকাক (كِتَابُ الرِّقَاقِ)

এ গ্রন্থ সম্পর্কে 'কাশ্ফ আল-যুনূন' গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৮. বিররুল ওয়ালিদাইন (بِرُّ الْوَلِدَيْنِ)

এ গ্রন্থটিতে মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হাফেয ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (রহ) এ গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

---

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

www.pathagar.com

১৯. কিতাব আল-কুনা (كِتَابُ الْكُنٰى)

গ্রন্থটিতে মুহাদ্দিসগণের নাম, উপনাম ও পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম আবূ আহমাদ হাকিম এ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং নিজ গ্রন্থে এর থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২০. কিতাব আল-আশরিবা (كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ)

হাফেজ দারু কুত্নী (রহ)-এর 'আল-মু'তালাফ ওয়াল মুখতালাফ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

২১. আল-তাফসীর আল-কাবীর (اَلتَّفْسِيْرُ الْكَبِيْرُ)

ফারবারী এবং ওয়াররাক এ গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

২২. বদ্উ আল-মাখলূকাত (بَدْءُ الْمَخْلُوْقَاتِ)

মানব সৃষ্টতত্ত্ব সম্পর্কে রাসূল (সা) থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে তা এ বইতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

২৩. কিতাব আল-হিবা (كِتَابُ الْهِبَةِ)

এটি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত পাঁচশ' হাদীসের একটি সংকলন।

২৪. কিরাত আল-ফাতিহা খালফ আল-ইমাম (قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ)

ইমামের পেছনে মুক্তাদীগণের সূরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে সব হাদীস রয়েছে তা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এর রাবী হচ্ছেন মাহ্মূদ ইবন ইসহাক আল-জাযায়ী (রহ)।

২৫. জুয্উ রাফ'ইল ইয়াদাইন (جُزْءُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ)

নামাযের বিভিন্ন তাক্বীরে হাত ওঠানো সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসগুলো এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর রাবী বা বর্ণনাকারী হচ্ছেন মাহমূদ ইবন ইসহাক আল-জাযায়ী (রহ)।

সহীহ আল-বুখারী সংকলনের কারণ

বুখারী শরীফ সংকলনের জন্যে ইমাম বুখারী (রহ) উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে–

(ক) ইমাম বুখারী (রহ) তাঁর প্রখ্যাত শিক্ষক ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন।

لَوْجَمَعْتُمْ كِتَابًا مُخْتَصَرًا فِى الصَّحِيْحِ سُنَنَ رَسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"যদি তোমরা সংক্ষিপ্তকারে রাসূল (সা)-এর হাদীসসমূহ সহীহ গ্রন্থাকারে সংকলন করতে?"

ইমাম বুখারী (রহ) বলেছেন–তখন থেকেই আমার মনে এ গ্রন্থ সংকলনের ইচ্ছা জাগে।

(খ) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম বুখারী (রহ) নিজেই বলেছেন–

رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ الْمَنَامِ كَاَنِّىْ وَاقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبِيَدِىْ مِرْوَحَةُ اَذُبُّ عَنْهُ فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْمُعَبِّرِيْنَ فَقَالَ اَنْتَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكِذْبَ فَهُوَ الَّذِىْ حَمَلَنِىْ عَلَى اِخْرَاجِ الصَّحِيْحِ.

"এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি নবী (সা)-এর সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং আমার হাতে একটি পাখা। এর দ্বারা পাখা করে তাঁর শরীর মুবারক থেকে মাছি তাড়াচ্ছি। ঘুম থেকে ওঠে তা'বীরকারীগণ

www.pathagar.com

থেকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বললেন–আপনি নবী করীম (সা)-এর হাদীস থেকে মিথ্যাগুলো দূরীভূত করবেন। এ স্বপ্নই আমাকে হাদীসের শুদ্ধিকরণে উদ্বুদ্ধ করে।[৪৬]

তারপর তিনি সহীহ আল-বুখারী সংকলনে গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং একটানা ১৬ বছরের সাধনায় এ অমূল্য গ্রন্থটি প্রণীত হয়।

সংকলনের স্থান

ইমাম বুখারী (রহ) বায়তুল্লাহ শরীফে বসেই বুখারী সংকলন করেন। এরপর মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে মিম্বর ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রওজা মুবারকের মাঝখানে বসে এর অধ্যায় ও শিরোনাম রচনা করেন।[৪৭]

সংকলন পদ্ধতি

বুখারী শরীফ সংকলনে ইমাম বুখারীর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি কোনো হাদীস লিখার ইচ্ছা করতেন তখন তা গ্রন্থে সন্নেবেশিত করার আগে গোসল করতেন। তারপর দু'রাকাআত সালাত আদায় করে ইস্তিখারা করার পর একেকটি হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন।

এক লাখ শুদ্ধ ও দু'লাখ অশুদ্ধসহ মোট তিন লাখ হাদীস ইমাম বুখারী (রহ)-এর মুখস্থ ছিল। এছাড়া তাঁর কাছে সংগৃহীত আরো তিন লাখসহ মোট ৬ লাখ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে এ গ্রন্থটি সংকলন করেন।

হাদীস সংখ্যা

ইব্ন হাজার আল-আসকালানীর মতে, বুখারী শরীফে সর্বমোট ৭৩৯৭ (সাত হাজার তিনশ' সাতানব্বই)টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। তাকরার বা পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে মাত্র ২৫১৩ (দু'হাজার পাঁচশত তের)-এ দাঁড়ায়। আল্লামা নববীর মতে পুনরাবৃত্তিসহ ৭২৭৫ (সাত হাজার দু'শ পঁচাত্তর)টি হাদীস রয়েছে। পুনরাবৃত্তি বাদে ৪,০০০ (চার হাজার) হাদীস স্থান পেয়েছে। মু'আল্লাকাতা ও মুতাব'আত যোগ করলে সর্বমোট হাদীস সংখ্যা ৯,০৭৯ (নয় হাজার ঊনাশি)টি। এতে সুলাসিয়াত (ইমাম বুখারী ও রাসূলে করীম (সা)-এর মাঝে বর্ণনা পরম্পরায় তিনি মাধ্যম বিশিষ্ট) হাদীস রয়েছে ২২টি। আর এতে ১৬০টি অধ্যায় (كِتَابٌ) এবং ৩৪৫০টি পরিচ্ছেদ (بَابٌ) রয়েছে।

বুখারী শরীফের অনুসৃত নীতিমালা

কি ধরনের হাদীস গ্রহণ করা হবে এবং কোন ধরনের হাদীস গ্রহণ করা হবে না এ সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। সিহাহ্ সিত্তার সংকলকগণও হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বহু জরুরী শর্ত অবলম্বন করে নিজ নিজ গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী (রহ)-এর শর্তাবলী সর্বাধিক সূক্ষ্ম ও কঠিন। শর্তগুলো হচ্ছে–

১. হাদীসের বর্ণনাসূত্র ধারাবাহিক সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন হতে হবে।

২. হাদীসের বর্ণনাকারীকে তার উস্তাদের সাহচর্যে উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করতে হবে।

৩. বর্ণনাকারীকে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য হতে হবে।

৪. যিনি যার থেকে হাদীস বর্ণনা করবেন তাঁদের পরস্পরের সরাসরি সাক্ষাত প্রমাণিত হতে হবে।

উল্লেখ্য, ইমাম বুখারী (রহ) নিজে সহীহ্ হাদীস নির্বাচনের মাপকাঠি সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তাঁর রিওয়াতের উপর গভীরভাবে গবেষণা চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থ প্রণয়নের সময় এসব নীতিমালা সযত্নে অবলম্বন করেছেন।

৪৬. গোলাম রসূল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-২৪
৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

www.pathagar.com

সহীহ আল-বুখারীর বৈশিষ্ট্য

অনবদ্য গ্রন্থ সহীহ আল-বুখারীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

(১) ইমাম বুখারী (রহ)-এর উদ্দেশ্য যদিও সহীহ্ হাদীসসমূহ সংকলন করা, কিন্তু বুখারী শরীফের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীস বিন্যাসের ক্ষেত্রে ফিক্হর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এতে এমন কিছু অধ্যায়ও পাওয়া যায়, যে অধ্যাগুলোকে মাসায়েল হিসেবে পেশ করে তার স্বপক্ষে কুরআনের আয়াত পেশ করা হয়েছে।

(২) বুখারী শরীফের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, বুখারী শরীফের কোনো কোনো স্থানে ছোটখাট ঘটনার দ্বারা বিশেষ উপকারী ফলাফল বের করে প্রত্যেকটি বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন হযরত বারিরাহ (রা)-এর হাদীস ইমাম মুসলিম (রহ) সাদাকার অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম বুখারী (রহ) এই হাদীস থেকে বিভিন্ন মাসআলা উদ্ঘাটন করে সেগুলোকে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

(৩) ইমাম বুখারী (রহ) হাদীস গ্রহণের আগে মুহাদ্দিসীনের স্তর নির্ধারণ করেছেন। ইমাম যুহুরীর ছাত্রদের মোট পাঁচটা স্তর যদিও সকলের গ্রহণযোগ্য; কিন্তু গুণাবলীর তারতম্যের কারণে তাদের মাঝে বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ) শুধুমাত্র প্রথম স্তর থেকে মৌলিকভাবে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর দ্বিতীয় স্তর থেকে সমর্থনস্বরূপ হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম মুসলিম (রহ) দ্বিতীয় স্তর থেকেও মৌলিকভাবে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

(৪) ইমাম বুখারী (রহ) মোট চারশ' ত্রিশজন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কেবল আশিজন রাবীর ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের কিছুটা ভিন্নমত থাকলেও হাদীস বিশারদগণের মতে তাদের রিওয়াআত গ্রহণযোগ্য।

(৫) অন্যান্য হাদীসের কিতাবের ভাষার তুলনায় বুখারী শরীফের ভাষা অধিক প্রাঞ্জল ও সাবলীল। ইমাম বুখারী (রহ) হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে নববী যুগের ও তার পরবর্তী যুগের প্রচলিত ভাষার প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন। মোটকথা, ইমাম বুখারী (রহ) হাদীসের অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখার সাথে সাথে তার শব্দের প্রতিও অন্যান্য মুহাদ্দিসের তুলনায় বেশি নজর দিয়েছেন।

(৬) ইমাম বুখারী (রহ) সহীহ্ বুখারীতে চব্বিশ জায়গায় কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরামের মতামতকে 'কালা বা'যুন নাস' (কেউ কেউ বলেছেন) উনওয়ান (শিরোনাম) নাম দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

(৭) ইমাম বুখারী (রহ) সনদে ধারাবাহিতা থাকার জন্য উভয় রাবী সমকালীন হওয়ার সাথে সাথে উভয়ের অন্তত একবার সাক্ষাত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। সুতরাং এসব দিক থেকেও বুখারী শরীফের মর্যাদা সকল হাদীস গ্রন্থের উর্ধ্বে। মুসলিম জাতি এ গ্রন্থটির প্রতি অপূর্ব ও অতুলনীয় গুরুত্ব দান করেছেন। মুসলিম মনীষীগণ কুরআন শরীফের পর বুখারী শরীফকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন।

(৮) শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) বলেছেন– যে কোন নেক উদ্দেশ্যেই বুখারী শরীফের খতম পড়ানো হয়, আল্লাহ সে উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করেন। তাযরাবা দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে।

(৯) ইমাম বুখারী (রহ) কোনো কারণবশত হাদীস লিখনকার্য স্থগিত রাখলে পুনরায় তা শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখে শুরু করতেন। এ জন্য হাদীসের মধ্যে মধ্যে বিসমিল্লাহ্র উল্লেখ রয়েছে।

(১০) অধ্যায়ের সাথে সাথে যাতে পাঠকরা এর ভাবার্থ ও নির্দেশিত বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত ও উপকৃত হতে পারে সে জন্য ইমাম বুখারী (রা) হাদীসসমূহ বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করে তারজুমাতুল বাব বা শিরোনাম কায়েম করেন। অনেক তারজুমাতুল বাবে তিনি আয়াতে কুরআনী

www.pathagar.com

উল্লেখ করেছেন। এতে করে পাঠক একই স্থানে হাদীসের বক্তব্যের সাথে কুরআনের বাণী মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাবে।

(১১) মুহাদ্দিসগণের কাছে উচ্চতর সনদের বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে। এতে সহীহ আল-বুখারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এতে সুলাসিয়াত (তিন মাধ্যম বিশিষ্ট হাদীস)। বুখারী শরীফে এ ধরনের বাইশটি হাদীস রয়েছে।

(১২) হাদীসের বক্তব্য যাতে পাঠক পুংখানুপুংখরূপে অনুধাবন করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে ইমাম বুখারী (রহ) হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট সমসাময়িক ঘটনা অর্থাৎ—যুদ্ধ বিগ্রহ সংক্রান্ত ঘটনাসমূহ চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। কিতাব আল-মাগাযীতে এ ধরনের অনেক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

(১৩) ইমাম বুখারী (রহ) ইতিহাস বিষয়েও প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি বুখারী শরীফের প্রতিটি পর্বের সূচনাতে এর প্রারম্ভিক সময়কাল এবং শরীয়তের বিধান হওয়ার সূচনাকালের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

(১৪) বুখারী শরীফের শুরু ও শেষের মাঝে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ইব্ন হাজার আল-আসকালানীর মতে, ইমাম বুখারী (রহ) বুখারী শরীফটি 'কিতাব আল-তাওহীদ' দিয়ে শেষ করেছেন। কেননা, তাওহীদ হলো আখিরাতের মুক্তির একমাত্র চাবিকাঠি।

(১৫) বুখারী শরীফ শুরু করেছেন নিয়ত বিষয়ক হাদীস দিয়ে। কেননা, যে কোনো কাজ আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে সহীহ নিয়তের প্রয়োজন।

(১৬) আরবী ভাষাশৈলী সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ) যে কতটা ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন তার প্রমাণ পাওয়া যায় সহীহ আল-বুখারীতে। এ গ্রন্থে তিনি মহানবী (সা)-এর যুগের ভাষা ও শব্দালংকার ব্যবহার করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধতম গ্রন্থ

সকল মুহাদ্দিসের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে, হাদীস গ্রন্থের মধ্যে সহীহ আল-বুখারীর মর্যাদা সবার উর্ধ্বে এবং কুরআন মজীদের পরই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধতম গ্রন্থ। বলা হয়ে থাকে–

اَصَحُّ الْكُتُبِ كِتَابُ اللّٰهِ تَحْتَ اَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابُ الْبُخَارِيِّ.

"আকাশের নিচে আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো সহীহ আল-বুখারী।"

বুখারী শরীফের শরাহ বা ব্যাখ্যা

বুখারী শরীফ জগদ্বিখ্যাত একটি হাদীস গ্রন্থ। এর গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে অনেক বড় বড় পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণীগণ আরবী, উর্দূ, ফার্সী এবং ইংরেজি ভাষায় এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নলিখিত কয়েকখানা কিতাব বুখারী শরীফের স্ববিস্তার শরাহ। যা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কাছে বিশেষ করে মুহাদ্দিসগণের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সমাদৃত। সেগুলো হচ্ছে–

১. উমদাতুল কারী : এ গ্রন্থ প্রণেতা শায়খ আল-ইমাম হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী (মৃ. ৮৫৫ হি.)। এখনো পর্যন্ত সহীহ আল-বুখারী'র এ ধরনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বের হয়নি। বদরুদ্দীন আইনী এ ব্যাখ্যার কাজ শুরু করেন ৮২১ হিজরীতে এবং সমাপ্ত করেন ৮৪৭ হিজরী সালে।

২. ফাতহুল বারী : এ গ্রন্থের প্রণেতা হাফেজ শিহাব উদ্দীন ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি.)। আল-আসকালানী এ গ্রন্থের কাজ শুরু করেন ৮১৩ হিজরীতে এবং শেষ করেন ৮৪২ হিজরী সালে।

৩. ফায়যুল বারী : এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি রচনা করেছেন আল্লামা আন্‌ওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ)।

৪. ইরশাদ আল-সারী : এ গ্রন্থের লেখক শিহাব উদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ আল-খতীব আল-কসতালানী (মৃ. ৯২৩ হি.)। এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি দশ খণ্ডে সমাপ্ত।

www.pathagar.com

৫. **আ'লাম আল-সুনান :** আবু সুলায়মান আহমদ বিন মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন খাত্তাব বসতী খাত্তাবী (মৃ. ৩০৮ হি.) বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন।

৬. **শারহ্ আল-বুখারী :** সহীহ আল-বুখারীর এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন ইমাম আবুল হাসান আলী বিন খাল্ফ আল-গরবী আল-মালেকী (মৃ. ৪৪৯ হি.)।

৭. **আল-কাওয়াকিব আল-দুরারী :** এ গ্রন্থ রচনা করেছেন আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন আলী আল-কিরমানী (মৃ. ৭৮৬ হি.)। এ গ্রন্থের শুরুতে ইল্মে হাদীসের ফযীলত, হাদীসের ব্যাখ্যা, শাব্দিক অর্থ, আরবী গ্রামার ও আসমাউর রিজাল বর্ণনা করেছেন।

৮. **শারহ্ আল-বুখারী :** এ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী মুহাম্মদ আল-বযদবী আল-হানাফী (মৃ. ৪৮২ হি.)। এটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

৯. **শারহ আল-জামে :** এ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন ইমাম কুতুব উদ্দীন আবদুল করীম ইবন আবদুর নূর বিন মায়সারী (মৃ. ৭৪৫ হি.)। এ গ্রন্থটি দশ খন্ডে সমাপ্ত।

১০. **কিতাব আল-নাজাহ :** এ ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন ইমাম নজমুদ্দীন উমর ইবন আল-নাসাফী (মৃ. ৫৩৭ হি.)। হাদীসের ব্যাখ্যার পাশাপাশি গ্রন্থকার ইমাম আযম আবূ হানীফার মাসআলাসমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এটি একটি উন্নতমানের কিতাব।

১১. **শাওয়াহেদ আল-তাওযীহ ঃ** এ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন জামাল উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-নাহবী (মৃ. ৬৭২ হি.)। জটিল ব্যাখ্যাগুলোতে তিনি নাহবী (ব্যাকরণগত) ব্যাখ্যা করেছেন।

১২. **আল-কাউসার আল-জারী আলা রিয়ায আল-বুখারী :** এ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন আহমাদ ইবন ইসমাঈল আর-কাউরানী আল-হানাফী (মৃ. ৮৯৩ হি.)। এ গ্রন্থের শুরুতে রাসূলে করীম (সা)-এর চরিত্র বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের ব্যাখ্যা ও শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন।

১৩. **আল-তাওশীহ আল-জামে আল-সহীহ :** এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ হচ্ছে হাফেয জালাল উদ্দীন সুয়ূতির (মৃ. ৯১১ হি.)।

১৪. **হেদায়াহ আল-বারী :** গ্রন্থটি রচনা করেছেন শায়খ আল-ইসলাম যাকারিয়া আনসারী (মৃ. ৯২৮ হি.)।

১৫। **তায়সার অল-বারী :** আল্লামা নূরুল হক ইবন মাওলানা আবদুল হক দেহলভী (মৃ. ১০৭৩ হি.) গ্রন্থটি রচনা করেছেন। যে কালে শায়খ আবদুল হক মিশকাতের শরাহ (ব্যাখ্যা) লিখেছেন সে কালে তিনি ফার্সীতে বুখারী শরীফের শরাহটি লিখেন।

১৬. **নাজাহ আল-কারী ফী শরহে আল-বুখারী :** শায়খ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আমাসী হানাফী (মৃ. ১১৬৭ হি.) গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থেটি ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত।

১৭. **শারহ আল-জামে :** গ্রন্থটি নাসির উদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন মনীর এস্কানদারানী রচিত। গ্রন্থটি দশ খন্ডে সমাপ্ত।

১৮. **মাজমা আল-বাহরায়ন :** শায়খ তকী উদ্দীন য়াহয়া বিন শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন আলী কিরমানী গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটি বড় বড় আট খণ্ডে সমাপ্ত।

১৯. **'আউন আল-বুখারী :** নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (মৃ. ১৩০৭ হি.) গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তিনি তাজরীদুল বুখারীরও সংক্ষিপ্ত শরাহ লিখেছেন।

২০. **নিবরাস আল-সারী ফী আতরাফ আল-বুখারী :** মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ইবন আবদুল আযীয হানাফী গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

২১. নূরুল কারী শারহে সহীহ আল-বুখারী : শায়খ নূরুদ্দীন আহমদ আবাদী এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

২২. ফযল আল-বারী : আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানীর বুখারীর পাঠদান থেকে মাওলানা আযীযুল হক লিখেছেন এবং গ্রন্থটি সাজিয়েছেন কাযী আবদুর রহমান।

২৩. এমদাদ আল-বারী : মাওলানা আবদুল জাব্বার আজামী ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটি চার খন্ডে রচিত।

২৪. লামি আল-দূরারী : হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহীর (মৃ. ১৩২৩ হি.) পাঠদান থেকে কয়েকজন ছাত্র গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটি হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব সাজিয়েছেন এবং একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে গ্রন্থটিকে মান সম্পন্ন করেছেন। এ গ্রন্থটি পড়লে অনেক জ্ঞান অর্জন করা যাবে।

২৫. আনওয়ার আল-বারী : গ্রন্থটি রচনা করেছেন মাওলানা সৈয়দ আহমাদ রেযা। আঠারো খণ্ডে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে।

২৬. ইযাহ্ আল-বুখারী : গ্রন্থটি হচ্ছে হযরত মাওলানা সৈয়দ ফখরুদ্দীন আহমদ মুরাদ আবাদীর পাঠদান। গ্রন্থটিকে তাঁর প্রিয় বন্ধু মাওলানা রিয়াসত আলী সাজিয়েছেন। গ্রন্থটি আঠারো খণ্ডে রচিত হয়েছে।

২৭. মাসাবীহ আল-জামি : গ্রন্থটি রচনা করেছেন আল্লামা বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর আল-দামায়িনী (মৃ. ১৮২৮ হি.)।

২৮. শারহ আল-বুখারী : গ্রন্থটি রচনা করেছেন কাযী আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইব্ন আল-আরবী আল-মালিকী (মৃ. ৫৩৪ হি.)।

২৯. আল-তাউযীহ : গ্রন্থটি রচনা করেছেন সিরাজ উদ্দীন উমর ইবন আলী বিন আল মালকান আল-শাফেয়ী (মৃ. ৮০৪ হি.)। গ্রন্থটি বিশ খন্ডে সমাপ্ত।

৩০. আল-লামে আল-সবীহ : গ্রন্থটি রচনা করেছেন আল্লামা শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদ্ আল-দায়েম ইবন মূসা বরমাবী শাফেঈ (রহ)। গ্রন্থটি রচনা করেছেন ৮৩১ হিজরীতে। এটি একটি চমৎকার ব্যাখ্যা গ্রন্থ। গ্রন্থটি চার খণ্ডে সমাপ্ত।

৩১. শারহে আল-জামে : গ্রন্থটি রচনা করেছেন আবুল কাসেম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন উমর ইবন দুরার তামীমী।

৩২. আল্-নূর আল-সারী আলা সহীহ আল-বুখারী : গ্রন্থটি রচনা করেছেন আল্লামা আল-হাসান আল-আদভী আল-আলম আল-আযহারী (মৃ. ১৩০৩ হি.)

ইন্তিকাল

মহান কীর্তিমান পুরুষ শেষ জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ও দুঃখকষ্ট ভোগ করেন। বুখারার গভর্নর তাঁর দু'পুত্রকে প্রাসাদে গিয়ে বিষেশভাবে শিক্ষাদানের অনুরোধ জানালে হাদীস শাস্ত্রের অবমাননা মনে করে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। গভর্নর তাঁকে কিছু সংখ্যক হিংসুকের প্ররোচনায় বুখারা ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তখন তিনি বুখারা ছেড়ে সমরকন্দে খরতংক নামক শহরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যান এবং আল্লাহর কাছে দ্বীন-ইসলামের এ কঠিন বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্যে আকুল আবেদন জানান। এ সময় রাত্রিকালে নামায শেষে তিনি যে দু'আ করতেন তা হচ্ছে–

اَللّٰهُمَّ قَدْ ضَاقَتْ عَلَىَّ الاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ فَاقْبِضْنِى اِلَيْكَ.

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ! এ বিশাল পৃথিবী আমার প্রতি সংকীর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং তুমি আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও।"

আশ্চর্য! আল্লাহ পাকের কাছে এ দু'আ সত্যি সত্যিই কবুল হয়ে গেছে। খরতংক শহরে ২৫৬ হিজরী সালে ১ শাওয়াল শনিবার ঈদুল ফিতরের রাতে ইশার নামাযের পর তিনি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।[৪৮]

মৃত্যুর পর কবর থেকে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত

ইমাম বুখারী (রহ)-কে দাফন করার পর তাঁর কবর থেকে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। তখন দূর-দূরান্ত থেকে কবরের মাটি নেয়ার জন্যে লোকজন আসতে থাকে এবং মাটি নিতে থাকে। এতে কবরের মাটি শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন কবরের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কোনোভাবে নিবৃত করতে না পেরে কাঁটা দিয়ে ঘিরে তাঁর কবর রক্ষা করা হয়। অবশেষে জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি মানুষের আকীদা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকায় সে সুঘ্রাণ বন্ধ হওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করেন। তারপর তা বন্ধ হয়ে যায়।[৪৯]

نَوَّرَ اللّٰهُ مَرْقَدَهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ

"আল্লাহ্ তাঁর কবরকে আলোকিত করুন এবং জান্নাতকে তাঁর ঠিকানা করুন।"

ইন্তিকাল পরবর্তী ঘটনা ও বুযুর্গানে দ্বীনের কতিপয় স্বপ্ন

আবদুল ওয়াহেদ ইব্ন আদম (রহ) নামক এক বিশিষ্ট বুযুর্গ বর্ণনা করেছেন যে, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি স্বীয় সাহাবীগণের এক জামা'আত নিয়ে এক স্থানে দাঁড়ানো অবস্থায় অপেক্ষা করছেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম করে বিনীতভাবে আরয করলাম–হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কার অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন–আমরা মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারীর জন্যে অপেক্ষা করছি। আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন আদম (রহ) বলেছেন–এর কিছুদিন পরেই আমি যখন শুনতে পেলাম যে, ইমাম বুখারী (রহ) ইন্তিকাল করেছেন, তখন আমি হিসাব করে দেখলাম, আমি যে সময় স্বপ্নে দেখেছিলাম ঠিক সে সময়ই ইমাম বুখারী (রহ)-এর পবিত্র আত্মা ইহকাল ত্যাগ করে পরকালে অতিথি হওয়ার পর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে নিয়ে এই অতিথির অভ্যর্থনা জানান।

হাদীস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন– যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে সে প্রকৃত পক্ষে আমাকেই দেখে থাকে। কেননা, শয়তান কখনও আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস নজম ইব্ন ফুযাইল বর্ণনা করেছেন–আমি স্বপ্নে দেখলাম রাসূল (সা) স্বীয় রাওযা মুবারক থেকে বের হয়ে আস্ছেন এবং ইমাম বুখারী (রহ) তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে স্থানে পা রেখে হাঁটছেন ইমাম বুখারী (রহ) তাঁর পেছনে ঠিক্ ঠিক সে স্থানে পা রেখে হাঁটছেন।

ইমাম বুখারী (রহ)-এর বিশিষ্ট ছাত্র বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বপ্নে দেখলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম–মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈলের কাছে যাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন–তাঁকে আমার সালাম বলিও।

---

৪৮ মুহাম্মদ আবূ যাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৪৯. আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল -জুন ২০০৩

অর্থব্যবস্থায় সুদের নেতিবাচক প্রভাব

মুহাম্মদ ছাইদুল হক*

ভূমিকা : ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনে যে সব বিষয় একান্ত প্রয়োজনীয় তন্মধ্যে অর্থব্যবস্থা অপরিহার্য-অবিচ্ছেদ্য। কুরআন মাজীদে নামাযের বিষয় উল্লেখ করার সাথে সাথে যাকাতের কথা উল্লেখ করে মূলত ঐ দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে প্রচলিত অর্থব্যবস্থাকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। এর প্রথমটি হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা, দ্বিতীয়টি সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থা। প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থব্যবস্থা মূলত সূদভিত্তিক আর তৃতীয়টি হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ একটি কল্যাণকর অর্থব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় সুদের স্থান নেই, এ ব্যবস্থায় সুদ হারাম-এটাই ইসলামী অর্থব্যবস্থা সূদের কুপ্রভাব ও কালো থাবায় বিশ্ব অর্থনীতি আজ ক্ষতবিক্ষত এবং মুসলিম মনীষীগণ অর্থব্যবস্থায় সূদের প্রয়োগকে অভিশাপরূপে চিহ্নিত করেছেন। অর্থব্যবস্থায় সূদের বিপর্যয়কর অবস্থা এবং এর শোষণ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য উপস্থাপন করাই আলোচ্য প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

রিবা (সূদ)-এর আভিধানিক অর্থ

কুরআন ও হাদীসে সুদের প্রতিশব্দ হিসেবে 'রিবা' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কুরআন মাজীদে 'রিবা' শব্দটি দু'টি লিখন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং উভয় রূপই শুদ্ধ।[১] লেখ্যরূপ দু'টি হচ্ছে : (ক) "ربوا" (২:২৭৫) এবং (খ) "ربا" (৩০:৩৯)। এর আরবী, বাংলা, উর্দূ, ফারসী প্রতিশব্দ হচ্ছে সূদ এবং এটাই ইসলামী আইনের পরিভাষা হিসেবে গৃহীত। 'রিবা' শব্দের অভিধানিক অর্থ পরিবৃদ্ধি, মূল থেকে বেড়ে যাওয়া, বাড়তি, বিকাশ ইত্যাদি। কেননা কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِنْ رِّبًا لِّيَرْبُوْا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ

'মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যা সুদ দিয়ে থাক আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করেনা'।[২]

ربا فلان الرابية—অমুক টিলায় চড়লো, ربا فلان السويق—অমুক ছাতুর মধ্যে পানি ঢাললো এবং স্ফীত হয়ে উঠলো। এ থেকেই আরবী শব্দ 'রাবিয়া' (الرابية) এসেছে এবং এ থেকেই 'রাবওয়া' শব্দ এসেছে। এর অর্থ উঁচু ভূমি। যেমন আরবদের ভাষায়–

اربى فلان على فلان فى القول اوالفعل اذا زاد عليه

'অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির উপর প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে কথায় বা কাজে, যখন সে তার চেয়ে বেড়ে যায়'।[৩]

---

* প্রভাষক, স্কুল অভ্ এ্যাডিউকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।

১. ইমাম ফাখরুদ্দীন আর-রাযী আবূ আবদুল্লাহ, *তাফসীরুল কাবীর*, (৩য় সংস্করণ, বৈরূত), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫১

২. আল-কুরআন ৩০ : ৩৯

৩. আবূ বাক্‌র আহমাদ ইবনে আলী আর-রাযী আল-জাস্‌সাস : *আহকামুল কুরআন*, বাংলা অনু : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (ইফাবা., ১ম সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮), সূরা আল-বাকারার ২৭৫ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

হাসীসে আছে, "كل قرض جرنفعا فهو ربا" 'যে ঋণ কোন মুনাফাকে টেনে আনে তাই সূদ।'

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সূদে বর্ধিত অংশের বিকল্প থাকে না। যেমন একমণ ধানের বিনিময়ে দেড়মণ ধান গ্রহণ করা হলে অতিরিক্ত অর্ধমণ সুদ হিসেবে গণ্য হবে। অথবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এক মাসের জন্য এ শর্তে একশত টাকা ধার দিল যে, মেয়াদ শেষে সে ঋণদাতাকে একশত বিশ টাকা দিবে। এখানে অতিরিক্ত 'বিশ টাকা' সুদ হিসাবে গণ্য হবে।[৪]

কুরআন মাজীদে 'রিবা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে :

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ .

'আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন'।[৫]

فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا

'প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে, এভাবে আবর্জনা উপরে আসে'।[৬]

اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ

'যাতে এক দল অপর দল অপেক্ষা অধিক লাভবান হয়'।[৭]

فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

'যখন আমি তাতে পানি বর্ষণ করি তখন তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়'।[৮]

وَاٰوَيْنٰهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ

'আমি মরিয়ম ও ঈসাকে একটি উচুঁ স্থানে আশ্রয়দান করলাম'।[৯]

فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً

'তিনি তাদেরকে আরো শক্ত করে পাকড়াও করলেন'।[১০]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আসল অর্থের উপর যা কিছু বাড়তি হবে তা হবে রিবা (সুদ)। কিন্তু কুরআন মাজীদ ঢালাও ভাবে সর্বপ্রকার বৃদ্ধিকে হারাম করেনি। কুরআন মাজীদ একটি বিশেষ ধরনের বৃদ্ধিকে হারাম করেছে এবং এ বৃদ্ধিকে রিবা (সুদ) নামকরণ করেছে। জাহিলী যুগেও আরবী ভাষায় এ বিশেষ লেনদেনকে ঐ একই নামে অভিহিত করা হতো। তদানীন্তন যুগের লোকেরা 'রিবা'কে ব্যবসায়ের ন্যায় বৈধ মনে করতো যেমন একবিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় মনে করা হয়। ইসলাম জানিয়ে দিল, ব্যবসায়ের ফলে মূলধনে যে প্রবৃদ্ধি ঘটে তা সূদের মাধ্যমে বৃদ্ধি হওয়া থেকে পৃথক।[১১] এ পর্যায়ে বলা হয়েছে اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا —'আল্লাহ্ বেচাকেনাকে বৈধ এবং সুদকে অবৈধ করেছেন'।[১২]

৪. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ইফাবা. ১ম সংস্করণ, ১৪১৭/১৯৯৬), ২২ খ. পৃ. ৪৩৩
৫. আল-কুরআন ২ : ২৭৬
৬. আল-কুরআন ১৩ : ১৭
৭. আল-কুরআন ১৬ : ৯২
৮. আল-কুরআন ২২ : ৫
৯. আল-কুরআন ২৩ : ৫০
১০. আল-কুরআন ৬৯ : ১০
১১. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী : *সূদ*, (বাংলা অনু.) আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান (আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা ১৪১৫/১৯৯৪, "*সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*, পৃ. ৮৬
১২. আল-কুরআন ২ : ২৭৫

www.pathagar.com

রিবা-এর পরিভাষিক অর্থ :

'রিবা'র সংজ্ঞা প্রদান করতে যেয়ে বিভিন্ন মনীষী তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কয়েকজন বিখ্যাত মনীষী ও বিখ্যাত গ্রন্থের আলোকে 'রিবা'র সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

١. وهو فى الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض فى معاوضة مال بمال

'শরী'আতের পরিভাষায় মালের পরিবর্তে মালের লেনদেনকালে যে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে প্রদান করা হয় এবং যার কোন বিনিময় নেই তাকে 'রিবা' (সুদ) বলে।[১৩]

٢. الربا هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعى مشروط لاحد المتعاقدين فى المعاوضة.

'চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের যে কোন এক পক্ষ শর্ত অনুযায়ী লেনদেনে শরী'আতসম্মত বিনিময় ব্যতীত যে অতিরিক্ত মাল প্রদান করে তাকে রিবা (সুদ) বলে'।[১৪]

٣. كل زيادة مشروطة فى العقد خالية عن عوض مشروع

'শরী'আতসম্মত বিনিময় ছাড়াই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যে সব বর্ধিত মাল গ্রহণ করা হয় তাকে রিবা বলে'।[১৫]

٤. فهو زيادة احد البدلين المتجانسين من غيران يقابل هذه الزيادة عوض.

'একই প্রজাতির কোন বস্তুর পারস্পরিক লেনদেনের সময় কোন বিনিময় ব্যতীত এক পক্ষ কর্তৃক (অপর পক্ষ থেকে) যে অতিরিক্ত পরিমাণ মাল গ্রহণ করে সেই অতিরিক্ত অংশকে রিবা (সূদ) বলে'।[১৬]

সূদের শ্রেণী বিভাগ

সূদের একাধিক শ্রেণী বিভাগ থাকলেও প্রধানত সূদ দুই প্রকার—

ক. রিবা আন-নাসিয়া

খ. রিবা আল-ফাদ্‌ল

ক. রিবা আন-নাসিয়া বা মেয়াদী সূদ যা বর্তমান কালেও ইসলামী শরী'আ বিরোধী অর্থ ব্যবস্থায় সর্বাধিক প্রচলিত আছে এবং কুরআন মাজীদ সরাসরি তা নিষিদ্ধ করেছে। তাই এর অপর নাম 'রিবা আল-কুরআন'। জাহিলী যুগে উক্ত শ্রেণীটি সুদ রূপে পরিচিতি লাভ করায় এর অপর নাম 'রিবা আল-জাহিলীয়্যাও। ইমাম জাস্‌সাস (র) বলেন, 'ঋণ গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে অতিরিক্ত পরিমাণ মালসহ যে ঋণ ফেরত প্রদান করতে হয় তাকে 'রিবা আন-নাসিয়া' বলে'।

একটি হাদীসেও প্রায় অনুরূপ সংজ্ঞা বর্ণিত আছে। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যে কোন ঋণের সাথে মুনাফা যুক্ত হলেই বা যে ঋণ মুনাফা টানে তাই সুদ।'

ফাযালা ইবনে উবাইদ (রা) বলেন, যে কোন ঋণের সাথে মুনাফা যুক্ত হলেই তা এক ধরণের সুদ।[১৭]

---

১৩. *আলামগীরী* (৩য় সংস্করণ বৈরূত তা. বি.) কিতাবুল বুয়ূ, বাব-৯, ফাস্‌ল-৬, পৃ. ১১৭; বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী : *আল-হিদায়া* (কুতুবখানা রহীমিয়্যা, দেওবন্দ, ভারত, তা. বি.), কিতাবুল বুয়ূ, বাব-আররিবা, ৩৯, পৃ. ৬১ (টীকা নং ২)।

১৪. আল মুফতী মুহাম্মাদ আস-সায়্যিদ আমীমুল হইসান আল-মুজাদ্দিদী আল-বারকুতী : *কাওয়াইদুল ফিক্‌হ*, (আশরাফিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইউপি, ভারত ১৩৮১/১৯৯১), পৃ. ৩০২

১৫. ড. মুহাম্মদ রাওয়ান ও ড. হামিদ সাদিক : *মুজামু লুগাতিল ফুকাহা*, (করাচি, পাকিস্তান), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২১৮

১৬. আবদুর রহমান আল-জাযীরী : *কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, (বৈরূত সংস্করণ, তা. বি.), কিতাবু আহ্‌কামিল বায়, –মাবাহিছুর রিবা, ২য় খণ্ড., পৃ. ২৪৫

১৭. আবূ বাকর আহমাদ ইবনে হুসাইন আল-বাইহাকী : *আস-সুনানুল কুবরা:* (হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ১ম সংস্করণ, ১৩৪৪/১৯২৫), ৫খণ্ড, পৃ. ৩৫

www.pathagar.com

'মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, চুক্তির শর্ত মোতাবেক মেয়াদকালের বিপরীতে শরী'আতসম্মত বিনিময় ছাড়াই যে বর্ধিত মাল প্রদান করা হয় তাকে 'রিবা আন-নাসিয়া' বলে।

রিবা আন-নাসিয়ার উপরে যে সংজ্ঞা প্রদান করা হলো তার আলোকে ঋণের পরিবর্তে চুক্তিমত যে বর্ধিত অর্থ প্রদান করা হয় তাই সূদ হিসাবে গণ্য, তার পরিমাণ কম-বেশী যাই হোক। 'তোমারা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়োনা' (৩ : ১৩০) আয়াতের আলোকে একদল লোক বলতে চায় যে, আল্লাহ তা'আলা কেবল চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেতে নিষেধ করেছেন। অতএব চক্রবৃদ্ধি হারে না হলে তা বৈধ হবে। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং ইসলামী শরী'আ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। উপরিউক্ত আয়াতে মূলত সূদের মৌলিক ধারণা এবং একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, জাহিলী যুগে যার ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং বর্তমানে সূদী ব্যাংক ব্যবস্থায়ও প্রচলিত রয়েছে। অতএব 'চক্রবৃদ্ধি হার' সূদ হারাম হবার শর্ত নয় বরং অতিরিক্ত অর্থের ধারণা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয়টি ঠিক এরূপঃ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন; 'আমার আয়াতসমূহ স্বল্প মূল্যে বিক্রি করোনা' (২ : ৪১)। এখানে স্বল্প মূল্য শর্ত হিসেবে যোগ করা হয়নি বরং এ ধারণা প্রদানের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আয়াতের বিনিময়ে যে পরিমাণ মূল্যই গ্রহণ করা হোক তা স্বল্পই। অতএব উক্ত আয়াতের এরূপ অর্থ করা নিতান্তই ভুল যে, অধিক মূল্যে কুরআনের আয়াতসমূহ বিক্রয় করা যেতে পারে।

মূলধনের উপর বৃদ্ধিকে তা কম বেশী যাই হোক না কেন, যুলুম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত কাতাদা (র) কুরআনের ২ : ২৭৮-৭৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তির অপরের নিকট ঋণ পাওনা আছে কুরআন তাকে মূলধন ফিরিয়ে নেয়ার অনুমতি প্রদান করেছে, কিন্তু তার সামান্যতম অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অনুমতিও প্রদান করেনি।[১৮]

মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস হতেও উপরিউক্ত আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ইমাম ইবনে আবু হাতেম ও ইমাম শাফিঈ (র) নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'সাবধান ! জাহিলী যুগের প্রাপ্য সূদ তোমাদের হতে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হলো। অবশ্য তোমরা তোমাদের মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা অত্যাচারও করবেনা, অত্যাচারিতও হবে না। সর্বপ্রথম আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের প্রাপ্য সূদ সম্পূর্ণ রহিত ঘোষণা করা হলো'।[১৯] অনুরূপভাবে সাহাবীগণের অব্যাহত কার্যক্রম হতেও 'রিবা আন-নাসিয়ার' যে কোন পরিমাণ হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়। ঋণ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত যে কোন পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ প্রদানকে তারা সূদ গণ্য করেছেন।

এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-কে বলল, 'আমি এক ব্যক্তির নিকট হতে এই শর্তে পাঁচ শত দিরহাম ঋণ নিয়েছি যে, তাকে আমার ঘোড়াটি বাহন হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রদান করবো। ইবনে মাসঊদ (রা) বললেন, সে যতবার তা বাহন হিসেবে ব্যবহার করবে তা হবে সূদ'।[২০]

আবু বুরদা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, 'তুমি এমন এক এলাকায় বাস কর যেখানে সূদের প্রচলন রয়েছে। কাজেই কারো নিকট যদি তোমার ঋণের পাওনা থাকে এবং সে যদি তোমাকে ভূষি, বালি,পশু খাদ্য (অর্থাৎ তুচ্ছ জিনিসও) উপঢৌকন দিতে চায়, তবে তুমি তা গ্রহণ করোনা, কারণ তা সূদ'।[২১]

---

১৮. আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত তাবারী : তাফসীর জামিইল বায়ান, (মিসর সংস্করণ, তা. বি.), ৩য় খণ্ড পৃ. ৬৭

১৯. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর : *তাফসীর ইবনে কাসীর* (দারুল কলম, বৈরুত সংস্করণ, ১৪০০/১৯৮০), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১

২০. আবূ বাকর আহমাদ ইবনে হুসাইন আল-বাইহাকী : *আস-সুনানুল কুবরা* (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩৫১

২১. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী : *জামে আস-সহীহ*, (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী, ১৩৫৭/১৯৩৮)

www.pathagar.com

ঋণ যে উদ্দেশ্যেই আদান-প্রদান করা হোক তা উদ্বৃত্ত যুক্ত হলেই অতিরিক্ত অংশ সূদ হিসেবে গণ্য হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের যুগে যে কোন প্রকার ঋণের উপর উদ্বৃত্তকে সূদ বলা হতো, চাই ঋণ বা কোন সাধারণ আর্থিক ব্যয় নির্বাহের জন্যই নেয়া হোক অথবা কোন ব্যবসায়িক উৎপাদনী প্রয়োজনের জন্য নেয়া হোক।

হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, 'তিনি জনগণের আমানত এই শর্তে গ্রহণ করতেন যে, তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। তাতে মালিকের এই সুবিধা ছিল যে, তা ধ্বংস বা নষ্ট হলে সে তা ফেরত পাবে এবং তার এই সুবিধা ছিল যে, তা ব্যবসায় খাটিয়ে তিনি লাভবান হতে পারেন। অতএব তিনি শাহাদাত বরণকালে বাইশ লাখ দিরহাম রেখে যান যা ব্যবসায়ে লগ্নীকৃত ছিল'।[২২]

সাহাবীগণের যুগে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রচলিত এই ব্যবস্থা ব্যবসায়িক ঋণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপরিউক্ত বিবরণ হতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী (সা) ও সাহাবীগণের আমলেও ব্যবসায়িক ঋণের প্রচলন ছিল। অবশ্য সূদ হারাম ঘোষিত হবার পর সূদের আদান-প্রদান চিরতরে খতম হয়ে যায়।

বর্তমান শতকের ফকীহ্গণও 'রিবা আন-নাসিয়া' হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। ব্যাংক বিষয়ক মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের সহায়তায় ও পরামর্শে বিশ্বব্যাপী সূদ বিহীন এক কথায় ইসলামী শরী'আ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। ইতোমধ্যে তাঁরা বিভিন্ন মুসলিম দেশে এমনকি খ্রিস্টান অধ্যুষিত পাশ্চাত্যেও সূদ বিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান শরী'আ আইনের আওতায় পরিচালনার জন্য প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষজ্ঞ আলিমগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি করে শরী'আ বোর্ড রয়েছে। এ বোর্ড সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে যে, ব্যাংকের কোন লেনদেনই যেন সূদ যুক্ত হতে না পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা যায়, এখানে যে কটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোকে এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংক নিজ নিজ জমার বিপরীতে যে সূদ প্রদান করে থাকে তা স্বতন্ত্রভাবে হিসাব করে রাখা হয় যা অংশীদারদের শরী'আ আইন যে পন্থায় ও যে খাতে ব্যয়ের পরামর্শ দেয় সে ভাবে ব্যয় করা হয় । অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'রিবা আন-নাসিয়া' হারাম হবার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর বিশেষজ্ঞগণ একমত।

খ. রিবা আল-ফাদল

সূদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হল 'রিবা আল-ফাদ্ল'। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভিত্তিতে হারাম হওয়ায় একে 'রিবা আস-সুন্নাহ'ও বলা হয়। মূলত একই প্রজাতিভুক্ত বিশেষ কতিপয় জিনিসের পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত উদ্বৃত্তকে 'রিবা আল-ফাদ্ল' বলে। তবে সেই বিশেষ কতগুলো জিনিস কি কি তার পূর্ণাঙ্গ আইনগত সংখ্যা নির্ণয়ে ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ আছে। একই প্রজাতিভুক্ত দ্রব্য ও মুদ্রার লেনদেন করলে একপক্ষ চুক্তি মোতাবেক অপর পক্ষকে শরী'আত সম্মত বিনিময় ব্যতীত যে বর্ধিত মাল প্রদান করে তাকে 'রিবা আল-ফাদ্ল' (ঋণের সূদ) বলে।[২৩]

ফিক্হবিদগণের মধ্যে 'রিবা আল-ফাদ্ল' হারাম হওয়া সম্পর্কে মতভেদ নেই বরং একই শ্রেণীভুক্ত কোন্ কোন্ দ্রব্যের আন্তঃবিনিময় বা লেনদেন 'রিবা আল-ফাদলের আওতাভুক্ত হবে সে ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে। মহানবী (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে এই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, বার্লির বিনিময়ে বার্লি,

---

কিতাবুল মানাকিব, বাব-মানাকিব আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৮

২২. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী : *জামে আস-সহীহ* (প্রাগুক্ত), কিতাবুল জিহাদ, বাব-বারাকাতুল গাযী ফী মালিহি হাইয়ান ওয়া মায়্যিতান মাআন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উলাতিল আমর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১

২৩. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড : *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,* (ইফাবা. ঢাকা, ১৪১৭/১৯৯৬) ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ৪৪১

www.pathagar.com

খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবনের বিনিময়ে লবনের লেনদেন করা হলে সেক্ষেত্রে পরিমাণের সমতা রক্ষা করে নগদ লেনদেন হতে হবে, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত প্রদান বা গ্রহণ করবে সে সূদ অনুষ্ঠানকারী সাব্যস্ত হবে এবং দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে সমান (পাপী)।[২৪]

উপরিউক্ত হাদীসে মাত্র ছয়টি দ্রব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একই শ্রেণীভুক্ত জিনিসের পারস্পরিক লেনদেন নগদ এবং সমান সমান হতে হবে, হ্রাস-বৃদ্ধি করলে বা বাকিতে লেনদেন করলে তা সূদ হবে। হাদীসে এ কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, উক্ত বিধি-নিষেধ কি এই ছয়টি দ্রব্যের লেনদেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না অন্যান্য দ্রব্যও তার আওতাভুক্ত হবে। হযরত তাউস ও কাতাদা (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা 'রিবা আল-ফাদল'কে উক্ত ছয়টি দ্রব্যের লেনদেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করেন। চার ইমামের মতে 'রিবা আল-ফাদলে'র বিধান হাদীসে বর্ণিত ছয়টি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর পরিধি আরো ব্যাপক।[২৫]

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বলেন, রিবা আল-ফাদলের বিধান মূলত প্রতিরোধক প্রকৃতির। আরব ও অন্যান্য জাতির মধ্যেও একই জাতীয় দ্রব্যের পারস্পরিক লেনদেন কম-বেশী করার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এতে রিবা আন-নাসিয়ার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার আশংকা ছিল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তা প্রতিরোধের জন্য রিবা আল-ফাদলের নিষিদ্ধতার বিধান ঘোষণা করেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে আছে 'আমি তোমাদের ব্যাপারে সূদের আশংকা করি'।[২৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, 'লেনদেন বাকীতে হলে তখন রিবাযুক্ত হবে'।[২৭]

বর্তমানকালে পৃথিবীর সর্বত্র স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে কাগজী মুদ্রা প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের কাগজী মুদ্রার নাম টাকা। অতএব টাকার সাথে টাকার পারস্পরিক লেনদেন কম-বেশী করা হলে তা সূদের মধ্যে গণ্য হবে। আর বৈদেশিক মুদ্রার সাথে দেশী মুদ্রার নগদ লেনদেন সরকারী বা আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত হারে করা হলে তাতে সূদের যোগ ঘটবে না।

জাহিলী যুগে সুদ

জাহিলী যুগে যে সমস্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে 'রিবা' (সুদ) শব্দটির প্রয়োগ হাদীসে পরিলক্ষিত হয় তার নাতিদীর্ঘ আলোচনা করতে আমরা প্রয়াস পাব।

০১. হযরত কাতাদা (র) বলেন, জাহিলী যুগের সূদের স্বরূপ ছিল নিম্নরূপ : এক ব্যক্তি কারো কাছে কিছু বিক্রি করতো এবং মূল্য পরিশোধের জন্য সময় বেধে দিত। এ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি সে মূল্য পরিশোধ না করতো কিংবা পরিশোধে ব্যর্থ হতো, তবে তাকে আরো সময় ও মূল্য বাড়িয়ে দিত।[২৮]

০২. জাহিলী যুগে ঋণ গ্রহণ করার সময় ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হতো। তাতে বলা হতো, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসল মূলধন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশী অর্থ ঋণগ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হবে।[২৯]

০৩. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, জাহিলী যুগে রিবা(সূদ) ছিল নিম্নরূপ : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাকে বলতো, যদি তুমি আমাকে অমুক দিন থেকে অমুক দিন পর্যন্ত সময় দাও, তবে আমি তোমাকে এ পরিমাণ বেশী দিব'।[৩০]

---

২৪. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : *সহীহ মুসলিম*, (মাকতাবা রশীদিয়া দিল্লী, ১৩৫৭/১৯৩৮), কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুযারাআত, বাব-আর রিবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩

২৫. মুওয়াফফাকুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুদামা : *আল-মুগনী*, (কায়রো, ১ম সংস্করণ, অ. বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪

২৬. আল্লামা আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী ইবনে হুসামুদ্দীন আল-হিন্দী আল-বুরহানপুরী : *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল* (আলেপ্পো, ১ম সংস্করণ, ৯৭৫/১৫৬৭), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩১

২৭. ইবনে হাজার আল-আসকালানী : *ফাতহুল বারী*, (মিসর সংস্করণ, ১৩৪৮/১৯২৯), ৪র্থ, পৃ. ৩০৩

২৮. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী : *সূদ*, (বাংলা অনু.) *সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৮৭

২৯. ইমাম আবূ বাক্‌র আহমাদ ইবনে আলী আর-রাযী আল-জাস্‌সাস : *আহকামুল কুরআন*, (প্রাগুক্ত), ১ম খণ্ড, সূরা আল-বাকারার ২৭৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী : *ইসলামে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১

www.pathagar.com

০৪. ইমাম ইবনে জুরাইয (র) বলেন, জাহিলী যুগে বনু আমির বনু মুগিরাকে সূদের উপর টাকা ধার দিতো এবং সময় উত্তীর্ণ হলে বনু মুগীরা তাদের থেকে সূদ আদায় করতো। এরূপ গোত্র বিভিন্ন গোত্রের ধনিক শ্রেণীর সাথে সূদী কারবার করতো।[৩১]

০৫. জাহিলী যুগে লোকেদের মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ম প্রচলিত ছিল। তারা কাউকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ দিতো এবং তার নিকট থেকে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ আদায় করতো। মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ঋণগ্রহীতার নিকট আসল মূলধন চাওয়া হতো। যদি সে আদায় করতে না পারতো, তবে আরো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে অবকাশ দেয়া হতো এবং সূদও বাড়িয়ে দেয়া হতো।[৩২]

উপরিউক্ত প্রচলিত ব্যবসায়-বাণিজ্যকে আরববাসীরা নিজেদের ভাষায় 'রিবা' (সুদ) নাম দিয়েছিল। কুরআন মাজীদ একেই হারাম ঘোষণা করেছে।

অন্যান্য ধর্মে সূদ

প্রাচীনকালে থেকেই বিশ্বে প্রচারিত সকল ধর্মেই সূদের অপকারিতা তুলে ধরে একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বের প্রখ্যাত দার্শনিক ও গবেষকগণ যুগে যুগে সূদের অশুভ পরিণতির ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং সূদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। আধুনিক বিশ্বের ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ সূদকে মানবতার জন্য অভিশাপ রূপে চিহ্নিত করে তা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছেন। প্রখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল তাঁর '*পলিটিক্স*' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সূদকে কৃত্রিম মুনাফা আখ্যায়িত করে বলেছেন, অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা একটি জালিয়াতি ব্যবসা।

হযরত মূসা (আ)-এর মূল কিতাব যা আজ কোথাও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়না ; তবে বর্তমানে যে দুটি গ্রন্থকে হযরত মূসা (আ)-এর আনীত কিতাব বলে চালানো হচ্ছে, সে দু'টিতেও সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সূদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।[৩৩]

বাইবেলেও সুদকে স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে Lend hoping for nothing again.[৩৪]

এছাড়াও হিন্দু দার্শনিকবৃন্দ এবং ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণও সূদকে ঘৃণা করতেন।

খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ লর্ড কীন্স সূদের অশুভ পরিণতির ব্যাখ্যা করেছেন এবং সূদের হারকে শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার জন্য সরকারকে ভূমিকা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন।

ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সূদ সম্পর্কে সর্বশেষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে আল-কুরআন। আর তা হচ্ছে, আল-কুরআন সকল প্রকার সূদকেই হারাম করেছে।[৩৫]

আল-কুরআনের আলোকে সূদ

কুরআন মাজীদের যেসব আয়াতে হারাম শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে তান্মধ্যে সূদ হারাম সম্পর্কিত আয়াতটি অন্যতম। সূদ ও তার প্রাসংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে কুরআন মাজীদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১৫টি আয়াতের উল্লেখ পাওয়া যায়। আয়াতগুলো হচ্ছে : সূরা বাকারার সাতটি (৭) আয়াত—

---

৩১. আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত-তাবারী : *তাফসীর জামিইল বায়ান,* (মিসর সংস্করণ, তা. বি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২

৩২. ইমাম ফাখরুদ্দীন আর-রাযী আবূ আবদুল্লাহ : *তাফসীরুল কাবীর,* (প্রাগুক্ত), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫১

৩৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন ও শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : *ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন ?* (বাংলা অনু: ১৯৮৩) পৃ. ৮৬

৩৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন : *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা,* (জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি : দিলকুশা বা/এ, ঢাকা,১৯৯৬), পৃ. ৪৫

৩৫. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন ও শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : *ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন ?* (প্রাগুক্ত), পৃ. ৮৬

www.pathagar.com

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهٖ ..... وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ.

'যারা সূদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এতো এজন্য যে, তারা বলে : বেচাকেনা তো সূদের মতো, অথচ আল্লাহ্ বেচাকেনাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপারে আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই হবে দোযখী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে'। (সূরা বাকারা ২ : ২৭৫)

'আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না'। (সূরা বাকারা ২ : ২৭৬)

'যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে এবং যাকাত আদায় করে, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না'। সূরা বাকারা ২ : ২৭৭

'হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমারা মুমিন হও'। (সূরা বাকারা ২ : ২৭৮)

'যদি তোমারা না ছাড়ো তবে জেনে রাখ যে, এতো আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবেনা অথবা অত্যাচারিতও হবে না'। (সূরা বাকারা ২ : ২৭৯)

'যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে'। (সূরা বাকারা ২ : ২৮০)

'তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে, আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবেনা'। (সূরা বাকারা ২ : ২৮১)

সূরা ইমরানের দুই আয়াত :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْا الرِّبٰوٓا..... الْكَافِرِيْنَ

'হে মু'মিনগণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়োনা এবং আল্লাহ্কে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। এবং তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (সূরা আল ইমরান ৩ : ১৩০-৩১)

সূরা নিসার তিন আয়াত

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا ..... الاية

'ভালো ভালো যা ইয়াহূদীদের জন্য বৈধ ছিল তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি তাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহর পথে অন্যকে বাধা দেয়ার জন্য'। (সূরা নিসা ৪ : ১৬০)

'এবং তাদের সূদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি'। (সূরা নিসা ৪ : ১৬১)

'কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা ও মু'মিনগণ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও ঈমান আনে এবং যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে, তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব'। (সূরা নিসা : ১৬২)

www.pathagar.com

সূরা মায়িদার দুই আয়াত :

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ ..... يَصْنَعُوْنَ

'তাদের অনেককে তুমি দেখতে পাবে সীমালঙ্ঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর, তারা যা করে নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট। রব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণ কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? এরা যা করে নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট'। (সূরা মায়িদা ৫ : ৬২-৬৩)

সূরা রূমের এক আয়াত

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا ..... الْمُضْعِفُوْنَ

'মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সূদে যা দিয়ে থাক, আল্লাহ দৃষ্টিতে তা ধন সম্পদ বৃদ্ধি করেনা ; কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায় ; তারাই সমৃদ্ধশালী' (সূরা রূম ৩০ : ৩৯)

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত পনেরটি আয়াতের সাতটিতে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি 'রিবা' শব্দ উল্লেখ করে তার কুফল, তার সাথে সংশ্লিষ্টদের ভয়াবহ পরিণতি, আখিরাতে তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও কঠোর শাস্তির বিষয় বর্ণনা করেছেন। আয়াত সাতটি হচ্ছে :

সূরা বাকারা : ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮ ও ২৭৯	= ৪ আয়াত
সূরা আল ইমরান : ১৩০	= ১ আয়াত
সূরা নিসা : ১৬১	= ১ আয়াত
সূরা রূম : ৩৯	= ১ আয়াত
সর্বমোট	= ৭ আয়াত

আল-হাদীসের আলোকে সূদ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিপুল সংখ্যক হাদীস দ্বারা সূদের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত। সূদের অবৈধতা ও সূদের সাথে সংশ্লিষ্টদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হলো :

০১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সূদখোর, সূদদাতা, সূদের সাক্ষীদ্বয় ও সূদের (চুক্তি বা হিসাব) লেখককে অভিসম্পাত করেছেন।[৩৬]

০২. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অভিসম্পাত করেছেন সূদখোরকে, সূদদাতাকে, সূদের হিসাব রক্ষককে ও তার স্বাক্ষীদ্বয়কে এবং তিনি বলেছেন : এরা সকলেই সমান (অপরাধী)।[৩৭]

০৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে এক দিরহাম পরিমাণ সূদ গ্রহণ করলে তা ছত্রিশবার যিনা করার চেয়েও মারাত্মক (অপরাধ)।[৩৮]

০৪. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : সূদের গুনাহের সত্তরটি স্তর রয়েছে। এ সবের মধ্যে সর্বাধিক হালকা স্তর হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিজ মাকে বিবাহ করা।[৩৯]

---

৩৬. আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা : *আল-জামে আততিরমিযী*, (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী, তা. বি.), আবওয়াবুল বুয়ূ, বাব-মা জাআ ফি আকলির রিবা, পৃ. ২২৯

৩৭. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : *সহীহ মুসলিম*, (প্রাগুক্ত), কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুযারাআত, বাব—আর-রিবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭

৩৮. হাফেয নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবি বাক্‌র আল-হায়সামী : *মাজমাউয যাওয়ায়েদ ও মামবাউল ফাওয়ায়েদ*, (দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন, ১৪০৮/১৯৮৮), কিতাবুল বুয়ূ. বাব-মা জাআ ফির-রিবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৭

৩৯. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইযায়ীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনী : সুনানু ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুত তিজারাত, বাব—আত-তাগলীয ফির-রিবা (সূত্র *মাওসূআতুল হাদীসিশ শারীফ আল-কুতুবুস সিত্তা*, দারুস সালাম, রিয়াদ ৩য় সংস্করণ, ১৪২১/২০০০), পৃ. ২৬১৩

www.pathagar.com

০৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সূদের দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও পরিণামে অভাব-অনটন আসবেই।[৪০]

০৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মি'রাজের রাতে আমি এমন একদল লোকের নিকট পৌঁছলাম-যাদের পেট ঘরের ন্যায় বিশাল এবং তার ভেতরে রয়েছে অসংখ্য সাপ যা বাইর থেকে দেখা যায়। আমি বললাম হে জিব্‌রাঈল! এরা কারা ? তিনি বললেন, এরা সূদখোর।[৪১]

০৭. হযরত আবূ বুরদা ইবনে আবূ মুসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মদীনায় আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এমন এক এলাকায় বাস কর যেখানে সূদের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। অতএব কারো কাছে যদি তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর যদি তোমাকে এক বোঝা নয়, এক পোটলা যব বা ঘাসের একটি বোঝাও উপহার (হাদিয়া) দেয়, তবে তুমি তা গ্রহণ করো না। কারণ তা সূদ।[৪২]

০৮. হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে জনপদে ব্যভিচার ও সূদের ব্যাপক প্রসার ঘটবে সেখানে আল্লাহর শাস্তি (প্রেরণ) অনিবার্য হয়ে পড়ে।

০৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : চার ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনা এবং তারা জান্নাতের নিয়ামতের স্বাদও পাবে না। তারা হলো : (ক) মদখোর (খ) সূদখোর (গ) অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণকারী ও (ঘ) পিতামাতার অবাধ্য সন্তান।[৪৩]

সূদ কেবল ঋণ বা আর্থিক লেনদেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়-বণিজ্যে ও বস্তুসমূহের বিনিময়ের ক্ষেত্রেও সূদের সংযোগ ঘটতে পারে। কোন লেনদেনে সূদের ছোঁয়া থাকলে তা হবে হারাম ও বাতিলযোগ্য এবং উক্ত লেনদেন ইসলামী লেনদেনে গৃহীত হবে না। উল্লেখ্য যে, সূদের নিষিদ্ধতা ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কিত হাদীস ২৪ জন বিশিষ্ট সাহাবী হতে বর্ণিত।

সূদ নিষিদ্ধ হওয়ার সময়কাল

সূদ হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রধানত চারটি পর্যায়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

প্রথম স্তর

সূদ সম্পর্কে কুরআনে মাজীদের যে আয়াতটি প্রথম নাজিল হয় তা হচ্ছে সূরা রূমের ৩৯ নং আয়াত। এতে বলা হয়েছে, 'মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা সম্পাদ বৃদ্ধি করেনা। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায় ; তারাই সমৃদ্ধিশালী'। (৩০ : ৩৯)

এ আয়াতে সূদ নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়নি। এতে কেবল সূদের কুফল তুলে ধরা হয়েছে। সূদ যে প্রকৃতপক্ষে সম্পদ বৃদ্ধি করেনা—এ আয়াতে সেসত্য কথাটি জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সূরা রূম নাযিল হয়েছে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মহানবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মক্কী জিন্দেগীতে। এ সময় সামান্য ক'জন মুসলমান যারা ছিলেন তাদের পক্ষে দীনের কোন বিধান কায়েম করা ছিল সত্যিই স্বপ্নের মত। মানুষের মানসপটে যেন সূদের কুফল প্রোথিত হয় সে লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম সূদ সংক্রান্ত উক্ত-আয়াত অবতীর্ণ করেন।

---

৪০. (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৬১৩

৪১. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী : জামে আস-সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, বাব-মানাকিব আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, (প্রাগুক্ত), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৮

৪২. হাফেয নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবি বাক্‌র আল-হায়সামী : *মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়েদ,* (প্রাগুক্ত), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৮

৪৩. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী : *সূদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে ?* (মাহিন পাবঃ, ১৪১৯/১৯৯৮), পৃ. ৩১

www.pathagar.com

দ্বিতীয় স্তর

এরপর সূদ সম্পর্কে দ্বিতীয় যে আয়াত নাযিল হয় তা হচ্ছে সূরা আলে-ইমরানের ১৩০ নং আয়াত। এতে বলা হয়েছে : 'হে মুমিনগণ ! তোমরা ক্রমবর্ধমান সূদ খেয়োনা এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা আল-ইমরান ৩ : ১৩০)। এ আয়াতে কেবল মু'মিনগণকে চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খাওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এ জন্য তাদেরকে কল্যাণ লাভ করার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে সূদ সম্পদ বৃদ্ধি করেনা বলে জানানোর পর দ্বিতীয় এ আয়াতে সূদ রহিত হলে কল্যাণ সাধিত হবে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতটি মহানবী (সা)-এর মাদানী যিন্দেগীতে নাযিল হয়েছে। লক্ষণীয় যে, সূদ সংক্রান্ত প্রথম আয়াত নাযিলের প্রায় এগার বছর পর এ সংক্রান্ত দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয়েছে।

তৃতীয় স্তর

এভাবে সুদীর্ঘ বারো বছর প্রশিক্ষণ দানের পর সূদের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত সূরা বাকারার ২৭৫ আয়াত থেকে পর পর কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। সূরা বাকারার উক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে : যারা সূদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। —কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবেনা এবং অত্যাচারিতও হবে না।' (সূরা বাকারা ২ : ২৭৫-৭৯)

সূদ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে উল্লেখিত সর্বশেষ আয়াত ক'টি নাযিল হয়েছে মক্কা-বিজয়ের বছর সূদ সম্পর্কিত দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণের প্রায় আট বছর পর। ইতোমধ্যে ১৮/১৯ বছর কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ মজবুত হয়েছে এবং আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তি দানের পূর্ণ ক্ষমতাও মুসলমানদের অর্জিত হয়েছে । ঐ সময়ে আল্লাহ তা'আলা সূদকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও উচ্ছেদ করার বিধান সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সূদী কারবার একটি ফৌজদারী অপরাধে পরিণত হয়।[৪৪]

চতুর্থ স্তর

দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা) আরবদের বিশেষত তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সমুদয় সূদী কারবার লক্ষাধিক : সাহাবীগণের উপস্থিতিতে আরাফাতের মাঠে বাতিল ঘোষণা করেন।

'জাহিলী যুগের সূদ রহিত হলো আর আমাদের সূদসমূহের মধ্যে যে সূদ আমি প্রথম রহিত করলাম তা হলো আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সূদ'।[৪৫]

এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমগ্র আরব থেকে সূদী কারবার চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তা রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর হয়।

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রচলিত সূদ

কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি ও একদল পুঁজিপতির মতে বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রচলিত সূদ হারাম নয়; অথচ আধুনিক ব্যাংক ও অপরাপর সূদী প্রতিষ্ঠানে জাহিলী যুগে প্রচলিত সূদই প্রচলিত আছে। আর জাহিলী যুগে যে সূদ প্রচলিত ছিল কুরআন তাকে হারাম ঘোষণা করেছে যার কার্যকারিতা জগৎ বিলয় না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কাজেই একথা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রচলিত সূদ সম্পূর্ণ হারাম।[৪৬] বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, মুষ্টিমেয়

---

৪৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন : *সূদ, সমাজ, অর্থনীতি*, (ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা, ১৯৯২), পৃ. ৮৮-৯২

৪৫. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : *সহীহ মুসলিম*, (প্রাগুক্ত), কিতাবুল হজ্জ, বাব-হিজ্জাতুন নাবিয়্যি (সা) ১ম খণ্ড., পৃ. ৩৯৪।

৪৬. মাওঃ মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী : *সূদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে ?* (প্রাগুক্ত), পৃ. ১০২-১০৩

www.pathagar.com

কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী পুঁজিপতি ব্যাংকে গচ্ছিত শতশত কোটি টাকার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। তারা কেবল স্বদেশে নয়, সমগ্র বিশ্বে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর চরম স্বার্থপরতার সাথে প্রভুত্ব কায়েম করে। অতঃপর এ শক্তির জোরে তারা বিভিন্ন দেশ ও জাতির ভাগ্য নিয়ে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠে। তারা ইচ্ছে করলে কখনো কোন দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, দু'দেশের মধ্যে অহেতুক যুদ্ধ বাধায় আবার কখনো সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করে আবার কখনো অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে মানবতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। নিজেদের অর্থ লিপ্সার দৃষ্টিতে যে জিনিসকে তারা বাঞ্ছনীয় মনে করে তারই বিকাশ সাধন করে আবার যে জিনিসকে অবাঞ্ছনীয় মনে করে তা বিকশিত হওয়ার সকল পথ বন্ধ করে দেয়। তাদের কর্তৃত্ব যে কেবল অর্থব্যবস্থার উপরই সীমাবদ্ধ থাকে তা-ই নয় বরং সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মচর্চা কেন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় সংসদ সর্বত্রই কর্তৃত্ব থাকে অবারিত-একচ্ছত্র।[৪৭]

ব্যবসায় ও সূদের মধ্যে পার্থক্য

কুরআন মাজীদে যখন সূদের অবৈধতা সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন জাহিলী যুগের লোকেরা বলাবলি শুরু করে : 'ব্যবসা তো সূদের মতই' (সূরা বাকারা ২ : ২৭৫)। শুধু জাহিলী যুগেই নয় বর্তমান বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও একদল সূদখোর ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্যে সূদকে ব্যবসা বলেই আখ্যায়িত করতে চায় অথচ ব্যবসায় ও সূদ এক ও অভিন্ন জিনিস নয়। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ বেচাকেনাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন' (সূরা বাকারা ২ : ২৭৫)। নিম্নে ব্যবসায় ও সূদের মধ্যকার কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

১. ব্যবসা : ব্যবসা হালাল। সৎ ও নীতিবান ব্যবসায়ীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

সূদ : সূদ হারাম। সূদী লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য রয়েছে আল্লাহর কঠিন শাস্তি ও অভিশম্পাতের বজ্র নির্ঘোষ ঘোষণা।

২. ব্যবসা : ব্যবসায়িক লেনদেনে একপক্ষ দেয় পণ্য এবং অপর পক্ষ দেয় টাকা।

সূদ : সূদের ক্ষেত্রে মূলধনের অতিরিক্ত যে অর্থ গ্রহণ ও প্রদান করা হয় তার কোন বিনিময় থাকে না।

৩. ব্যবসা : ব্যবসায়িক লেনদেনে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। সূদ : সূদের ক্ষেত্রে ঋণদাতার লোকসানের ঝুঁকি থাকে না। ঋণদাতার লাভ নির্ধারিত ও নিশ্চিত। কিন্তু ঋণগ্রহীতা ঝুঁকি ও চিন্তামুক্ত নয়।

৪. ব্যবসা : ব্যবসায়ী তার বিক্রিত পণ্যের বিপরীতে যতই লাভ করুক তাকে কেবল একবারই অর্জন করতে পারে।

সূদ : সূদদাতা একাধিক বার সূদ আদায় করতে পারে। সময় অতিক্রান্ত হলেই ঋণগ্রহীতার উপর চক্রবৃদ্ধি হারে সূদের বোঝা জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসে।

৫. ব্যবসা : ব্যবসার সম্পর্ক পণ্যের সাথে।

সূদ : সূদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে।

৬. ব্যবসা : ব্যবসার বুনিয়াদ পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

সূদ : সূদের বুনিয়াদ হচ্ছে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার উপর স্থাপিত। সূদের বেলায় ঋণ গ্রহীতার কল্যাণ-অকল্যাণ, সচ্ছল-অসচ্ছল দিকটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়।

---

৪৭ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন : *সূদ সমাজ অর্থনীতি* (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৪

www.pathagar.com

৭. ব্যবসা : ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসায় অর্থ, শ্রম, চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা, সময় ইত্যাদি ব্যয় করতে হয়।
সুদ : সূদী কারবারের ঋণদাতাকে শ্রেম, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি কিছুই ব্যয় করতে হয়না। বরং সুদ হচ্ছে সময়ের পরিবর্তনের ফল।[৪৮]

সূদ ও মুনাফা : ভ্রান্তি মোচন

সুদ ও মুনাফা সম্পর্কে আমাদের সমাজে বিশেষত প্রচলিত সূদী অর্থনীতিতে অভিজ্ঞ এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ মহল বিভ্রান্তির শিকার। তাদের বিভ্রান্তির ফলে সাধারণ মানুষের কাছেও সূদ ও মুনাফার ভিন্নতার বিষয়টি পরিষ্কার নয়। কাজেই এ বিষয় সম্পর্কে ক্ষুদ্র পরিসরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা অপরিহার্য মনে করি।

আমাদের দেশের কোনো কোনো সূদী ঋণদান প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংকও সূদকে মুনাফা বলে প্রচার করে থাকে। তাদের প্রচারপত্র ও বিজ্ঞাপনে সাধারণত এ ধরণের কথা লেখা হয়। 'বার্ষিক মুনাফার হার ২০ ভাগ'। এ থেকে বোঝা যায় যে, হয় তা জনগণের অজ্ঞতার সুযোগে তাদের আকৃষ্ট করার জন্যই সূদকে মুনাফা বলে প্রচার করে থাকে, অন্যথায় তারা সূদ ও মুনাফার পার্থক্যই জানেনা। অবস্থা যাই হোক, জাহিলী যুগের ধারণা এবং আধুনিক যুগের এক শ্রেণীর লোকের কথার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অথচ আল্লাহ সূদকে করেছেন হারাম এবং মুনাফাকে করেছেন হালাল। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল এবং সূদকে করেছেন হারাম' (সূরা বাকারা ২ : ২৭৫)। সুতরাং সূদ ও মুনাফার পার্থক্য জানা শুধু প্রয়োজনই নয় অপরিহার্যও বটে।

ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা অনুযায়ী সূদ ও মুনাফা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটি বস্তু, এমনকি পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায়ও সূদ ও মুনাফা ভিন্নতর দু'টি পরিভাষা। সূদ, ঋণ ও তার সময়ের সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু মুনাফা ব্যবসায়-বাণিজ্য হতে উদ্ভূত। সূদ লোকসানের ঝুঁকিমুক্ত কিন্তু মুনাফার ক্ষেত্রে লোকসানের ঝুঁকি বিদ্যমান। সূদের পরিমাণ পূর্ব নির্ধারিত কিন্তু মুনাফার পরিমাণ অজ্ঞাত ও অনির্ধারিত। তাই সূদ একটি নিশ্চিত আয় কিন্তু মুনাফা অনিশ্চিত আয়। সূদের ক্ষেত্রে নগদ অর্থপণ্যে রূপান্তরিত হয় না কিন্তু মুনাফা অর্জন করতে হলে নগদ অর্থে পণ্য ক্রয়ের পর তা বিক্রয়ের মাধ্যমে পুনরায় নগদ অর্থে রূপান্তর না করা পর্যন্ত মুনাফা অর্জিত হয় না।[৪৯]

সূদী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী

ইসলামের মৌলনীতি হচ্ছে, নিজে অন্যায় করা যাবে না এবং অপরকে অন্যায় কাজে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোনভাবে সাহায্যও করা যাবে না। সূদ যেহেতু হারাম কাজেই এ হারাম কাজে সহযোগিতাকারী কোন প্রতিষ্ঠানে যেমন টাকা গচ্ছিত রাখা যাবেনা তদ্রূপ এ হারাম কাজে সহায়তাকারী কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করাও জায়িয নয়। কেননা হাদীসে আছে : রাসূলুল্লাহ (সা) অভিসম্পাত করেছেন সূদখোর, সূদদাতা, সূদের স্বাক্ষীদ্বয় ও সূদের চুক্তি লেখককে এবং বলেছেন, তারা সমান অপরাধী'।[৫০]

তবে যদি কোন মুসলমান পরিস্থিতির শিকার হয়ে সূদী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে বাধ্য হয় এবং এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকে যে, সূদবিহীন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পেলে সে সূদী প্রতিষ্ঠানের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে উক্ত সূদমুক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নেবে, এ ক্ষেত্রে অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য সূদী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা তার জন্য হারাম হবে না।[৫১] ঐ বিষয়ে কুরআন মাজীদের ঘোষণা ও সুস্পষ্ট ইরশাদ হয়েছে :

---

৪৮. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী : *সূদ*, (বাংলা অনু.) আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৮৭-৮৯

৪৯. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী বিশ্বকোষ*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৪৩৮-৪৩৯)

৫০. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : *সহীহ মুসলিম*, (প্রাগুক্ত), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭

৫১. মাওঃ মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী : *সূদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে?* (প্রাগুক্ত), পৃ. ১০৬

www.pathagar.com

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

"তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে নিরূপায় হলে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আন'আম ৬ : ১৪৫)

প্রয়োজনে সূদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ

মহানবী (সা) ঋণগ্রহণ করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন এবং ঋণের দায় মুক্তি থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাইতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন, তবে একান্ত প্রয়োজনে ঋণ করার বিষয়টি তিনি উপেক্ষা করেননি। সেক্ষেত্রেও তিনি বলে দিয়েছেন এ দু'আ পড়তে : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও এবং আমাকে দরিদ্রতা থেকে স্বাবলম্বী করে দাও'।[৫২] তিনি আরো বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমি কুফরী ও ঋণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই'।[৫৩]

মহানবী (সা) দুঃস্থ অভাবী লোকদের ঋণ না করার উপদেশ দিয়ে যেমন তাদের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন অপরদিকে ধনীদেরকে করযে হাসানা (উত্তম ঋণ) দিতেও অনুপ্রাণিত করেছেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ ত'আলা বলেছেন :

مَنْ ذَالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا الاية

'কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার'।[৫৪]

অন্যত্র আছে :

اِنْ تُقْرِضُوْا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণদান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন'।[৫৫]

সংগত কারণেই এ প্রশ্ন জাগে যে, কোন ব্যক্তির যদি একান্ত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করতেই হয় এবং 'করযে হাসানা' পাওয়া না যায়, তবে এক্ষেত্রে করণীয় কি হবে—এ বিষয়ে আলিমগণ অভিমত দিয়েছেন। তাঁদের অভিমত নিম্নরূপ :

'কারো যদি মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে অর্থ ঋণের তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সাধ্যমত চেষ্টা করেও যদি সে কারো নিকট থেকে করযে হাসানা বা কোনরূপ সাহায্য সহযোগিতা না পায় এবং সূদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর না থাকে, এমতাবস্থায় বাঁচার তাগিদে যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু সূদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করতে পারে। তবে এও তাকওয়া পরিপন্থী কাজ সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে সূদখোর গুনাহগার হবে।[৫৬]

উপরিক্ত আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, বাড়ি, গাড়ি, কলকারখানা, বিলাসী সামগ্রী ইত্যাদি ক্রয়ের লক্ষ্যে সূদ ভিত্তিক লোন গ্রহণের কোন সুযোগ ইসলামে নেই। আর এ ক্ষেত্রে সূদী লোন না নেয়াই ঈমানের দাবি। কেননা সূদের লেনদেন আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর বলা হয়েছে।

---

৫২. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা : *আল-জামে আত-তিরমিযী*, (প্রাগুক্ত), আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাব-১৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭

৫৩. আবূ আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ী : *সুনানু নাসায়ী* মাকতাবা রহীমিয়্যা, নয়াদিল্লী, তা. বি.), কিতাবুল ইস্তিআযা, বাব–আল-ইস্তিআযা মিনাল ফাক্‌রি, ২খণ্ড, পৃ. ২৬৭

৫৪. আল-কুরআন ৫৭ : ১১

৫৫. আল-কুরআন ৬৪ : ১৭

৫৬. মাওঃ মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী : *সূদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে?* (প্রাগুক্ত), পৃ. ১০৩-১০৪

www.pathagar.com

সূদের মাধ্যমে প্রাপ্ত টাকা ব্যয়ের খাত

সূদের লেনদেন—এক কথায় সূদ গ্রহণ, প্রদান, সাক্ষ্যদান, লিখন কিংবা সূদের লেনদেনকারী কোন প্রতিষ্ঠানকে কোনরূপ সহযোগিতা করা জায়িয নয়।

আধুনিক অর্থব্যবস্থায় ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম। কাজেই কোন এলাকায় ইসলামী ব্যাংকের শাখা থাকা সত্ত্বেও সূদী ব্যাংকে (একাউন্ট করে) টাকা জমা রাখা জায়িয হবে না যদিও এ শর্তে টাকা জমা রাখা হয় যে, No Interest 'সূদ নেয়া হবে না', কারণ এতেও সূদী অর্থব্যবস্থাকে সহযোগিতা করা হয়। আর এরূপ পরোক্ষ সহযোগিতা করারও কোন সুযোগ আল-কুরআন মানুষকে দেয়নি। ইরশাদ হয়েছে : সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করোনা' (সূরা মায়িদা ৫ : ২)।

যদি একান্ত প্রয়োজনে অনন্যোপায় হয়ে সূদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখতেই হয়, সূদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ নিজের কিংবা পরিবারের কারো জন্য ব্যয় করা যাবে না। সওয়াবের নিয়ত ব্যতীত দুঃস্থদের মাঝে তা বিতরণ করা যাবে। এ ছাড়া জনহিতকর কাজেও খরচ করা যাবে কিন্তু সূদের টাকা মসজিদ মাদ্রাসায় দেয়া হবে না এটাই আলিমগণের সর্বসম্মত অভিমত।[৫৭]

যে ক্ষেত্রে ঋণের উদ্বৃত্ত সূদ গণ্য হয় না

ঋণগ্রহীতা চুক্তি বহির্ভূতভাবে ঋণ পরিশোধকালে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে যদি অতিরিক্ত কিছু দান করে তা সূদ হিসাবে গণ্য হবে না এবং ঋণদাতার জন্য আর্থিক লেনদেন অথবা পণ্যের লেনদেন উভয় ক্ষেত্রেই তা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ বৈধ। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার একটি উট ধার করেন। তিনি ধার পরিশোধকালে তার তুলনায় একটি উত্তম ও বড় উট প্রদান করেন এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে ধার পরিশোধে উত্তম'।[৫৮]

অতএব কোন ব্যক্তি কোন বস্তু ঋণ নিয়ে তা পরিশোধকালে স্বেচ্ছায় কিছু অতিরিক্ত প্রদান করলে তা প্রদান-গ্রহণ উভয়ই জায়িয হবে।

সূদের কুফল : মানবজাতির ইতিহাস পার্যালোচনা করে ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর গবেষণা করে দেখা গেছে যে, সূদে নানাবিধ কুফল ও অকল্যাণ নিহিত রয়েছে। সূদের সামাজিক, অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক, ওআন্তর্জাতিক কুফলরয়েছে। প্রতিটির উপর নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

সামাজিক কুফল : সূদের মাধ্যমে নির্ধারিত ও নিশ্চিত আয় প্রাপ্তির অদম্য লোভ মানুষের বিচার-বিবেচনা, আচার-আচরণ, আবেগ অনুভূতি এমনকি বিবেককে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে। যারা সূদখোর তাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে স্বার্থপরতা, লোভ ও কৃপণতা এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে যে, তারা সমাজের অপরাপর মানুষের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করতেও কুণ্ঠিত হয়না। ফলে সামাজিক শান্তির প্রাসাদে ধস নামে এবং মনুষ্য সমাজের পরিবর্তে একটি পাশবিক সমাজের সৃষ্টি হয়।

সূদের অপর নাম যুলুম : সূদী অর্থব্যবস্থায় ঋণ প্রদানের পূর্বেই সূদের হার নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এক্ষেত্রেই ঋণগ্রহীতার লাভ-ক্ষতির বিষয়টি আদৌ বিবেচনা করা হয় না। ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ খাটিয়ে বিপুল অর্থ লাভ করলেও সে ঋণদাতাকে পূর্ব নির্ধারিত সূদই পরিশোধ করে, এতে ঋণদাতাকে ঠকানো হয়। আবার ঋণের অর্থ খাটিয়ে ঋণগ্রহীতার বিপুল লোকসান হলে, এমনকি তাঁর পুঁজি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গেলেও তাকে পূর্ব নির্ধারিত হারে সূদ আদায় করতে হয়। এ পদ্ধতিকে অমানবিক যুলুম ছাড়া আর কী বা বলা যায়!

সূদের অর্থনৈতিক কুফল : সূদের অর্থনৈতিক কুফল সবচেয়ে ব্যাপক ও মারাত্মক। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ লক বলেছেন, 'উচ্চ হারে সূদ, ব্যবসাকে ধ্বংস করে দেয়। মুনাফার চেয়ে সূদ বেশী সুবিধাজনক হওয়ায় ব্যবসায়ীরা সূদ প্রাপ্তির লোভে ব্যবসা ছেড়ে সূদে অর্থ খাটায়।

---

৫৭ (প্রাগুক্ত), পৃ. ১০৬-১০৭

৫৮. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : *সহীহ মুসলিম*, (প্রাগুক্ত), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০

www.pathagar.com

দৃশ্যমান ও বড় ধরনের কতিপয় অর্থনৈতিক কুফল সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

সূদ বনাম অর্থনৈতিক শোষণ : একদল লোক সূদের সাহায্যে বিনা শ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায়, চাই ঋণগ্রহীতা তার লগ্নীতে লাভবান হোক কি ক্ষতিগ্রস্থ। অনেক সময় ঋণগ্রহীতাকে বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করেও সূদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এটা এক ধরণের অর্থনৈতিক শোষণ।

সূদ বিনিয়োগ কমিয়ে দেয় : অর্থনীতিবিদগণ সূদের হারের সাথে বিনিয়োগের বিপরীতধর্মী সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রমাণ করেছেন। লর্ড কীন্স তাঁর *'জেনারেল থিওরি অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এন্ড মানি'* গ্রন্থে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, সূদের হার বাড়লে বিনিয়োগ কমে যায় এবং সূদের হার কমলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে সূদের হার কমতে থাকলে মানুষ বেশী ঋণ নেয় এবং বিনিয়োগ বেড়ে যায়। এ কারণেই লর্ড কীন্স শূন্য সূদের হারকে পূর্ণ বিনিয়োগ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সূদের হার যাতে শূন্য হয় সেজন্য তিনি সরকারকে আইন প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নেরও পরামর্শ দিয়েছেন।

সূদ পুঁজিকে অলস রাখতে সাহায্য করে : সূদী অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হওয়ার এটি একটি কারণ। সূদখোর মনে করে যে, কোন নির্দিষ্ট সূদের হারে ঋণ দেয়া হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়া যাবেনা এবং ইতোমধ্যে সূদের হার বেড়ে গেলে সেই ঋণের উপর অতিরিক্ত সূদও পাওয়া যাবেনা। ফলে এ সময় তাদের ঠকতে হবে। এ কারণে তারা ভাবিষ্যতে সূদের হার বেড়ে গেলে সে সুযোগে অধিক সূদ প্রাপ্তির লোভে তাদের পুঁজির সিংহভাগ অলসভাবে ধরে রাখে। ফলে অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় পুঁজির তীব্র সংকট পরিলক্ষিত হয় এবং অর্থনীতিতে স্থবিরতা নেমে আসে।

সূদ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ হ্রাস করে : এমন কিছু ব্যবসায়-বাণিজ্য আছে যাতে বিপুল পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন হয় এবং অন্যান্য বিনিয়োগের তুলনায় এতে ঝুঁকিও থাকে অধিক। এসব ব্যবসায় অর্থ এককভাবে বিনিয়োগ করা অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে উঠে না। সংগত কারণেই সূদের উপর ঋণ নিতে হয়। তা ছাড়া শিল্প ও কলকারখানা থেকে উৎপন্ন দ্রব্য বাজারজাত করতে দুই চার বছর সময় লেগে যায়। এরই মধ্যে সূদের বোঝা মহীরূহ ধারণ করে যে, উৎপাদন লাভজনক হলেও তা পরিশোধ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজেই সূদ রহিত করা যদি সম্ভব হয় এবং গোটা অর্থব্যবস্থা লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তবে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায় বিনিয়োগের পথে সূদরূপী বাঁধা আর থাকবেনা।[৫৯]

সূদ সঞ্চয়কারীদের অকর্মণ্য বানায় ঃ সূদী অর্থনীতিতে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলে বিনা পরিশ্রম ও বিনা ঝুঁকিতে নিশ্চিত সূদ পাওয়া যায়। এ অবস্থা সঞ্চয়কারীদের অলস ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেয়।

সূদ উৎপাদন হ্রাস করে : সূদী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ কম হয় বলে উৎপাদনও হ্রাস পায়। সূদী কারবারে পুঁজির বরাদ্দ দক্ষতা পূর্ণ হয় না, সঞ্চয়কারীদের মধ্যে আলস্যভাব সৃষ্টি হয় এবং ঝুঁকিপূর্ণ দীর্ঘ মেয়াদী উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ হয় খুবই কম। এসব কারণে বিনিয়োগ যতটা হওয়ার কথা সূদী অর্থনীতিতে হয় তার চেয়ে অনেক কম এবং উৎপাদনও হয় কম।

সূদ ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করে : সূদী অর্থনীতিতে স্বাভাবিকভাবে দ্রব্য মূল্য বেড়ে যাওয়ায় ক্রেতাগণকে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। এছাড়া সূদ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করার ফলে ও পণ্য সামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এভাবে অধিক অর্থব্যয় করার ফলে ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়।

সূদ বেকারত্ব সৃষ্টি করে : সূদ কেবল বেকার সমস্যা সৃষ্টি করে না, বেকারত্ব বৃদ্ধিও করে। বলা যায়, বেকার সমস্যা সৃষ্টি সূদী অর্থনীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সূদ মুক্ত অর্থনীতিতে যে পরিমাণ

৫৯. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন : *সূদ, সমাজ, অর্থনীতি*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩২

www.pathagar.com

বিনিয়োগ হয় সূদী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ হয় তার চেয়ে অনেক কম। সুদী অর্থনীতিতে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সূদের হারের সমান হয়, বিনিয়োগ সেখানেই থমকে দাঁড়ায়।

সুদ মজুরী হ্রাস করে : সুদী অর্থনীতিতে শ্রমিকের মজুরী সর্বদাই পিছিয়ে থাকে। কারণ চাহিদার তুলনায় যোগানের আধিক্যের দরুন শ্রমের মূল্য অভাবিতভাবে কমে যায়। তাছাড়া সূদের বোঝা বহন করার পর উদ্যোক্তাদের পক্ষে মজুরী বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

সূদের হার মুদ্রানীতিকে বিকল করে দেয় : কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মুদ্রা সরবরাহের মাধ্যমে অর্থের মূল্য স্থিতিশীল রাখা, দ্রব্য মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনয়ন এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বহাল রাখার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি চালু করে থাকে। কিন্তু সূদ এই মুদ্রানীতির কার্যকারীতার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করার প্রয়াস পায় এবং বিধিবদ্ধ জমার হার বাড়িয়ে দেয় তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের সূদের হার বৃদ্ধি করে। ফলে দেশে বিনিযোগ হ্রাস পায় এবং দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে সূদের হারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়। ডঃ উমর চাপরা তাই লিখেছেন,—The Central bank Can either Control the rates of interest or the stock of money..... Exprience has indicated that it is impossible to regulate both in such a blanced manner that inflation is Checked without hurting investment.

সূদ বৈদেশিক ঋণ বাড়ায় : সূদ বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ায়। উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রায়শশিল্প ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণের জন্য বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ঐ সব ঋণ মেয়াদ শেষে সূদসহ পরিশোধযোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রায় দেখা যায়, ঐ সব ঋণ না নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা সম্ভব হয় আর না উপযুক্ত কাজে লাগিয়ে কাঙ্খিত উন্নতি লাভ করা যায়। ফলে ঋণ পরিশোধ তো দূরের কথা অনেক সময় শুধু সূদ পরিশোধ করতে যেয়েই নাভিশ্বাস উঠে। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে পূর্বের ঋণ পরিশোধ করার জন্য এ সব দেশ নতুন করে ঋণ গ্রহণ করে। এই নতুন ঋণ সূদে আসলে পূর্বের ঋণকে ছাড়িয়ে যায়। এতে বৈদেশিক ঋণ ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলে।

সূদের রাজনৈতিক কুফল : অনেক সময় সরকার ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে লাভজনক বিনোয়গ করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু অভিজ্ঞাতা থেকে দেখা গেছে, এক্ষেত্রে সরকারের অনুমান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সঠিক হয় না । বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ধার্যকৃত সূদের হারের চেয়ে বেশী হওয়া তো দূরের কথা, সূদের হারের সমানও হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে ঋণের আসল ও সূদ পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয় এবং সরকারকে নতুন ঋণ গ্রহণ করে তার দ্বারা পুরাতন ঋণের আসল ও সূদ পরিশোধ করতে হয়। এতে অর্থনৈতিক সমস্যার পাশাপাশি নানা ধরণের রাজনৈতিক জটিলতা ও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে।[৬০]

সূদের আন্তর্জাতিক কুফল ঃ সূদের আন্তর্জাতিক কুফল আরো মারাত্মক, আরো ভয়াবহ বিশেষত উন্নয়শীল দেশের জন্য। ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক ঋণ ও রাষ্ট্র কর্তৃক অভ্যন্তরীণভাবে গৃহীত সূদী ঋণের মধ্যে যেসব ক্ষতিকর উপাদান বিদ্যমান তার সবই বৈদেশিক ঋণের মধ্যে বিদ্যমান কিন্তু এই শেষোক্ত ঋণের মধ্যে ঐ গুলোর তুলনায় আরো ক্ষতিকর একটি উপাদান রয়েছে। কারণ স্বরূপ বলা যায়, ঋণদাতা দেশসমূহ তাদের পরামর্শ মুতাবিক ঋণগ্রহীতা দেশ বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ঋণগ্রহীতা-দেশে তাদের ঋণের সাথে নিজেস্ব বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে তাদের বেতন ভাতা বাবদ ঋণের সিংহভাগ হাতিয়ে নিয়ে যায়। আন্তর্জাতিক ঋণের কারণে জাতির আর্থিক মর্যাদা বিনষ্ট হয় এবং অনেকাংশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। ফলে বৈদেশিক ঋণ দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার পরিবর্তে স্বাধীনতা ও

৬০. (প্রাগুক্ত), পৃ. ৭০

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ উন্নয়নশীল দেশসমূহকে তার ক্রীড়নকে পরিণত করে তারপরও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে হয়। তবে ঋণদাতা উন্নত দেশসমূহ এ ব্যাপারে আরো উদার হতে পারেন এবং সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে পারেন এ উদ্দেশ্যে যে, ঋণ দেয়া হবে মানবতার খাতিরে, কোন হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নয়।[৬১]

সুদের নৈতিক কুফল : সুদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষতির সাথে সাথে তার নৈতিক ক্ষতিও রয়েছে অপরিসীম। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিই মানবতার মূল প্রাণশক্তি। মানবতার এই প্রাণশক্তির জন্য যে কোন বস্তুই অন্যদিক দিয়ে যতই লাভজনক হোক না কেন তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। সূদের মনস্তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থ সঞ্চয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হতে শুরু করে সুদী ব্যবসায়ের বিভিন্ন পর্যায় পর্যন্ত সমস্ত মানসিক কর্মকাণ্ড, স্বার্থন্ধতা, কার্পণ্য, সংকীর্ণমনতা, অর্থ পূজার-প্রভাবাধীনে পরিচালিত হয়। মানব চরিত্রের মহৎ গুণাবলী তথা দানশীলতা, মহানুভবতা, উদারতা, সহানুভূতি ও স্বার্থত্যাগের গুণকে সূদ প্রাপ্তির লোভ ধ্বংস করে দেয়। সূদখোর কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার পরিবর্তে বিপদ ও অসহায়ত্বের সুযোগে অধিক সূদ অর্জনের চেষ্টায় নীতি-নৈতিকতা হারিয়ে ফেলে। এসব কারণে ইসলাম সূদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআন মাজীদে সূদখোরকে 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত' 'বলে ঘোষণা করা হয়েছে (সূরা বাকারা ২ : ২৭৯)। মহনবী (সা) বলেছেন, সুদ এমন একটি ধ্বংসাত্মক পাপ যে, তা সত্তরটি ভাগে বিভক্ত করলে তার সর্বাধিক হালকা অংশটি হবে নিজ মাকে বিবাহ করার সমতুল্য (অপরাধ)'।[৬২]

সুদী সমাজে বেশী প্রাপ্তির আশায় বিনিয়োগকারীরা কেবল ঐ সব খাতে বিনিয়োগ করে যেখানে বেশী লাভের সম্ভাবনা আছে। উক্ত বিনিয়োগ দ্বারা সমাজের ভালো-মন্দ বিচার করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে মাদক দ্রব্য, জুয়া, অশ্লীল ও চরিত্র বিধ্বংসী ছায়াছবি, পর্ণো পত্রিকা, সিনেমা, নারী ব্যবসা ইত্যাদি নৈতিকতা বিধ্বংসী খাতে অর্থ বিনিয়োগ বেশী হয়। এর অনিবার্য পরিণতিতে সমাজে নৈতিক মূলবোধের প্রাসাদ সহসা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

সূদ হারাম হওয়ার কারণ : সূদ হারাম হওয়ার অনেক কারণ আছে। ইতোপূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি। সূদ কার্পণ্য, স্বার্থন্ধতা, নিষ্ঠুরতা, স্বেচ্ছাচারিতা,অলসতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অপচয়, বিদেশ-নির্ভরতা, শোষণ ইত্যাদি অসৎ গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের বিশাল প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়। পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার পথ রুদ্ধ করে দেয়, ধনের আবর্তনের গতি ঘুরিয়ে বিত্তহীনদের থেকে বিত্তবানদের দিকে ফিরিয়ে দেয়। এর ফলে সমগ্র দেশবাসীর ধন -সম্পদ সমাজের এক শ্রেণীর পুঁজিপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। অথচ কুরআন মাজীদে আছে :

كَيْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

'যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে'।[৬৩]

এর ফলে সমাজদেহে অর্থনৈতিক ক্ষত প্রকট হয়ে উঠে। সূদের এ সকল ক্ষতির প্রভাব অনস্বীকার্য। কাজেই ন্যূনতম সূদী কারবারও অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংস করে দেয়। এ কারণেই তো আল্লাহ বলেছেন : 'হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা না ছাড়, তবে জেনে রাখ, এতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ....(সূরা বাকারা ২ : ২৭৯)।

৬১. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী বিশ্বকোষ* (প্রাগুক্ত), ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪৪০

৬২. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী : *সুনানু ইবনে মাজাহ,* (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৬১৩

৬৩. আল-কুরআন ৫৯ : ৭

www.pathagar.com

সুদ থেকে তাওবা : সূদ হারাম হওয়ার পূর্বে যারা সূদী লেনদেনে জড়িত ছিল কিংবা সূদের মাধ্যমে অর্থ সম্পদ উপার্জন করেছিল তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ

'যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে'.....। (সূরা বাকারা ২ : ২৭৫)

উপরিউক্ত আয়াত থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তাওবা করে নিতে হবে। ইচ্ছে হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন অন্যথায় শাস্তি দিবেন। বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। সূদের বিধান সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও যদি কেউ সূদী লেনদেন বর্জন না করে বরং সূদী লেনদেনে পুনরায় জড়িয়ে পড়ে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ এ পর্যায়ে বলেছেন :

وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

'আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই দোযখী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে'। (সূরা বাকারা ২ : ২৭৫)

অতঃপর বলা হয়েছে :

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

'কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবেনা এবং অত্যাচারিতও হবে না'। (সূরা বাকারা ২ : ২৭৯)।[৬৪]

উপরিউক্ত আয়াতে মূলধন প্রাপ্তিকে তাওবার সাথে শর্তসাপেক্ষ বলা হয়েছে। হাদীসে আছে, 'আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দার তাওবায় অধিক আনন্দিত হন' (মুসলিম, বাংলা অনু. ৮ম খণ্ড, নং ৬৭০৫)। মোদ্দাকথা, তাওবা করলে ঋণদাতা তার মূলধন ফেরত পাবে, তবে কানাকড়ি সূদও গ্রহণ করতে পারবে না।

সুদ উচ্ছেদ—একটি প্রস্তাবনা : এ প্রশ্ন উঠা আদৌ অযৌক্তিক নয় যে, বাংলাদেশে দীর্ঘকাল থেকে সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে, কাজেই সূদ উচ্ছেদ করা যাবে কিভাবে এবং সূদের আভিশাপ থেকে জাতি কিভাবে রক্ষা পাবে এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থাই বা কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে, সে লক্ষ্যে কার্যকর প্রস্তাবনা আসা একান্ত প্রয়োজন। এ পর্যায়ে নিম্নে সূদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হল :

ক. ব্যাপকহারে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপন : এ কথা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত সূদী ব্যাংকের বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি শুধু সফলই প্রমাণিত হয়নি বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সূদী ব্যাংকের চেয়ে অধিকতর যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে ইসলামী ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। এ জন্যে আজ অমুসলিম দেশেও অমুসলিমদের পরিচালনায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ডেনমার্ক, ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লুক্সেমবার্গ। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রভূত সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। কাজেই বাংলাদেশে আরো ব্যাপক হারে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

খ. ইসলামী অর্থনীতিকে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তকরণ :

বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য এটা সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, বৃহত্তর শিক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের ঈমান-আকীদার উল্লেখযোগ্য কোন সংগতি নেই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রাথমিক ও

৬৪. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : *সহীহ মুসলিম*, (প্রাগুক্ত), কিতাবুত তাওবা, বাব-সুকুতুয যুনূব বিল-ইস্তিগফারি ওয়াত তাওবাতি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৫

www.pathagar.com

মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষার কথা বাদ দিলে উচ্চতর শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার কোনো পর্যায়েই ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তা জানার ও অনুশীলনের কোনো সুযোগ নেই। কাজেই দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকীদার সাথে সংগতিপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি সকল শিক্ষাক্রমে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তবেই কেবল ছাত্রজনতার মন-মগজে ইসলামী অর্থব্যবস্থার সুফল এবং সূদী অর্থব্যবস্থার কুফল ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হতে থাকবে।

গ. গণসচেতনতা সৃষ্টি : ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেও অর্থব্যবস্থাকে সূদ মুক্ত করার মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে পারে। ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করা প্রচলিত অর্থব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী একটি বিষয় হওয়ায় ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত হলেও তারা ধর্মভীরু নিঃসন্দেহে। কাজেই তাদের নিকট যদি সূদ ভিত্তিক অর্থনীতির ক্ষতিকর দিক বোধগম্য করে উপস্থাপন করা যায়, তবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন সময় সাপেক্ষ হতে পারে কিন্তু দুঃসাধ্য নয়। এ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে মসজিদের ইমামগণ জুমু'আর দিন বক্তৃতায় এবং বরেণ্য আলিমগণ তাফসীর, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে পারেন। তবে এজন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনারও বিকল্প নেই।

ঘ. করযে হাসানা : করযে হাসানা পদ্ধতি বিত্তহীন, দক্ষ, যোগ্য লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে। এ অপরিহার্য বিধানটি আমাদের এ দেশে অনুপস্থিত বললে অত্যুক্তি হবে না। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও শ্রীলংকাতে মসজিদ ভিত্তিক করযে হাসানা প্রদানের কিছু কিছু ব্যবস্থা চালু আছে। আমাদের দেশেও এ ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। এ পদ্ধতি কার্যকরকরণে মসজিদগুলো বিরাট অবদান রাখতে পারে এবং এতে বিপুল সওয়াবের বিষয় ও কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছে।

অপরাপর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা : উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও সূদ উচ্ছেদ করার আরো কতিপয় পদ্ধতি রয়েছে। তবে এগুলো কার্যকর করার বিষয়টি মূলত জনগণ নির্ভর। গুরুত্বপূর্ণ কয়েক ব্যবস্থা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

(ক) সূদখোরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। বিষয়টি প্রথমত কষ্টসাধ্য মনে হলেও সকলে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে এলে তা মোটেই দুঃসাধ্য নয়।

(খ) সূদখোরদের সামাজিকভাবে বয়কট। যারা সূদী কারবার করে, তাদের সাথে বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক স্থাপন না করা এবং তাদের জানাযা না পড়ানোও উত্তম প্রতিষেধক হতে পারে।

(গ) সূদখোরদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত না করা। তারা প্রার্থী হলে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলা যাতে কোনো ক্রমে তারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার নামে সূদের পক্ষে ওকালতি করার সুযোগ না পায়।

উপরে বর্ণিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কায়েম করা সম্ভব হলে এমন দিন বেশী দূরে নয় যে, অর্থব্যবস্থা ইসলামীকরণ শুধু প্রাতিষ্ঠানিকরূপই লাভ করবেনা বরং তা সার্বজনীন স্বীকৃতি অর্থব্যবস্থায় রূপ পরিগ্রহ করবে ইন্‌শাআল্লাহ।

সূদ উচ্ছেদে ইসলামী সরকারের ভূমিকা : প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন :

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاٰتَوا الزَّكَاةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

'আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে'.....।[৬৫]

৬৫. আল-কুরআন, ২২ : ৪১

www.pathagar.com

আর তাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মহানবী (সা) সূদের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সূদী কারবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে চিরদিনের জন্য তা সামাজ থেকে সমূলে উৎখাত করেন। নবম হিজরীতে নাজরানের খ্রিস্টানদের সত্তর সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধি দলের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করার পর যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে এও শর্ত ছিল যে, 'তোমরা সূদ গ্রহণ করবেনা। তিনি আরো বলেন, যদি তোমরা পুনরায় সূদী কারবার কর, তবে তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে।'

সুদের অবৈধতা সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবে সূদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। মক্কায় বানু সাকীফ ও বানু মাখযুমের সূদী কারবারে লিপ্ত থাকার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহানবী (সা) দূত প্রেরণপূর্বক সুদ নিষিদ্ধের বিধান জনগণের নিকট পৌঁছে দেন। দশম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি সূদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করেন এবং নিজ বংশ থেকে তা কার্যকর করার প্রক্রিয়াও শুরু করেন এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা অর্জন করেন।

উপসংহার : ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নি'আমত। ইহ-পারলৌকিক উভয় জগতের নির্ভুল পথনির্দেশ করার ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা অনন্য। 'অর্থব্যবস্থা' মানব জীবনের একটি মৌলিক বিষয় সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা গ্রহণীয় ও বর্জনীয় বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। কালের আবর্তে পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা মানব সমাজে শক্ত অবস্থান করে নিয়েছে। ফলে অর্থব্যবস্থা ইসলামীকরণে স্থবিরতা নেমে আসে। কিন্তু মুসলিম মনীষীগণ সূদী অর্থব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলে বিশ্ব মানবতাকে সূদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে আসেন। তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম-অমুসলিম দেশে অসংখ্য ইসলামী ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে এবং সফলতার দিক থেকে প্রচলিত সূদী ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা ইসলামী ব্যাংক-বীমা অনেক গুণ এগিয়ে যায় এবং বিশ্বাসীকে হতচকিত করে দেয়। পরিশেষে আমরা বলতে চাই, আল্লাহ বিশ্বের সবকিছু যেমন মানবতার কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন ঠিক তদ্রূপ কুরআনের প্রতিটি বিধান ও মানব কল্যাণে বিরাট অবদান রাখতে পারে। সুতরাং সূদী অর্থব্যবস্থার স্থলে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়েই কেবল মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধিত হতে পারে।

•

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল- জুন ২০০৩

সুলতানী আমলে বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা

(১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ)

ড. মোঃ ওসমান গনী*

আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে মুসলিমগণ তাদের প্রতিভার অনুকূলে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সে কাঠামোর অনুকরণে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের মত সুলতানী বাংলাতেও শিক্ষা বিস্তারে এক ব্যাপক আয়োজন পরিলক্ষিত হয়। সুলতান তথা শাসক ও সূফী-দরবেশদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং পৃষ্ঠপোষকতার ফলে শিক্ষার জাগরণ অনুভূত হয়েছিল এছাড়া জ্ঞান অর্জন ও সামাজিক সম্মান লাভের[১] উপায় হিসাবে শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। মুসলিমগণ তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা গ্রহণ ধর্মীয় কর্তব্য[২] বলে মনে করতেন।

মুসলমান ছেলে মেয়েরা মক্তবে শিক্ষা শুরু করত। এসব মক্তবের অধিকাংশ ছিল মসজিদ ভিত্তিক। প্রত্যেক শহরে বহু মসজিদ ছিল। এমনকি ক্ষুদ্র গ্রামে যেখানে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান ছিল সেখানেও অন্তত একটি মসজিদ পাওয়া যেত। প্রতিটি মসজিদেই মক্তব থাকত। মসজিদ ছাড়া শিয়া মুসলমানদের ইমামবাড়াগুলোতেও মক্তব পরিচালিত হত। অনেক স্থানে ধনী ব্যক্তিদের বাড়ী সংলগ্ন মক্তব চালু থাকত। কবি মুকুন্দরামের কাব্যে পাওয়া যায়, হিন্দু এলাকার ক্ষুদ্র মুসলমান পাড়াতেও মুসলমান ছেলে-মেয়েদের মক্তব ছিল। সেখানে ধর্মপ্রাণ মৌলবীগণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতেন।[৩] সেকালে গরীব শ্রেণীর পিতামাতার মনেও তাদের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষাদানের আকাংখা অত্যন্ত নিবিড় ছিল।[৪]

সুলতানী আমলের মক্তব মানের শিক্ষালয়গুলোকে বাংলাতে পাঠশালা নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। সহিত্যিক সূত্রে আমরা অবগত হই যে, তৎকালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার প্রচলন ছিল। বালকবালিকারা একত্রে একই বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করত। অবশ্য সেকালে নিয়মিত বালিকা বিদ্যালয়ও ছিল।[৫] সেখানে পৃথকভাবে লেখাপড়া করত।

---

* লেকচারার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজ।

১. আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, ঢাকা : ১৯৭৭, পৃ. ২৬৪

'ভাগ্যবন্ত পুরুষের বিদ্যা অলংকার,
বিদ্যা যে গলার হার বিদ্যা যে শৃঙ্গার।'

২. আলাওল, *তোহফা*, গোলাম সামদানী কোরায়শী সম্পাদিত, ঢাকা : ১৯৭৫, পৃ. ৪২৪৩

'উস্তাদ শিশুরে যদি বিসমিল্লা পড়াএ।
শিশু মাতাপিতা গুরু বেশেতে যাএ ॥
পড়িতে যাইতে যদি ধুলালাগে পাএ।
দোযখ হারাম তার করএ খোদাএ ॥

৩. মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী, *চন্ডিমঙ্গল*, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৫২, পৃ. ৩৩৪

৪. William Adam, *Report on the state of Education in Bengal,* (1835-1838), Calcutta 1941, p. 78-79.

৫. S M Jaffar, *Education in Muslim India*, Delhi : 1972, p.190.

www.pathagar.com

প্রাথমিক পর্যায়ে মক্তব বা পাঠশালাগুলোতে বালকবালিকাদের মৌলিক শিক্ষা প্রদানের প্রচলন ছিল। শিক্ষার্থীকে প্রথমেই শুদ্ধ উচ্চারণ, যতি বিন্যাস ও শ্বাসাঘাত বর্ণ শিক্ষা দেয়া হত। এগুলো শেখানোর পর শব্দ গঠন শিক্ষা চলত। অতঃপর ছোট বাক্য তৈরীর অনুশীলন হত। বাক্য গঠনের সাথে সাথে লিখবার অভ্যাস করানো হত। এ পর্যায়ে শিক্ষকগণ বর্ণমালা, যুক্তাক্ষর, একই অর্ধপদ শ্লোক বা দ্বিচরণ শ্লোক ও পূর্বপাঠের পুনরাবৃত্তি এই চারটি অনুশীলন দিতেন।[৬] ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষকগণ অংক শেখাতেন। ক্লাসের সকল ছাত্রকে যৌথভাবে 'পাহারা' বলে অভিহিত 'নামতা' মুখস্ত করানোর একটা সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল।[৭]

পাঁচ বছর বয়সে মুসলমান বালকবালিকাদের শিক্ষা জীবন শুরু হত।[৮] অনেকে বেশী বয়সে পড়তে যেত। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের বালকের সাধারণত পাঁচ কিংবা ছয় বছর বয়ঃক্রমকালে শিক্ষা জীবন শুরু করত।[৯] কিন্তু মুসলমানদের বিশেষত উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চার বছর চার মাস চারদিন বয়সে শিক্ষা শুরু করার প্রচলন ছিল।[১০] শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুদের এই আনুষ্ঠানিক প্রবেশ 'বিসমিল্লাহখানি' বা 'মক্তব উৎসব' নামে অভিহিত হত।[১১] একজন জ্যোতিষীর সাথে পরামর্শ করে একটি বিশেষ নির্ধারিত সময়ে শিক্ষকের নিকট শিশু তার প্রথম পাঠ গ্রহণ করত।[১২] শিক্ষক কুরআন শরীফ থেকে নির্দ্ধারিত একটি আয়াত[১৩] পাঠ করতেন এবং শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত।[১৪] এ উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হত। ভোজ-পায়েস-সিন্নি-গুড়-বাতাসা-মিষ্টি ও পানযোগে অভ্যাগতদের আপ্যায়নের চল ছিল।[১৫]

বালকদের মত বালিকাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আয়োজন হত। বালিকাদের মক্তবে যাওয়ার প্রাক্কালে একখানা রঙ্গীন কাগজে মেয়েদের আশীর্বাদ করে কিছু লেখা থাকত। যা 'জরফেশানী' নামে পরিচতি।[১৬] এ সময় মাতাপিতা অভিভাবকরা শিক্ষককে আপ্যায়ন ও উপঢৌকন দ্বারা ভূষিত করতেন।[১৭] এ জাতীয় অনুষ্ঠানে উপলক্ষে মক্তব অর্ধদিবস বন্ধ থাকত।[১৮]

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত UNESCO-এর Studies on compulsory education এ উল্লেখ করা হয়েছে যে মুসলিম শাসনকালে শিক্ষা ও ধর্মকে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিবেচনা করা হত।[১৯] বালক-বালিকা নির্বিশেষে প্রত্যেককে ইসলাম ধর্মের মূলনীতিসমূহ ছাড়া পৃথকভাবে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার রীতি অটুট

---

৬. Abul Fazl, *Ain-i-Akbri,* Vol. II, tr. Jarret and Sarkar, Calcutta 1948, p. 78-79

৭. ইউসুফ হোসেন, *মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতি,* ফারুক আহমদ অনূদিত, ঢাকা : ১৯৬৭, পৃ. ১০৫

৮. দোনাগাজী, *সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামান,* আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা : ১৯৭৫, পৃ. ৬৪
'পঞ্চম বরিখে শাস্ত্র পরিবারে দিল'।

৯. M A Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* Vol. II, Karachi 1967, p. 308.

১০. Jafar Sharif, *Islam in India or the Qanun-i-Islam,* tr. G A Harklots (Indian Reprint), New Delhi, 1972, p. 43.

১১. *তদেব*

১২. S M Jaffar, Op. cit., p. 152-153.

১৩. Quran, Sura, Xcvi, I.

১৪. উদ্ধৃত, Binod Kumar Sahay, *Education and learning Under the great Maghal,* Bombay, N. dp. 32, p

১৫. আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১৬. S M Jaffar, Op. cit., p. 190-191

১৭. *তদেব*

১৮. *তদেব*

১৯. উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আলমগীর, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি,* ঢাকা : ১৯৮৭, পৃ. ৯৪

www.pathagar.com

ছিল। মুসলমান ছেলে- মেয়েরা মক্তবে মৌলবীর নিকট যেত।[২০] সেখানে তাদের ওযু ও নামায পড়া শেখানো হত।[২১] এছাড়া শিশুকে কলেমা, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানদান করা হত।[২২]

মক্তব পর্যায়ের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে কুরআন মুখস্থ করানো হত। এগুলো হেফজখানা নামে পরিচিত ছিল। এখানে বালকেরা কুরআন শরীফ মুখস্থ করত।[২৩] মুখস্থ শেষে তারা 'হাফেজ' উপাধি পেত। শমসের গাজীর পুঁথিতে হাফেজের উল্লেখ মেলে।[২৪] তারা সুরেলা কণ্ঠে কুরআন শরীফ পড়ত। এছাড়া মক্তবগুলোতে 'মিযান', 'মুনসাইব', 'মাসাদির', ও 'মিফতাহুল লুগাত' পড়ানো হত।[২৫] আগ্রহী পিতামাতার ইচ্ছানুযায়ী অনেক সময় মোল্লাদের নিকট মসজিদে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দলভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিত।[২৬]

আরবী ছাড়া মক্তবগুলোতে ফার্সী এবং বাংলা শেখানো হত। সুলতানী আমলে ফার্সী ছিল রাজদরবারের ভাষা ও শিক্ষার বাহন। ফার্সী ভাষায় বুৎপত্তি লাভের জন্য সাদীর '*কারীমা*' ও আত্তারের '*পান্দনামা*' প্রভৃতি পাঠ্যভুক্ত ছিল।[২৭] চৈনিক দূতদের বর্ণনায় তৎকালীন বাংলায় ফার্সী ও বাংলা ভাষার উল্লেখ আছে।[২৮] শমসের গাজীর পুঁথিতে অনুরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৯] মক্তবগুলোতে আরবী, ফার্সী ও বাংলা ছাড়া গদ্য-পদ্য, ইতিহাস ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হত।[৩০] প্রাথমিক শিক্ষার একটি আবশ্যকীয় অংশ ছিল অংক শাস্ত্র। অংক শাস্ত্রের বিভিন্ন উপাদান যেমন- যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ শেখানো হত।[৩১] জমি মাপের সাথে সম্পর্ক যুক্ত কড়িকিয়া, গণ্ডাকিয়া, কাঠাকালি ও বিঘাকালি প্রভৃতি মক্তব বা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা দেওয়ার প্রচলন ছিল।[৩২] উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়া পদার্থ বিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ শিক্ষা দেওয়া হত।[৩৩]

সেকালে সুন্দর হস্তশিল্পের যথেষ্ট সমাদর ছিল।[৩৪] মসজিদ বা সৌধসমূহের উৎকীর্ণ লিপি দৃষ্টে তা অনুমান করা চলে। তখন ছাপাখানার বহুল প্রচলন ছিল না। ছাপাখানা অভাবে গ্রন্থাদি সাধারণত হাতেই লিখতে হত।[৩৫] এ কারণে লিখন শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। মক্তবসহ সকল স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা ছিল। মক্তবে মেয়েদেরকে রন্ধন, সেলাই, ভেলভেট জুতা ও তূণীর তৈরীর প্রশিক্ষণ দেয়া হত।[৩৬]

---

২০. মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪

২১. বিপ্রদাস পিপলাই, *মনসা বিজয়*, সুকুমার সেন সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৫৩, পৃ. ৬৭

২২. M. A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol. I, Karachi 1963, p. 153

২৩. M. L. Bhagi, *Mediaval Indian Culture and Thought*, Amballa Cantt 1965, p. 358

২৪. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গসাহিত্য পরিচয়*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা : ১৯১৪, পৃ. ১৮৫৪

২৫. M.L. Bhagi, Op. cit., p. 353 ; Binod Kumar Sahay, Op. cit., p. 10

২৬. উদ্ধৃত, M. L. Bhagi, Op, cit., p. 360

২৭. *তদেব*, পৃ. ৩৫৮

২৮. P C Bagchi 'Political Relations between Bengal and China in the Pathan period, 'Visva Bharati Annals, Vol. I, Calcutta 1945, p. 113.

২৯. দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫৪

৩০. M A Rahim, Op. cit., Vol.I, p. 193

৩১. *তদেব*, পৃ. ৩১০

৩২. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, কলিকাতা : পৃ. ১৩৪৬

৩৩. M A Rahim, Op. cit., Vol. 1, p. 310

৩৪. S M Jaffar, Op. cit., p. 12

৩৫. AKM Yaqub Ali, 'Education for Muslims Under the Bengal Sultanate, *Islamic Studies*, Vol, XXIV, NO. 4, Islamabad, 1985, p. 433

৩৬. ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

www.pathagar.com

মুসলমান নিয়ন্ত্রিত বাসগৃহ সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বা মক্তবগুলোতে হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কায়স্থ পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রায়শ মৌলবীদের নিকট মক্তবে শিক্ষা গ্রহণ করতে যেত। তাদের পাঠ্যতালিকায় সংস্কৃত অর্ন্তভুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ পান্ডিতেরা সেখানে শিক্ষা দান করত।[৩৭]

সুলতানী আমলে মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের শিক্ষাঙ্গন গুলোতে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। কারণ এ দুটো স্তরের পাঠ অনেক সময় একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং একই শিক্ষকের অধীনে পরিচালিত হত। সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মসজিদ ও পবিত্র স্থানসমূহে পরিচালিত হত।[৩৮] অনেক মসজিদে উচ্চস্তরের পাঠাদান চলত।[৩৯] মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় গীর্জার মত প্রায় সব মসজিদেই ধর্ম ভিত্তিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল।[৪০] ইমামবাড়া ও মাদরাসাগুলো মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে পাঠদান চলত। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, কিছু কিছু মসজিদ ও ইমামবাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান রূপে উনিশ শতক পর্যন্ত চালু ছিল।[৪১]

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে শায়খ ও উলামাদের খানকাহ ও কতিপয় উচ্চমান সম্পন্ন মাদরাসার উল্লেখ আছে। অনেক সময় প্রতিভাবান পন্ডিতগণ নিজগৃহে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষামূলক পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে জ্ঞান বিস্তারে মনোযোগী ছিলেন। সে যুগের প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এই যে, মাদরাসার ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় জ্ঞান ও লোকবিজ্ঞান উভয় বিষয়ের পর্যালোচনা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। ধর্মবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি পদার্থ বিদ্যা ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে সমান দক্ষ ছিলেন। ছাত্ররা সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত শিক্ষাকেন্দ্রে উভয় বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন।[৪২] আবদুল হামিদ লাহোরী ধর্মতত্ব, দর্শন, আইন ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী এবং মীর আলাউল মূলককে বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেন।[৪৩] সেকালে ইসলামী ধর্মতত্ব, দর্শন, আইন, গণিত শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, রসায়ন শাস্ত্র ও পদার্থ বিদ্যায় বিপুল জ্ঞানের অধিকারী অসংখ্য মনীষীর নাম পাওয়া যায়।[৪৪] যাঁদের নিষ্ঠা ও আগ্রহের ফলে জ্ঞানের প্রতিটি শাখা ফুলেফলে পল্লবিত হয়ে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছিল।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সুলতানী বাংলায় আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম চালু ছিল।[৪৫]

সে অনুসারে আলীম হতে হলে একজন ব্যক্তিকে তাফসীর (ভাষা বা টীকা), হাদীস (নবীর (সা) বাণী), ফিকাহ (ইসলামী আইন), উসুল-উল-ফিকাহ (ইসলামী আইনের নীতি), তাসাওউফ (অতীন্দ্রিয়বাদ), আদব (সাহিত্য), নাহও (ব্যাকরণ), কালাম (দার্শনিক রীতিনীতি), ও মানতিক (যুক্তি বিদ্যা) বিষয়ে পারদর্শীতা অর্জন করতে হত।[৪৬] সুতরাং বলা চলে যে, উপরোক্ত বিষয় সমূহ উচ্চস্তরে

---

৩৭. দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫৪

৩৮. AR Mallick, *Brithish Policy and the Muslim in Bengal*, Dhaka. 1961, p. 149 ; AKM Yaqub Ali, Op. cit., p. 422-23

৩৯. AKM Yaqub Ali, Ibid

৪০. S M Jaffar, Op. cit., p. 18

৪১. AR Mallick, Op. cit., p. 49

৪২. M A Rahim, Op. cit. Vol. II, p. 296-298

৪৩. তদেব, পৃ. ২৯৭

৪৪. এঁরা হলেন মৌলভী মুহম্মদ নাসির, জায়েন হোসেন খান, সৈয়দ মীর মুহম্মদ সাজ্জাদ, মুহম্মদ আলী, হাজী বদিউদ্দিন, হাকিম তাজউদ্দিন এবং হাকিম হাদী আলী খান, দ্র. M A Rahim, Op, cit. Vol. II, p. 297

৪৫. M A Rahim, Op. cit., Vol. I, p. 197; বাংলায় আগমনকারী অনেকেই বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্‌রাসার ছাত্র ছিলেন। এঁদের মধ্যে শায়খ জালালউদ্দিন তাবরিজী অন্যতম। তিনি ১২১৩ খ্রিস্টাব্দে লখনৌতিতে আগমন করেন। দ্র. শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ, *গৌড় কাহিনী*, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা : ১৮৮৬ শকাব্দ, পৃ. ৩৪৯

৪৬. K A Nizami, *Some Aspects of Religion and Politics in India During the Thirteenth Century,* Aligarh : 1961, p. 151.

www.pathagar.com

পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া মাদরাসাসমূহে ইলম-উশ-শরাহ্ (ইসলামী আইন), ও উলম-উদ-দ্বীন (ধর্ম বিদ্যা), শিক্ষা দেয়া হত। সে হিসাবে কুরআন, হাদীস, ধর্মতত্ব, আইনশাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়াদি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উচ্চস্তরে লোকায়ত সাধারণ বিজ্ঞান যেমন- যুক্তিবিদ্যা, জ্যামিতি, ব্যাকরণ ও ভূগোল বিদ্যা অধীত হত।[৪৭]

আবুল ফজল-এর *'আইন-ই-আকবরী'* গ্রন্থে উচ্চস্তরের পাঠ্যক্রমের কথা জানা যায়। তাতে নৈতিকতা, গণিত, গণিতের বিশেষ চিহ্ন সমূহ, কৃষি পরিমাপ শাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, চরিত্র নির্ণয় বিদ্যা, গার্হস্থ্য বিষয়াদি, সরকারী আইনকানুন, চিকিৎসা বিদ্যা, যুক্তি বিদ্যা, তাবিয়ী,[৪৮] রিয়াজী[৪৯] ইলাহী শাস্ত্র[৫০] এবং ইতিহাসের উল্লেখ মেলে।[৫১] এভাবে দেখা যায় যে, জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখা পাঠ্যভুক্ত ছিল। প্রাচীন *পূর্ববঙ্গ গীতিকাতে* অনুরূপ প্রমাণ মেলে। গ্রন্থটিতে চৌদ্দটি 'এলেমের' উল্লেখ আছে।[৫২]'

এ্যাডামের বর্ণনায় তৎকালীন বাংলার পাঠ্যক্রমের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের সপ্রশংসা বর্ণনা মেলে। সেখানে আরবী বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক ধরণের পাঠ্যতালিকার উল্লেখ আছে। এতে ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ ব্যাকরণ গ্রন্থ, ছন্দের পূর্ণ তালিকা, তর্কশাস্ত্র ও আইন, বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ সমূহের অধ্যয়ন এবং ইসলামের মূলনীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোন কোন বিদ্যায়তনে ইউক্লিডের জ্যামিতি ও টলেমীর জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী অনূদিত হয়ে প্রাকৃতিক দর্শন ও সাধারণ শাস্ত্রের উপর নিবন্ধ সমূহের সাথে একত্রে পঠিত হত।[৫৩]

প্রতিষ্ঠানের বাইরে গার্হস্থ্যরীতিতে বিদ্যার্থীরা গুরুগৃহে গিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করত। বৈঠকী আলোচনা, কবিয়াল, কথকতা ও রূপকথা ভিত্তিক অনুষ্ঠানের নারী পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার সুযোগ পেত। দুই ঈদ, জুম'আর খুত্‌রা সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খতিবদের বক্তৃতার দ্বারা অল্প শিক্ষিত ও নবদীক্ষিত মুসলমানেরা জ্ঞান লাভ করত।

সুলতানী বাংলায় তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি প্রায়োগিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এটি সে আমলের একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। গুরুগৃহে অথবা কারখানায় প্রায়োগিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে শিক্ষানবিশগণ দক্ষ কারিগর হয়ে উঠত। স্বনির্ভর অর্থনীতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় অনানুষ্ঠানিক কারিগরি প্রশিক্ষণ দানের এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর ছিল। সে সময় চারু ও কারু শিল্পের ব্যাপক চর্চা ছিল।

শিক্ষা বিস্তার সাধনে সুলতান-শাসকদের অসামান্য অবদান ছিল। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ইসলামী ভাবধারার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় সূফী-সাধকদের খানকাহ্‌গুলো জ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞান বিতরণে খানকাহ্‌গুলো খ্রিস্টীয় মঠের অনুরূপ ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্রমোচ্চ পর্যায়ের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করত। ফলে প্রাথমিক স্তর হতে উচ্চ স্তর পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিষয় অধীত হত।

উল্লেখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সুলতানী আমলে বাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। একদিকে সুলতান-শাসকদের আগ্রহাতিশয্যে প্রচুর সংখ্যক শিক্ষায়তন গড়ে উঠে, অন্যদিকে জনসাধারণ জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে নিজেরাই উৎসাহী হয়ে শিক্ষা বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে। ফলে সুলতানী বাংলায় আনুষ্ঠানিক-উপানুষ্ঠানিক পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিপ্লব সূচিত হয়। প্রচলিত দেশীয় সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা কাঠামোর পাশাপাশি ইসলামী ভাবধারাপ্রসূত ধর্মভিত্তিক অথচ সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। যা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

---

৪৭. M.L. Bhagi, Op. cit., p. 258
৪৮. শরীর বিদ্যা বিষয়ক
৪৯. সংখ্যা বিজ্ঞান, অংক, জ্যোতিষ শাস্ত্র, সঙ্গীত ও বলবিদ্যা।
৫০. ধর্ম বিদ্যা বিষয়ক।
৫১. ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
৫২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা,* ৩য় খণ্ড, কলিকাতা : ১৯৭১, পৃ. ১০৮
৫৩. উদ্ধৃত, AR Mallick Op, cit, P. 153.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল -জুন ২০০৩

শিক্ষার ইসলামীকরণে প্রজাতন্ত্রের দায়বদ্ধতা : বর্তমান প্রেক্ষাপট

মাহমুদ জামাল*

১.১ শিক্ষা কি ?

শিক্ষার ইসলামীকরণে প্রজাতন্ত্রের দায়বদ্ধতা নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভেই শিক্ষা কি কেন-সে সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত আলোকপাতের অবকাশ রয়েছে। বলাবাহুল্য শিক্ষার সংজ্ঞা নিয়ে মতান্তর কম নেই। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কিছু বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। প্রথমে দেখা দরকার শাব্দিকভাবে শিক্ষার অর্থ কি ?

বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ 'তালিম' যার মূল হল ইলম বা ইংরেজীতে Knowledge 'তালিম' অর্থ শিক্ষা গ্রহণ বা গ্রহণে সহায়তা করা।

শিক্ষা'র ইংরেজী প্রতিশব্দ *Education*-এর উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ *Educare, Educere* বা *Educatume* হতে। *Educare* অর্থ Rearing বা লালন-পালন করা, Educere অর্থ ভিতর থেকে বাইরে আনা, আর *Educatume* অর্থ প্রশিক্ষণ দান।

শিক্ষার উপরোক্ত আভিধানিক অর্থ থেকে এর সংজ্ঞা তেমন পরিষ্কার করে প্রকাশিত হয়নি। তাই আর একটু এগিয়ে দেখা যাক *World book of Encyclopaedia*-তে শিক্ষার সংজ্ঞা কিভাবে দেয়া হয়েছে—

"Education is the process by which people acquire knowledge, skills, habits, values or attitudes.[১]

"শিক্ষা এমন একটি পদ্ধতির নাম যার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান, দক্ষতা, অভ্যাস, মূল্যবোধ কিংবা আচরণ আয়ত্ত করে থাকে।

এতে পরবর্তী পর্যায়ে যা উল্লেখ করা হয় তাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য-প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ফুটে উঠে-

> *Education should help people become useful members of the society. It should also help them develop an appreciation of their cultural heritage and live more satisfactory lives. Education is continious process through which mental, physical and moral training is provided to new generation who also acquire their ideals and culture through it.*[২]

বিশ্ব মনীষীরা শিক্ষা নিয়ে কম ভাবেননি। এঁদের কেউ মনে করেছেন - নিজেকে জানার নামই শিক্ষা।[৩] কেউ মানুষের ভিতরের আসল মানুষটির পরিচর্যা করে তাকে খাঁটি করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার

---

* প্রাবন্ধিক, লেখক ও গবেষক।

১. *World Book of Encyclopaeda,* United States. Vol. 3, p.561

২ Ibid.

৩. সক্রেটিস মনে করতেন — Education is to know thyself.

www.pathagar.com

মধ্যে শিক্ষার সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছেন।[৪] আবার কেউবা খুদির উন্নয়নের মধ্যেই শিক্ষার বীজ রোপিত বলে ধারণা দিয়েছেন।[৫] পাশ্চাত্যের অন্যতম বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষা বলতে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকশিত মুক্ত মানবাত্মাকে মহান স্রষ্টার সাথে সমন্বিত করার চিরন্তর প্রক্রিয়া বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৬] তবে শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ধারণা ছিলো খুবই স্পষ্ট। তিনি মনে করতেন, 'শিক্ষাই মানুষকে মানুষ করে, শিক্ষা ছাড়া মানুষ মানুষ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। মহানবী (সা) ইরশাদ করেন, 'জ্ঞান অন্বেষণ করা সকল মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।'[৭]

এ অবস্থায় ওপরে উপস্থাপিত ধারণার আলোকে শিক্ষার যে সংজ্ঞা দাঁড়ায় সংক্ষেপে তা হল মানুষকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্ট জীব হিসেবে মনুষত্ব ও মানবিক মূল্যবোধে বিকশিত করে তোলার পাশাপাশি দুনিয়াদারী দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়ার লক্ষ্যে তৈরী করার জন্য পরিচালিত প্রয়াসের নামই শিক্ষা।

১.২ শিক্ষা কেন ?

শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমেই ঘটে থাকে একটি জাতির উৎকর্ষতা ও বিকাশ। এই উৎকর্ষতা ও বিকাশ মানবিক ও আত্মিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনার অবকাশ রাখে। আধুনিক মনীষীদের দৃষ্টিকে *Economic employment*-এর জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাঁরা আরো মনে করেন, *Education is a key to development.* আধুনিক এসব অর্থনীতিবিদ নিরক্ষরতাকে প্রগতির পথে মহাপ্রতিবন্ধকরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে দেশের জনসংখ্যায় নিরক্ষরতার প্রাবল্য উন্নয়ন কর্মে বিরাট বাঁধার সৃষ্টি করে।

Bowman and Anderson সাক্ষরতার হার এবং মাথাপিছু আয়ের মধ্যে অনুবন্ধ (Correlation) পরীক্ষা করে যা বলেছেন তার অর্থ হলো—

উচ্চ সাক্ষরতার হার (৯০% ও তদুর্ধ্ব) ও উচ্চ মাথাপিছু আয়ের (বার্ষিক পাঁচশ ডলারের উর্ধ্বে) মধ্যে, আর নিম্ন সাক্ষরতার হার (৩০% এর নীচে) ও নিম্ন মাথাপিছু আয়ের (বার্ষিক দু'শ ডলারের নীচে) মধ্যে উল্লেখযোগ্য উচ্চ অনুবন্ধ পাওয়া যায়।[৮]

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ Harbition মনে করেন—

নিরক্ষরতার গ্লানি থেকে চাষী মজুরদের মুক্তিদানকে একটি নিশ্চিত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এও সত্য যে, সাক্ষরতা ব্যতিরেকে কোন প্রকার কৃষিজীবিরা প্রগতিশীল হয়েছে এমন ঘটনা জগতে কোথাও ঘটেনি।[৯]

---

৪. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধারণা প্রদান করেন। শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বেশ সমৃদ্ধ। শিক্ষা, *রাশিয়ার চিঠি* প্রভৃতি প্রবন্ধগুলোতে তিনি শিক্ষার সার্বজনীন উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যা এবং তা সমাধানের উপায় ইত্যাদি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

৫. ইসলামী দার্শনিক ও বরেণ্য কবি আল্লামা ইকবাল মনে করতেন মানুষের 'খুদি' বা আত্মার উন্নয়ন যে ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব তাকেই শিক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

৬. পাশ্চাত্যের অন্যতম বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ prof. Heman H. Home তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থে লেখেন : *"Education is the eternal process of superior adjustment of the physical and mantaly developed free and conscious human being to God as manifested in the intellectuale motional and volitional environment of man".*

৭ আল হাদীস সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইলম।

৮. মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, *সাক্ষরতা ও সাক্ষরতা পদ্ধতি,* ঢাকা, ইউনিসেফ, বাংলাদেশ ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ৫-এর সূত্রে আবূ হামিদ লতিফ তাঁর *'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা'* গ্রন্থে এই মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। (প্রকাশক বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯০/ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, পৃ. ১০০)

৯. পূর্বোক্ত

www.pathagar.com

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কৃষিজ উন্নয়নের পিছনেও সাক্ষরতার গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই শিক্ষা অর্জন করতে হবে বা এটিই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এমন কথা ভাবা নিরেট বস্তুবাদিতার নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুগত বা বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনকে অস্বীকারের কোন উপায় নেই। কিন্তু শুধু সেই শিক্ষা যা কেবল মানুষের বাইরের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয় আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন বা আত্মার বিকাশের প্রয়াসকে গৌণ করে তোলে সেই শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত ও চিরস্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় না—এ সত্য বিশ্বে আজ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ যে আত্মা মানুষকে পরিচালিত করে তা যদি যথার্থ পথের দিশা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে যত মেধা-মস্তিষ্ক সম্পন্ন নিখুঁত পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যত লজিস্টিক সাপোর্টই দেয়া হোক না কেন তার দ্বারা সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষের যে বিকাশ তা হতে হবে অবশ্যই সুষম, অর্থাৎ তার দেহ আর আত্মা যেন শিক্ষায় সমন্বিতভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে সেদিকটি বিবেচনায় আনতে হবে। আর মানুষের এই সুসমন্বিত বিকাশের জন্য এমন একটি যুগোপযোগী ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন যার মাধ্যমে জাতি একই সাথে মানবিক ও আত্মিক উৎকর্ষতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। এ দিকটি সামনে রেখে জাতিকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন একটি সুসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ও উন্নয়ন। এর মাধ্যমেই সম্ভব জাতিকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার আসল প্রয়োজন এখানেই নিহিত।

১.৩ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের প্রথম কথাই হলো জ্ঞান অর্জন। মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে প্রথমে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে—

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

"আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন।"[১০]

মুফাস্‌সিরে কিরামের মতে আরবী 'আসমা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'নাম' হলেও এ ক্ষেত্রে 'বস্তুজগতের জ্ঞান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় 'আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে বস্তুজগতের জ্ঞান দান করলেন।'[১১]

এভাবে স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা প্রথম মানুষ ও নবী (আ)-কে সৃষ্টি করে তাকে যেমন জ্ঞান শিক্ষা দিলেন, তেমন পরবর্তী সকল নবী-রাসূলদেরকেও (আ) এই শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাঁদের ওপর রিসালাতের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। নবুওতের সর্বশেষ প্রান্তে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কালে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রেরিত প্রথম বাণীতেও শিক্ষার তাকীদ দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনে নাযিলকৃত প্রথম আয়াতেই মহান আল্লাহ বলেন—

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

"পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।"[১২]

মহান আল্লাহ তা'আলাই মানুষের জন্য জ্ঞানের ব্যবস্থা করেছেন। শুধু জ্ঞানই দেননি বরং যা মানুষ জানতো না তাই তাকে শিখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে—

---

১০. আল কুরআন, সূরা বাকারা : ৩১।
১১. আল কুরআনুল করীম (বাংলা অনুবাদসহ), প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।
১২. পূর্বোক্ত, সূরা আলাক, : ১

www.pathagar.com

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

"দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।"[১৩]

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলামের দৃষ্টিতে ফরয কাজের মধ্যে অন্যতম হলো জ্ঞান অর্জন ব শিক্ষালাভ। এ প্রসঙ্গে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ঘোষণা করেন—

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন ফরয।[১৪]

শিক্ষা লাভকে রাসূলে করীম (সা) নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। এমনকি শিক্ষা লাভের জন্য চী দেশে পর্যন্ত যাবার নির্দেশক একটি আরবী প্রবাদ এরকম— শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও।[১৫]

বদরের যুদ্ধে দশজন মুসলমানকে শিক্ষাদানের শর্তে বন্দী কাফিরদের মুক্তি দান করে মহানবী (সা শিক্ষার প্রতি ইসলামের গুরুত্ব ও ঔদার্যতার নিদর্শন স্থাপন করেছেন। এখানেই শেষ নয়, 'জ্ঞানী কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র', 'এক মুহূর্তের জ্ঞান সাধনা সারা রাতের ইবাদতের চে উত্তম' ইত্যাদি যুগান্তকারী ঘোষণা দিয়ে ইসলাম শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব ও এর ফযীলতকে তুে ধরেছেন। সুতরাং সকল মানুষ শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক এটাই ইসলামের অন্যতম দাবী।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে ইসলামে যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং যাকে ফরয ঘোষণা কর হয়েছে তা কোন্ শিক্ষা ? এ প্রসঙ্গে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গায্যালী (র)-এর বক্তব্ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে কোন্ ইল্ম অন্বেষণ করা ফরয সে সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে কেউ মনে করেন - ইল্মে কালাম শিক্ষা করাই ফরয। কেউবা মনে করেন, ইল্মে ফিকাহ শিক্ষা কর ফরয। কেউবা কুরআন হাদীসের জ্ঞান অর্জন আবার কেউবা ইলমে তাসাউফ শিক্ষা ফরয বলে মে করেছেন। মোটকথা, প্রত্যেক শ্রেণীর আলিম নিজ ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে তার শিক্ষাকে ফর হিসেবে বিবেচনার চেষ্টা করেছেন।[১৬] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে ফরয শিক্ষা কি ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম গায্যালী (র) লেখেন—

মনে কর, প্রাতঃকালে কোন কাফির মুসলমান হইল অথবা নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। তৎক্ষণাৎ সব ইলম শিক্ষা করা তাহাদের উপর ফরয হইয়া পড়ে না। সেই সময় শুধু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'—কলেমার মর্ম অবগত হওয়াই তাহাদের উপর ফরয।[১৭]

তাঁর মতে এরপর পর্যায়ক্রমে যে ইলম অর্জন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে তাকে কয়েকটি ভাগে ভা করা যায়। এর একটি আত্মার সাথে সম্বন্ধযুক্ত এবং অপরটি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্বন্ধযুক্ত শেষোক্ত ইলম আবার করণীয় ও বর্জনীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত। এখন এই সকল ইলমের মধ্যে যখ যে প্রয়োজনটি সামনে দেখা দেবে সেটা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনই ফরয হিসেবে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে মৌলিক ইসলামী জ্ঞানের পাশাপাশি দুনিয়াবী প্রয়োজনীয় জ্ঞান হাসিল করাও ফরয বলে গণ্য হবে।[১৮]

তাছাড়া প্রতিটি মুসলিম শিশুকে বিশেষত ইসলামী শিক্ষা প্রদান তার মাতা-পিতার জন্য অন্যত দায়িত্ব ও কর্তব্য। এমন শিক্ষা শিশুকে দান করতে ইসলাম চায় না যার দ্বারা শিশুর চরিত্র মনুষ্যত্বহী হয়ে পড়ে। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে—

---

১৩. আল-কুরআন, সূরা আর রহমান : ১-২

১৪. আল হাদীস, ইবনে মাজাহ

১৫. বহুল প্রচলিত আরবী প্রবাদ।

১৬. হযরত ইমাম গায্যালী (র), *সৌভাগ্যের পরশমণি*, প্রথম খণ্ড, প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা প্রকাশকাল, জুন ১৯৯৩, পৃ. ১৪১

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১-১৪২

১৮. *সৌভাগ্যের পরশমণি*, পৃ. ১৪২-১৪৮

www.pathagar.com

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

"যাহারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত রীবিকাকে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তাহারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা অবশ্যই বিপথগামী হইয়াছে এবং তাহারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।"[১৯]

উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় নিজ সন্তানকে হত্যা না করার ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরে কিরাম বাহ্যিক হত্যার পাশাপাশি সন্তানকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনের ভাষায় চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা না দেয়া এবং—তার চরিত্র গঠন না করা, যার দরুন সে আল্লাহ্, রাসূল ও পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে — এটাও সন্তান হত্যার চেয়ে কম মারাত্মক নয়।[২০]

আরো বলা হয় —

যারা সন্তানদের কাজ-কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয় না। তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় কিংবা এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয় যার ফলে ইসলামী চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায় তারাও একদিক দিয়ে সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী। বাহ্যিক হত্যার প্রভাব তো শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবন বিপর্যস্থ হয়। কিন্তু এ হত্যা মানুষের পারলৌকিক ও চিরস্থায়ী জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করে।[২১]

সুতরাং ইসলাম শিশুদের জন্য ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে গড়ে ওঠার অধিকারের প্রতি জোরালোভাবে গুরুত্বারোপ করে থাকে।

১.৪ ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার সাথে ধর্মের সম্পর্ক আগাগোড়াই বেশ নিবিড়। ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'আল কুরআন' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক বাংলা প্রতিশব্দ হল 'আবৃত্তি করা' বা 'পাঠ করা'।[২২] শুধু ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থই নয় বরং খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সাথেও লেখা-পড়ার সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। হিব্রু শব্দ 'বাইবেল' অর্থ 'বই' —ব্যাপক অর্থে 'জ্ঞান' বা 'শিক্ষা'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্মগ্রন্থগুলোর নামের সাথে শিক্ষার বা জ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে।

এখন দেখা দরকার আসলে ধর্মীয় শিক্ষার[২৩] প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা ? বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রচলিত চরম নৈতিক অবক্ষয় থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হলে ইসলামী শিক্ষার যে কোনো বিকল্প নেই একথা আজ আর অস্বীকারের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। ইসলামী জিন্দেগীর পুরোটাই ধর্ম নির্ভর। সুতরাং মুসলমানদের জন্য ধর্মকে বাদ দিয়ে শিক্ষার চিন্তা অবান্তর। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম মনীষীগণ ধর্ম শিক্ষাকে প্রাধান্য দেবেন। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য অমুসলিম বরেণ্য শিক্ষাবিদ, মনীষী, শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা এ প্রসঙ্গে কি বলেন তা এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা দরকার। বলাবাহুল্য তাঁদের অনেকেই শিক্ষার সাথে ধর্মকে সম্পৃক্ত করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন

---

১৯. আল কুরআন, সূরা আন'আম : ১৪০

২০. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, অনুবাদ, মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮

২১. পূর্বোক্ত

২২. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৮৬ ইং, পৃ. ৩৩০

২৩. ধর্মীয় শিক্ষা বলতে আমরা মূলত ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষার কথাই বুঝবো। কারণ অন্যান্য ধর্মে শিক্ষার ব্যাপারে কোন বিশেষ তাগিদ বা এ ব্যাপারে তেমন কোন বিশেষ নির্দেশনা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

www.pathagar.com

স্ট্যানলি হল (Stanly Hall), জন মিল্টন (John Milton), এ্যলবার্ট স্কেজার (Albert Scezer). প্রফেসর হিম্যান এইচ হোম (Prof. Heman H. Home), শিক্ষা বিজ্ঞানী রাস্ক (Rusk), নান (Nune), এমনকি বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato) পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করতে চাননি।

বিশিষ্ট শিক্ষা বিজ্ঞানী স্ট্যানলী হল (Stanly Hall) দ্ব্যর্থহীনভাবে ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষে মত ব্যক্ত করে বলেন —

If you teach their the three 'R's, Reading, Wrighting and Arithmatic and do'nt teach the fourth 'R' Religion, they are sure to become fifth 'R' Rascal.

অর্থাৎ — শিক্ষার্থীকে শুধু পড়তে লিখতে আর অংক কষতে শিখালে, আর ধর্ম না শিখালে তারা দুষ্টু হয়ে পড়বেই।

John Milton মনে করেন —

Education is the harmonious development of body, mind and soul.

অর্থাৎ —শরীর, মন ও আত্মার সুষম বিকাশের নাম শিক্ষা।

এই তিনের সুষম বিকাশ ঘটাতে হলে ধর্মকে বাদ দিয়ে যে সম্ভব নয় তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষা চিন্তাবিদ Albert Scezer তাঁর একটি গ্রন্থে শিক্ষার সাথে ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন —

Three kinds of progress are significant progress of knowledge and technology, progress in socialigation of man progress in spirituality.

এখানেই শেষ না করে এর সাথে তিনি যোগ করেন—*The last one is the most important.*

এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আর একটু এগিয়ে তিনি পরামর্শ রাখেন —

Our age must achieve spiritual renewal. A new renaissenc must come the renaissence in which mankind discovered that ethical action is the supreem truth and the supreem utiliterieanism by which mankind will be liberated.[২৪]

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিজ্ঞানীদের এই সকল ধারণা ও মতামত শুধু তত্ত্ব হয়েই থাকেনি বরং বাস্তবে এর প্রতিফলন কিভাবে ঘটতে পারে সে ব্যাপারেও তাদের চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে কিভাবে ধর্মকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার পথ বাতলে দিয়েছেন রাস্ক (Rusk)[২৫]নান (Nune)[২৬] প্লেটোও (Plato)[২৭] প্রমুখ মনীষী।

এতো হল, সাধারণ ধর্মের কথা, যার সকল ক্ষেত্রে সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।[২৮] জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল পর্যায়ে ইসলামের রয়েছে সমৃদ্ধ দিক-দর্শন। শিক্ষার ব্যাপারেও এর রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা। আর সেই ইসলামী

---

২৪. Albert Scezer — *The Teachings of Reverence for Life*, London, p. 213.

২৫. রাস্ক-শিক্ষাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন। (ক) শারীরিক শিক্ষা (খ) আধ্যাত্মিক শিক্ষা। আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে আবার চারটি ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে - ১. মানবিক ২. নৈতিক ৩. চারুকলা ও ৪. ধর্ম।

২৬. নান—নৈতিক চরিত্র ও ধর্মকে প্রথমেই স্থান দেয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছে।

২৭. প্লেটো যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক তা হল আদর্শবাদ। তাঁর এই আদর্শবাদ শিক্ষা দেয় বস্তু জগতকে আয়ত্ব ও করতে। মানব জীবনের সারাংশ আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিকাশের মাধ্যমে এর উৎকর্ষতা সাধনই আদর্শবাদী শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য।

২৮. পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন — (اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ)—*"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধান"*।

www.pathagar.com

শিক্ষার মাধ্যমে যে নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সুতরাং দেশের আগামী নাগরিককে নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত রেখে সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইসলামী শিক্ষার অপরিহার্যতা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় আজকের শিশু-কিশোর আগামী প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালানো প্রতিটি মুসলমানের অন্যতম কর্তব্য। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলিম দেশগুলো ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইসলামী শিক্ষা কোন পর্যায়ে রয়েছে সে বিষয়াট বিবেচনার অবকাশ রাখে।

১.৫ বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় শিক্ষা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে দেখা যায়। এর মধ্যে ইসলামী দেশগুলো ছাড়া আমেরিকা, বৃটেন, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলংকা, ভারত প্রভৃতি দেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমেরিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বেসরকারী স্কুল গীর্জাসংশ্লিষ্ট এবং প্রধানত রোমান ক্যাথোলিক সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত। ধর্ম শিক্ষা দানের জন্যই এই স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই স্কুলগুলো উন্নতমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। পাবলিক স্কুলগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হলেও অঙ্গরাজ্য সরকার ও স্থানীয় স্কুল ডিস্ট্রিক্ট বেসরকারী ও গীর্জা পরিচালিত স্কুলগুলোকে নানা উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদেরকে রাজ্যের শিক্ষার মান সংরক্ষণ করতে হয়, অনুমোদিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হয় ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়।[২৯]

বৃটেন বা যুক্তরাজ্যেও একই ভাবে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন ছিলো। কিন্তু উনিশ শতকের শেষদিকে ধর্মীয় দল বা গীর্জা পরিচালিত স্কুলগুলো অর্থাভাবে শিক্ষার মান রক্ষা করতে অসমর্থ হয়। স্কুলগুলোর অস্তিত্ব রক্ষা ও শিক্ষার উন্নত মান সংরক্ষণের জন্য তারা সরকারী অর্থ সাহায্যের দাবী জানাতে থাকে। ফলে ১৮৯০-১৯০০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৪০০ ধর্মীয় সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে অর্থ সাহায্য দানের গুরুভার বহন করতে হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে উদারপন্থী রাজনৈতিক দল ধর্মীয় ও জাতীয় এই দ্বৈত বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একই প্রকার জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে আন্দোলন শুরু করে।[৩০]

একইভাবে থাইল্যাণ্ডে ও শ্রীলংকায় প্যাগোডা ভিত্তিক শিক্ষার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে থাইল্যাণ্ডে সরকারী সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই প্যাগোডা ভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে বলে জানা যায়।[৩১]

ভারতে ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থা এদেশের সাথে তুলনীয়। মুসলমান ও হিন্দু ধর্মীয় দু'টি সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় দু'টি ধারাকে কখনও অস্বীকার করা যায়নি। এক আন্তার্জাতিক সমীক্ষায় ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার এই অনিবার্য অবস্থাকে স্বীকার করে মন্তব্য করা হয় —

> *Indian culture has evolved out of impact of there two main streams of the society. One of the most salient feature and the religious education during this period was co-ordination between secular and religious education. Also the religious and social leaders directed their attention to the essential unity and equaly of all religious creeds to infuse national intigration.*[৩২]

---

২৯. মো. সিদ্দিকুর রহমান ও মো. শাওকাত ফারুক, *শিক্ষা ব্যবস্থা*, আহমদ পাবলিশিং হাইজ, ঢাকা, প্রকাশকাল মে ১৯৯৮ ইং, পৃ. ১৩৬

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

৩১. মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত মূল্যায়ন রিপোর্ট ২০০১। প্রকল্প কর্মীরা সরেজমিনে উক্ত দেশ দু'টি সফর করে গভীরভাবে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে এই রিপোর্টে তা উল্লেখ করেন।

৩২. UNESCO—NIER Regional programme for Educational Research, Asian study of curriculum, Tokyo 1970, p. 111.

www.pathagar.com

এটা হলো ভারতের বর্তমান শিক্ষার অবস্থা। অবিভক্ত ভারত বর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিলো পুরোপুরি ধর্মনির্ভর। সে আমলে শিক্ষাকে ইহকাল ও পরকালের প্রস্তুতি হিসেবে ধরে নেয়া হত। তখন ধর্ম প্রত্যেক শিক্ষার মূল হিসেবে কাজ করতো। প্রতিটি মাদ্রাসা ও মসজিদের সাথে মক্তব সংযুক্ত ছিল এবং প্রতিটি মসজিদে আলাদাভাবে ধর্ম ছাড়াও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হত, যাতে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে বৈষয়িক শিক্ষাও হাত ধরাধরি করে চলতে পারে।[৩৩] মুসলিম শাসনের শেষাবধি শিক্ষার হালফিল এ রকমই ছিলো। মুসলমানদের হাত থেকে রাজ ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার পর ইংরেজশাহী শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনে। আজকের বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা তারই অনিবার্য ফসল।

আরব বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই ইসলামী শিক্ষার সুযোগ বেশ সম্প্রসারিত। বিশেষত সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, লিবিয়া প্রভৃতি দেশে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষার মূল ভিত্তিই রচিত হয়েছে ইসলামী কৃষ্টি-সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে।[৩৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা কার্যকর রয়েছে।

১.৬ বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার গ্রহণযোগ্যতা

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও বাংলাদেশের জন্য তা আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা বা এদেশের মানুষের কাছে তা কতটা গ্রহণযোগ্য ? এর উত্তরে বলতে হয়—শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী অনুশাসনের প্রতিফলন ঘটানোর ক্ষেত্রে এ দেশের সচেতন মানুষের আগ্রহের ঘাটতি নেই। এ কারণেই এ সংক্রান্ত জরিপ রিপোর্টগুলোতে এ দেশের মানুষ বারবার ধর্মীয় শিক্ষার অপরিহার্যতা বা নিজ জীবনে এর আবশ্যকতাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। ১৯৭৪ সালে ড. কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রণয়নের সময়ে শিক্ষার সাথে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন —জরিপে অধিকাংশ তথ্য প্রদানকারীগণ। ১৯৭৪ সালের ঐ রিপোর্টটি প্রণয়নকালে সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তির কাছে প্রশ্নমালা পাঠিয়ে এক জরিপ চালানো হয়। এতে ২৮৬৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২২৮৫ জনই মাধ্যমিক পর্যায়ে অথবা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্ম শিক্ষাকে বহাল রাখার পক্ষে মত দেন, যার শতকরা হার দাঁড়ায় ৭৯.৬৪%। অপর পক্ষে ধর্ম শিক্ষাকে তুলে দেয়ার পক্ষে মত দেন ১১৬ জন, যার হার মাত্র ৪%।[৩৫] সে অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাজানোর

---

৩৩. Henry Holt & Company, New York, p. 393.

৩৪. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* - পঁচিশ বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৫ তে প্রকাশিত মুহাম্মদ শাকুরের 'কয়েকটি মুসলিম দেশের পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী উপাদান' শীর্ষক নিবন্ধ — পৃ. ১৩৯-১৪২। সাতটি মুসলিম দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের দু'টি শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করে সেখানকার পুস্তকে ইসলামী উপাদানের তুলনামূলক পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয় তা হলো :

ক্রমিক স্যংখ্যা	দেশের নাম	ইসলামী রচনার পৃষ্ঠা সংখ্যা	ইসলামী শব্দাবলীর সংখ্যা	ইসলামী ছবির সংখ্যা	মোট ইসলামী উপাদানের সংখ্যা	মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা	মোট পৃষ্ঠা সংখ্যার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১.	সৌদী আরব	৭০	২০৯	৭	৪১	২৭৫	২৫.৫%
২.	ইরাক	২২	৮৫	১	১৫	৩১৬	৭%
৩.	লিবিয়া	৭০	২১৫	২৪	২৩	৩৫৪	২০%
৪.	পাকিস্তান	৩৬	১৮৭	১২	২৩	১৭৫	২০%
৫.	মালয়েশিয়া	৩	৪	২	১	২০০	১.৫%
৬.	বাংলাদেশ	৭	১৫	২	৩	১৮৭	৩.৫%

৩৫. *বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট* - মে ১৯৭৪, পৃ. ৬১

www.pathagar.com

মধ্যেই যে নিহিত রয়েছে নৈতিক অবক্ষয় রোধের মূল সূত্র এ কথা সে সময়ের শিক্ষিত সচেতন সাধারণ নাগরিকগণ উপলব্ধি করেছিলেন যা ঐ সার্ভে রিপোর্টে প্রমাণ মেলে। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল জরিপ রিপোর্টে যাই প্রমাণিত হোক না কেন উল্লিখিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে তা আদৌ প্রতিফলিত হয়নি। সম্ভবত সে কারণেই কিনা জানা নাই ঐ রিপোর্টটির অধিকাংশ প্রস্তাবই পরবর্তী কোন সরকারই বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

শুধু ঐ রিপোর্টই নয় এ দেশের মানুষের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যখন মানুষ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্যই লেখা-পড়া শেখার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। বেসরকারী সংস্থা FREPD পরিচালিত অপর একটি জরিপে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থার বাস্তবায়নে বয়স্ক শিক্ষায় অংশ গ্রহণকারীদের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হওয়ার বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে ২০টি করে প্রশ্ন করা হয় তাতে তিনটি প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ১০০জন শিক্ষার্থী 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর দেন। প্রশ্নগুলি ছিল ১. To read books, ২. To read and Write letters ও ৩. To read religious books. দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল—To gain prestige (৯৮.৯১%), তৃতীয় অবস্থানে ছিল—To help children in education (৯৬.৭৪%), চতুর্থ অবস্থানে যৌথভাবে ছিল—To understand religious instructions এবং To be useful member of the society. উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বনিম্ন সংখ্যক মত দেন To perticipate in political activities এর পক্ষে—যার হার ২৬.০৯।[৩৬]

আর একটি তথ্য এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করলে এ দেশের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগের বিষয়টি আরো একটু পরিষ্কার হতে পারে। ১৯৭৮ সালে তিনটি গ্রামের ৪৭২০ জন অধিবাসীর মধ্যে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে শতকরা ২১ ভাগ ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠে সক্ষম। এ সময় ঐ এলাকায় শিক্ষিতের হার ছিলো ১৭%। অর্থাৎ সাক্ষরতার হারের চেয়ে ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠে সক্ষমদের হার ছিলো বেশী। তবে পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে বাংলা ও আরবী বা ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের ক্ষেত্রে একেবারে উল্টো অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। জরিপ রিপোর্টে ধর্মীয় গ্রন্থ ও বাংলা পাঠে সক্ষম ব্যক্তিদের ওপর যে তথ্য পাওয়া যায় তার প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য অংশ নিচে তুলে ধরা হলো:

About 26 percent of the male population and only 14 percent of the female population can read Bengali. As regards to read the religious books it may be observed in table 6.3 that nearly 21 percent of the total population can read religious books. It is interesting to note that proportionately more females are able to read religious books. Table 6.3 shows that 25 percent females against 18 percent males are able to read religious books. The situation is reverse with respect to Bengali. Fourteen percent of the female and 26 percent of the male population can read Bengali. This situation may possible be explained by the fact that particularly in the rural areas young girls can read at least religious books are preferred at the time of their marriage. [৩৭]

(দুই)

২.১ শিক্ষার ইসলামীকরণে দায়বদ্ধতা

শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব সকলের। বিশেষত মুসলমানদের তাদের সন্তানাদীকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব অপরিসীম। এটি মুসলিম শিশু-

৩৬. Riport of an adults Literacy motivation, A survey on adult education in Bangladesh - 1979-by the foundation for research on educational planning & development.

৩৭. A PILOT RESEARCH PROJECT ON NONFORMAL EDUCATION. A Micro Stiudy by THE FOUNDATION FOR RESEARCH ON EDUCATIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT (FREPD), BANGLADESH — December 1979, p. 85.

www.pathagar.com

কিশোরের জন্য অন্যতম হকও বটে যা ইতোপূর্বে আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং শিক্ষার ইসলামীকরণ সকল মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় দায়ের অন্তর্গত। তা ছাড়া এ বিষয়টি এদেশের জন্য সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের যে মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে তা হল :

৮.(১) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার - এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(১.ক) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।

(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূল সূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।[৩৮]

এ ছাড়া এই সংবিধানের অপর একটি ধারা মতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম।[৩৯]

শুধু সাংবিধানিকই নয় এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্বও কম নয়। মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কায় ও. আই. সি এক শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঐ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ সম্মেলন শেষে প্রণীত ঘোষণায় বলা হয়:

Believing the tenets of Islam which preach that the quest of knowledge is an obligation on all Muslims. We declare ourselves determined to co-operate spreading education more widely and strengthening educational institutions until ignorance and illiteracy have been eradicated and to take measures aimed towards the strengthening of Islamic education curriculam and to encourage research and Ijtihad among Muslim thinkers and Ulema while expanding the modern science and technologies.

We also pledge ourselves to co-ordinate our efforts in field of education and culture. So that we may draw on our religious and traditional sources in order to unite the Ummah. Consolidates its culture and strengthen its solidarity. Cleanse our societies of the manifestation of moral laxity deviation by inculcating moral virtues protecting our youth from ignorance and from exploitation of the material needs of some Muslims to alienate them from their religion.

Believing in the need of propagate the principles of Islam and the spread of its cultural glory through out the Islamic societies in the world as a whole and to emphasize its rich heritage. Its spiritual strength, moral values and laws conducive to progress, justice and prosperity. We are determined to co-operate to provide the Human and material means to achieve these objectives. We also pledge to exert further efforts in various

---

৩৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত আকারে প্রকাশিত সংখ্যা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৫

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩। এখানে ধারা ২.ক তে বলা হয়েছে—*প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।*

www.pathagar.com

cultural fields to achieve raprochment in the thinking of the Muslims and to purify Islamic thaught of all that may be alien or divisive.[৪০]

সম্মেলন পরবর্তী পর্যায়ে দেশে ফিরে প্রেসিডেন্ট জিয়া শিক্ষা সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী প্রথমে আবদুল বাতেন ও পরে কাজী জাফর আহমদ-এর নেতৃত্বে তিনি শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত দেশের প্রখ্যাত ৪০ জন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে গঠিত এই জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ পরিপূর্ণ শিক্ষানীতি প্রণয়ন সময় সাপেক্ষ বিবেচনায় একটি অন্তবর্তী শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করে। সারা দেশের ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষা সচেতন মানুষের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত এই শিক্ষানীতিতে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য পৃথক বেতন কমিশন গঠন, তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক ও পুরস্কার প্রদানের মত বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর উদ্যোগ তেমন পরিলক্ষিত হয়নি।[৪১] তবে অন্তবর্তীকালীন এই শিক্ষানীতিতে যাই থাক না কেন শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠ্যক্রমে ইসলামী তাহজিব-তমদ্দুনের উপস্থিতি এ সময়ের পাঠ্যপুস্তকে বিদ্যমান ছিল।[৪২]

এরপর ১৯৮৩ সালে গঠিত মজিদ খান কমিটি এবং ১৯৮৮ সালে অধ্যাপক মফিজউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের কথা বলা হলেও তা ইসলামী শিক্ষার পক্ষে জোরালো মত বলে বিবেচনা করার কোন কারণ নেই।

২.২ শিক্ষার ইসলামীকরণে সরকারী প্রয়াস

শিক্ষার ইসলামীকরণে সরকারী তেমন উল্লেখযোগ্য প্রয়াস নেই বললেই চলে। তবে ১৯৯১ থেকে ৯৬ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালে তৎকালীন বি এন পি সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরুদ্দিন সরকার (বর্তমানে মাননীয় স্পীকার) শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষত কারিকুলামকে ঢেলে সাজাবার জন্য একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। গঠিত এই টাস্কফোর্স শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই টাস্কফোর্স নতুনভাবে যে কারিকুলাম প্রণয়ন করেন তাতে সংবিধানের উল্লিখিত মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে এখানে বলা হয় :

শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গিন বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে নিচের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করতে হবে :

১. *শিক্ষার্থীদের মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।*

২. *সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অন্তরে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।*

৩. *শিক্ষার্থীর মনে ধর্মীয়, আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, অর্থাৎ সৎ, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ মানুষ তৈরী করা।*[৪৩]

---

৪০. Makka Diclaration - 1977.

৪১. অন্তরবর্তীকালীন শিক্ষা নীতি, জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ, ১৯৭৯।

৪২. *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নবম শ্রেণী, প্রথম মুদ্রণ জানুয়ারী ১৯৮৪, সংশোধিত ডিসেম্বর ১৯৮৭, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৫, রচনা/সম্পাদনা, মুহাম্মদ নূরুল করিম, পৃষ্ঠা ৪৭-৭৮, ৬০—এতে মধ্যযুগ সুলতানী আমল শিরোনামে একটি অধ্যায় ছিলো যেখানে ইসলামের ইতিহাস পটভূমি সহ বর্ণিত ছিলো। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এখানে মহানবী (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন মুবারক, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সরকার, খুলাফায়ে রাশেদিনের আমল ও উমাইয়্যা আমল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশিত ছিলো। সেখানে বখতিয়ার খিলজীর বাংলা অভিযানকে বঙ্গ বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৬ পরবর্তী পর্যায়ে এ পাঠ্যপুস্তকটির আমূল পরিবর্তন করা হয়।

৪৩. স্বপন কুমার ঢালী ও রেজা ইমাম, *শিক্ষার ভিত্তি*, প্রকাশক প্রভাতী লাইব্রেরী, নীলক্ষেত, ঢাকা, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ২৫৩। ১৯৯৪ সালের শিক্ষা কারিকুলাম বিষয়ক টাস্কফোর্সের রিপোর্টের আলোকে এখানে ঐ তথ্য সংযোজিত হয়েছে।

www.pathagar.com

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিক্ষার ঐ পুনঃনির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু সাংবিধানিক নয় বরং অনেকাংশে বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম দেশের চাহিদার সাথেও সামঞ্জস্যশীল। একই সাথে ১৯৭৭ সালের ঐ মক্কা ঘোষণাকেও তা অনেকাংশে ধারণ করতে পেরেছে। কিন্তু কারিকুলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক হলেও বাস্তবে এর প্রতিফলন সরকারী পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছে বা হচ্ছে কিনা সেটি পর্যালোচনা করে বিশেষত আশির দশকের শেষ দিক থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত যে ফল পাওয়া যায় তাতে নিরাশ হওয়ার তেমন কারণ ছিল না। কিন্তু তার পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষত ১৯৯৬ উত্তরকালে ন্যাশনাল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা স্কুল পর্যায়ে যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে তাতে ইতোপূর্বের উল্লিখিত ১৯৯৪ সালের টাস্কফোর্সের স্থিরিকৃত লক্ষ্য অস্বীকার করে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী শিক্ষার বিকাশ ঘটানো হয়।[৪৪]

২.৩ বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত প্রয়াস

দেশে ইসলামী শিক্ষার প্রচলনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের আওতায় প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনার অবকাশ রয়েছে বলে মনে হয়।

প্রফেসর ড. সৈয়দ আলী আশরাফের উদ্যোগ

শিক্ষার ইসলামীকরণে বাংলাদেশের বিশ্বখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. সৈয়দ আলী আশরাফের অবদান অসামান্য। শুধু বাংলাদেশেই নয় মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে শিক্ষার ইসলামীকরণে তাঁর প্রয়াস ছিল উল্লেখ করার মত। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৭ সালে কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মক্কা শরীফের বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮০ সালে ইসলামাবাদে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, ১৯৮১ সালে ঢাকায় পাঠ্যপুস্তক রচনা, ১৯৮২ সালে জাকার্তায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ১৯৮৭ সালে কায়রোতে মূল্যায়ন এবং ১৯৯৬ সালে কেপ টাউনে 'ইসলামী শিক্ষা কর্মশালা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রফেসর আশরাফ এ সকল সম্মেলনের উদ্যোক্তা হিসেবে এ ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখেন।[৪৫]

এই সকল সম্মেলনে ইসলামী শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক আলোচনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইবরাহিম এবং ব্রুনেই এর শিক্ষামন্ত্রী ছাড়া এ ক্ষেত্রে কোন মুসলিম দেশের সরকারই তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বললেই চলে। বাংলাদেশ সরকার এ ক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ নেয়াতো দূরের কথা মক্কা ঘোষণার পাশাপাশি শিক্ষার ইসলামীকরণের ব্যাপারটি নিয়ে জনগণকে ভাবার সুযোগ পর্যন্ত করে দেয়ার পক্ষপাতি নয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রফেসর আশরাফ বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরীর লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট না থাকায় ইনস্টিটিউট অব হায়ার ইসলামিক লার্নিং—নামে প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করে। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯২ সালে বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাশ হলে ১৯৯৩ সাল থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।

শিক্ষার ইসলামীকরণে প্রফেসর আলী আশরাফের ছিল পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি মনে করতেন - 'পাশ্চাত্যের সেকুলারিস্ট ধ্যান-ধারণা মানুষকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির মোহে আবদ্ধ করে এবং সে কোন মূল্যবোধকেই গ্রহণ করতে রাজি হয় না। তারই ফলে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা ভঙ্গুর অবস্থায় উপনীত

৪৪. বাংলাদেশ স্কুল ও মাদরাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম মক্কা ঘোষণার আলোকে একটি পর্যালোচনা —২০০১।

৪৫. *মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস*, বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৪, নভেম্বর ১৯৯৭—'ধর্মভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার রূপকার দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক নিবন্ধ।

www.pathagar.com

হয়েছে। সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এই অবক্ষয় থেকে নতুনদের রক্ষা করতে হলে মনুষ্যত্বের যে মানদণ্ড ধর্ম আমাদের দিয়েছে এবং যার ঐতিহ্য সমাজে এখনো বিদ্যমান, নতুনদের সেই মানদণ্ড সম্পর্কে সচেতন করে দিতে হবে।' তিনি বলেন - 'মানুষ সম্পর্কে ধর্ম যে ধারণা দিয়েছে, চিরন্তন মূল্যবোধকে মানবাত্মায় প্রতিষ্ঠিত বলে বুঝিয়েছে। আমরা সেই মূল্যবোধের মানদণ্ডকে অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র বলে দেখতে চাই। আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জাগ্রত করতে চাই যার মাধ্যমে তারা বুঝতে পারবে মানুষ পরিবর্তনের দাস নয়। সে নিজে পরিবর্তন আনে। সুতরাং ভাল মন্দের মানদণ্ড দিয়ে যাচাই করে সমাজের এবং মানুষের উন্নতি অবনতির কথা বিবেচনা করে। সমাজে যে শক্তি পরিবর্তন আনে সেই সমস্ত শক্তিকে রোধ করবে বা তার গতি পরিবর্তিত করবে অর্থাৎ প্রতিনিয়ত সে সত্যের জন্য জিহাদ করতে প্রস্তুত থাকবে। এই ধরনের ছাত্র-ছাত্রী তৈরীর লক্ষ্যেই দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।'

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় রয়েছে তিনটি অনুষদ — (১) ধর্ম বিজ্ঞান অনুষদ (২) মানবিক বিজ্ঞান অনুষদ ও (৩) প্রকৃতি বিজ্ঞান অনুষদ। এর মধ্যে ধর্ম বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে রয়েছে ইনস্টিটিউট অব হায়ার ইসলামিক লার্নিং এবং মানবিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে রয়েছে ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন ও ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ। এ ছাড়া এর অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজ, ইসলামিক একাডেমী এবং একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ইত্যাদি।

উপরোক্ত অনুষদ ও ইনস্টিটিউটগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপ্তি ব্যাচেলর-মাস্টার্স-এম ফিল থেকে পি এইচ ডি পর্যন্ত বিস্তৃত। এ ছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বি এড ও এম এড কোর্সও এখানে চালু করা হয়েছে। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে এ ক্ষেত্রে 'দারুল ইহসান মডেল স্কুল'-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনের তত্ত্বাবধানে এ স্কুলটি পরিচালিত হয়ে থাকে। পাঁচ থেকে বার বছরের প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একই সাথে আরবী ও ইংরেজির ওপর সমান গুরুত্ব দিয়ে এখানে ভিন্নধর্মী শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। আবাসিক এ স্কুলটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এখানে হিফযুল কুরআন বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ নির্ধারিত আরবী ও ইংরেজি পাঠ্য বই ছাড়াও প্রত্যেক ছাত্রকে বাদ ফযর থেকে পবিত্র কুরআন শরীফ মুখস্থ করতে হয়।

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলী নিয়ে ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি গঠিত হয়।

- সাম্ভাব্য সকল উপায়ে জনসাধারণের মাঝে ইসলামী শিক্ষার প্রসার।
- সাধারণ শিক্ষার উপর বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষার উপর গবেষণা
- শিশু-কিশোরদের জন্যে উন্নততর শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকল্পে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, শিক্ষা সম্মেলন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থাকরণ
- ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সহায়ক সাময়িকী, ম্যাগাজিন, বই-পুস্তক ইত্যাদি প্রণয়ন ও প্রকাশ[৪৬]

এ সমস্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সোসাইটি ইতোমধ্যে যে সকল কাজ সুসম্পন্ন করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল :

১. যোগ্য শিক্ষক তৈরী এবং ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির কলাকৌশল শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সম্মেলন অনুষ্ঠান।

৪৬. *পাঠ্যতালিকা*, ২০০১ স্কুল শাখা, ইসলামী এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা।

www.pathagar.com

৩. মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪. শিশু শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত এগারোটি ক্লাশের উপযোগী ৭৭টি বইসহ এ পর্যন্ত শিক্ষাবিষয়ক মোট ৮৮টি বই প্রণয়ন ও প্রকাশ।

৫. ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার পথ উন্মোচনের জন্য একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এখানকার বর্তমান বই সংখ্যা ২৭২৫টি।

৬. ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ১৫২টি আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব পরিচালিত হচ্ছে।

৭. নিজস্ব উদ্যোগে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

৮. সোসাইটির বই পড়ানো হয় প্রতি বছর এ ধরনের গড়ে ৯০ থেকে ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করত প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা করা হয়।

৯. পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনার পর ইসলাম বিরোধী বিষয়াবলী নির্দেশ করে ইসলামের আলোকে তা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরামর্শ দেয়ার ব্যবস্থা করা।

১০. সারা দেশে ইসলাম প্রিয় লোকদের দ্বারা পরিচালিত আদর্শ মক্তব, স্কুল ও মাদরাসাগুলোকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান করা।

উল্লেখ্য সমগ্র দেশের প্রায় ৫শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় সিংহভাগ এবং আরো প্রায় ৩শ স্কুলে আংশিকভাবে ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির বই পাঠ্য তালিকায় সংযোজন করা হয়েছে। সোসাইটির কয়েকটি বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাতিঝিল আইডিয়াল স্কুল, ভিখারুন্নিছা স্কুল, বাদশাহ ফয়সল ইনস্টিটিউট-ঢাকা অন্যতম। এ স্কুলসমূহে সোসাইটি প্রকাশিত ইসলাম শিক্ষা, দ্রুতপঠন বা গল্পের বইগুলো পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য স্কুলের মধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠিত মসজিদ মিশনসহ অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোসাইটির বইকে পুঁজি করেই ইসলামী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে।[৪৭]

বাংলাদেশের শিক্ষায় ইসলামীকরণের লক্ষ্যে এডুকেশন সোসাইট আরো কিছু কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হল :

- ইসলামী এডুকেশন সোসাইটি পরিচালিত ল্যাবরেটরী স্কুলকে এইচ এস সি মানের কলেজিয়েট স্কুলে রূপান্তর।
- হিফযুল কুরআন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।
- ঢাকায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।
- নৈশ শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।[৪৮]

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে রয়েছে। এখানে সাহিত্য কলার বাংলা-ইংরেজী, সাধারণ জ্ঞান, আঁকতে শেখা, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান) পুস্তকসমূহ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে রচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ইসলাম শিক্ষার জন্য এতে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে ইসলামিয়াত, আল কিরাতুল হাদীসা (হাদীসের সংকলন), আরবী ওয়ার্ড বুক, কাওয়ায়েদুল লুগাতিল আরাবীয়া ইত্যাদি পুস্তক। এ ছাড়া প্রতিটি শ্রেণীতে রয়েছে আমল-আখলাক ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ইসলামী ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ঘটনা প্রবাহের আলোকে রচিত ইতিহাস সংকলন।

---

৪৭. বার্ষিক রিপোর্ট ২০০০, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা।
৪৮. পূর্বোক্ত

www.pathagar.com

আল হিকমাহ্ ফাউন্ডেশন

রাজশাহীর কাজিহাটায় আল হিকমাহ্ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সিকান্দর ইবরাহীমী। প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি পুস্তিকায় বলা হয় :

শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি-কালচার ও সমাজ সংস্কারের মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই সৃষ্টি হয়েছিল আল হিকমাহ্ ফাউন্ডেশন। এই সংস্থার মাধ্যমে দীন ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরে বিশ্ববাসীকে তাগুবী শক্তির খপ্পর থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।[৪৯]

এই সকল উদ্দেশ্য সামনে রেখে মসজিদ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আল হিকমাহ্ মসজিদ, আল হিকমাহ্ একাডেমী, আল হিকমাহ্ মসজিদ একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া আল হিকমাহ্র ব্যানারে অন্যান্য যে সকল সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে তার মধ্যে বালিকা একাডেমী, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, গবেষণা ও ফতুয়া কেন্দ্র, ইয়াতিমখানা, পাবলিক লাইব্রেরী, চিকিৎসা কেন্দ্র, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, হাউজিং সোসাইটি ইত্যাদি অন্যতম।

ছয়টি বিভাগের মাধ্যমে বর্তমানে আল হিকমাহ্ ফাউন্ডেশন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এগুলো হল :

১. মসজিদ ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২. শিক্ষা বিভাগ, ৩. রচনা অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ

৪. লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরী বিভাগ, ৫. প্রেস ও প্রকাশনা বিভাগ, ৬. জনসংযোগ ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ।

শিক্ষা বিভাগের আওতায় দারুল হিকমাহ্ কমপ্লেক্স গড়ে তোলার কর্মসূচী মুতাবিক শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মসজিদ ভিত্তিক মাদরাসাতুল হিকমাহ্ / আল হিকমাহ্ মসজিদ একাডেমী স্থাপিত হচ্ছে। এর আওতায় ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর হুকুম ও মহানবী (সা)-এর আদর্শ শিক্ষা দেয়ার পরিপূর্ণ সুযোগ রয়েছে। ঢাকা, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, রাজবাড়ীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫১টি ইউনিট চালু রয়েছে এবং আরো শতাধিক ইউনিট চালুর প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য ইসলামী জীবন ও সংস্কৃতির আলোকে প্রণীত নিজস্ব পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আল হিকমাহ্ শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঁচটি স্তর বিশিষ্ট শিক্ষার ধারণা প্রদান করেছে এবং পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট রয়েছে। এগুলো হল :

০ প্রাথমিক স্তর	৬ বছর
০ মাধ্যমিক স্তর	৪ বছর
০ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর	২ বছর
০ স্নতক বা সম্মান স্তর	৩ বছর
০ স্নাতকোত্তর স্তর	২ বছর
	সর্বমোট ১৭ বছর।

বর্তমানে অবশ্য আল হিকমাহ্র শিক্ষা কার্যক্রম প্রথমোক্ত দুই স্তরে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অন্যান্য স্তর শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।[৫০]

এগুলো ছাড়াও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আরো প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক উদ্যোগে ইসলামী শিক্ষার প্রয়াস চালাতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে প্রয়াস সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক এবং তার পরিসরও বেশ ক্ষুদ্র। তবে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকও শিক্ষার ইসলামীকরণে এগিয়ে এসেছে বলে জানা যায়। এ

৪৯. প্রফেসর সিকান্দর ইবরাহীমী, আল হিকমাহ্ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত 'পরিচিতি পুস্তিকা'।
৫০. পূর্বোক্ত

www.pathagar.com

লক্ষ্যে তারা ঢাকায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেছে। এভাবে দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ইসলামী শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ রয়েছে যা তেমন সুসংহত না হলেও তার গুরুত্বকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। তবে সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই বলে মনে হয়।

(তিন)

৩. পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

১৯৭৭ সালে 'মক্কা ঘোষণার' প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী উপাদানের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য সম্প্রতি ইসলামী একাডেমী, ক্যামব্রীজ—বাংলাদেশে একটি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে। এ গবেষণার উদ্দেশ্য ছিলো উল্লিখিত মক্কা ঘোষণার আলোকে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ পরিপন্থী উপাদান আছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং মক্কা ঘোষণার আলোকে শিক্ষার ইসলামীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করা। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর আজহারুল ইসলাম ও প্রফেসর শাহ হাবীবুর রহমানের নেতৃত্বে পারিচালিত এ গবেষণা কর্মের আলোকে বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষত স্কুল পাঠ্যপুস্তকে ইসলাম বা মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জন্য ক্ষতিকর এবং এ দেশের ইতিহাস বিকৃতির যে নমুনা পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য লজ্জাজনক।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় সাধারণ ইতিহাস, জাতীয়বাদের জন্য ক্ষতিকর এবং ইসলামী তাহজিব, তমদ্দুন ও সর্বপরি মুসলিম হিসেবে পরিচয় ও আত্মপ্রসাদ লাভের পরিবর্তে বিপরীতধর্মী বোধ বিশ্বাসের চিন্তার বিকাশ ঘটানোর মত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হয়েছে—তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে। এর মধ্যে রয়েছে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পরিবেশ পরিচিতি, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান আর অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত গার্হস্থ বিজ্ঞান এবং নবম-দশম শ্রেণীর আধুনিক ও বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস পুস্তকে। এর মধ্যে ইসলামের জন্য আপত্তি বা ক্ষতিকর ও ইতিহাস বিকৃতির বিষয়গুলো আলাদাভাবে আলোচনায় আনলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

৩.১ ইসলাম ও মূল্যবোধ পরিপন্থী উপাদান

উক্ত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় প্রাথমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যে মোট ২৩০টি রচনার মধ্যে ইসলামী ঐতিহ্য, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিষয়ক রচনার সংখ্যা মাত্র ১৩টি। একটি ইসলামী অনুশাসন ও মূল্যবোধ পরিপন্থী উপাদানের অস্তিত্বও এতে লক্ষ্য করা যায়।[৫১] উদাহরণস্বরূপ, ইবরাহীম খাঁ লিখিত 'পুটু' গল্পটির কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে একটি ছাগলের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ গল্পের উপসংহারে কুরবানীর মূল স্পিরিট খাটো করে একটি সামান্য পশুর প্রতি অতিরিক্ত দরদ দেখানো হয়েছে। পোষা ছাগলটি কুরবানী না দিয়ে বাবা চরিত্রের মানুষটি প্রকারন্তরে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন।[৫২]

'রচনার শিল্পগুণ' শীর্ষক রচনার লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনাশৈলী বোঝাতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সংস্কৃতিকে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে প্রকাশের অবকাশ পেয়েছেন। যেমন এক স্থানে তিনি 'জাতি" শব্দের উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রথমেই হিন্দু ও পরবর্তীতে ইংরেজ, ফরাসি, চৈনিক, আর্য, সেমিয় প্রভৃতি জাতির কথা উল্লেখ করলেও মুসলিম জাতির কথা উল্লেখ করেননি। রচনার অন্যত্র সংস্কৃতিকে আপন ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করে আরবীকে বিদেশী ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়—'বিজ্ঞাপন' সংস্কৃত শব্দ, 'ইশতিহার' বৈদেশিক শব্দ, এ জন্য অনেকে বিজ্ঞাপন শব্দ ব্যবহার

৫১. *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদরাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, মক্কা ঘোষণার আলোকে একটি পর্যলোচনা,* রাজশাহী — ২০০১, পৃ. ২১

৫২. *রূপময় বাংলা,* পৃ. ২৬-৩০

www.pathagar.com

করিতে চাহিবেন। কোমলমতি শিশুদের মধ্যে আরবীকে বিদেশী ভাষা হিসেবে পরিত্যাজ্য বিবেচনার সুযোগ করে দেয়।[৫৩]

মাধ্যমিক স্তরে ইসলামী ঐতিহ্য, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিষয়ক রচনার সংখ্যা মাত্র ৬টি—৬২টির মধ্যে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এ পর্যায়ে ইসলামী অনুশাসন ও মূল্যবোধ পরিপন্থী উপাদানের অস্তিত্ব তেমন নেই বললেই চলে।[৫৪] বলাবাহুল্য ইংরেজি সাহিত্যে ইসলামী মূল্যবোধের পক্ষে বা বিপক্ষে তেমন কোন উপাদানের অস্তিত্ব এখানে প্রদত্ত টেবিলে দেখা যায় না।[৫৫]

তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)-এ আমাদের অধিকার ও কর্তব্য শিরোনামে মা, বাপ, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীদের প্রতি এবং দেশের নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সৃষ্ট জীব হিসেবে স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব আছে—যা এ অধ্যায় থেকে শিক্ষার কোন সুযোগ নেই।[৫৬]

চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বই এ পরিবারের সদস্য, তাদের কাজকর্ম, পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য, প্রতিবেশী কারা, তাদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা রয়েছে। এতে 'সকল ধর্মে প্রতিবেশীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের তাগিদ রয়েছে' বলে উল্লেখ করা হয়েছে[৫৭] যা যথার্থ নয়। বরং ইসলামে এ ধরনের তাগিদ রয়েছে। একইভাবে 'প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে যে পেট ভরে খায় সে আমার উম্মত নয়' মর্মে রাসূল (সা)-এর ঘোষণার মর্মার্থ এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হলেও এটি যে ইসলামের অনুপম শিক্ষা তা উল্লিখিত হয়নি।[৫৮]

তৃতীয় অধ্যায়ে-সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ক আলোচনায় সমাজের একজন সদস্য হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে। এতে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডার মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মসজিদকে মুসলমানদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে স্বীকার করলেও সামাজিক কর্মকাণ্ডেরও যে এটি কেন্দ্রবিন্দু তা আলোচনায় ফুটে ওঠেনি।[৫৯]

ষষ্ঠ শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান বই-এ সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচিতি, সভ্যতার উত্তোরণ, লিখন, ধাতুর ব্যবহার, প্রাগৈতিহাসিক সমাজের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। প্রকৃতি পূজা, পূর্বপুরুষ পূজা, তাদের আচার-আচরণ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এখানে একত্ববাদী ধর্মের কোন উল্লেখ নেই।[৬০]

অষ্টম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান বই এর ১ম অধ্যায়ে বিশ্বের সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় ও অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে সামাজিক পরিবর্তনের যে নয়টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো :

---

৫৩. *মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য,* নবম শ্রেণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬-৮

৫৪. *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদরাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, মক্কা ঘোষণার আলোকে একটি পর্যালোচনা,* রাজশাহী — ২০০১, পৃ. ২১।

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৫৬. *পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ),* তৃতীয় শ্রেণী, রচনা/সম্পাদনা - রাশিদা বেগম, ড. হাসান উজ্জামান চৌধুরী, মো. তাবারেক আলী, মমতাজ জাহান, আবদুল মালেক, প্রকাশক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, প্রকাশকাল ১৯৯৭।

৫৭. *পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ),* চতুর্থ শ্রেণীর রচনা/সম্পাদনা ঃ ড. মো. আজহার আলী, কাজী গুলশান নাহার, মো. তাবারেক আলী, ড. আবদুল লতিফ মাসুম, আবদুল মালেক, প্রকাশক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ১৯৯৪, পুনর্মুদ্রণ - নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ০৬

৫৮. পূর্বোক্ত

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬-২৭

৬০. *সামাজিক বিজ্ঞান,* ষষ্ঠ শ্রেণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

www.pathagar.com

১. ভৌগোলিক কারণ, ২. জৈবিক কারণ, ৩. জনসংখ্যা, ৪. রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ, ৫. অর্থনৈতিক কারণ, ৬, শিক্ষা, ৭. মহৎ ব্যক্তির ভূমিকা, ৮. নতুন আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতির প্রভাব, ৯. পরিবহন ও যোগাযোগ ইত্যাদি।

লক্ষণীয় বিষয় হল এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোনো কারণ তো উল্লেখ করা হয় নি উপরোক্ত ৭ নং এ উল্লিখিত মহৎ বা প্রভাবশালী ব্যক্তির ভূমিকা অনুচ্ছেদে বিভিন্ন দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তির কথা বলা হলেও কোনো মুসলিম ব্যক্তির কথা আসেনি। সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা পালনকারী যে সকল ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয় তাঁরা হলেন — জর্জ ওয়াশিংটন, কামাল পাশা, রাজা রামমোহন রায়, বেগম রোকেয়া, লেনিন, মহাত্মা গান্ধী, এ কে ফজলুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ।[৬১] কোনো নবী-রাসূল (আ)-এর কথা এতে উল্লেখ করা হয়নি।

নবম-দশম শ্রেণীর গার্হস্থ অর্থনীতি বই-এ গৃহ ও গৃহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনায় গৃহ ব্যবস্থাপকের যে সকল গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল বুদ্ধিমত্তা, উদ্দীপনা, মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান, সৃজনী শক্তি, বিচার বুদ্ধি অধ্যাবসায়, অভিযোজ্যতা, আত্মসংযম, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি।[৬২] অথচ একজন মুসলমানের যে সকল গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়নি। মুসলমানের প্রথম গুণই হল তার ঈমান। সুতরাং একজন মুসলিম পরিবার প্রধানকে অবশ্যই ঈমাদার হতে হবে। তা ছাড়া মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর পরিচয়, সৃষ্ট জীব হিসেবে মহান স্রষ্টার প্রতি-পালনীয় দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা না থাকলে ভবিষ্যৎ বংশধরকে মানুষ করার সুযোগ থাকে কোথায় ?

অন্যত্র গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব-কর্তব্য শিরোনামের আলোচনায় ইসলামী জীবন পদ্ধতির আলোকে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে কোন আলোচনায় আসেনি। শুধু ইসলামী জীবন পদ্ধতিই নয় মুসলিম পরিবারের ঐতিহ্যগতভাবে লালিত পালিত সংস্কার ও জীবনবোধকে স্থান দেয়া হয়নি। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বা মহানবী (সা)-এর আদর্শ পারিবারিক জীবনের নিদর্শন সামনে থাকলেও তার আলোকে গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব কর্তব্য পালনের জন্য কোন শিক্ষা এ ক্ষেত্রে দেয়া হয়নি।

তবে এতে 'একজন স্কুল ছাত্রীর জন্য একটি দৈনিক (স্কুল খোলার দিনে) সময় তালিকার নমুনা' শিরোনামে যে তালিকা দেয়া হয়েছে তাতে—সকাল ৫.৪০ থেকে ৫.৫৫, বেলা ২.২০ থেকে ২.৩৫, বিকেল ৫.০০ থেকে ৫.১৫, সন্ধ্যা ৬.৪০ থেকে ৭.০০ এবং রাত ১১.০০ থেকে ১১.১৫ মিনিট পর্যন্ত সামান্য সময়ের জন্য হলেও নামায/প্রার্থনার সময় রাখা হয়েছে। তবে ছুটির দিনের জন্য যে সময় তালিকা দেয়া হয়েছে তাতে অন্যান্য নামায/প্রার্থনার সময় অপরিবর্তিত থাকলেও দুপুরের নামায.প্রার্থনার জন্য কোন সময় বরাদ্দ রাখা হয়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ২৪ ঘন্টা সময়ের মধ্যে মাত্র এক ঘন্টা সময় ছাত্রীদের মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য ব্যয় করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, ছুটির মত অবসর দিনে যার পরিমাণ না বাড়িয়ে বরং আরো ১৫ মিনিট কমিয়ে সময়সূচী প্রণীত হয়েছে।[৬৩]

পরিবারের শিশুর যত্ন অধ্যায়ে শিশু পরিচর্যার আধুনিক কলা-কৌশল শিক্ষা দিলেও এ সংক্রান্ত ইসলামী শরী'আতের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা যেমন - সুন্দর নাম রাখা, আকিকা ইত্যাদি বিষয়ে কোন শিক্ষার কথা বলা হয়নি। তা ছাড়া শিশুকে মায়ের দুধ পান করানোর ব্যাপারে এখানে জোরালো তাগিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ এ ক্ষেত্রে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ নির্দেশনা থাকলেও তা উল্লেখ করা হয়নি।[৬৪]

---

৬১. *সামাজিক বিজ্ঞান*, অষ্টম শ্রেণী, রচনা মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরী ও আরো চার জন, সম্পাদনা মো. শামসুল হক সহ চার জন, প্রকাশক : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০০০, পৃ. ১৩

৬২. *গার্হস্থ অর্থনীতি*, নবম শ্রেণী, রচনা হোসনে আরা আমিন, নঈমা আখতার, প্রকাশক : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ২০-২৪

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪-২৬

৬৪. গার্হস্থ অর্থনীতি, নবম শ্রেণী। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫-৬২

www.pathagar.com

নবম-দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস নামে যে বইটি পাঠ্যভুক্ত রয়েছে তাতে প্রাচীন সভ্যতা শিরোনামে বিভিন্ন সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরই এক পর্যায়ে নবীদের উন্মেষের স্তর অনুচ্ছেদে তাচ্ছিল্যভাবে নবী (আ)-দের নাম উচ্চারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে :

ধর্ম সংস্কার করতে গিয়ে হিব্রুদের (সম্ভবত ভুলবশত 'মধ্যে' কথাটি বাদ পড়েছে) বেশ কয়েকজন নবীর আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে আমস, দোসিয়া, ঈসা (আ) এবং মিকাহ প্রধান।[৬৫]

নবী আলাইহিস সালাতু আসসালামের ধর্ম প্রচার সম্পর্কে বলা হয়েছে —

অষ্টম ও সপ্তম খ্রীস্টপূর্বাব্দে নবীদের (আলাইহি ওয়াস সালাম শব্দটি ব্যবহার না করে চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দেয়া হয়েছে) প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল হিব্রুদের উপর। তাঁরা সর্বশক্তিমান একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনার কথা প্রচার করেছিলেন।[৬৬]

বলাবাহুল্য নবী-রাসূল (আ)-দের সকলেই তাওহীদ ভিত্তিক ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ভাব ভাষায় এ ক্ষেত্রে 'ঈশ্বর' 'আরাধনা' ইত্যাদি বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার করে প্রকারান্তরে তাঁদের ইসলামী পরিচয়কে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা যেন ফুটে উঠেছে।

পরবর্তী পর্যায়েও নবী (আ)-গণের নাম উল্লেখ শ্রদ্ধার সাথে করা হয়নি। তা ছাড়া তাঁরা যে স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তাঁর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্রতী ছিলেন এ বিষয়টি বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়নি।[৬৭]

বাঙালী সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মীয় প্রসঙ্গ টেনে এনে এখানে বলা হয়েছে —

একাদশ শতক থেকে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য সূফী সাধকগণ আসতে থাকে। বাংলাদেশের সাধারণ হিন্দু বৌদ্ধদের অনেকেই এ সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এভাবে ধীরে ধীরে বাংলায় একটি মুসলিম সমাজ কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। এ যুগে পুরো বাংলায় হিন্দু আর মুসলমান পাশাপাশি বাস করছিল। ফলে একে অন্যের চিন্তা-ভাবনা ও আচার-আচরণে মিশ্রণ ঘটতে থাকে। এভাবে বাংলায় যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে তাকেই বলা চলে বাঙালী সংস্কৃতি।[৬৮]

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হিন্দু সংস্কৃতিতে মুসলিম সংস্কার অন্তর্ভুক্তির তেমন উদাহরণ নেই। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুয়ানী কিছু কৃষ্টি ঢুকে পড়ে। চন্দন-তিলক আঁকা, অ-আরবী নাম রাখা, ছবি-কবর পূজা, পুষ্পস্তবক অর্পণের আজকের এই প্রতিযোগিতা সেই সংস্কৃতিরই অংশ। সম্ভবত এটিকেই বাঙালী সংস্কৃতি হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াসের কথা বলা হয়ে থাকতে পারে।

নবম-দশম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান পুস্তকে বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হলেও এখানে ইসলাম নিয়ে কোন আলোচনা স্থান পায়নি।[৬৯] পাশ্চাত্যের সেকুলার মনীষী টেইলর, ডুরযেইম, ফেজারের দেয়া ধর্মের সংজ্ঞা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আত্মিক জীবে বিশ্বাস, বা পবিত্র

---

৬৫. *বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস*, রচনা ঃ ড. রতন লাল চক্রবর্তী, ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, সম্পাদনা —ড. সিরাজুল ইসলাম, ড. এ বি এম শামসউদ্দীন আহমদ, ২০০০ শিক্ষা বর্ষ সংশোধিত ও পরিমার্জিত, প্রকাশক : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ২০

৬৬. পূর্বোক্ত

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ০৫-৩২

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

৬৯. *সামাজিক বিজ্ঞান*, নবম-দশম শ্রেণী, রচনা - রওশন আরা বেগম, আবদুল হাই শিকদার, আব্দুস শহীদ, মো. আবুল হাসান, মো. তাবারেক আলী, মনোয়ারা সুলতানা, তাহমিনা রহমান, মোঃ শামসুল হক, জাহান-ই-গুলশান, মনোয়ারা রশিদ, এরফানউদ্দিন আহমদ, প্রথম মুদ্রণ মার্চ ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯৭ (১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষে সংশোধিত ও পরিমার্জিত), পৃ. ২১

www.pathagar.com

জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস বা অতি প্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস যার মূল প্রতিপাদ্য।

ধর্মের উৎপত্তি বিকাশের ধারণায় ইসলামী বিশ্বাসের কোন মূল্য দেয়া হয়নি। প্রথম মানব হযরত আদম (আ) হতেই যে একেশ্বরবাদী ধর্মের উৎপত্তি — ইসলামের এই বিশ্বাসকে ম্লান করে এখানে টেইলর আর মেরেটের মতবাদ শেখানো হয়েছে। ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনবাদী টেইলরের ধারণা এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এতে বলা হয় —

আদিম মানুষ প্রথমে আত্মা, প্রেতাত্মা ও নিজ নিজ মৃত পূর্ব পুরুষের পূজা করতো। পরে তাদের মধ্যে প্রকৃতি পূজার উন্মেষ ঘটে। ফলে তারা নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, চাঁদ-তারা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা শুরু করে। প্রকৃতি পূজা থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় দেব-দেবীর মূর্তি পূজার উদ্ভব হয়। এ পর্যায়ে আদিম মানুষ ছিল বহু ঈশ্বরবাদী। কালক্রমে তাদের মধ্যে পরমেশ্বরের ধারণার সৃষ্টি হয় এবং সমাজে একেশ্বরবাদের উদ্ভব হয়।[৭০]

মেরেট নামক আর একজন মনীষীর মত এখানে তুলে ধরা হয়। তার মতে —

সর্বপ্রাণবাদে পৌঁছার আগে আদিম মানুষের মনে মনা বা নৈব্যক্তিকে প্রাকৃত শক্তির ধারণা জন্মে। এ তত্ত্বের নাম মহাপ্রাণবাদ।[৭১]

তার মতে —

আদিম মানুষ এই মনা শক্তির উপস্থিতি অনুধাবন করে এবং সেগুলোকে ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে থাকে। আর এভাবেই আদিম সমাজে ধর্ম উৎপত্তি লাভ করে।[৭২]

এই বই এর অন্যত্র রয়েছে বাংলাদেশে অপরাধের কারণ। এর মধ্যে যে আটটি কারণের কথা বলা হয়েছে তাতে নৈতিক মূল্যবোধের বা ধর্মীয় চেতনার অভাব যে অন্যতম কারণ সে ধারণা অনুপস্থিত।[৭৩]

তবে প্রতিকারের ক্ষেত্রে নৈতিক বা ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে বলে স্বীকার করা হয়েছে।[৭৪] পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষত অপরাধ, যৌতুক প্রথা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব বিষয়ে সমস্যা ও তার প্রতিকারের কোন পর্যায়েই ইসলামী মূল্যবোধের কোন ভূমিকা রয়েছে বলে স্বীকার করা হয়নি।[৭৫] তবে এসব ক্ষেত্রে গোষ্ঠী বা সাধারণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে বলে ধারণা দেয়া হয়েছে।[৭৬]

উল্লিখিত ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের বই সমূহে ইসলামী সংস্কৃতি ও ইতিহাসের কোন স্থান হয়নি। বরং এর পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামের বিপরীতধর্মী বা অগ্রহণযোগ্য বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই মুসলিম পরিবারের চিত্র প্রতিফলিত হয়নি। এ সব বিষয় নিঃসন্দেহে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় বা উচিৎ নয়।

৩.২ ইসলামী ও সাধারণ ইতিহাস বিকৃতি

তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)-এ দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এই দেশপ্রেমের পাশাপাশি অন্য দেশের প্রতি ঘৃণা জাগানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি জাতীয় দিবসের আলোচনায় দেশের প্রতি মমত্ববোধের চেয়ে অন্যের (পাকিস্তান) প্রতি ঘৃণা প্রাধান্য পেয়েছে। ৭ নভেম্বরের মহান জাতীয় সংহতি দিবসের কোন আলোচনা এতে স্থান পায়নি। ফলে সত্য ইতিহাস থেকে জাতির আগামী দিনের কর্ণধার শিশু-কিশোরদের অন্ধকারে রাখা হয়েছে।

---

৭০. সামাজিক বিজ্ঞান, অষ্টম শ্রেণী, পূর্বোক্ত
৭১. পূর্বোক্ত
৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০-৪১
৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২-৪৬
৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

www.pathagar.com

একই অধ্যায়ে 'প্রাচীনকালের বাংলাদেশ' শিরোনামে এদেশের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক আলোচনায় ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীকে 'দখলদার' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৭৭] অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে মুসলিম আমলের অবস্থা আলোচনার বাইরে রয়েছে। তাছাড়া প্রাচীন বাংলাদেশের আলোচনায় এদেশের অধিবাসীকে 'বাঙালী' বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে একে ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।[৭৮]

অষ্টম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান বই এ বাংলার শিক্ষা ও সংস্কার বিষয়ক আলোচনায় পাঁচ ব্যক্তির জীবন ও অবদান নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এঁরা হলেন —

১. হাজী মুহম্মদ মহসীন, ২. রাজা রামমোহন রায়, ৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৪. নবাব আবদুল লতিফ, ৫. সৈয়দ আমীর আলী।

এঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অতি মহান হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বিশষত প্রথম ব্যক্তিকে গর্বের সাথে আধুনিক ভারতের স্থপতি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।[৭৯] প্রকৃত পক্ষে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের জন্য তিনি সবিশেষ খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া আধুনিক ভারতের স্থপতি যদি তিনি হয়েই থাকেন তা নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের গর্বের কি থাকতে পারে তা বোঝা দুষ্কর। সুতরাং তাঁর মত ভারতীয় নেতাকে এদেশের শিশু-কিশোরদের কাছে বিরাট বড় ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থানের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা নিশ্চয়ই ভেবে দেখার অবকাশ রাখে। অপর পক্ষে বাংলার মানুষের শিক্ষা আন্দোলনে যিনি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন স্যার সলিমুল্লাহ। শিক্ষা ও সংস্কার বিষয়ক আন্দোলনে যাঁর নামই উচ্চারিত হয়নি।

এর অন্যত্র নবাব সিরাজ উদ্-দৌলার পরিচয়, সিংহাসন লাভ, ইংরেজদের সাথে বিরোধ, ইংরেজদের ষড়যন্ত্র এবং পলাশীর যুদ্ধ ও তার দুঃখজনক পরিণতির ইতিহাস স্থান পেয়েছে। পলাশীতে যে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল এমন ধারণা এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত লক্ষ্য করা যায়। ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই যে নবাব সিরাজ উদ্-দৌলার পরাজয় ঘটেছিল সে সত্যকে উপক্ষো করে নবাবের যোগ্যতার প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করে এক স্থানে বলা হয় —

তবে তাঁর (সিরাজ) পরাজয়ের জন্য তিনি নিজেও কিছুটা দায়ী ছিলেন।[৮০]

এর পরেই অবশ্য তৎকালীন সংক্ষুব্ধ ও প্রতিকূল পরিবেশের কথা বলা হয়েছে।[৮১] কিন্তু ওপরের ঐ বাক্যটি কোমলমতি শিশুদের মনে নবাব সম্পর্কে বিরূপ ধারণার জন্ম দিতে পারে।

এর এক স্থানে প্রাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কোম্পানী এদেশের মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে এমন ধারণারই ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম আমলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনায় বলা হয় —

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হত মক্তব মাদ্রাসা ও টোলকে কেন্দ্র করে।[৮২]

---

৭৭. *পরিবেশ পরিচিতি* (সমাজ), তৃতীয় শ্রেণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪-৬৯

৭৯. *সামাজিক বিজ্ঞান*, অষ্টম শ্রেণী, রচনা - মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরী ও আরো চার জন, সম্পাদনা মো. শামসুল হক সহ চার জন, প্রকাশক: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০০০, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৮০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪-২৬

৮২. *সমাজি বিজ্ঞান*, অষ্টম শ্রেণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

www.pathagar.com

এরপর এক রকম কটাক্ষ করেই বলা হয় —

এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মূলত ধর্মশাস্ত্র শেখানো হত।[৮৩]

যা আদৌ বাস্তব ভিত্তিক বলে বিবেচনার কোন কারণ নেই। মুসলিম আমলে প্রচলিত ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা বা এর উন্নত মান সম্পর্কে খোদ উইলিয়াম হান্টার পর্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। তিনি তাঁর একটি গ্রন্থে, ভারতীয় মুসলমান : তারা কি রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বিবেকমতে বাধ্য ? শিরোনামে লেখেন —

> *আমরা এদেশের মালিক হওয়ার পূর্বে তারা (মুসলমানরা) শুধু এদেশের রাজনৈতিক নিয়ন্তাই ছিল না-চিন্তার ক্ষেত্রেও তারা ছিল প্রধান শক্তি। তাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাচীন ধরনের হলেও মূল নীতির দিক থেকে মোটেও হীন ছিল না। এর মধ্যে দিয়েই তাদের উচ্চস্তরের মানবিক বিকাশ ও উন্নতি ঘটতো। ভারতের তৎকালীন অন্য যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে এই ব্যবস্থা বহুগুণ উচ্চমানের ছিল। এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই চিন্তার ক্ষেত্রে বৈষয়িক ব্যাপারে এরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল।*[৮৪]

বলাই বাহুল্য এই বাস্তবতা উল্লিখিত পাঠ্যপুস্তকে প্রতিভাত হয়নি মোটেও।

একইভাবে ফকির আন্দোলন-তীতুমীরের সংগ্রাম-ফারায়েজী আন্দোল ও নীল বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এতে ফকিরদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা প্রদানের প্রচেষ্টা বেশ স্পষ্ট। যেমন ফকির আন্দোলন শিরোনামে তাদের পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে —

> *মুঘল আমলে এদের নিষ্কর ভূমি দান করা হত। তারা অবাধে ধর্মীয় কাজ চালাতে পারতেন। তাই তারা শান্ত ছিলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার এই নীতির পরিবর্তন করে। তাই ফকিররা বেশ কিছু বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেন।*[৮৫]

অন্যত্র বৃটিশদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় —

> *ফকিরদের আন্দোনের উদ্দেশ্য ছিল অবাধে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা। তারা জাতীয়তাবোধে তেমন উদ্বুদ্ধ ছিলেন না।*[৮৬]

এ ধরনের বক্তব্যে শ্রদ্ধেয় পীর-দরবেশ-ফকিরদের প্রতি বিরূপ ধারণার জন্ম হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি ? কিন্তু এঁরা কি এমনই ব্যক্তি ছিলেন যাঁদের প্রতি আজকের শিশু-কিশোরদের অশ্রদ্ধা জাগানো দরকার ?

বাংলার সূর্য সন্তান বীর মুজাহিদ মীর নেছার আলী ওরফে তিতুমীর সম্পর্কে এই বই-এর এক স্থানে বলা হয়েছে —

> *তিতুমীরের দাপটে চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।*[৮৭]

বাস্তবে এ আতঙ্ক ছিল লুটেরা, জমিদার, জোতদারদের মধ্যে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে ছিল তাঁর অগাধ জনপ্রিয়তা এটি এক ঐতিহাসিক সত্য। অথচ সে চিত্র এখানে অনুপস্থিত রয়েছে। ফকির বিদ্রোহ ও তিতুমীরের আন্দোলনের ইতিবাচক দিক তুলে না ধরে বরং এদের দমন প্রয়াসকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রকাশ ভঙ্গিতে প্রতীয়মান হয় যেন এদের দমন প্রক্রিয়া জনসাধারণের

---

৮৩. *সমাজি বিজ্ঞান*, অষ্টম শ্রেণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
৮৪. উইলিয়াম হান্টার, *দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস*,
৮৫. *সামাজিক বিজ্ঞান*, অষ্টম শ্রেণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯
৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

www.pathagar.com

কাছে কাঙ্খিত ছিল।[৮৮]

এ বই এর অন্য স্থানে সিপাহী বিদ্রোহকে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন বলে প্রচারের চেষ্টা রয়েছে। বাস্তবে এটা যে মাসুলমানদেরই আন্দোলন ছিল সেটি অস্বীকারের কোন সুযোগ নেই। এ কারণে যে মুসলমানদের ইংরেজ শাসকদের তোপের মুখে পড়তে হয় তা সকলেরই জানা এবং এখানে সেটি স্বীকারও করা হয়েছে।[৮৯] এ প্রসঙ্গে বলা হয় —

সংগ্রামের ব্যর্থতার পর ইংরেজরা মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।[৯০]

বোঝাই যাচ্ছে যে, উভয় সম্প্রদায়ের লোকই যদি জড়িত থাকে তাহলে কেন শুধু মুসলমানদের ওপর তাদের আক্রোশ জাগবে ? তাছাড়া ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে ইংরেজদের কোন বিরোধ লক্ষ্য করা যায়না। বরং তারা মুসলমানদেরই তাদের শত্রু বিবেচনা করতো। মুসলমানরা অবশ্য তাদের এই ধারণাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও কখনো করেনি। বিষয়টি উল্লিখিত পাঠ্যপুস্তকের অন্যত্র আংশিকভাবে স্বীকার করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে —

১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বৃটিশ সরকার মুসলমানদের দায়ী করে। তারা ইংরেজদের অত্যাচারের শিকার হয়।[৯১]

পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে বেশ বড় করে তুলে ধরার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাশবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে একে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারকারী আন্দোলন হিসেবে প্রচারের প্রয়াস বেশ জোরেশোরে চালানো হয়েছে।[৯২] যা কতটুকু বাস্তবসম্মত সে বিষয়ে অনুসন্ধানের অবকাশ রয়েছে। কবি নজরুলের প্রচেষ্টা বা সন্ত্রাশবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা, বাংলা বিভাগের বিষয়ে তাদের তেমন তৎপরতা ছিল বলে ইতিহাসে কোন প্রমাণ নেই।

নবম-দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস পুস্তকের বাংলাদেশের ইতিহাস পর্বে প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ, আধুনিক যুগ এ তিন ভাগে ভাগ করে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। প্রাচীন যুগে আর্যদের এদেশের ক্ষমতায় আরোহণকে 'প্রবেশ' বলে অভিহিত করে তাদের প্রশংসায় বলা হয় —

ভারতবর্ষে আর্য জাতি প্রবেশ করেছিল খ্রিষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর পূর্বে। তারা ভারতে এক উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়ে তোলে।[৯৩]

অথচ মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমনকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়কে 'দখল' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়—

ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের রাজ ক্ষমতা দখলের পর থেকে শুরু হয় বাংলার মধ্যযুগের কালপর্ব।[৯৪]

আধুনিক যুগে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে বলা হয় —

---

৮৮. *সামাজিক বিজ্ঞান*, অষ্টম শ্রেণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩
৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫
৯৩. *বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস*, রচনা : ড. রতন লাল চক্রবর্তী, ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, সম্পাদনা : ড. সিরাজুল ইসলাম, ড. এ বি এম শামসউদ্দীন আহমদ, ২০০০ শিক্ষাবর্ষে সংশোধিত ও পরিমার্জিত, প্রকাশক : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৪৩
৯৪. পূর্বোক্ত

www.pathagar.com

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ধীরে ধীরে বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষের বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। এ বিক্ষোভ বেশী ছিল মুসলমানদের মনে। কারণ তাদের হাত থেকেই ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল।[৯৫]

বলাবাহুল্য ইংরেজরা শুধু ক্ষমতা কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং মুসলমানদের মূল প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে নানাভাবে তাদের ক্ষতি করতে সচেষ্ট ছিল। এ কারণেই পরবর্তী একশো বছর মুসলমানরা ইংরেজ প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ। কিন্তু এই সত্য ইতিহাস এখানে অনুপস্থিত।

চতুর্থ অধ্যায়ে বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি শিরোনামে বঙ্গভঙ্গের পটভূমি, এর কারণ, প্রতিক্রিয়া, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন, বয়কট আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, মর্লি মিন্টো সংস্কার আইন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। বঙ্গভঙ্গের কারণ পর্বে লর্ড কার্জনের এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের সমালোচনায় এখানে বলা হয় —

তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবিরা ক্রমশঃ জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠছে। কলকাতা হতে সমগ্র ভারতে কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালনা করছে। সে ক্ষেত্রে লর্ড কার্জন বিভেদ ও শাসন নীতি প্রয়োগ করে বাংলাকে শাসন করতে চাইলেন। কেননা বাংলাকে ভাগ করা হলে বাঙালীরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং কলকাতা হতে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র সরে যাবে। অন্যদিকে ঐক্যবদ্ধ বাংলা ছিল এক বিরাট শক্তি এবং সেক্ষেত্রে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বৃটিশ সম্রাজ্যের পক্ষে মোটেও নিরাপদ ছিল না।[৯৬]

এতে বঙ্গভঙ্গের কারণ সম্পর্কে আরো বলা হয় —

কেননা বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হয়ে বৃটিশ সরকারের প্রতি অনুগত হবে। অন্যদিকে এ দেশ বিভাগ মুসলমানদের অখণ্ডতাকে নিশ্চিত করে ভারতের জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করে তুলবে।[৯৭]

এতে আরো যে সমস্ত বিতর্কিত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে তা হলো :

- *বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে স্বদেশী আন্দোলকে মুসলমানগণ সমর্থন করেনি। ফলে বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনকে ঘিরে হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কে ফাটল ধরে। এর ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী।*[৯৮]
- *প্রকৃত পক্ষে জাতিগত প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করে ইংরেজ সরকার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে তোলে। এ ঘটনা পরবর্তী রাজনৈতিক অগ্রগতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।*[৯৯]
- *মুহম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে পরস্পরের নিকটে আনার জন্যে তথা হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। এ জন্য মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের অগ্রদূত হিসেবে আখ্যায়িত করেন কংগ্রেস নেতা গোখলে।*[১০০]

খিলাফত আন্দোলনকালে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয় —

---

৯৫. *বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১
৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩
১০০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪

www.pathagar.com

০ ধর্মীয় দিক হতে তারা ছিলেন তুরস্কের সুলতানের সমর্থক। অন্যদিকে রাজনৈতিক দিক হতে এ সময় মুসলমানরা ছিলেন বৃটিশ সরকারের অনুগত। যুদ্ধের সময় মুসলিম লীগও কংগ্রেসের মত বৃটিশ সরকারকে সর্বোতভাবে সাহায্য করে।[১০১]

ওপরের বক্তব্যগুলো কতটা ঐতিহাসিক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত লর্ড কার্জনের পরিকল্পনার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য যাই থাক বঙ্গভঙ্গ না হলে পাকিস্তান হোত না, আর পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশের জন্ম হওয়া সম্ভব ছিলো না। সুতরাং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে বড় করে প্রকাশ করা বা এর পিছনে ইংরেজ সরকারের দূরভিসন্ধি আবিষ্কার করে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে আঘাত করার কোন প্রয়োজন অন্তত দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীর অন্তরে থাকার কথা নয়। একই সাথে স্বদেশী আন্দোলন মুসলমানেরা সমর্থন করেনি, জিন্নাহ ছিলেন হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত আর খিলাফত আন্দোলনকালে মুসলমানেরা ব্রিটিশ সরকারের অনুগত ছিলেন এসব বক্তব্য কতটা সত্যনিষ্ঠ সে বিষয়ে নিশ্চয় বিতর্ক রয়েছে।

তাছাড়া বাস্তাবিক পক্ষে বঙ্গভঙ্গের সাথে স্বদেশী আন্দোলনের তেমন নিবিড় সম্পর্ক ছিল বলে মনে হওয়ার কোন কারণ নেই। এর প্রমাণ মেলে যখন বলা হয় —

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও এ আন্দোলন বন্ধ হয়নি। ১৯০৮ সাল হতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন চলে।[১০২]

ভারতে প্রকৃত পক্ষে এ আন্দোলনের সূচনা ১৮০৭ সালে বলেও এতে উল্লেখ করা হয়।[১০৩]

এর আর এক স্থানে মহাত্মা গান্ধীকে খিলাফত নেতা হিসেবে বর্ণনা করে এতে বলা হয় —

একমাত্র মাহাত্মা গান্ধী ব্যতীত খিলাফতের প্রায় সব নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।[১০৪]

মুসলমানদের এই খিলাফত আন্দোলনে হিন্দু নেতা (মহাত্ম গান্ধী) কিভাবে নেতা হতে পারেন তা আল্লাহই মালুম, তবে তিনি যদি সত্যিই এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন তাহলে এতবড় নেতাকে বাদ দিয়ে ছোট-খাটো নেতাদের (?) গ্রেফতার করারই বা কারণ কি ছিলো তা এখানে অপরিষ্কার রয়ে গেছে।

১৯২২ সালে গান্ধীর হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধের পক্ষে সাফাই গেয়ে এ আন্দোলন বন্ধের যৌক্তিকতা ছিলো বলে প্রমাণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[১০৫] কিন্তু খিলাফতের সকল নেতা-কর্মীকে জেলে রেখে ঐ আন্দোলন বন্ধের সিদ্ধান্ত ইংরেজদের পক্ষে যায়। এর ফলে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের ফাটল ধরে এ কথা যেমন সার্বজনীনভাবে সত্য এবং সে বিষয়টি পরে স্বীকারও করা হয়। এ পর্যায়ে বলা হয়—

অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ বন্ধ করার ফলে মুসলমানগণ কংগ্রেসের উপর বিক্ষুব্ধ হয়। ভবিষ্যতে হিন্দুদের সাথে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনে তাদের সংশয় সৃষ্টি হয়। বাংলার কিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর আর হিন্দু-মুসলিম মিলন সম্ভব হয়নি।[১০৬]

---

১০১. *বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
১০২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩
১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪
১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২
১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২
১০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

www.pathagar.com

গান্ধীর ঐ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধের পক্ষে সাফাই গেয়ে আবার বলা হয় —

শেষ পর্যন্ত ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। উত্তেজিত জনতা চৌরিচৌরা থানায় আগুন লাগিয়ে ২১ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারে। এ ঘটনায় গান্ধী উপলব্ধি করেন যে, দেশবাসী অহিংস আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত নয়। ফলে তিনি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধের নির্দেশ দেন।[১০৭]

বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিলের জন্য মূলত হিন্দুরা দায়ী হলেও তা এক্ষেত্রে ফুটে ওঠেনি বরং মুসলমানদের এ জন্য আংশিকভাবে দায়ী করা হয়।[১০৮]

এই বই এর সপ্তম অধ্যায়ের উপসংহারে স্বাধীনতার জন্য তিতুমীর, হাজী শরিয়তউল্লাহ, ক্ষুদিরাম, মাষ্টার দা, প্রীতিলতা প্রমুখকে বীর হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও মুসলিম বীর শহীদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (র)-এর কথা উচ্চারণ করা হয়নি।[১০৯]

প্রাচীনকাল থেকে বঙ্গভঙ্গ-পূর্ব পর্যন্ত আলোচনায় এক পর্যায়ে বৃটিশ বিরোধী তৎপরতার কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে —

ভারতবর্ষ বৃটিশ সরকারের অধীনস্ত হয়ে পড়ার পর এ দেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতি অনুভব করলো যে অধিকার আদায় করতে হলে সুচিন্তিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। এ জন্য প্রথম প্রয়োজন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া, এরপর রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা।[১১০]

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এটি ছিল তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানদের ভাবনা বা বোধদয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকরা প্রথম থেকেই বৃটিশদের এদেশে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে ইংরেজদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে এক দিকে তারা যেমন প্রতিশোধের আগুন নিভাতে চেয়েছিল, অন্য দিকে ইংরেজদের দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে তৎপর ছিল। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব বিরাজ করছিল। এই মনোভাবের কারণে তারা ইংরেজী ভাষাকে ঘৃণার চোখে দেখতো। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বত্র মুসলমান শাসকদের প্রবর্তিত ফারসী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা প্রবর্তনের পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার পিছনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা তুলে নিলে মুসলমানরা অসহায় বোধ করতে থাকে। এই সময় স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও নবাব আবদুল লতিফের মত প্রগতিশীল মুসলিম চিন্তাবিদরা মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস চালান। সুতরাং 'ক্ষমতা হারানোর অভিমানে মুসলমানরা পিছিয়ে ছিল' বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা আসলে সঠিক ইতিহাস নয়।

একইভাবে বাংলার জাগরণ পর্যায়ে ফকির বিদ্রোহের ইতিহাসে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। আলোচনার একস্থানে বলা হয় —

১৭৮০ সালে মজনু শাহ্ বগুড়া জেলার কালায়ের জমিদার শ্রীকৃষ্ণের নিকট ৫০,০০০/- টাকা দাবী করেন। শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে অন্যত্র চলে যান।[১১১]

এমনিভাবে ঐতিহাসিক তথ্য বিকৃতির মাধ্যমে মুসলমানদের ইংরেজ বিরোধী স্বাধীকার আন্দোলনকে খাটো করে ফকির মজনু শাহ-এর মত বীর সেনানীকে চাঁদাবাজ বা ডাকাত হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়া সকল আন্দোলনের পিছনে অমুসলিমদের কোন ভূমিকা থাক বা না থাক উভয় সম্প্রদায়ের আন্দোলন বলে তা চালিয়ে দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

---

১০৭. *বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২
১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮
১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০
১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮
১১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

www.pathagar.com

৩.৪ জনসংখ্যা বিষয়ক আলোচনা

এখানে আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তৃতীয় হতে নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাশের পাঠ্যপুস্তকের শেষ দিকে জনসংখ্যা বিষয়ক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে এদেশের জনসংখ্যা অধিক উল্লেখ করে এর নানা সমস্যার দিক তুলে ধরা, এর কারণে সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে বলে প্রমাণ করে প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব উল্লেখ করে তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান-খাদ্য-পুষ্টি নিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে প্রমাণের অপচেষ্টা, এ থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে ছোট্ট বয়সের শিশুদের ধারণা দেয়ার প্রচেষ্টা রয়েছে। একজন কোমলমতি শিশুর জন্য যা মোটেই উপযোগী নয়।

নবম-দশম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ হিসেবে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, মহিলাদের কর্মসংস্থানের অভাব, দারিদ্র্য, ধর্মীয় গোঁড়ামী, বাল্য বিবাহ, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, চিত্ত বিনোদনের অভাব এই সাতটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ধর্মীয় গোঁড়ামী পর্যায়ে মুসলমানদের আক্রমণ করে বলা হয় —

> *ধর্মভীরু মুসলমানগণ বিয়ে ও সন্তান জন্মদানকে পবিত্র জ্ঞান করে। সন্তান জন্মদানে মানুষের হাত নেই। সন্তান আল্লাহর দান, মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি, এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।*[১১২]

এখানের বক্তব্য ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন পর্যায়ে পড়ে তা বিবেচনার অবকাশ রয়ে যায়। অথচ এই বিষয়ে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের স্কুল জীবন থেকেই শোনানো হচ্ছে এই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে।

(চার)

৪. উপসংহার

উপরে উপস্থাপিত তথ্য ও উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শিক্ষার ইসলামীকরণে প্রজাতন্ত্রের দায়বদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু সরকারী পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক বিশেষত গত কয়েক বছরে যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীদের হাতে দেয়া হয়েছে তাতে ইসলামী তাহজিব-তমদ্দুন বা ইসলামী মূল্যবোধ তো দূরের কথা বরং এর উল্টোটাই শেখানোর প্রয়াস চালানো হয়েছে। আজকের শিশু-কিশোর যারা দেশে আগামীর ভবিষ্যৎ তাদের মুসলমান নয় বরং বাঙালী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টাবেশ জোরে শোরে চালানো হয়েছে।

সর্বক্ষেত্রে যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস যখন রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকাণ্ডের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। অন্য দিকে ওআইসি'র মক্কা ঘোষণার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ— তখন আগামী দিনের নাগরিক আজকের শিশু-কিশোরকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর পরিচয় ও নির্দেশনা কতটা গুরুত্ব বহন করতে পারে তা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু বাস্তবে এই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়ন রয়েছে কিনা তার জবাব ইতিবাচক নয়। এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগের অবস্থা যেন অনেকটা উল্টো দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর বেসরকারী শিক্ষা ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন আশা করা বাতুলতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কারণ সেক্ষেত্রে সরকারী বা কোনো পর্যায়েই নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ম-নীতি নেই বা থাকলেও তার বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ফলে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া এ সময়ে সাংবিধানিক অঙ্গীকার রক্ষায় বা ওআইসি-এর মক্কা ঘোষণার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কোন উদ্যোগ নেই এ কথা বলা যায়।

---

১১২. *সামাজিক বিজ্ঞান*, নবম-দশম শ্রেণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

www.pathagar.com

এখন হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যম তো দেশে ইসলামী শিক্ষার সুযোগ অবারিত রয়েছে এবং এ জন্য সরকারী বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার দায়বদ্ধতা নিবারণ হতে পারে বলে অনেকে মনে করতে পারেন। কিন্তু ইসলামী শিক্ষার প্রচলন আর শিক্ষার ইসলামীকরণ এক বিষয় নয়। উপরোক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা অনুযায়ী আজ দেশে প্রচলিত শিক্ষাকে ইসলামীকরণ করাই জরুরী। আর সে ক্ষেত্রে বিশেষত স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। কারণ এ দেশের শতকরা ৭৫% ভাগ শিক্ষার্থী স্কুলের ওপর নির্ভরশীল। একই সাথে বেসরকারী পর্যায়ের শিক্ষায় যাতে রাষ্ট্রীয় এই অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃপক্ষের নেই। এ কারণে শিক্ষার ইসলামীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

সুপারিশমালা

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামীকরণে প্রথমেই এই মর্মে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতে হবে যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলামের সুষম শিক্ষা নীতির আলোকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে। এরপর বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। পর্যায়ক্রমে গৃহীতব্য সে পদক্ষেপগুলো হলো :

১. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করতে হবে। বিশেষত বর্তমানে প্রচলিত সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তরের সরকারী, বে-সরকারী সকল পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী মূল্যবোধ পরিপন্থী উপাদান চিহ্নিত করে তা অপসারণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. ইসলামের মৌলিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং বিশিষ্ট শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাবিদ সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী শিক্ষা কমিশন গঠন করে দেশে একটি সুসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। নিম্নের বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে :

(ক) এককেন্দ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। অর্থাৎ স্কুল ও মাদ্রাসার দু'টি পৃথক ধারার পরিবর্তে শিক্ষাকে একবিন্দুকে এনে দাঁড় করাতে হবে।

(খ) প্রতিটি মসজিদে প্রাক-প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক পর্যায়ে অন্তত তিনটি অর্থাৎ ১ম থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে মসজিদে।

(গ) পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সকল মুসলমানের জন্য আরবী ভাষা বিশেষত পবিত্র কুরআন ও প্রয়োজনীয় হাদীস শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(ঘ) শিক্ষানীতি যেন ইসলামী তাহজিব-তমদ্দুন ধারণ করে রচিত ও বাস্তবায়িত হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০০৩

ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদ : পর্যালোচনা

মোঃ ইব্রাহীম খলিল*
মোঃ রেজাউল করিম**

মানবজাতির জীবনধারায় সবচেয়ে পুরনো ও অনিবার্য বিষয় হল ধর্ম। প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক, প্রাচীন বা আধুনিক জীবনে কোন না কোন ভাবে ধর্মের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সকল যুগে, সংস্কৃতি বিকাশের সকল স্তরে, সমগ্র মানব গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম স্বমহিমায় বিদ্যমান। ধর্ম তাই মানব জীবনের এক সার্বিক বৈশিষ্ট্য। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সকল সমাজেই কোন না কোন ধর্মীয় ধারণা বা অতিপ্রাকৃত শক্তি কল্পনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী ও অশিক্ষিত সমাজগুলোতে ধর্ম ছিল তাদের কর্মতৎপরতার বৈশিষ্ট্যবহ এক সর্বাত্মক প্রভাবক শক্তি। অন্তত সমাজের একজন সাধারণ অনুশীলনকারীর পক্ষেও তাই সামাজিক ক্ষেত্রে, অগ্রগণ্য বিষয় হিসেবে ধর্মকে অবজ্ঞা করা সম্ভব ছিল না। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম এক সার্বজনীন ও স্থায়ী প্রভাবক। কেবল ধর্ম ছাড়া অন্য কোন বিষয় মানব সংস্কৃতির ওপর সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। মূলত মানবাত্মার চিরায়ত মুক্তি কামনার মধ্যে ধর্মের অপরিহার্যতা নিহিত। এটি মানুষের মন সহজাত এবং তার স্বভাবের অবিভাজ্য ও অনিবার্য অঙ্গ। মানব মনন ও অভিজ্ঞতায় ধর্মের এরূপ গভীর স্পর্শ থাকায় তাতে বহুমাত্রিক ও বিচিত্র উপাদান যুক্ত হয়েছে। বিচিত্র বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা, অনুধ্যান ও আচারে ঋদ্ধ ধর্ম—বিশ্বের সকল মানুষকে তার মধ্যে অন্তলীন করে রেখেছে। কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী তাই ধর্মকে পার্থিব জগতের একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। অতি প্রাচীনকাল থেকে সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মের সর্বসম্মত সংজ্ঞা আজো পাওয়া যায়নি। এখন পর্যন্ত ধর্মের উৎস ও উৎপত্তি বিষয়ে ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, নৃ-তত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে ধর্মের উৎস ও উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন রকমের পরস্পর বিরোধী বা বৈসাদৃশ্যমূলক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল মতবাদের মধ্যে ঈশ্বর প্রত্যাদেশবাদ, অতিবর্তীবাদ, নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ অন্যতম। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে 'ধর্ম' অভিধাটি সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা যায়।

ব্যুৎপত্তিগত বিবেচনায় ধর্ম হল ঈশ্বরোপাসনা পদ্ধতি, আচার-আচরণ, ইহ-পরকাল বিষয়ক নির্দেশ ও তত্ত্ব, কর্তব্যকর্ম, শাস্ত্র, বিধান, সুনীতি, সাধনার পথ, স্বভাব বা গুণ।[১] সংস্কৃতিতে 'ধৃ' ধাতুর সাথে 'মন' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি। যা ধারণ করে, সামাজিক জীবনের বৃহত্তর ঐক্যের ভেতর যা মানুষকে ধরে রাখে-তাই ধর্ম। ইংরেজিতে ধর্ম হল 'Religion অর্থ belief in a higher unseen controlling power esp. in a personal God. অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক শক্তির বিশেষত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। any system of faith and worship, rites or worship, devoted fidelity, ভক্তিপূর্ণ বা নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য an action that one is bound to do. ধর্মাচরণের মত

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা মহানগর, মহিলা কলেজ, ঢাকা।
** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, দনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ঢাকা।

১. *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪ (পুনমুদ্রণ-জানিয়ারি ১৯৯৮) পৃ. ৩৫৩

www.pathagar.com

অবশ্যকরণীয় কর্ম।[২] ইতিহাসে ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন রকম ও এমন পরস্পর বিরোধী মত দেখা যায় যে, ধর্মের মৌলিক পরিচয় প্রকাশের চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অনেকে অনেক ভাবে ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। জন মোরলে (John morley) বলেছেন, কথিত আছে ধর্মের দশ হাজার রকম সংজ্ঞা আছে।[৩] ধর্মের সংজ্ঞার এ সংখ্যাধিক্য প্রমাণ করে, খোদ নৃতাত্ত্বিক-গবেষকগণও ধর্ম সম্পর্কে এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন ও প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন। যে জন্যে ধর্মের সংজ্ঞা যদি দিতেই হয় সম্ভবত নিরীক্ষা শেষে তা উপসংহারেই দেয়া যেতে পারে।

আরবী ভাষায় 'দীন' হল ধর্মের প্রতিশব্দ।[৪] সাধারণত দীন সম্পর্কে তিনটি স্বতন্ত্র ধারণার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। যথা (১) বিচার, প্রতিফল বা প্রতিদান (২) প্রথা, রীতিনীতি (৩) ধর্ম। সাধারণভাবে ধর্মের সমার্থক হিসেবে 'দীন' ব্যবহৃত হলেও 'দীন' শব্দ দ্বারা নির্দেশিত গূঢ়ার্থের সাথে 'ধর্ম' (Religion) শব্দের অন্তর্নিহিত সাধারণ মর্মার্থের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নেই। ধর্মীয় অভিব্যক্তি মানবকে স্রষ্টার প্রতি নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করে আর দীন হল সেই অপরিহার্য বিধি-বিধান যা স্রষ্টা তাঁর বিবেকবান সৃষ্টির ওপর আরোপ করেছেন। যে জন্য দীন হল আল্লাহ প্রদত্ত অবশ্যকরণীয় নির্দেশাবলী যার প্রতি প্রত্যেককে আত্মসমর্পণ করতে হয়।[৫] Religion বা ধর্মের ব্যাপারটা তেমন নয়। কেননা তা হল "The belief in the existence of a God or Gods, and the activities that are connected with the worship of them ; one of the systems of faith that are based on the belief in the existence of a particular God or Gods,"[৬] তবে সাধারণভাবে পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলনের স্রষ্টা নির্দেশিত ও নির্ধারিত মাধ্যমই ধর্ম। তাই ধর্ম মূলত কিছু বিধি-বিধানের সমষ্টি। যাতে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় কার্যাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত নির্দেশনা বিবৃত হয়।

ধর্মের উৎপত্তির সমস্যাটি একটি স্বতন্ত্র সমস্যা। এর সাথে ধর্মের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমস্যার কোন সম্পর্ক নেই। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী সূচনায় ধর্ম ছিল অত্যন্ত স্থূল। বলা যেতে পারে নিতান্ত অস্পষ্ট অনুল্লেখ্য অবস্থা থেকে ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ধর্মের বর্তমান উন্নত অবস্থায় দাঁড়িয়ে মূল্যায়ন করে আদিম ধর্মকে অন্ধবিশ্বাস বলে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দেয়াটা ঠিক হবে না। বরং ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে কোন পূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে যদি নির্মোহ ও নিরপেক্ষ আলোচনা করা যায় সম্ভবত তাহলেই এর উৎপত্তি বিষয়ের প্রকৃত সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক সর্বপ্রাচীন মতবাদ হল ঈশ্বর প্রত্যাদেশবাদ। এ মতবাদকে ঐশ্বরিক প্রতিভাসবাদ বা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশবাদও বলা হয়। এ মতবাদের মূল কথা হল ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে পাওয়া প্রত্যাদেশই ধর্মের উৎপত্তির প্রথম ও প্রধান উৎস। ইয়াহূদী, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্ম এ মতবাদের প্রবর্তক। আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকেই এ মতের কঠোর সমালোচনা করেছেন। D. Miall Edwards বলেছেন ঃ "ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশাবাদে ধর্মের উৎপত্তির প্রসঙ্গটি অত্যন্ত

---

২. *Samsad English-Bengali Dictionary*, compiled by Late Sailendra Biswas, Fifth edition, edited by Sri Birendra Mohan Das Gupta, Sahitya Samsad, Calcutta : August-1980 (5th edition) 44th Impression, August-1997, p.946

৩. D. Miall Edwards, *The philosophy of Religion*, Translated by Sushil Kumar Chakrabortty (*ধর্ম দর্শন*, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা জানুয়ারি, ১৯৮৯ (২য় প্রকাশ) পৃ. ১১৮

৪. *আল-কাওছার আধুনিক বাংলা আরবি অভিধান*, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সম্পাদিত। কাওসার পাবলিকেশন্স লিঃ, প্রকাশকাল : রবিউল আউয়াল, ১৪০০ হিজরি, পৃ-৩৩২

৫. L. Gardet /মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম, *দীন* (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৩শ খণ্ড, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত) ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প-ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর, ১৯৯২, পৃ.-৪৩৫

৬. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English*, A S Hornby, edited by Sally wehmeler, Oxford University Press, Sixth edition-2000, p.1075

www.pathagar.com

বৌদ্ধিক ও যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ মতানুসারে একসঙ্গে তৈরি করা ঢালাও কতগুলো ধারণা মানুষের শূন্য মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেয়ার ফলে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অত্যন্ত স্থূল ও অমনস্তাত্ত্বিক মতবাদ। এ মতানুযায়ী প্রত্যাদেশ ঈশ্বরের একটা ক্রিয়ামাত্র। মানুষের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ কিভাবে এই প্রত্যাদেশকে প্রভাবিত করল এবং মানুষ কিভাবে এই প্রত্যাদেশকে গ্রহণ করল সে সব জানতে এ মতবাদ কোনো সাহায্য করে না।[৭]

D. Miall Edwards, শেলিং (Schelling)-এর মতামত ও সমালোচনাকে এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করে মতবাদটির বিস্তারিত ত্রুটি নির্দেশ করেন। সমালোচনায় বলা হয়-কোনো এক সময় ঐশ্বরিক সংস্পর্শে এসে এবং ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ লাভ করেই যদি মানুষ ধার্মিক হয়ে উঠে তাহলে মেনে নিতে হয় যে, ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসার আগে মানুষ ধর্মহীন ছিল। তারা নিরীশ্বরবাদী ছিল এবং তাদের কোন ধর্মীয় ধারণা ছিল না। তাহলে সে মানুষ কি করে প্রত্যাদেশের ফলে ধর্মীয় চেতনা লাভ করল ? বিষয়টিকে অবিশ্বাস্য মনে হয়। সমস্যাটি সমাধানের অযোগ্য না হলেও এখনো এর সমাধান করা সম্ভব হয়নি। যে মনে কোনো ধর্মবোধ বা ধর্মীয় চেতনা নেই কেবল বাহ্যিক প্রত্যাদেশ থেকে সেই মনে কি ধর্মীয় ধারণার সৃষ্টি হতে পারে ? অবশ্য এ ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশবাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। এর ফলে ধর্মবিশ্বাসের একটা বাস্তব ভিত্তি পাওয়া যায় এবং ধর্মের সার্থকতা প্রমাণেরও সুবিধা হয়। তাছাড়া মানুষের ধর্মীয় জীবনে ঈশ্বরের নেতৃত্ব মেনে চলার জন্যও এ মতবাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও এ প্রত্যাদেশের ধারাবাহিকতা থাকা দরকার এবং মানুষের সে সময়ের গ্রহণ করার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রাখা প্রয়োজন। প্রত্যাদেশকে কেবল বাহ্যিক বা শাশ্বত হলে চলবে না ; আবার যথেচ্ছ নির্ধারিত কয়েকজনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেও একে আটকে রাখা ঠিক নয়। অধিকন্তু স্বর্গ থেকে কিছুটা বৌদ্ধিক জ্ঞান বা কতগুলো ধারণা মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেয়াকে প্রত্যাদেশ বলে না। প্রত্যাদেশ হবে মানুষের সামগ্রিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। সে যাই হোক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রকাশিত ধর্মীয় ধারণার মত উন্নত ও জটিল ধারণা গ্রহণ করার ক্ষমতা যে আদিম মানুষের একেবারে ছিলনা, বিবর্তনের ইতিহাস থেকে সে তথ্য জানা যায়।[৮]

Schelling এবং D. Miall Edwards প্রত্যাদেশবাদের যে সমালোচনা করেছেন তা সমর্থন করা যায় না। তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে মনে হয় ইয়াহূদী, খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্মে প্রত্যাদেশের যে উদ্দেশ্য, প্রেক্ষিত, ধারাবাহিকতা, নিগূঢ় তাৎপর্য ও উৎস উল্লেখ করা হয়েছে এবং সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর বা আল্লাহ ও মানুষ সম্পর্কে যে ধারণা ও বিশ্বাস পোষণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে অপ্রতুল অবহিতির জন্যেই এরকম সমালোচনায় উদ্যোগী হতে পেরেছেন। প্রত্যাদেশ হল 'ওহী' বা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত ও মনোনীত নবী-রাসূলদের প্রতি বিশেষ প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনায় প্রেরিত গোপন নির্দেশ। এ বিষয়টি বুঝতে হলে আল্লাহর প্রকৃতি, ক্ষমতা, মানব সৃষ্টির ইতিহাস এবং তাদের পরিণতি সম্পর্কে ধর্মত্রয়ের ধারণা মূল্যায়ন অনিবার্য। পূর্বাপর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে কেবল প্রত্যাদেশের খণ্ডিত সমালোচনা করে বিষয়টিকে দুর্বোধ্য ও অযৌক্তিক করে তোলা হয়েছে। শেলিং যেমন বলেছেন, 'ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসার আগে' কিন্তু প্রত্যাদেশবাদে ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসার আগে বিষয়টি অকল্পনীয়। কেননা এখানে আল্লাহ হলেন শাশ্বত, চিরন্তন, অনাদী, অনন্ত, এক অবিনাশী সত্তা। যেমন- নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর ; প্রজ্ঞাময়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সব কিছু করতে সক্ষম। তিনি প্রথম, তিনিই শেষ। তিনি প্রকাশমান এবং তিনিই গোপন। আর সব বিষয়ে তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত।[৯]

---

৭. D. Miall Edwards, *The philosophy of Religion*, Translated by Sushil Kumar Chakrabortty. পূর্বোক্ত, পৃ-২০

৮. প্রগুক্ত, পৃ. ২০-২১

৯. আল-কুরআন, ৫৭ : ১-৩

www.pathagar.com

এখানে মানুষ সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে—তা শেলিংয়ের সিংহভাগ সংশয়, প্রশ্ন ও আপত্তিকে অবান্তর প্রমাণ করে। যেমন আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—আর যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা বানাতে যাচ্ছি। তখন তারা বলল, তুমি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি তা ভালভাবে জানি, যা তোমরা জাননা।' আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু সামগ্রীর নাম। তারপর সেগুলোকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। আর বললেন আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাকো। তারা বলল, তুমি পবিত্র। আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদের শিখিয়েছো। নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞান সম্পন্ন, প্রজ্ঞাময়। তিনি বললেন, হে আদম! ফেরেশতাদের এ সবের নাম বলে দাও। তারপর সে যখন বলে দিলো সে সবের নাম, তিনি বললেন- আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আকাশ ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবহিত রয়েছি ? আর সে সব বিষয়ও আমি জানি, যা তোমরা প্রকাশ কর ও যা তোমরা গোপন কর। এবং যখন আমি ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলাম তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে নির্দেশ পালনে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আর আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাকো। এবং ওখানে যা চাও, যেখানে থেকে খুশি, পরিতৃপ্তিরসহ খেতে থাকো, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। তা না হলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে সেখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ স্বাছন্দে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল। আমি বললাম- তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে। এরপর আদম তার রবের নিকট থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন- আর আল্লাহ তার প্রতি লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোন হিদায়াত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হিদায়াত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোনো ভয় আসবে, না তারা চিন্তাগ্রস্থ ও সন্ত্রস্ত হবে। আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামী। অনন্তকাল তারা সেখানে থাকবে।[১০]

সুস্পষ্ট এ বক্তব্যের পর আর কোন এক সময়ে এসে মানুষের ঈশ্বরের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার বা নিরীশ্বরবাদী থাকার সম্ভবনা থাকে না। কেননা ঈশ্বর অনন্তকাল থেকে অস্তিত্বশীল। মানুষ অস্তিত্বহীন ছিল। নিজের অনুগ্রহ ও ক্ষমতা প্রকাশের জন্যে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির শুরুতেই মানুষকে জ্ঞান দেন। মানুষ সৃষ্টিরাজী ও বস্তুনিচয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। সুতরাং বলা যায় না ধর্মীয় ধারণাহীন অবস্থায় সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ তাদের নিকট প্রত্যাদেশ এসেছে। বরং মানুষের সূচনায় তাদের জ্ঞানগত পথচলার প্রারম্ভেই ছিল আল্লাহর নির্দেশনা। এরপর আল্লাহ তাকে দুটি নির্দেশ দিয়েছেন। যার একটি ইতিবাচক—'স্ত্রীসহ জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখান থেকে যা খুশি খাও' আর অপরটি নেতিবাচক—'কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়োনা।' বস্তুত ধর্মও এরকম আদেশ নিষেধের, গ্রহণীয়-বর্জনীয় বিধি-বিধানেরই সমষ্টি। যে জন্য প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই মানুষ প্রথম ধর্মীয় বিধান লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে এর বিস্তৃত পার্থিব প্রকাশের সম্ভাবনার কথাও ব্যক্ত করেন। বলেন...'এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোন হিদায়াত পৌঁছে।'

---

১০. আল-কুরআন, ২ : ৩০-৩৯

www.pathagar.com

সুতরাং Edwards ও Schelling আপত্তি উত্থাপন করেছেন তা যৌক্তিক মনে হয় না। কেননা প্রত্যাদেশে মানুষের সার্বজনীন কোন আদিম অবস্থার কথা স্বীকার করা হয় না। প্রারম্ভেই জ্ঞানের পরীক্ষায় মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে। যে জন্যে গোড়া থেকেই তাদেরকে প্রত্যাদেশ গ্রহণ, অনুশীলন ও অনুসরণের উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। আর প্রত্যাদেশ যে কেবল মনোনীত কিছু নির্ধারিত মানুষকে দেয়া হয়েছিল- তা ছিল আল্লাহর বিশেষ পরিকল্পনা। মানব জাতির পার্থিব পথচলার সূচনায় তাদের সংখ্যা যেমন কম ছিল, তেমনি সমস্যাও ছিল সীমিত। মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, আনুপাতিক হারে বেড়েছে সমস্যা। ফলে প্রথমে দেয়া প্রত্যাদেশ প্রথম কালের মানুষের জন্যে যথার্থ ও যথেষ্ট হলেও পরবর্তী কালের জন্য যথেষ্ট ছিল না। বরং এ জন্যে বিধানাবলীর সংস্কার ও সংযোজন অনিবার্য ছিল। তাছাড়া লোকবল বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে মানুষের বিস্তৃতির পাশাপাশি তাদের মধ্যে আল্লাহ্ দ্রোহিতা ও পাপাচার বিস্তৃত হচ্ছিল। আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় সৃষ্টি মানুষ বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতায় হাবুডুবু খাচ্ছিল। প্রিয় সৃষ্টির এমনি পদস্খলন ও ধ্বংসোন্মুখতায় অনুগ্রহবশতই আল্লাহ তা'আলা সমমায়িক জীবনের উপযোগী করে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন। সমাজের সকল লোকের পক্ষে একই সাথে যেহেতু সমাজ নেতা- ধর্মনেতা হওয়া সম্ভব নয়—এ জন্যে মনোনীত ব্যক্তিদের ভিন্ন ভিন্ন যুগে প্রত্যাদেশ দেয়া হয়েছে। হযরত আদম (আ)-এর সময়ে সূচনা, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সমসাময়িককালে যার পূর্ণতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন- 'আজ আমি তোমাদের নিকট দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।[১১] মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন ; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।[১২]

অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রত্যাদেশবাদকে ধর্মের উৎস হিসেবে মেনে নিলে আল্লাহ ও তাঁর আনুষঙ্গিক সকল বিষয়েই বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়, ঈমান পোষণ করতে হয়। প্রচলিত নৃতত্ত্ব এজাতীয় বিশ্বাসকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। যে জন্যে প্রত্যাদেশবাদকে তাদের বিবেচনায় বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য মনে হয়। অথচ নিজস্ব গবেষণার ক্ষেত্রে নৃতত্ত্বকেও প্রথমত কিন্তু শাশ্বত মূলনীতি স্বীকার করে নিয়েই সামনে এগুতে হয়। বস্তুত আধুনিক গবেষকদের এ হলো এক স্বেচ্ছাচারী স্ববিরোধিতা— অস্বীকার ও অমান্য করার জন্যেই তারা অস্বীকার করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে Lord Herbert তাঁর *De Religione Gentilium* (Pub : 1663) এবং John Toland তাঁর *Christianity not Mystetries* (pub: 1696) গ্রন্থ ধর্ম উৎপত্তির এক নতুন মতবাদ প্রচার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী চিন্তাবিদ La Mettre, D. Alembert, Voltaire প্রমুখ এ মতবাদ স্বীকার করে নেন। এ মতবাদে দু'রকম ধর্মের কথা বলা হয়। একটি হল স্বাভাবিক ধর্ম এবং অপরটি ঐতিহাসিক ধর্ম। এ মতাবলম্বীদের মতে স্বাভাবিক ধর্ম মানুষের বিচার বুদ্ধি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। কেননা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরতা, নৈতিক নিয়মের আবশ্যকতা হচ্ছে ধর্মের মৌলিক সত্য। এ সত্য যুক্তিসিদ্ধ এবং সকল স্বাভাবিক ধর্মের উপাদান। পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্মেই এগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী। তাদের পক্ষে যুক্তি দিয়ে ধর্মজ্ঞান লাভ করাই স্বাভাবিক। আর গাণিতিক সত্যের মত ধর্মের মৌলিক সত্যগুলোরও সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ সম্ভব। এভাবেই মানুষ স্বাভাবিক ধর্মের উৎপত্তি ঘটিয়েছে। যুক্তিবাদী, প্রত্যাদেশ নিরপেক্ষ ধর্ম শুরু থেকেই ছিল পূর্ণাঙ্গ। পরবর্তীতে 'পুরোহিত ও ধর্মযাজকরা জনগণকে আয়ত্তে রাখার জন্য তাদের ভীতি ও বিশ্বাস প্রবণতাকে নিজেদের কাজে লাগানোর অপকৌশল গ্রহণ করেছিল। ফলে স্বাভাবিক ধর্ম বিশ্বাসের স্থান দখল করেছিল ব্যাপক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার।'[১৩] আর এভাবেই সমস্ত প্রকৃত

---

১১. আল-কুরআন, ৫ : ৩

১২. আল-কুরআন, ৩৩ : ৪০

১৩. D. Miall Edwards, *The philosophy of Religion,* Translated by Sushil Kumar Chakrabortty, পূর্বোক্ত, পৃ.২২

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ধর্মের উদ্ভব ঘটে। ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাসে এ মতবাদ বৃটিশ অতিবর্তী দার্শনিকদের মতবাদ হিসেবে অভিহিত।

বর্তমানে এ মতবাদ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কেননা এ মতবাদধারীরা অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ও অমীমাংসিত প্রশ্নের কোন জবাব রেখে যাননি। এ মতবাদে বুদ্ধি ও যুক্তিকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অথচ যে আবেগ ও সজ্ঞার দীপ্তি ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উৎস হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—তাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। এ মতাবলম্বীরা মানুষের আদিম অবস্থায় বিশ্বাস করেন আবার নিরক্ষর ও মূর্খ আদিম মানুষদের দ্বারা যুক্তি নির্ভর ধর্ম প্রবর্তনের বিপুল স্ববিরোধী অভিমতও পোষণ করেন। এ মতবাদের সবচেয়ে অবাস্তব যুক্তি হল স্বার্থপর ও লোভী পুরোহিতেরা সুচিন্তিত ভণ্ডামীর সাহায্যে ঐতিহাসিক ধর্মমতগুলো আবিষ্কার করেছিল। পুরোহিতরা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে প্রায়ই যে মানুষের ধর্মপ্রবণতার সুযোগ গ্রহণ করত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরোহিতদের এ অপচেষ্টার পূর্বে যে বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল তাকেই কেবল তারা কাজে লাগাতে পেরেছিল। পুরোহিতরা স্রষ্টা ছিল না। বরং তারা ছিল সংরক্ষক।[১৪] সুতরাং মানুষের স্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হিসেবে ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে এ মত পুরোপুরি অসমর্থ।

ধর্মের উৎপত্তির নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যেমন প্রেতাত্মাবাদ, টাবু প্রথা, টোটেমবাদ, মানা, যাদুবিদ্যা ও সর্বপ্রাণবাদ। বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানীগণ এ মতবাদগুলোর প্রবর্তক। লক্ষণীয় ব্যাপার হল প্রায় সকল নৃবিজ্ঞানীই নিজ নিজ মতবাদকে ধর্মের উৎপত্তির উৎস হিসেবে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে প্রায়শ অপরাপর মতবাদগুলোকে উপেক্ষা করেছেন।

মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা সম্পর্কে একটা সশ্রদ্ধ ভয়ের মনোভাব আদিম ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং মানুষ তার পূর্ব পুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে অনেক কিছু উৎসর্গ করতো। এ কারণে হার্বটি স্পেন্সার সিদ্ধান্ত নেন, প্রেতাত্মারূপে আবির্ভূত পূর্বপুরুষদের উপাসনা থেকেই ধর্মের অন্যান্য রূপগুলোর উদ্ভব ঘটেছে। তিনি দেখিয়েছেন- ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মূলে রয়েছে মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভীতিকর মনোভাব—যারা জীবতদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ "All primal and many later cultures have regarded the dead and particularly the newly dead - as continuing to be active and concerned members of their respective families. Having passed beyond the limitations of earthly life, they are in possession of power greater than that of mortals. This power may be turned to the advantage of the living in the memory of the dead is respected and offerings continue to be made at the graveside or elsewhere. The unburied or uncremated dead, who have not been sent into the afterlife with the proper rituals or those reglected by their families, are, on the other hand liable to be dangerous. Always, However, they are believed to occupy a relatively lowly position in the supernatural hierarchy.[১৫]

এ মতবাদ জটিল ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে অতিরিক্ত সরল করে ব্যাখ্যা করতে চায়। মৃত পূর্ব পুরুষের ক্ষেত্রে দেবত্ব আরোপকে ধর্মের ভিত্তিরূপে গণ্য করার ফলে, এ ভিত্তি ধর্মের খুব দুর্বল ভিত্তি হয়ে পড়ে। কেননা মৃতের আত্মাকে কখনো ঈশ্বররূপে চিন্তা করা হয়নি। মানুষ ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে আর মানুষের ওপর নির্ভর করে মৃত পূর্বপুরুষের আত্মা। উপাসকের বিশ্বাসে তার পূর্ব পুরুষ ঈশ্বর ছিলেন। সুতরাং তিনি অমর। আসল ব্যাপার হল, পূর্বপুরুষদের যখন মানুষ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে তখন আর তারা ঈশ্বররূপে উপাস্য থাকছেন না। বিপরীতপক্ষে তারা যখন ঈশ্বররূপে উপাস্য হয়ে উঠছেন তখন আর তাদের মানুষরূপে বিশ্বাস করা হচ্ছেনা। তাছাড়া শুধু একটা মাত্র আচার অনুষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে ধর্মের

---

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ.২২-২৩

১৫. Eric J. Sharpe, *Manism* (The Encyclopaedia of Religion, Editior in chife Mircca Eliade, Volume-9, p.172, Macmillan Publishing Company New York 1987)

www.pathagar.com

মত একটা জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া চলে না। কেননা উপাসনা তা যতই আদিম হোক না কেন তা একটি মাত্র চিন্তন বা আবেগের ফল নয়। একাধিক শক্তিশালী জটিল চিন্তনের ফল। সুতরাং আদিম ব্যক্তিদের মধ্যে প্রেতাত্মার পূজা যতখানি ধারণা করা হয় ততখানি প্রচলিত ছিল না এবং প্রাকৃতিক বস্তুকে আশ্রয় করে যে আত্মা রয়েছে তার তুলনায় পূর্বপুরুষদের উপাসনা কোন মতেই প্রাচীনতম নয়। কাজেই পূর্বপুরুষদের উপাসনা থেকে ধর্মের উৎপত্তি স্পেন্সারের এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

নৃবিজ্ঞানী Sigmund Freud 'টাবু' (Toboo) প্রথাকে ধর্মের উৎপত্তির উৎস হিসবে ব্যাখ্যা করেছেন।ট্রাইব সমাজের মানুষেরা নানা রকম বিধি-নিষেধ মেনে চলত। এ সকল বিধি নিষেধকে বলা হয় টাবু।[১৬] আভিধানিকভাবে টাবু হল পবিত্র বা অপবিত্র বিবেচনায় কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে আলাদা করে রাখা, সাধারণের সম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ বা একঘরেকরণ। অলংঘনীয় বা নিষিদ্ধ।[১৭] John B. Noss বলেন- Toboo are prohibitions or hands - off worings applied to many things, persons and actions. Specifically, there are things that may not be touched or handle persons who must be avoided on who may be approachede only to a creation distance, actions that may not be performed, pleaces that may not to be entered. If we define that term broadly enough toboo are found in every religion and any society.[১৮]

টাবুকে বলা যায় বর্বর জাতির নিষিদ্ধকরণ প্রথা।[১৯] অলিখিত প্রাচীনতম সংবিধান। J.G. Frazer এসব বিধি-নিষেধকে বলেছেন এক ধরনের বৈদ্যুতিক অন্তরক। যার ভাষায়, রাজা বা দলপতির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সেই শক্তির সংস্পর্শের ফলে যাতে কোন ক্ষয়-ক্ষতি না ঘটে তা নিশ্চিত করার বৈদ্যুতিক অন্তরক।[২০] টোটেম সম্পর্কিত বিধি-নিষেধগুলোকেও টাবু আখ্যা দেয়া হয়। আবার টাবুকে 'মানার' বিপরীত ধারণা বলে গণ্য করা হয়। 'মানা' হল অলৌকিকতার সদর্থক দিক এবং টাবুর বিষয়টি তার নঞর্থক দিক। অর্থাৎ যা অলৌকিক তাকে লংঘন বা অবহেলা করা চলবে না। সাধারণ বিবেচনায় টাবু হল বিশ্বসমাজ কর্তৃক আরোপিত একটি সামাজিক নিষিদ্ধতা বা সীমাবদ্ধকরণ নীতি অথবা অপরাধের অভিযোগে সামাজিকভাবে আরোপিত এক শ্রেণীর নিষিদ্ধ বলপ্রয়োগকৃত আদেশ। এটা মূলত মানব সুলভ বিষয়বলীর আন্তঃবিভাজন যা বিশাল বিশ্বের শক্তিসমূহের রক্ষক।[২১] আদিম যুগের মানুষ বিভিন্নভাবে টাবু আরোপ করতো। প্রথমভাগে পড়ে রাজা বা পুরোহিত কর্তৃক ঘোষিত ও আরোপিত বিধি-নিষেধ আর সে সব বিধি-নিষেধের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের উপস্থিতি অনিবার্য। এর ফলস্বরূপ যা রহস্যময় শক্তির অধিকারী হয়—তা পড়ে দ্বিতীয় ভাগে।[২২] এভাবে মানুষ শাসক, সমাজপতি, মৃতদেহ, যোদ্ধা, মৃত সংশ্লিষ্ট বস্তু ও বিষয়, শাসক সংশ্লিষ্ট বস্তু ও বিষয় এবং পবিত্র-অপবিত্র বিভিন্ন ব্যক্তি ও বস্তুতে নৈর্ব্যক্তিক শক্তির উপস্থিতি কল্পনা করে এ সবের উপর টাবু আরোপ করে ও মেনে চলতে থাকে। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, মানুষের এই নিষেধাজ্ঞাজাত নিয়ম-নীতিই ক্রমবিকশিত হয়ে ধর্মের রূপ লাভ করেছে।

গবেষকদের কেউই টাবুকে ধর্মীয় প্রথা হিসেবে গ্রহণ করেননি। তারা একে বলেছেন অলিখিত প্রাচীনতম মানবীয় আইন, অলিখিত জীবন পদ্ধতি। টাবুকে ব্যাখ্যা করা হয় প্রাচীন যুগের বর্বর জাতির

১৬. আবদুল হালিম ও নুরুন্নাহার বেগম, *মানুষের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ), ঢাকা-১৯৯৩ (৪র্থ সংস্করণ) পৃ. ৬০

১৭. *Samsad English-Bengali Dictionary*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫০

১৮. John B. Noss, *Man's Religions*. The MacMillan Company, London-1965, p.17

১৯. কাজী আবদুল রউফ, *মানুষ ও সংস্কৃতি*, গোল্ডেন বুক হাউস, ঢাকা-১৯৭৬ (১ম সংস্করণ), পৃ.৬২৫

২০. মাহমুদা ইসলাম, *নৃতত্ত্বের সহজ পাঠ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮১, পৃ. ১২৪।

২১. Roy Wagnar, *Taboo* (The Encyclapaedia of Religion, Vol-14. MacMillan Publishing Company. New York, 1987) p. 233-36.

২২. আবদুল হাফিজ, *মৌলিক সংস্কার ও মানব সমাজ*, মুক্তাধারা ঢাকা-১৯৭৫, পৃ. ৫৯-৬০

www.pathagar.com

পালনীয় নিষিদ্ধ নীতিমালা হিসেবে। তার পশ্চাতে নিষেধাজ্ঞার কোন উপযুক্ত কারণ বা যৌক্তিকতা নেই। টাবু মূলত তাই বর্বর যুগের একটি সামাজিক কু-প্রথা যা ছিল গোত্র পরিচিতির মাধ্যম। অবশ্য এর নেপথ্যে ধর্মীয় ভাবধারাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কেননা যতদূর সম্ভব টাবু বস্তুর স্পর্শ পরিহার বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ এগুলোর সংস্পর্শে এলে গুরুতর বিপদ এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বাস্তবে কিন্তু এসব নিষিদ্ধ বস্তু বা দেহ সমাজের জন্যে বিপদজনক ছিলনা। বিধি-নিষিধের পেছনে যে সমর্থন ও ভিত্তি তা একমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিশ্বাস প্রসূত বিধান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পলেনেশিয়ায় মৃতদেহ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। কারণ মৃতদেহ যে স্পর্শ করে সে নাকি গুরুতর ব্যাধিতে পতিত হয় এবং মারা যায়। এ নিষেধের পেছনে বাস্তব সত্য নেই। এর যা মূল্য তা ধর্মীয়[২৩] কিন্তু এ ব্যাখ্যাও টাবুকে ধর্মীয় প্রথায় পরিণত করে না। বরং ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রতি কুসংস্কারপূর্ণ ভয় ও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই এ নিষেধাজ্ঞার প্রচলন করা হয়েছে। আর ভয় যে কোনক্রমেই ধর্ম উৎপত্তির কারণ হতে পারে না, মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনায় সে বিষয়টিও স্পষ্ট বোঝা যাবে।

অনেকের মতে টোটেমবাদ ধর্মের প্রাচীন ও আদিম রূপ। W. Robertson Smith (Religion of the Semities-1885). F. B. Javons (An Introduction to the History of Religion-1896) Emile Dudrkheim (Les Formes Elementoires dela vie Religiense) প্রমুখ সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদগণ টোটেমকে ধর্মের উৎপত্তির উৎস হিসেবে আলোচনায় নিয়ে আসেন। এক ধরণের প্রাণী বা লতাগুল্মের প্রজাতি বা কখনো কখনো এক শ্রেণীর জড় বস্তুর সঙ্গে একটি সামাজিক গোষ্ঠী যখন বিশেষ অন্তরঙ্গভাবে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পৃক্ত হয় তখন সেই প্রাণী বা লতাগুল্ম বা জড় বস্তুকে টোটেম বলা হয়। প্রায়ই টোটেমকে গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সেই সামাজিক গোষ্ঠীর নামকরণ টোটেমের নামানুসারে হয়। টোটেম ঠিক ঈশ্বর নয়। সমজাতীয় বা সমগোত্রীয় শ্রদ্ধার পাত্র। সাধারণ কাজে একে আদৌ ব্যবহার করা যায় না। পবিত্রভাবে উৎসর্গ না করে একে হত্যা করা যায় না খাওয়াও যায় না। টোটেমকে অবশ্যই একটি প্রজাতি হতে হবে। কোন একটি মাত্র গাছ বা একটি মাত্র প্রাণীকে টোটেম বলে ধরা হয় না।[২৪]

স্মিথ বলেন, Sacrifice প্রথার উদ্ভব ঘটেছে টোটেমের উপাসনা থেকে এবং টোটেমবাদ ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। জেভেনস-এর মতে, টোটেমবাদ হল সমাজের প্রাচীনতম রূপ। এর প্রচলন জগৎ জুড়ে এবং এর থেকে Polytheism বা বহুদেববাদের উদ্ভব। তিনি বলেন, টোটেম বস্তুর মধ্যে প্রাণীরাই প্রথম উপাস্য হয়ে উঠেছিল এবং সে উপাসনার প্রথম রূপ হল টোটেমবাদ। আর বহুদিন ধরে মানুষ একটি মাত্র বস্তুকেই উপাসনার বস্তু করেছিল। সেটি হল টোটেম বা Tribal God তথা উপজাতীয় দেবতা। ফরাসী সমাজ বিজ্ঞানী দুরখীম টোটেমবাদকে সর্বাপেক্ষা সরল ও প্রাচীন ধর্ম বলে গণ্য করেন। তার মতে, ধর্ম হল প্রধানত একটি সামাজিক বিষয়। সর্বধর্মীয় বিশ্বাসের মূলে আছে একটি রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তি যা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই শক্তি যা ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যা উদ্ভূত হয় ব্যক্তির ওপর সমাজের কর্তৃত্ব থেকে। ব্যক্তির জীবনের ওপর সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষমতার চেতনাই ব্যক্তির কাছে জগতে অস্তিত্বশীল এক রহস্যময় শক্তির চেতনা এনে দেয়। দুরখীমের মতে, টোটেম হল সমাজের এই শক্তির দৃশ্যমান প্রতীক।

এ মতবাদের সমালোচনায় বলা হয় যে, প্রতিটি ধর্মকেই যে টোটেমের স্তরটি অতিক্রম করতে হয়েছে সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায় না। টোটেম যে প্রাচীন তা অনস্বীকার্য। কিন্তু এর সার্বজনীনতা প্রমাণ সাপেক্ষ। অনেক আদিম জাতি যেমন আন্দামান দীপপুঞ্জ বা সিংহলের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এ প্রথার প্রচলনের কোন প্রমাণ মেলে না, যদিও আদিম জাতি

২৩. মাহমুদা ইসলাম, *সমাজ ও ধর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪ (২য় সংস্করণ) পৃ. ৪১, ৪২
২৪. D. Miall Edwards, *The philosophy of Religion*, Translated by Sushil Kumar, পূর্বোক্ত, পৃ-২৮

www.pathagar.com

হিসেবে এদের সার্বজনীন স্বীকৃতি আছে। কিছু উপজাতির টোটেম বিশ্বাস করে কিন্তু উপাসনা করে না। তাদের কাছে টোটেম কোন দেবদেবী নয়।[২৫] তাই টোটেমকে যথার্থভাবে ধর্ম বলে অভিহিত করা চলে না, যদিও এটি ধর্মের সীমান্ত রেখায় অবস্থিত। আদিম ধর্মের বিশিষ্ট রূপের তুলনায় এটি একটি সামাজিক বা উপজাতীয় সংগঠন বিশেষ। কুরআন মজীদে সরাসরি টোটেমের ধারণাকে কল্পনা প্রসূত উদ্ভট ও ভ্রান্ত আখ্যা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—'আল্লাহ 'বাহিরা' 'সাইবা' 'ওয়াছীলা ও হামকে শরী'আত সিদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ -করে, তাদের অধিকাংশেরই বিবেক বুদ্ধি নেই।'[২৬]

বাহিরা : এমন উট—যা পাঁচ বছর বাচ্চা জন্ম দিয়েছে এবং পঞ্চম বারে জন্ম দিয়েছে পুরুষ শাবক। এমন উটের কান ছিদ্র করে ছেড়ে দেয়া হত। এর গোশত বা দুধ খাওয়া হত না। এর পশম কাটা বা একে দিয়ে কাজ করানো হত না। এই উট যেখানে খুশি যেতে পারত, যা খুশি খেতে পারত- কেউ কিছু বলত না।

সাইবা : এমন উট যাকে কোন মানত পূর্ণ হওয়া বা বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া কিংবা কোন রোগ আরোগ্যর জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। যে উট দশবারই মেয়ে শাবক জন্ম দেয় তাকেও 'সাইবা' বলা হয়। এরকম পশুকেও স্বাধীন বিচরণের মর্যাদা দেয়া হও।

ওয়াছীলা : বকরীর প্রথম শাবক মেয়ে হলে মালিক নিজে রেখে দিত। প্রথম শাবক পুরুষ হলে তাকে জবেহ করা হত দেবতার জন্য। আবার এক সাথে মেয়ে ও পুরুষ শাবক হলে মেয়েটাকে রেখে পুরুষ শাবক দেবতার উদ্দেশ্য ছেড়ে দেয়া হত। সে অবাধ বিচরণের সুযোগ পেত। এর নাম ওয়াছীলা।

হাম : কোন উটের পৌত্র যখন আরোহী নেয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হতো- তখন সে উটকে মুক্ত করে দেয়া হত। একে বলা হত 'হাম'। এদের জবেহ করা হতো না। এগুলোকে দিয়ে কোন কাজ করানো হত না। বিচরণ ও খাদ্য গ্রহণে এগুলো অবাধ স্বাধীনতা পেত।

অব্যাখ্যেয়, রহস্যময়, সর্বব্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক শক্তি বা শক্তিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় থেকে ধর্মের উৎপত্তির একটি মতামতও নৃতত্ত্বে আছে। এ শক্তিকে 'Mana' বলা হয়। জন বি নস বলেন—Mana is a Melanesian term adopted by anthropologist as a convenient designation for the widespread alhough not universel, belif in occult forces or indwdling supernatural power as such independend of either persons or spirits. It is not the only term of the kind in circulation among primitive peoples.[২৭]

'মানা' একটি শক্তি অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত শক্তি। কিন্তু এটা কোন জীবনীশক্তি বা আত্মাশক্তি নয়। এটা ব্যক্তি বা বস্তুতে অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত গুণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটি ভূত-প্রেত বা প্রেতাত্মার শক্তি নয়। অস্বাভাবিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তি ও গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু হচ্ছে মানার অধিকারী। আত্মা বা প্রেতাত্মা অতি প্রাকৃতিক অস্বাভাবিক কিছুর পরিচায়ক বটে।[২৮] তবে 'মানা' হল মহাবিশ্বে এক অফুরন্ত শক্তির আধার। সেখান থেকে মানুষ ভাল-মন্দ যা খুশি সংগ্রহ করতে পারে। এই অপরিমেয় শক্তি অসাধারণ বস্তু, ব্যক্তি বা অপ্রত্যাশিত ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। সকল অনায়াস সাফল্য মানা'র অস্তিত্ব প্রমাণ করে। রাজনৈতিক, সামাজিক বা যে কোন কাজে মানুষ যদি তার ক্ষমতা প্রকাশ করে সেটাই হবে তার মানা। যদি কোন লোক যুদ্ধে সফল হয়, সেই সাফল্য তার স্বাভাবিক বাহুবলের জন্যে নয়। চোখের ক্ষিপ্রতা বা সম্পদের প্রাচুর্যের জন্যেও নয়। সে নিশ্চয় কোন আত্মার 'মানা' লাভ করেছে অথবা কোন মৃত বীরের আত্মা তার ওপর ভর করেছে। সেই শক্তি এসেছে তার কবচে,

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
২৬. আল-কুরআন, ৫ ঃ ১০৩
২৭. John B. Noss, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
২৮. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *নৃ-বিজ্ঞানের রূপরেখা*, ঢাকা-১৯৮৬ (২য় সংস্করণ), পৃ. ১৩৭

www.pathagar.com

গলায় বাঁধা পাথরে, কোমরে গুঁজে রাখা গাছের পাতায়.....অথবা অপার্থিব শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে সে যে সব মন্ত্র বলেছিল তার মাধ্যমে.....। 'মানা' ভর না করলে একটা নৌকা দ্রুত যেতে পারে না, জালে বেশি মাছ ওঠেনা অথবা তীর মারাত্মক আঘাত হানতে পারে না। মেলেনেশিয়ার অধিবাসীদের ধর্ম হল নিজের জন্যে এই মানার অধিকারী হওয়া বা নিজের সুবিধার জন্যে একে লাভ করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানুষ 'মানা' সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ধর্ম উৎপত্তি লাভ করেছে।

ব্যাপক মূল্যায়ন শেষে দেখা যায়, বস্তু বা ব্যক্তির অন্তঃস্থ অতিপ্রাকৃত নৈর্ব্যক্তিক শক্তি যার প্রভাবে ব্যক্তি বা বস্তু শক্তিমান হয়ে ওঠে সেই 'মানা' শক্তিতে বিশ্বাস থেকে ধর্ম এসেছে এটাও মেনে নেয়ার মতো ব্যাপার নয়। এ বিষয়টির সমালোচনা মনস্তাত্ত্বিক আলোচনার সাথে জড়িত। কেননা এখানেও ভয় ও বিশ্বাস থেকেই এমন একটি মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। তাই কেবল বাহ্যিক তথ্য ও সামাজিক রীতি-নীতির পর্যালোচনার চেয়ে এ ক্ষেত্রে আদিম মানসিকতা, অভ্যন্তরীণ আবেগ এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মের উৎপত্তির মতবাদের মধ্যে 'ম্যাজিক'কে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। কেননা খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, যাকে আমরা ধর্ম বলি তার অধিকাংশই আসলে যাদুবিদ্যা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ম্যাজিকের প্রচলন ছিল। বলা হয়েছে- "The history of man is the history of magic. It is difficalt task to turn to any particular era and say that at this time or that magic made its appearance in definite form.[২৯]

অবশ্য ম্যাজিক, ধর্মের পূর্ববর্তী নাকি পরবর্তী কিংবা সমসাময়িক—এ বিষয়ে মতদ্বৈততা লক্ষণীয়। জেমস ফ্রেজার বলেন—চিন্তার বিবর্তনে ম্যাজিক ছিল সর্বত্র ধর্মের পূর্ববর্তী। ম্যাজিকে বৌদ্ধিক উপাদান আছে। অনুসঙ্গের নীতি, সাদৃশ্য ও সান্নিধ্যের নীতি দেশে ও কালে ভুল প্রয়োগের ফলশ্রুতিই ম্যাজিক। কিন্তু এর মিথ্যা ও অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করে সমাজের চিন্তাশীল সম্প্রদায় প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অধিকতর ফলপ্রসূ যথার্থ কোন মতবাদ অন্বেষণ করতে লাগল। এভাবে ম্যাজিকের তিক্ত ও অসাফল্যের অভিজ্ঞতা মানুষকে অতীন্দ্রিয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য একটি উন্নততর পৃথক পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্যে উদ্বুদ্ধ করল। প্রকৃতিতে যে সব শক্তি আছে মানুষ তাদেরকে আহবান করা শিখলো, সেই প্রাকৃতিক শক্তিগুলো যদিও মানুষের মতো তবুও তারা ছিল অনেক বেশী শক্তিশালী। তাদেরই ঈশ্বর বলা হত। মানুষ সেই অদৃশ্য শক্তির কাছে বিনয়ের সাথে তার আনুগত্য প্রকাশ করল এবং কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের আশায় মানুষ সেই অদৃশ্য শক্তির অনুকম্পা প্রার্থনা করল। এভাবে ম্যাজিকের যুগ ধর্মের যুগের স্থান করে দিল।

ধর্ম উৎপত্তির উৎস হিসেবে ম্যাজিকের বড় সমালোচনা হল—এ মতবাদটি বড় বেশী বুদ্ধিবাদী বা যুক্তিধর্মী। এ মতবাদে আদিম মানুষের জীবনে চিন্তনের প্রাধান্যকে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু পরিবেশের প্রতি তার মননধর্মী চিন্তনের তুলনায় তার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগময় প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ম্যাজিক ও ধর্মের স্বরূপগত পার্থক্যকে স্বীকার করে নেয়া হলেও ধর্মের উৎপত্তির স্তরে আদিম মানুষ ম্যাজিক ও ধর্মের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে সচেতন ছিল এমন সিদ্ধান্ত নিলে সময়গত অসঙ্গতি দোষ দেখা দেবে। ইতিহাসের বিবর্তনের পথে অনেক বিলম্বে মানুষ তার উচ্চতর বিশ্লেষণিক ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে এ পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল। আদিম মানুষ ছিল অতিমাত্রায় বিশ্বাসপ্রবণ-কাজেই তাদের পক্ষে ম্যাজিক ও ধর্মের পার্থক্য সচেতন হওয়া কখনোই সম্ভব ছিল না। আসল ব্যাপার হল ম্যাজিক বা ধর্ম কেউ কারো থেকে উদ্ভূত হয়নি। উভয়ই স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হয়েছে। কেননা ধর্ম ও ম্যাজিকের পার্থক্যের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। ধর্ম চায় প্রার্থনা-উপাসনায় উচ্চতর শক্তির তুষ্টি বিধানের

২৯. R. Ahmed, *The Black Art*, Arrow Books Ltd, London & New York-1966, p.13

www.pathagar.com

মাধ্যমে তার অনুগ্রহ লাভ করতে আর ম্যাজিক তাকে নিজের কাজে বাধ্য করতে চায়। এমিলি দুরখীম যথার্থই বলেন—ম্যাজিকের কোন গীর্জা নেই, আছে মক্কেল। অপর পক্ষে ধর্মকে গীর্জার ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলেনা।

ধর্ম উৎপত্তির আধুনিক মতবাদের মধ্যে উনবিংশ শতকের বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী E.B Tylor. প্রবর্তিত সর্বপ্রাণবাদ মতবাদকে প্রথম বৈজ্ঞানিক মতবাদ বলা হয়।[৩০] ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে একটা সুসংবদ্ধ মতবাদ প্রচারের কৃতিত্ব তাঁর।[৩১] সর্বপ্রাণবাদ তত্ত্বটি ধর্ম উৎপত্তি সম্পর্কীয় এমন একটি মতবাদ যেটি আদিম নর-নারীর মন এবং অভ্যাস সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানসম্মত আলোচনার দ্বারা সমর্থিত। Tylor তাঁর বিখ্যাত *Primitive Culture* গ্রন্থে এ মতবাদ ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করেন। তিনি ছিলেন বিবর্তনে বিশ্বাসী। যে জন্যে ধর্ম উদ্ভবের মধ্যেও তিনি একটা বিবর্তন প্রক্রিয়ার সন্ধান করেন। Tylor তাঁর মতবাদে দেখিয়েছেন- আদিম মানুষ প্রথমে ভূত-প্রেত ও নিজ নিজ পূর্ব পুরুষের পূজা করতো। পরে তাদের মধ্যে প্রকৃতি পূজার উন্মেষ হয় এবং নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, চাঁদ-তারা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা শুরু হয়। প্রকৃতি পূজা থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় দেব-দেবী পূজার সূচনা হয়। তারা ছিল বহু ঈশ্বরবাদী। কালক্রমে তাদের মধ্যে পরমেশ্বর ধারণার উদ্ভব হয় এবং সমাজে একেশ্বরবাদের আধিপত্য শুরু হয়। মোট কথা ভূত-প্রেত ও মৃত পূর্বপুরুষদের পূজা দিয়ে ধর্ম শুরু হয় এবং তার সর্বশেষ পরিণতি হল একেশ্বরবাদ।

Tylor তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেন- ধর্মের মূলে আত্মা সম্পর্কিত ধারণা। তার মতে, আদিম মানুষ মনে করতো দেহ ও আত্মা এ দু'য়ের সমষ্টি মানব জীবন। আদিম মানুষ আত্মা সম্পর্কিত ধারণায় উপনীত হওয়ার ফলে ধর্ম উদ্ভূত হয়। নিদ্রিত অবস্থায় দেহ এক স্থানে থাকা সত্ত্বেও স্বপ্নে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করতে পারে। এটা থেকে তাদের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে যে মানুষের মধ্যে দু'টি সত্তা রয়েছে। যে সত্তা দেহ পরিত্যাগ করে যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারে সে সত্তা অধিক সক্রিয়। Tylor এর মনে প্রশ্ন জেগে ছিল কেমন করে আদিম মানুষ প্রেতাত্মার ধারণা লাভ করলো। আদিম মানুষ স্বপ্ন, জীবন ও মৃত্যুর ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে প্রেতাত্মার ধারণা অর্জন করে। তারা বিবেচনা করে যে, স্বপ্ন এক ধরেণর মতিভ্রম, মায়া, বিভ্রম বা মোহজনক অভিজ্ঞতা। কিন্তু ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে সে একটি বাস্তব মানুষ। স্বপ্নে সে বাস্তবতায় উর্ধ্বে চলে যায়। তার বিচিত্র ও দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা জন্মে। সে এমন সব দৃশ্য দেখে আর এমন সব জায়গায় যায় যা কোন দিন দেখেনি এবং যেখানে কোন দিন যায়নি। আদিম মানুষ স্বপ্নের মাধ্যমে তাদের দ্বৈত অস্তিত্বের বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল। তাদের অস্তিত্বের দুটো দিক দেহ ও আত্মা। একটি রক্ত মাংসের দেহ—জড় পদার্থ, অন্যটি আধ্যাত্মিক সত্তা বা আত্মা। আত্মার ধারণাই সর্বপ্রাণবাদের মূলকথা। আত্মার ধারণা সার্বজনীন।[৩২] আদিম মানুষ মনে করতো ব্যক্তির জীবন যেমন নিয়ন্ত্রিত হয়—দেহ মধ্যস্থিত আত্মা দ্বারা তেমনি বস্তু বিশ্বের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ ক'রে আত্মাসম্পন্ন কোন দেব-দেবী বা মহাশক্তি। সুতরাং সর্বপ্রাণবাদের প্রথম ভূমিকাটি নিঃশেষিত হয় আত্মার আবিষ্কারে, দ্বিতীয় ধারাটি শুরু হয় বহির্বিশ্বের সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিশেষ শক্তির সন্ধানে।[৩৩] এভাবে ক্রমান্বয়ে ব্যক্তির জীবনে বস্তুবিশ্বের মধ্যে আত্মার ধারণার জন্ম থেকে সর্বপ্রাণবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে।

Tylor দেখিয়েছেন- সংস্কৃতির একটা স্তরে মানুষ প্রকৃতির সকল বিষয়কে সপ্রাণ বলে ভাবতো। গাছ, নদী, পর্বত, মেঘ, প্রস্তর, নক্ষত্র ও নৈসর্গিক সবকিছুকে তারা প্রাণবান বলে মনে করত। আদিম মানুষ যা কিছু দেখতো নিজেদের মতো সবকিছুকে সপ্রাণ বা সজীব মনে করত। তাদের একটি মাত্র যুক্তি

---

৩০. D. Miall Edwards, *The philosophy of Religion.* Translated by Sushil Kumar, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪
৩১. মাহমুদা ইসলাম, *সমাজ ও ধর্ম,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
৩২. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *নৃ-বিজ্ঞানের রূপরেখা,* পূর্বোক্ত, পৃ ১৩১
৩৩. আবদুল হাফিজ, *বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৫, পৃ. ৬৮

www.pathagar.com

প্রয়োগের ক্ষমতা ছিল। সেটি হল সাদৃশ্যের নীতি। তারা যে এ যুক্তি প্রয়োগ করছে সে সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল না। সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে নিজেদের অভিজ্ঞতা মহাবিশ্বের সকল জিনিসের ওপর আরোপ করতো। চারিদিকে মানুষ যে সব গতি প্রত্যক্ষ করতো নিজেদের গতির সাদৃশ্যে সে তাদের ব্যাখ্যা করত। তাদের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতায় তারা বুঝতে পারত যে, নিজেদের গতির কারণ হল আত্মা। অতএব, গতিশীল প্রকৃতি আত্মাময়। আদিম মানুষের মতো বর্তমানের বর্বর মানুষও প্রকৃতিকে আত্মাময়-প্রাণময় মনে করে। প্রকৃতিতে বিরাজমান আত্মাসমূহের কোন কোনটার সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। অসংখ্যা আত্মায় জগৎ পরিব্যাপ্ত—এ জ্ঞান লাভের পর আদিম মানুষ ক্ষমতাধর আত্মাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে এবং অশুভ আত্মার ক্ষতি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছে। পরবর্তীকালে টাইলরের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ও মতবাদ ধর্মীয় আলোচনার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখন সাধারণভাবে সকলে এটা স্বীকার করে নিয়েছে যে, সভ্যতার কোন একটি স্তরে সকল মানুষ সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাস করত।[৩৪]

তা সত্ত্বেও ধর্ম উৎপত্তির উৎস হিসেবে সর্বপ্রাণবাদ প্রশ্নোত্তীর্ণ মতবাদ নয়। প্রথমত এটি ধর্ম সম্পর্কীয় কোন মৌলিক মতবাদ নয় বরং একটি মৌলিক দার্শনিক মতবাদ। তাছাড়া বস্তু আশ্রিত সকল আত্মাকে মানুষ উপাসনা করত না। কিন্তু এ মতবাদ এ উপাসনা করা না করার পেছনে কোন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে পারেনি। সর্বোপরি আদিম ধর্ম কোনো না কোনোভাবে নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় অলৌকিকত্ব আরোপ করে। কিন্তু সর্বপ্রাণবাদ তা করে না। জেভনস বলেন, নদীর অবিরাম প্রবাহ আমাদের কাছে যেমন, আদিম নর-নারীর কাছেও তেমনি প্রাকৃতিক ঘটনাই ছিল। যদিও আদিম মানুষ নদীকে অন্যান্য প্রাকৃতিক বিষয়ের মতো প্রাণময় ভাবতো, তারপরও নদীর গতির মধ্যে তারা রহস্যময় অতিপ্রাকৃত কিছু দেখেনি। তারা বিশ্বাস করতো, নদীর এই প্রবাহের পেছনে রয়েছে নদীর ইচ্ছা। কাজেই বলা যায় না যে, সর্বপ্রাণবাদই ধর্মের উৎস। সর্বোচ্চ এটুকু বলা যায় যে, আদিম মানুষের সমগ্র জীবনে সর্বপ্রাণবাদের আধিপত্য ছিল। দ্বিতীয়ত দার্শনিক মতবাদ হিসেবেও সর্বপ্রাণবাদ আদিম ধারণা নয়। কেননা এতে আত্মার ধারণা আছে। যে ধারণা মানুষের উন্নত চিন্তাশক্তির পরিণাম।

আদিম মানুষের পক্ষে এ রকম আত্মার ধারণা করা সম্ভব ছিল না। কাজেই সর্বপ্রাণবাদের ধারণা যে সময়ে মানুষের মনে উদিত হয়েছিল- তার পূর্বে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে-এরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত।

নৃবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ধর্মবিশ্বাসকে ধর্মের উৎসরূপে বা উৎসের সদৃশরূপে গণ্য করা যায়। কিন্তু তা হলেও ভুললে চলবে না যে, এ জ্ঞান অনুমান মাত্র এবং এ অনুমানের সত্যতা মনোবৈজ্ঞানিক পরিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। মানুষের মনের কোন গহনে ধর্মের উৎসটি রয়েছে আমাদের প্রধান আগ্রহ হল সেই জ্ঞান লাভ করার। এই মনস্তাত্ত্বিক আগ্রহ নিবৃত্তির কাজে সাহায্য করবে ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব। এর অর্থ ধর্মের স্বরূপ আবিষ্কারের সফল পদ্ধতি হল মনস্তাত্ত্বিক উৎপত্তি বিষয়ক পদ্ধতি। প্রকৃতই ধর্মের উৎপত্তি এবং তার বিকাশের মধ্যে এক মনস্তাত্ত্বিক ধারাবাহিকতা বর্তমান। ধর্মীয় বিবর্তনের সমগ্র প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে বর্তমান মানুষের ধর্মীয় চেতনার ঐক্য। ধর্মের অসংখ্য বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক অভিন্নতা লক্ষ করা যায়। ধর্মের বিকাশ সমগ্র প্রক্রিয়ার ঐক্য এবং নিরবচ্ছিন্নতার মধ্য থেকেই ঘটে থাকে। কাজেই মানব প্রকৃতির মধ্যে এমন কি আছে যা তাকে ধর্মপ্রবণ করে তুলেছে ? তার অভ্যন্তরীণ জীবনের মধ্যে কোথায় ধর্মের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে ? এসব প্রশ্নের কতগুলো উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রথমত, মানুষ ধর্মপ্রবণ, কেননা মানুষের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় এক সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান। দ্বিতীয়, মানুষ ধর্মপ্রবণ, কেননা মানুষের একটি ধর্মীয় বৃত্তি আছে। তৃতীয়ত, ধর্মীয় চেতনার উৎস হল একটি প্রাথমিক আবেগ—যা হল ভয়।

---

৩৪. D. Miall Edwards, *The philosophy of Religion,* Translated by Sushil Kumar, পৃ. ২৪-২৫

www.pathagar.com

ধর্ম উৎপত্তির মনস্তাত্ত্বিক প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল বিশেষ একটা বৃত্তির উদ্ভাবন করে ধর্ম প্রবণতাকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা। এ হল যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টার বিপরীতে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস। আর তৃতীয় ব্যাখ্যাটিও অযৌক্তিক। কেননা ধর্ম উৎপত্তির মূলে 'ভয়' বিষয়টি সমর্থনযোগ্য নয়। ধর্মের উন্নত রূপগুলোতে যেখানে ভয়ের তুলনার বিস্ময়, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা প্রভৃতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়—সেগুলোকে ভয়ের মত আবেগ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা ভীতিজনক বস্তু থেকে মানুষ দূরে সরে থাকতে চায়। ভয়ই যদি ধর্ম উৎপত্তির একমাত্র কারণ হত তাহলে মানুষ ধর্ম থেকে পালাতে চেষ্টা করত। মানুষ প্রেতাত্মা, বন্যজন্তু এবং অনেক বাস্তব ও কাল্পনিক বিষয় সম্পর্কে ভীত। এ সকল বিপদ থেকে আত্মারক্ষার জন্যে সে নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তির যে মনোভাব প্রকাশিত হয় তা এই জাতীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার শামিল নয়। সুতরাং ধর্মের ক্ষেত্রে ভয়ের আরোপ করে ধর্ম সম্বন্ধীয় আচরণের মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতিকে কোন মতেই সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না।

সুতরাং নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক মতবাদগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে খোদ নৃতত্ত্ববিদ-সমাজ বিজ্ঞানী-মনোবিজ্ঞানীরাই দ্বিধান্বিত ও সংশয়াপন্ন—সেগুলোকে নির্বিবাদে-নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া যুক্তি সঙ্গত নয়। তাছাড়া মতবাদগুলোর প্রতিটি মতবাদের প্রবক্তাদের স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট। মতবাদ প্রবর্তকরা সবাই বিশ্বাস করেন-মানুষ আদিম অবস্থা অতিক্রম করে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আধুনিক ও বুদ্ধিনির্ভর জীবনে উপনীত হয়েছে। অথচ তারাই আবার আদিম জীবনে ধর্ম উৎপত্তির এমন মতবাদ পোষণ করেন যা কেবল আধুনিক ও বুদ্ধিনির্ভর জীবন ধারার সাথে মানানসই। নিজেদের এই খাপছাড়া, বেমানান ও যুক্তিহীন মতবাদকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে তারা অন্যের মতবাদকে অযৌক্তিক বলেছেন এবং নিজেদের মতের অনুকূলে নানা বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য গল্প ফেঁদেছেন।

প্রত্যাদেশবাদে এ বিড়ম্বনা নেই। এর সরাসরি বক্তব্য সামাজিক বিবর্তন, মনস্তাত্ত্বিক আগ্রহ-আবেগ কিংবা নৃতাত্ত্বিক মতবাদগুলো ধর্ম উৎপত্তির উৎস নয়—হতে পারে না। ধর্ম এসেছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ বা ওহীর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে প্রথমত এবং প্রধানত মানব জাতির আদিম অবস্থাকে অস্বীকার করা হয়। কেননা প্রথম মানব হযরত আদম (আ) ছিলেন প্রথম নবী এবং একজন শিক্ষিত ও সুসভ্য ব্যক্তিত্ব। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এ শিক্ষাই মানব জাতিকে পার্থিব অপার্থিব সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। যে জন্যে মানবজাতিকে সামগ্রিকভাবে কোন দিনই কোন আদিম অবস্থা অতিক্রম করতে হয়নি। নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণা থেকে যে আদিম জীবন ধারার কথা জানা যায় তা ছিল বিশ্ব মানবের এক বিচ্ছিন্ন অবস্থা। নিজেদের মতবাদ ও নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে এ বিচ্ছিন্ন অবস্থাকেই তারা সার্বিক অবস্থা হিসেবে প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন। অথচ নৃতত্ত্ববিদদের বর্ণনার চেয়েও আরো আদিমতম জীবন নির্বাহ করছে আজকের আধুনিক বিশ্বের কোন কোন জাতি। কাজেই ধর্ম উৎপত্তির নেপথ্যে কুসংস্কার বা অজ্ঞানতাবশত অতিপ্রাকৃত কোন নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ধারণা করার প্রয়োজন পড়ে না। কেননা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে বিবেক সম্পন্ন বুদ্ধিমান সত্তা হিসেবে। তার পক্ষে তাই কোন আদিম স্তর অতিক্রম করার কথা চিন্তা করা যায় না। যতটুকু আদিমতার কথা বলা হয় আগেই বলা হয়েছে তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা। মানব জাতির সামগ্রিক অবস্থার বাস্তব চিত্র তা অবশ্যই নয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল -জুন ২০০৩

তুলনামূলক ধর্ম : প্রকৃতি ও স্বরূপ

ড. মোঃ আবদুল হান্নান*

মানব সভ্যতার অতি প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম মানব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। এটি মানব মন সহজাত এবং মানব বৃত্তির অবিচ্ছেদ্য অংগ। সব কিছুই হৃদয় থেকে মুছে যেতে পারে কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস যা পৃথিবীর সকল শ্রদ্ধার চরম স্বীকৃতি তা থেকেই যায়। তবে বিশ্বের সকল মানুষের ধর্মীয় জ্ঞানতত্ত্ব এক নয়। এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। তাই বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন, নিরপেক্ষ বিচার ও তথ্যানুসন্ধান একটি চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী বিষয়।[১]

তুলনামূলক ধর্মের পরিচয়

'তুলনামূলক ধর্ম' পরিভাষাটি আরবী ভাষায় 'মুকারানাহ আল-আদইয়ান' (مقارنة الأديان) এবং ইংরেজিতে 'কম্পারেটিভ রিলিজিওন' (Comparative Religion) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি আধুনিককালে একটি সুপ্রচলিত প্রবচন। বর্তমানে বিষয়টি সমাজ বিজ্ঞানের একটি পরিপূর্ণ শাখা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করছে।[২] তুলনামূলক ধর্ম প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে সামগ্রিকভাবে তুলনা করা, যদ্বারা ধর্মের পারস্পরিক সাদৃশ্য- বৈসাদৃশ্য ও সংযোগ সম্বন্ধের বিষয় অবগত হওয়া যায়।[৩] এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ মিকহ্যাল পি (Michael pye) বলেন, "The comparative study of religion or comparative religion for short is really a phrase used to indicate the study of religion in so far as the student is not confining his attentions to a single should be concerned with comparative religion simply, because the consideration of data analogous to those with which he is primarily concerned may contribute to his understanding of the latter. Moreover, any general view or theory of religion must take into account the similarities and dissimilarties between specific religion and hence is dependent on comparative study.[৪]

ধর্মতত্ত্ববিদ উইজারি (Widgery)[৫]-এর মতে, 'তুলনামূলক ধর্ম হল বিশ্বের ধর্মগুলোকে পাশাপাশি স্থাপন করে তাদের উপাদানের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের আলোকে অভিজ্ঞতার স্বরূপ অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার এবং মানুষের জন্য তা কতটুকু উপকারী ও ফলপ্রদ তা জানতে সহায়তা করে।'[৬]

---

*. গবেষক, লেখক ও প্রাবন্ধিক।

১. C. J. Ducasse, *A Philosophical Scrutiny of Religion* (London: 1957) p. 7-8. শ্রীপ্রমোদবন্ধু সেন গুপ্ত, *ধর্ম দর্শন* (কলিকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮৯), পৃ. ৩-৪

২. *ধর্ম দর্শন*, পৃ. ৪২১ ; মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা* ; চতুর্দশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ১

৩. *ধর্ম দর্শন*, পৃ. ৪২১

৪. Michael Pye. *Comparative Religion* (Great Britain : Britol Typesetting Company Limited, 1972), p.8

৫. A. B. Widgery. *The Comparatie Study of Religions* (London: 1930), p. 15.

৬. "A comparative study of religion such as the new era made possible enables us to have a fuller vision of what religious experience can mean, what forms its expressions may take and what it might do for man. of. Joachim wach. *The Comparative Study of Religions* (Columbia: 1958), p. 9.

www.pathagar.com

প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ লুইস হ্যানরী যোরডান (Louis Hanry Jordan) তুলনামূলক ধর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- Comparative Religion is that science which compares the origin, structure and characteristics of the various Religions of the world, with the view of determining their genuine agreements and difference, the measure of relation in which they stand one of another, and their relative superiority of inferiority when regarded as types."[৭]

মোট কথা, তুলনামূলক ধর্ম হ'ল বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় উৎস, কাঠামো, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, মূল্যবোধ, দর্শন অনুসন্ধান করে উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা। অতঃপর ধর্মগুলোকে পাশাপাশি স্থাপন করে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার ও উপাদানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিষয়গুলোকে সুচিন্তিতভাবে চিহ্নিত করে এবং যৌক্তিকতা, দাবী ও মূল্যবোধকে যথার্থভাবে তুলে ধরে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের প্রয়াস চালানো হয়।

তুলনামূলক ধর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

তুলনাত্মক ধর্মের আলোচনার লক্ষ্য হল, কি প্রাচীন কি আধুনিক কি প্রাগৈতিহাসিক কি ঐতিহাসিক সকল ধর্মের মধ্যে ধর্মীয় প্রকৃতি, মূল্য, দর্শন ও অভিজ্ঞতার স্বরূপ অনুসন্ধান করার সাথে সাথে ধর্মগুলোকে পাশাপাশি স্থাপন করে ধর্মীয় উপাদান, আচার পদ্ধতি ও বিশ্বাসের যথার্থতা সুচিন্তিতভাবে চিহ্নিত করা।[৮]

তুলনামূলক ধর্ম কোন নতুন ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায় সৃষ্টি করে বিরোধ ও বিতর্কের উদ্ভব ঘটায় না। এটি যেমন কোন বিশেষ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ, মহান বা প্রগতিশীল ধর্ম বলে নির্দেশ করে না, তেমনি অপরাপর কোন ধর্মকে নিকৃষ্ট, আদিম বলেও বর্ণনা করে না। এতদ্ব্যতীত প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করাও এ অভিজ্ঞানের লক্ষ্য নয়।[৯] এ প্রসঙ্গে এ. সি. বুকেট (A. C. Bouquct)-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "Since the essential function of religion is to integrate life. Such integration varies in quality not only in accordance with the goodness or badness of the religion accepted (and there is undoubtedly bad religion as well as good). But it also varies with the sincerity and whole heartedness displayed by the individual in surrendering to it."[১০]

এমনিভাবে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, পর্যালোচনার জন্য ধর্ম সম্পর্কীয় সকল তথ্য, তত্ত্ব ও উপাত্ত সংগ্রহ করে নতুন আঙ্গিকে পুরাতন তথ্যের বিজ্ঞান সম্মত যথাযথ ব্যাখ্যা দান করা এ অভিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য। বস্তুত ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, ধর্ম এক বিশেষ লক্ষ্য থেকে উৎসারিত হয়েছে। এর যথার্থতা ধর্মের সাধারণ লক্ষণ থেকে অনুমেয় হয়। তাই ধর্ম সমূহের মধ্যে নিরপেক্ষ বিচার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের যৌক্তিকতা এ শাস্ত্রের অভিষ্ট লক্ষ্যবস্তু হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।[১১]

---

৭ Louis Henry Jordan. Comparative Religion : And Growth (Edinburgh : Morrison & Gibb Limited, 1905). p. xi : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্দশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ১ : ড. সর্ব পল্লী রাধা কৃষ্ণ (Dr. S. Radhakrishnan) বলেন, Comparative Religion was a branch of Apologetics and apologists used it in defence of their respecitve faiths. The change which the recent study of comparative Religion has brought about is a change equally in the spirit of approach and the exactness of the data. No longer is it impressionist pictures that we obtain, but critical estimates based on more accurate information." of S. Radhakrishnan. *East and West in Religion* (London: Geogrge Allen & Unwin Ltd. 1959) p. 21.

৮. *ধর্ম দর্শন*, পৃ. ৪২৭

৯. *তদেব*

১০. A.C. Bouquet. *Comparative Religion* (Great Britain: Penguin Books Ltd. 1954). p. 17

১১. *ধর্ম দর্শন*, পৃ. ৪২৮

www.pathagar.com

সুতরাং ধর্মের তুলনামূলক গবেষণার জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি এবং উদার ও নিরপেক্ষ মনোভাবের প্রয়োজন। তাই লুইস হ্যানরী যোরডান যর্থাথই বলেছেন, "Its function consists in placing the numerous religions of the world side by side, in order that deliberately comparing and contrasting them, it may frame a reliable estimate of their respective claims and values."[১২]

তুলনামূলক ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

ধর্ম একটি সার্বজনীন বিষয়। এটি মানুষের জন্য একটি শাশ্বত বিধান। মানুষের স্বভাবের মধ্যে ধর্মের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু এর বিকাশের ধারা সর্বত্র একরূপ নয়। ফলে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরণের ধর্ম পরিলক্ষিত হয়। এ গুলোর মূলনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। কোন ধর্মের একেশ্বরবাদ অক্ষুন্ন রয়েছে। আবার কোন কোন ধর্মে পৌত্তলিকতার প্রভাবে বহু ঈশ্বরবাদ জন্ম নিয়েছে। আবার কোন কোন ধর্মের ঈশ্বরতত্ত্ব গৌণ বিবেচিত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের প্রকৃতি, উপদেশ বা শিক্ষা, আচার-অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ ও সহানুভূতিমূলক আলোচনা ছাড়া একটি ধর্মের সঙ্গে অপর একটি ধর্মের বিরোধ অনিবার্য কিনা তা বলা অসম্ভব। তাই উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ধর্মের পারস্পরিক তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমেই বিভিন্ন ধর্মের অন্তরালে যে মৌলিক ঐক্য বর্তমান তা উদঘাটন করা সম্ভব।[১৩]

মানব সমাজে ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে ইসলামের আগমনের শেষে। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এর বিশ্বাস ও মূলনীতিগুলো সর্বকালে সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম মানুষের দৈহিক, মানসিক, জৈবিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক কামনাগুলো আবিষ্কার করতে সক্ষম। ইসলাম শুধুমাত্র আত্মার চাহিদা পূরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং জৈবিক চাহিদাগুলো পূরণে সঠিক নির্দেশনা দিয়েছে। পক্ষান্তরে, অন্যান্য ধর্মে আত্মা ও দৈহিক কামনাগুলো সম্পূরণে সুনির্দিষ্ট সূত্র কিছুটা অনুপস্থিত। ইসলামের এই স্বকীয়তা ও বিজ্ঞানমনস্কতা তুলে ধরার জন্য ইসলাম ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের তুলনা আবশ্যক।[১৪]

মনুষ্য চেতনার ধর্ম সত্য, সুন্দর ও আনন্দের গভীর উপলব্ধি মাত্র। তাই ধর্মে অনুপ্রবিষ্ট অনাচার, কুসংস্কার, অপবিশ্বাস, ধর্মের সৌন্দর্য ও শুভবুদ্ধিকে ব্যহত করে। বিভিন্ন ধর্মের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ণয়ের জন্য নয়, বরং তার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট কুসংস্কার, স্বার্থবোধ, ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং পাদ্রী-পুরোহিত ও যাজকদের অহং ও স্খলনকে চিহ্নিত করে তা সংশোধনে সহযোগিতা লাভ করার লক্ষ্যে ইসলামের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য।[১৫]

অপরদিকে, ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার ফলে মানুষের মনের সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়ে প্রসারতা বৃদ্ধি পায় এবং মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ঘটে।[১৬] তাছাড়া প্রচলিত ধর্মসমূহের মাঝে সংযোগ ও সম্পর্কের নীতি আবিষ্কৃত হয় এবং সৃজনশীল জ্ঞানকোষে একটি ঐক্যসূত্র নির্ণয়ের সম্ভাব্যতা সূচিত হয়। ফলে সমাজ জীবনে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিদূরীত হয়ে ঐক্য ও সমঝোতার পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭]

অতএব, ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বস্তরের মানুষের উচিৎ উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তুলনামূলক ধর্মের অনুশীলন ও পরিচর্যায় মনোনিবেশ করা। এ প্রসঙ্গে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেন, "He who knows one Language knows one, what does he know of England who only England know? What is true of Language and history is true own religion also."[১৮]

---

১২. Louis Henry Jordan, *Comparative Religion : Its Genesis And Growth,* p. 63
১৩. *ধর্ম দর্শন,* পৃ. ৪২৬
১৪. *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* চতুর্থ খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৬, পৃ. ৫
১৫. *তদেব*
১৬. *ধর্ম দর্শন,* পৃ. ৪২২
১৭. *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* চতুর্থ খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৬, পৃ. ৫
১৮. Dr. S. Radhakrishnan, op. cit., p. 21

www.pathagar.com

তুলনামূলক ধর্মের গবেষণা পদ্ধতি

কোন বিষয়ে গবেষণার জন্য পূর্বশর্ত হল একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি (Method) বা নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা। তুলনামূলক ধর্মেও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্যমূলক বিষয়গুলোকে সুচিন্তিতভাবে চিহ্নিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। আর সেই আদর্শ পদ্ধতি হল তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method).[১৯] তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ লুইস হ্যানরী যোরডান বলেন, The Comparative Method is widely and increasingly employed in many lines of Inquiry."[২০] তবে এই পদ্ধতির প্রকৃত প্রয়োগ সম্পর্কে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদদের নিকট বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়।

কোন কোন ধর্মতত্ত্ববিদের মতে ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই প্রকৃত তুলনামূলক ধর্মের গবেষণা সুসম্পন্ন হতে পারে। তাঁদের মতে এই কাজ সকলের দ্বারা সম্ভব নয়। যাঁরা আধ্যাত্মিক অন্তদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার অধিকারী কেবলমাত্র তাঁরাই এই কাজে অগ্রণী হতে পারেন। গবেষণারত নবীশ ছাত্র-ছাত্রী আধ্যাত্মিক ও সূক্ষ্মদর্শী না হওয়ার কারণে তাদের পক্ষে ধর্মীয় বাস্তব অভিজ্ঞতার তুলনা করা সম্ভব নয়।[২১]

কেউ কেউ বলেন, তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন ধর্মের বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি জ্ঞানের অন্যান্য শাখার অনুসৃত পদ্ধতির ব্যতিক্রম। তাঁরা মনে করেন যে, ধর্মের বিষয়বস্তু বিচার বুদ্ধির অতীত। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এক অনুপম অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা যুক্তি নির্ভর নয় এবং যুক্তির মাধ্যমে এটি প্রকাশযোগ্যও নয়।[২২]

আবার অতীন্দ্রিয়বাদীরা মনে করেন যে, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল অন্তরের বিষয়, যা জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার চরম স্তরে যখন মহান আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে বান্দার গভীর মিলন হয়, তখন ভালবাসা এমন এক আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করে যা বর্ণনাতীত।[২৩] অতীন্দ্রিয়বাদীদের এ অভিমত সমালোচনার যোগ্য। কেননা স্বজ্ঞা (intuition) লাভ করা সীমিত কয়েকজনের পক্ষে সম্ভব, যা ধর্মের সামগ্রিক বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচ্য হবে না।[২৪]

ধর্মতত্ত্ববিদ শ্রী রবীন্দ্রনাথ দাস বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিচারের জন্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দু'টি অভিনব পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন।[২৫] প্রথমত সকল ধর্মই মিথ্যা ও অবাস্তব। এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য বিভিন্ন ধর্মের তুলনা করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিকে নেতিবাচক বা ধ্বংসমূলক বলা হয়।[২৬]

দ্বিতীয়ত, ধর্মের সত্যতার প্রশ্নটিকে উদার মনোভাব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে গ্রহণ করা। স্থান, কাল ও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত ধর্মসমূহ পার্থক্যের অন্তরালবর্তী যে ঐক্য ও সাদৃশ্যগুলো বিদ্যমান তা চিহ্নিত করা এবং এর গভীরতা পরিমাপ করতে চেষ্টা করা। এ পদ্ধতিকে 'সমর্থক' বলা হয়।[২৭]

---

১৯. *ধর্ম দর্শন*, পৃ. ৪৩৪ ; Michael Pye. *Comparative Religion*, p. 12-15
২০. Louis Henry Jordan, *Comparative Religion : Its Genesis And Growth*, p. 30
২১. *ধর্ম দর্শন*, পৃ. ৪৩৪
২২. *তদেব*, পৃ. ৪৩৪-৪৩৫
২৩. *তদেব*, পৃ. ৪৩৫
২৪. *তদেব*
২৫. শ্রী রবীন্দ্রনাথ দাস, *ধর্ম ও দর্শন* (কলিকাতা : নিউ এজ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮২ বাং), পৃ. ২১১-২১৫
২৬. *তদেব* : ই.উ. Bouquet. Comparative Religion, p. 17
২৭. শ্রী রবীন্দ্রনাথ দাস, *ধর্ম ও দর্শন*, পৃ. ২১১-২১৫ : J. E. Carpenter, *Comparative Religion*, p. 31-33

www.pathagar.com

আবার এ সমর্থক পদ্ধতির লক্ষ্য দু'টি। একটি হল তাত্ত্বিক ও অপরটি ব্যবহারিক। তাত্ত্বিক হল বিভিন্ন ধর্মের সাদৃশ্যমূলক উপাদানগুলো নির্ণয় করে ধর্মের অন্তর্নিহিত লক্ষ্যবস্তুটিকে খুঁজে বের করা এবং ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে অধিকতর স্বচ্ছ, পরিপূর্ণ ও নির্ভুল করতে সহায়তা করা। উল্লেখ্য যে, ধর্ম সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানান্বেষণের সুযোগ 'তুলনামূলক ধর্ম' অভিজ্ঞানের মাধ্যমে যতটা সহজ ততটা অন্য কোনও উপায়ে নয়।[২৮]

ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার একটি ব্যবহারিক দিকও রয়েছে। যে কোন বিষয়ে জ্ঞানের কিছুটা প্রভাব আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও পড়ে। ধর্মতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, দু'টি কারণে ব্যবহারিক জীবনেও ধর্মের প্রতি বৈপরীত্য প্রকাশ পায়। এক. ঐতিহাসিক ও দুই. মনস্তাত্ত্বিক।

এক. ঐতিহাসিক কারণ হল বর্তমান যুগে অনুসৃত প্রধান প্রধান ধর্ম গুলোর উৎপত্তি ইতিহাসের এমন এক যুগে হয়েছিল, যখন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ট পরিচয়, ভাব-বিনিময় ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। ফলে প্রত্যেকটি প্রাচীন ঐতিহাসিক ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়েছিল আঞ্চলিক সংকীর্ণতা, রক্ষণশীলতা ও বিচ্ছিন্নতা। আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও ধর্মান্ধতা সম্বন্ধে মানুষ আরও সজাগ ও সচেতন হওয়ার সুযোগ পায়।[২৯]

দুই. মনস্তাত্ত্বিক কারণ হল বিশ্বজনীন ধর্মীয় শিক্ষাকে বাস্তব রূপদানে বাঁধাসৃষ্টি করণ। সমাজ ও মনোবিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছেন 'যুথ মনোভাব' (herd sentiment)। এটি একটি যৌথ (Collective behaviour) আচরণের সংক্রামক, নির্বাচনী, অবচেতন প্রবণতা। এ প্রবণতার ফলে মনুষ মনে করে যা কিছু নিজের গোষ্ঠীভুক্ত তাই ভাল এবং যা বহির্ভূত তাই মন্দ।[৩০]

সুতরাং উল্লেখিত ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণজনিত প্রবনতা থেকে যদি নিজেকে অন্তত কিছুটা মুক্ত রাখা যায়, তাহলেই সম্ভব উদার মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক গবেষণা করা।

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত বলেন, 'তুলনামূলক ধর্মের গবেষণা পদ্ধতি দু'ধরনের হতে পারে। (ক) সংক্ষিপ্ত এবং (খ) বিস্তৃত। সংক্ষিপ্ত গবেষণার রূপ হল দু'টি বা তিনটি ধর্মের ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা এবং পারস্পরিক তুলনা করা। আর বিস্তৃত গবেষণা বলতে সকল ধর্মের উপাদানসমূহ সংগ্রহ করে পারস্পরিক তুলনা করাকে বোঝায়।[৩১] আর এর প্রধান লক্ষ্য হল বিভিন্ন ধর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক তথ্যের অনুসন্ধান করে উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এদের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধান করা। সাথে সাথে ঐতিহাসিক অথবা ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের আলোকে ধর্মের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সংযোগের নীতিগুলো আবিষ্কার করা।[৩২]

ধর্মতত্ত্ববিদ উইজারী (Widgery) তুলনামূলক ধর্মের তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, ধর্মগুলোকে সামগ্রিকভাবে জীবনের নমুনা হিসেবে তুলনা করা। এ ধরনের পদ্ধতি ব্যক্তি বিশেষ ধর্মের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে পরিচয় লাভে সহায়ক এবং বিভিন্ন পথ সম্পর্কে যথার্থ দৃষ্টি গ্রহণ করার উপযোগী।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বের ধর্মগুলোকে ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের নিরিখে তুলনা করা। কেননা; এটি ধর্মের তাত্ত্বিক আলোচনা ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে একটি যুগোপযোগী পদ্ধতি।

---

২৮. শ্রী রবীন্দ্রনাথ দাস, *ধর্ম ও দর্শন*, পৃ. ২১২
২৯. *তদেব*, পৃ. ২১২-২১৩ ; Dr. S. Radhakrishnan, op. cit., p. 51
৩০. শ্রী রবীন্দ্রনাথ দাস, *ধর্ম ও দর্শন*, পৃ. ২১৩-২১৪
৩১. *ধর্ম ও দর্শন*, পৃ. ৪২২
৩২. *তদেব*, পৃ. ৪২২-৪২৩

www.pathagar.com

তৃতীয়ত, সবচেয়ে সরল ও সহজ পদ্ধতি হল ধর্মগুলোকে ধর্মের অঙ্গীভূত উপাদান (constituent elements)-এর আলোকে বিভিন্ন ধর্মকে তুলনা করা। যেমন কোন ধর্মের প্রকৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, মূল্য, দর্শন, আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে অন্য ধর্মের অনুরূপ বিষয়গুলোর সহিত তুলনা করা। অবশ্য প্রথম পদ্ধতির সফলতার জন্যও এ পদ্ধতি বিশেষ প্রয়োজন। কেননা বিশদ আলোচনার পারস্পরিক তুলনা না করলে সামগ্রিকভাবে ধর্মের তুলনা যথার্থ হতে পারে না। তাই বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক তুলনার ক্ষেত্রে ধর্মের সামগ্রিক রূপটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[৩৩]

আধুনিক তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ ড. আহমদ শালাবী مقارنة الأديان গ্রন্থে তুলনামূলক ধর্মের দু'টি অভিনব পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত বিশ্বের ধর্মগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনার জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ড. আবদুল হালীম উওয়ায়িস বলেন ঃ

ولهذا الطريق سلبياته الكثيرة الناشئية من ضرورة تفلك الموضوعات وصعوبات عدم نشاته ال الموضوعات فى الأديان وضرورة دارسة الأديان قبل المقارنة الجزئية وهو عمل صعب،[৩৪]

দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ (الله) সম্পর্কে গবেষণার জন্য প্রথমত এর শব্দগত বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি উল্লেখ করে এ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা করা।[৩৫]

দ্বিতীয়ত, তুলনামূলক ধর্ম গবেষণার জন্য প্রথমে প্রত্যেক ধর্মের স্বতন্ত্র অধ্যায় বিন্যাস করতে হবে। অতঃপর সকল ধর্মের ধর্মীয় প্রকৃতি, মূল্য, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার স্বরূপ অনুসন্ধান করে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক বিষয়ে তাদের যৌক্তিকতা, দাবী ও মূল্যবোধকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে।[৩৬] স্পেনের প্রখ্যাত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ ইবন হাযম আল-আন্দালুসী (মৃত্যু ঃ ৩৮৪ হি.) এ পদ্ধতিকে অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন।[৩৭]

পর্যালোচনা

সুতরাং তুলনামূলক ধর্ম পর্যালোচনা একটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল গবেষকের উচিতউদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অনুশীলন ও গবেষণা করা। যদ্বারা ধর্মের পারস্পরিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিষয়গুলো সযত্নে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে খুঁজে বের করা যায় এবং এগুলোর গভীরতা পরিমাপ করা যায়। তাহলেই ধর্মের তুলনামূলক বিচারের উদ্দেশ্যটি সফল ও সার্থক হবে।

---

৩৩. A. B. Widgery, *The Comparative Study of Religions*, p. 15-16

৩৪. ড. আহমদ শালাবী, *মুকারানাহ আল-আদইয়ান ঃ আল-ইয়াহুদিয়্যাহ* ১ম খন্ড, (কায়রো ঃ মাকতাবাহ আল-নাহযাহ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৯২), পৃ. ৩৮-৩৯ (পরবর্তীতে এ উৎসটি আল ইয়াহুদিয়্যাহ হিসেবে ব্যবহৃত হবে।)

৩৫. ড. আবদুল হালীম উওয়ায়িস, *ইবন হাযম আল-আন্দালুসী*, পৃ. ৩২০

৩৬. আল-ইয়াদিয়্যাহ, পৃ. ৩৯ ; ড. আবদুল হালীম উওয়ায়িস বলেন :
الطريق الثانى هوأن يخصص كتاب لكل دين تدرس فيه مباحثه العقائدية والتشريعية مشفوعه بالمقارنة لكما وجدلها مجال وهذا الطريق هوالذى يسير عليه أغلب الكتاب،
দ্রঃ ড. আবদুল হালীম উওয়ায়িস, *ইবন হাযম আল-আন্দালুসী*, পৃ. ৩২০

৩৭. *তদেব*, পৃ. ৩২২

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল- জুন ২০০৩

দিল্লীর মুসলিম সালানাতের সাথে অমুসলিমদের সম্পর্ক : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ ইকবাল হোছাইন*

দিল্লী সালাতানাতের (১২১১-১৫২৬ খ্রি.) অমুসলিম নীতি এবং মুসলমানদের সাথে তাদের সহাবস্থান গবেষণার ক্ষেত্রে একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা এবং অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন। দিল্লী সালতানাতের অমুসলিমদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে হাসান নিজামী (Hasan Nizami) ও দিয়া আল দীন আল-বারানী (Diya Al Din Al-Barani) প্রথম দিকের ঐতিহাসিক হিসেবে আলোচনা করেছেন। বারানীর মতে, ভারতে বিজয়ী মুসলমানরা হিন্দুদের প্রতি হয় ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার চরম পত্র দিয়েছিল।[১] এ দাবী ব্রাহ্মণ সমাজ সরাসরি প্রত্যাখান করায় তাদেরকে জীবন্ত পোড়ানো হয়েছিল বলেও তিনি অভিযোগ করেন।[২] সত্যিকার অর্থে মুসলমানদের কোনো ইচ্ছা বা দাবী হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি।[৩] বারানী প্রদত্ত তথ্যের ব্যাপারে এ জন্যই সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, তিনিই একমাত্র লেখক বা ঐতিহাসিক যিনি এমন কড়া ও আপত্তিকর উক্তি করেছেন। সমসাময়িক ও পরবর্তীতে তার বক্তব্যের ন্যায় একপেশে ও ধৃষ্ঠতাপূর্ণ বক্তব্য প্রদানকারী অথবা সমর্থকারী একজন ঐতিহাসিকও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। অবশ্য *'ফতোয়ায়ে জাহান্দারী'* (Fatawa Jahandari) নামক একটি গ্রন্থও হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অসহিষ্ণুতার কথা আছে।[৪] বারানীর উল্লেখিত উক্তি সমূহ কুরুচিপূর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধ ও গোঁড়ামিপূর্ণ সর্বোপরি হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতের দিকেই স্পষ্ট ঈঙ্গিত করে। আমরা উল্লেখিত প্রবন্ধে মুসলমাদের

---

* . সহকারী অধ্যাপক, দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. Barani. *Tarika-e-Firuz Shahi* (Calcutta : 1862)p-290. বারানী তার মতে স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলেন- "One day some of the leading scholars of the age went see lltutmish (1210-36) and resquested him to confront the Hindus with the alternative of death or Islam. lltutmish asked Nizam-al-Mulk Junaydi to give a reply to the Ulema. Referring to the impracticability of the demand the wazir said "But at the moment India has newly been conquered and the muslim are so few that are like salt in a learge dish. If the above orders are to be applied to the Hindus. It is possible that they might combine and a general confusion might ensure and the Muslim would be too few in number to suppress their general confusion. However after a few years when the muslims are well well established it will be possible to give the Hindus the choice of death or Islam," Dr. S. Nurul Hassan, *Medieval India Quarterly*, vol. no-3-4, p-101-3.

২. Shams Siraj. Afif *Tarikh-i-Firuz Shahi* (Calcutta, 1890)p-380-81.

৩. K.S.Lal. *Political condition of the Hindus under the Khiljis* (Delhi : Proceedings India History Congress. 1946) p-232. তিনি তাঁর সর্মনে বলেন,- "In India hiwever, with a population if above cent per cent idolaters, any extreme measures were impossible ; and Muslims rulers here were tolerant from the very beginning of there rule,as they accorded the status of Zimmi to the idolatrous Hindus."

৪. Diya al-Din Barani, *Fatawa Jahandari*, Rotograph in Reserarh Library, History Departement, Aligarah Muslim University, Aligarah, p-120.

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে হিন্দুদের মন্দির ভাঙ্গার অভিযোগ এবং এর জবাব, দিল্লী সালতানাদের সর্বধর্ম সহিষ্ণু নীতি, অমুসলিমদের নাগরিক স্বাধীনতা সর্বোপরি নিম্ন বর্ণ ও বিভিন্ন জাতি-উপ জাতির কর্মসংস্থানের সুযোগ বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, মুসলমানদের বিজয়ের সময় কিছু মন্দির ভাঙ্গার অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে মুসলমানদের ভারত বিজয়ের একেবারে প্রথম দিকে।[৫] ইসলাম মুর্তি পূজাকে সমর্থন করে না[৬] বরং বহুত্ববাদকে সমূলে উৎখাত করে আল্লাহর একত্ববাদের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন ইসলামের লক্ষ্য কিন্তু ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি ও উপাসনালয় ভাঙ্গার কোন অধিকার ইসলাম তার অনুসারীদের দেয়নি।[৭] M.A. Tailor বলেন-While the religiouse motives and objectives of the conquerors and rulers should not be over emphasized, on the other hand they must not be ignored altogether, nor lightly set aside by the judgment that such men were inspired by the consideration of conquests and political power alone.[৮]

কোন কোন ঐতিহাসিক অন্য কারণেরও আভাস পেয়েছেন। হাসান নিজামী মনে করেন- Wealth of Hindu temples was another motivating and inspiring factor behind their attacks on templos.[৯] অপরদিকে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের যুদ্ধ বিভিন্ন রণাঙ্গনে চলছিল তখন শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী ও কুতুব উদ্দিন আইবেক যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তাদের অজ্ঞতাবশত কোনো মন্দির ভাঙ্গা হয়েই থাকে, তবে তা মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে। দিল্লী সালতানাত প্রতিষ্ঠার পূর্বেতো বটেই। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হাসান নিজামী মনে করেন, ইসলামের ঐতিহাসিক মানবিক ও সম্প্রীতিপূর্ণ ঐতিহ্যকে ম্লান ও ভারতে মুসলমানদের নিরঙ্কুশ বিজয়ে কালিমা লেপনের জন্যই হিন্দুদের মন্দির ধ্বংসের কাল্পনিক অতিরঞ্জিত ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। His accounts are definitely hyperbolic and exaggerated[১০] সার্বিক পরিপার্শ্বিক অবস্থা দেখার পরও যারা মুসলিম সুলতানদের সম্পূর্ণ ধর্মীয় কারণে মন্দির ভাঙ্গার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে চান, তারা একপেশে নীতির কারণেই এটা করছেন এ দাবী অযৌক্তিক নয়।

ভারতে মুসলমানদের বিজয় ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিজয়ী শাসকবর্গের প্রশাসন পরিচালনার স্বার্থেই অমুসলিমদের সাথে বিশ্বাসযোগ্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান প্রতিষ্ঠা জরুরী হয়ে পড়ে। তৎকালীন রেকর্ড তথা প্রামাণ্য তথ্যপুঞ্জী ব্যাপকভাবে অনুসন্ধানে দেখা যায়, হিন্দু মন্দিরের যা ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, তা কেবল যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে। যুদ্ধ শেষে শান্তিপূর্ণ সময়ে সামাজিক ও রাজনৈতক এমনকি ধর্মীয় কারণে মন্দির ভাঙ্গার একটি যৌক্তিক উদাহরণও কেউ পেশ করতে পারবে না। ফিরোজ শাহ তুঘলকের (১৩৫১-১৩৮৮) সময় সালিহপুর, গোহানা এবং মারওয়া এ তিন স্থানের যে তিনটি মন্দির ভাঙ্গার কথা

---

৫. Elliot and Dowson, *History of India,* viol. ii (Ahmadabad, 1969) p-217,222

৬. আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং আল্লাহর সাথে শরীক করলে সে ভীষণ পথভ্রষ্ঠ হয়। সূরা নিসা : ১১৬

৭. আহমদ শালাবী, *তারীখুল ইসলাম,* (মিশর ঃ মাকতাবাতু ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৪) পৃ-৯ আল্লাহ তা'আলা বলেন : বলুন তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা ইখলাস, আয়াত নং-১-৪)

৮. T. Titus, *Islam in India and Pakistan,* (Calcutta : 1959), p-14

৯. *History of India,* Op. cit.p-222

১০. Hasan Nizami, *History of India* Op. cit.p-127 নিজামী এ সম্পর্কে আরো বলেন- The Land of Hind from the fifth of identity and vice of freed the whole of the country from of god-plurality and impurity of idol worship and by his royal vigour and intrepidity left not one temple standing.'

www.pathagar.com

বলা হয়েছে, মূলত তা বিজয়াভিযানের সময় সামাজিক অস্থিরতার কারণে হয়েছে।[১১] তার শাসনমলে ধর্মীয় কারণে বা হিন্দুদের সামাজিকভাবে হেয় করার বা রাজনৈতিক হয়রানির কারণে তা হয়নি।[১২]

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও অমুসলিমদের স্বাধীনতা

ধর্মীয় কিছু গোঁড়ামির কথা বাদ দিলে দিল্লী সালতানাত তাদের অধীনস্ত সকল অমুসলিমকে বাপক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছিল। দিল্লী সালতানাত প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের যুদ্ধকালীন সময়ে কিছু মন্দির ধ্বংস হয়েছে সত্য, তবে প্রত্নতাত্ত্বিক রেকর্ডের মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত সত্য যে, দিল্লী সালতানাত-এর নিয়ন্ত্রণে সাম্রাজ্যে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা হবার পর কোন নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো বাধা বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়নি। জৈন সম্প্রদায়ের কিছু প্রতিমার সন্ধান পাওয়া যায় ঈটাহ[১৩] নামক স্থানে, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এগুলো ১২৭৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে তৈরী।[১৪] দিল্লীর পুরানা কিল্লায় প্রাপ্ত ফার্সী ও সংস্কৃত শিলালিপির একটি প্রস্তর খন্ডের রেকর্ডে দেখা যায়, দিল্লীর সূলতান কৃষ্ণকে উৎসর্গকৃত একটি মন্দির তৈরির জন্য ১২ বিঘা জমি বৃত্তি হিসাবে দান করেছিলেন।[১৫] অনুরূপভাবে গয়া, বৃন্দাবন এবং মথুরায়ও মন্দির নির্মাণ হয়েছিল।[১৬] প্রত্নতাত্ত্বিক রেকর্ড থেকে আরও দেখা যায়, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে মধ্য প্রদেশের জয়পুরের 'রেভাসায়' এবং '*বটিয়াঘাহে*' অনেক মন্দির নির্মাণ করা হয়।[১৭] মুসলিম অঞ্চল হতে দূরবর্তী স্থানেই মন্দির নির্মাণ করা হত। *ফতোয়ায়ে ফিরোজশাহীতে* একথা স্পষ্ট করে লেখা আছে যে, হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় মুসলমানেরা কোন ভাবেই প্রতিরোধের সুযোগ পেত না।[১৮] সংক্ষেপে এ কথা বলা যায়, অমুসলিমরা অবাধে তাদের মন্দিরে ভ্রমণ এবং তাদের স্ব-স্ব ধর্মের নিয়মানুযায়ী প্রার্থনা করতে পারত।[১৯] কিলয়ান জেলায় প্রাপ্ত শিলা লিপির প্রাপ্ত তথ্যেও দেখা যায়, মুসলিম শাসকরা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও অমুসলিমদের ধর্ম পালনে অবাধ স্বাধীনতা দেয়। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের নিয়োগকৃত কিলয়ানের গভর্নর আহমদ বিন আযীযের এক ফরমানে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তার ফরমানে বলেন : "Since worship the temples is the religious duty of the petitioners, they shuld follow it."

তিনি এমন এক সময় এ নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, যখন সামরিক বাহিনীর কিছু উচ্চতভিলাসী কর্মকর্তা ও সৈন্য কিলয়ানের মধুকেশ্বর মন্দির ও শিবলিঙ্গ ধ্বংস করেছিলেন বলে তাঁর কাছে অভিযোগ ছিল। সুলতানী প্রশাসন এ সমস্ত জাঁকজমকপূর্ণ মন্দির ও শিবলিঙ্গ পুনস্থাপন করেছিলেন এবং সমস্ত সম্পত্তি ট্রাস্টিদের হাতে ফেরত দিয়েছিলেন।[২০] সালতানাতের অধীন সমগ্র দেশেই হিন্দুরা পুরাতন মন্দির পুনসংস্কারের কাজ অবাধে করতে পারত।[২১]

জিয়াউদ্দিন বারানী'র লেখা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় তিনি ফিরোজ শাহের প্রতি ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কেননা ফিরোজ শাহ তাঁর আমলে হিন্দুদের অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ (ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ও উগ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা) আরো কিছু স্বাধীনতার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিলেন। কিন্তু একথাও সত্য যে, তিনি কেবল হিন্দুদের উপর নয় বরং ,মুসলমান নারীদের উপরও ধর্মীয় সভায় অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। আসলে এসব পদক্ষেপ দ্বারা সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মের নামে চলা সমাজ থেকে

---

১১. Firoz Shah Tughlu, *Futuhat-i-Firuż Shahi,* Op.cit, p-10

১২. Op.cit.p-10

১৩. মথুরার একটি স্থানের নাম।

১৪. *Reports of the Archaeological Survey of India*, 1923, p-92

১৫. Op.cit. p-131.

১৬. Agha Mahdi Hossain, *The Hindus in Medieval India,* Op.cit. p-712.

১৭. Agha Mahdi Hossain, *Tughlug Dynasty,* p-333.

১৮. Sadr al-Din Yaqub Muzaffar Kohrami, *Fatawa Firuz Shah Tuhlug, Futuhat-I-Firuz Shahi,* Op. cit, p-10 Shahi , In Mulana Azad Library, A.M.U. Aligarah, file-218.

১৯. Op. cit-214.

২০. Agha Mahdi Hossain, Op. cit. p-333.

২১. Op. cit.

www.pathagar.com

ধ্বংসাত্মক ও অনৈতিক কাজগুলোর মূলোৎপাটন। ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বা সামাজিক প্রচলিত নীতিতে আঘাত হানা নয়। একই সাথে এ দিকটিও লক্ষণীয় যে, সুলতানী প্রশাসন পক্ষপাতহীনভাবে অত্যন্ত শক্ত হাতে দল মত নির্বিশেষে (হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে) এমন সব আদর্শ ও নীতিচ্যুত নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন,যারা সমাজের শান্তি শৃংখলা, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও নৈতিকতা ধ্বংসে ব্যস্ত থাকত।[২২]

ধর্মীয় দর্শনার্থীদের তথ্য ও তালিকা থেকেও একথাই প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমরা স্বাধীনভাবে তাদের তীর্থ স্থানগুলো পরিদর্শন করত। মথুরার ঈটাহ জেলায় অবস্থিত সীতা রামজীর মন্দিরের (Sita Ramji Ka Mandir) ১১৬৮ থেকে ১৫১১ সাল পর্যন্ত দেয়ালে রক্ষিত রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, গড়ে ৩৮ জন তীর্থযাত্রী এ মন্দিরটি পরিদর্শন করত।[২৩] ১২৪১ সালে মুসলমানরা ভারত বিজয়ের পর থেকে ১২৯০ সাল পর্যন্ত মথুরার সরুন (Soron) মন্দিরের ১৫ টি রেকর্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তুর্কি সালতানাতের প্রথম দিকেও অত্যন্ত স্বাধীন ও ভাবগম্ভীরভাবে অমুসলিমরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন ও নিজ নিজ ধর্মীয় স্থানে মিলিত হত। এমনিভাবে খলজী ও তুঘলকদের শাসনামলে ১৩৭৫ ও ১৪২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রাপ্ত শিলালিপি এবং বাহলুল লোদীর শাসনামলে তথা ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্ত শিলালিপিতেও ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৪]

কোন কোন হিন্দু ঐতিহাসিক স্বাধীনভাবে হিন্দুদের তীর্থ যাত্রায় মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ আরোপের অভিযোগ করেছেন। Mrs Pushpa Prasad বলেন "The Pcople were deterred from making their usual pilgrimage for fear of persecution by the Muhammadan rules. Since there is no record after 1511 c." তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন যে, the temple must hava been destroyed during the reign of the intolerant Sikandar Lodi."[২৫]

তাদের অভিযোগের জবাবে বলা যায়, মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা বিভিন্ন কারণে কমবেশী হতে পারে কিন্তু তথ্য প্রমাণাদি ব্যতীত ঢালাওভাবে মুসলিম সুলতানদের বিরুদ্ধে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের মন্দিরে প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপের অভিযোগ সত্য নয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অমুসলিমদের প্রতি মুহাম্মদ বিন তুঘলকের ঔদার্য ও সহিষ্ণুতা এত অধিক ছিল যে, তার শাসনকালে মন্দির ও তীর্থ পরিদর্শনের কোন রেকর্ড ট্রাস্ট্রিরা রাখার প্রয়োজন মনে করতেন না। সুতরাং তীর্থ যাত্রীদের সংখ্যাধিক্যই স্বাধীনতা, আর যাত্রীদের পরিভ্রমণের রেকর্ড না থাকলে স্বাধীনতাহীনতা এরূপ মনোভাব সত্যিকার ইতিহাসের জন্য ক্ষতিকর।[২৬] ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, মুসলিম শাসনের পূর্বে হিন্দু শাসনামলে মুদ্রার এক পাশে আশ্বারোহী শিবের ছবি, অন্যদিকে শিবের বাণী লিপিবদ্ধ ছিল।[২৭] শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর শাসনামলে মুদ্রা পরিবর্তন না করে হিন্দু আমলের মুদ্রা অব্যাহত রেখেছিলেন।[২৮] যদিও ঘুরীর এ পদক্ষেপ তার বিজয়ের প্রথম দিকের কথা, তারপরও এখানে অসাম্প্রদায়িক একটি চিত্র ফুটে উঠে।[২৯]

---

২২. Zafrul Islam, *Firuz Shahi Tughlug's Attitude Towards Nun-Muslim*, artical in Islamic Culture, vol. 14, no. 4, 1990, Hydrabad, p-67.
২৩. Pushpa Prasad, *Sanskrit Iscriptions of the Delhi Sultanath* (New Delhi : 1990) p.-117.
২৪. Op. cit.
২৫. Op. cit. p-119.
২৬. M. Ifzalur Rahman Khan, *The attiude of Delhi Sultans Towards Non-Muslims : Some Observation*, artical Islamic Culture Journal Quatarly, April-1995, p-44.
২৭. D.C. Sirkar *Studies in Indian Coins* (Patna : 1968), p-17, 2.230.
২৮. মুহাম্মদ ঘুরীর শাসনামলের যে মুদ্রাগুলো পাওয়া গেছে এগুলোর একপাশে শিবের ছবি অপরদিকে অশ্বারোহী ও শিবের বাণী মুদ্রিত ছিল। দ্র. D.C. Sirker, *Studies in Indian Coins* (Patna : 1968) p-19 Nelson Wright, *The Coinage & Metrology of the Sultans of Delhi* (New Delhi, 1975) p-5-10.
২৯. K. A. Nizami, Op. cit. তিনি ঘুরীর ধর্মীয় সহিষ্ণুতার দিকটি তুল ধরে বলেন, "Shihab Al-Din Muhammad Ghawri continued the figures of Laksmi on his gold coins. A fact which indicates the extent to which the conquerors were pripared to compromise their religious ideas with the demands of the state. *Some aspects of religion and politics* (Delhi : 1978), p-316.

www.pathagar.com

অমুসলিমরা কেবল ধর্মীয় স্বাধীনতাই ভোগ করেনি বরং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও ব্যাপকভাবে ভোগ করেছিল। অবশ্য কোন কোন হিন্দু ঐতিহাসিক অমুসলিমদের ভোগকৃত স্বাধীনতার কথা স্বীকার করেন না। তন্মধ্যে কানহিলাল শ্রী ভাসটা অন্যতম।[৩০] মুসলিম শাসনামলে অমুসলিমদের জন্য মদ্যপান ও শূকরের গোশত বৈধ ছিল। তারা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে তাদের উৎপাদিত মদ শূকরের গোশতসহ বিভিন্ন জিনিস মুসলিম অধ্যুষিত শহরগুলোতে অবাধে বিক্রি করতে পারত। অথচ মদ উৎপাদন,পানকরা এবং শূকর পালন ও গোশত ভক্ষণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ।[৩১] অত্যন্ত সম্মানের সাথে অমুসলিমদের নিরাপত্তা, সম্পদের সংরক্ষণ এবং সমানাধিকারের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ ছিলনা। *ফতোয়ায়ে ফিরোজ শাহীতে* বলা হয়েছে যে, মুসলিম অথবা অমুসলিমকে অবৈধভাবে হত্যার জন্য অপরাধীকে সমান দন্ডে দন্ডিত করা হত।[৩২] যদি কোন জিম্মী কোন খাস জমি চাষ করার পর পুনরায় তার জন্য দাবী করত, তাহলে এটি তাকেই বরাদ্ধ দেয়া হত, যে সুযোগটি মুসলমানদের জন্য ছিলনা।[৩৩] সার্বিকভাবে একথা বলা যায় অমুসলিমরা দিল্লী সালতানাতের অধীন অত্যন্ত নিরাপদ ছিল। পারামবলী শিলালিপিতে[৩৪] দেখা যায় হিন্দু রাজন্যবর্গ তাদের প্রজাদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্যে গিয়াস উদ্দিন বলবনের প্রশংসা করেছেন এবং এও বলেছেন, তাদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য এ মূহূর্তে প্রভু বিষ্ণুর প্রয়োজন নেই।[৩৫]

সুলতানী শাসনামলে নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও বিভিন্ন উপ-জাতিদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নিয়োগ

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারত রাজপুত শাসনাধীন ছিল। এসময় ব্রাহ্মণরা শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নের্তৃত্বের পর্যায়ে ছিল। এ দুটি সম্প্রদায় ভারতের জনগোষ্ঠীর খুব কম লোকের প্রতিনিধিত্ব করত। অথচ বিশাল জনগোষ্ঠীর লোকদের কোন প্রতিনিধিত্ব ভারতের প্রশাসনে ছিল না। শাসক ও শাসিত উভয়েই একই ধর্মের অনুসারী হলেও নিম্নবর্ণের হওয়ার কারণে তাদেরকে বঞ্চিত করা হত। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হবার সাথে সাথে রাজপুতদের শাসনের অবসান ঘটে। তুর্কী মুসলমানদের শাসনে ব্রাহ্মণদেরকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অসম্মান না করে নিম্নবর্ণের লোকদের উন্নয়নের দিকে বিজয়ী মুসলিম শাসকেরা মনযোগ দেয়।[৩৬]

ভারতের তুর্কী মুসলমাদের সংখ্যা খুব কম হলেও পনর শতাব্দী পর্যন্ত তারা অত্যন্ত দাপটের সাথে শাসন পরিচালনা করেন। আলাউদ্দিন খলজী ও গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের তুর্কী বংশোদ্ভূত ছিলেন। এটা সত্য যে, ক্ষমতা সংহত হওয়া পর্যন্ত তুর্কীরা তাদের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগগুলো তুর্কী বংশোদ্ভূত ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে হতে দিত না। অমুসলিমদের সাথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাদের সম্পর্ক

---

৩০. Kanhaiyya lai Sriwastava তিনি মনে করেন মুসলিম শাসনাধীন ভারতে হিন্দুরা তাদের ধর্ম কর্ম পালন করতে পারেনি। তার মতে "With the foundation of Muslim rule in India the Hindus had lost their freedom of religious worship "*The Position of the Hindus under the Sultanate*, (Delhi : 1980), p-99.

৩১. Firuz Shah Tughlug, *Futuhat-i-Firuz Shahi*, Op. cit. p-10, মদ ও জুয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, (হে মুমিনগণ ! মদ, জুয়া, মুর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক ঘৃণ্য বস্তু শয়তানর কাজ। তাই তোমরা তা বর্জন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা মায়িদা-৯০)

৩২. Op. cit. p-197.

৩৩. Op. cit. p-172.

৩৪. প্রাপ্ত শিলালিপিটি হিন্দি ভাষায় লিখিত। এর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন ইফজালুর রহমান খান। অনুবাদটি এরকম "The earth now being supported by this sovereign. Sesa althogether forsaking his duty of supporting the weight of the globe, has be taken himself to the great bed of Vishnu and Vishnu himself for the sake of protection taking Lakshmi on his breast and relinquishing all warriors, sleeps in peace on the ocean of milk.

৩৫. Pushpa prasad. *Sanskrit Inscription of the Dellhi Sultanath*, Op. cit. p-13

৩৬. K.S. Lal. *Twilight of the Sultanath* (Bombay : 1963) p-266.

www.pathagar.com

নিরূপন করত।[৩৭] যদিও সতর্কতার সাথে অমুসলিম নীতি পরিচালিত হত, তা সত্ত্বেও তুর্কীরা হিন্দু জমিদার ও নেতৃস্থানীয়দের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেন এবং তাদেরকে প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়োগ দেন।[৩৮] এ সম্পর্কে Dr. Tara Chand বলেন :

> When Qutbuddin Aibak decided to stay in Hindustan, he had no other choice but to retain the Hindu staff, which was familiar with Hindu administration ; for without it all government including the collection of revenue would have fallen into utter chaos, The Muslim did not bring with them from beyond the Indian frontiers the artisans, accountants and clerks. The Hindus who adapted their ancient rulrs to newer condition erected their buildings: Hindu goldsmiths struck their coins and the Hindu officers kept their accounts. Barhman legist advised the king on the administration of Hindu law, and Barhman astronomers helped in the performance or their general functions.[৩৯]

ভারতের মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর অমুসলিমরা রাজকীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন এবং সুলতান প্রদত্ত খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।[৪০] তারা বিভিন্ন সুলতানের অধীনে অফিসার ও সাধারণ সৈন্য হিসেবে চাকুরী করেছেন এবং বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।[৪১] সুলতানী আমলে হিন্দুরা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সাথে একীভূত হয়ে পড়েছিল। সাধারণত তারা অফিসের বিভিন্ন কাজ, নিম্ন অফিসার ও হিসাব রক্ষকের কাজ করতেন। তবে অনেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৪২] ঐতিহাসিক কে এস লাল বলেন :

> The kshattriyas were employed in the army as soldiers and the higher ups enjoyed the status of Rajas and and nobles. They also took up other professions in various arts and crafts. In the 14th century the kshattriyas had acquired the status of big Zamindars and petty rulers. They had become more powerful after the invasion of Timur. Hindus in general and kshattriyas in particular had never been so strong ever since Muhammed Ghauri's invasion as they were in the first half of 15th century Hindustan"[৪৩]

দিল্লী সালতানাতের বশ্যতা স্বীকারকারী হিন্দুরা বলবনের বিচারালয়ের চাকুরী করতেন, কিন্তু বারানী এ সময়টিকে খিলজী আমল না বলে কায়কোবাদের শাসনামল বলে অভিহিত করেছেন এবং আরো বলেছেন : এ সমস্ত হিন্দু নেতা ও রাজারা ভীত হয়ে মুসলিম সুলতানদের বশ্যতা স্বীকার করেছেন।[৪৪] এমনিভাবে কোন তথ্য প্রমাণাদি ব্যতীত হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু লোকের নাম উল্লেখ করেছেন যারা সুলতানী প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে চাকুরী করত।[৪৫]

---

৩৭. K.A. Nizami. Op. Cit.P-316.

৩৮. K.A. Nizami. Op. Cit.P-322.

৩৯. Dr. Tara Chand. *Influence of Islam in Indian Culture* (Alahabad : 1946). p-137

৪০. Tarikh-i-Mudabbir, *Tarikh-i-Fakhr al Din Mubarak shah* (London : Dennison Ross), p-33

৪১. Yasin Mazhar Siddiqui, *Delhi Sultanat ke Nazm wa Nasq mein Hindu on ka Hissah,* artical in Hindi Islam Tahdhib Ka Irtica (New Delhi), p-19-22.

৪২. Agha Mahdi Hossain . Op. cit. p-712

৪৩. K.S. Lal, *Political condition of the Hindus under the Khaljis*, artical Proceding Indian History Congress. 1946. p-132.

৪৪. Diya al-Din Barani, *Fatawa Jahandari,* Rotograph in Research Library, History Department, Aligarah Muslim University, Aligarah, p-33-36

৪৫. Op.cit.p-182.

www.pathagar.com

নিম্নে তথ্য প্রমাণাধির ভিত্তিতে এবং বিভিন্ন সময় শিলালিপিতে প্রাপ্ত দলীল ও রেকর্ড অনুযায়ী একটি টেবিল দেয়া হলো, যাতে দিল্লী সালতানাতের অধীন অমুসলিমরা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিল। উল্লেখ্য, এ টেবিলটি নেয়া হয়েছে M. Ifzalur Rahman Khan লিখিত *The attiude of Delhi Sultans Towards Non-Muslims : Some Observation* প্রবন্ধ থেকে।

Table
Hindus in Army, Administration and Tributaries

S.No	Name	Participation	Source
1	Raj Danuj	A Tribuory under Balban who helped the Sultan in suppression of the rebel Tughril	Yahya, *Tarikh-i-Mubarak shahi,* ed Hidayat Hussain pub. Calcutta, p-42-43
2	Hathia	They were officers under Balban	T. F. *Tarikh-i-Firuzshahi* of Diya Baeani, ed. Syed Ahmad Khan, pub, Calcutta, p-210-11
3	Payak Brinjetan	They were good generals	op. cit.
4	Mangali	An officer in Army of Prince Muhammad, Son of Balban. It was after the defeat of Mongali that prince Muhammed was killed by the Mongols in 1286	Isami, *Futuhal. Salatin,* ed A.s. Usha, pub., Madras, 1948. p-178
5	Rai Bhim Deo	They were trivutary,under Balban, who on account of their	Yahya *Tarikh-i-Mubarak shahi,* ed. Hidayat Hussain pub. Calcutta, p-59
6	Rai Piram Deo Kotla	Loyality to the house of Balban, helped Malik Chhajju in his struggle against Jalal al-Din Khalji	M. F. *Miftah al-futuh of Amir Khusraw*, pub., Aligarah, 1954.
7	Rajni Payak	A noble of Sultan Kaikubad	Yahya, *Tarikh-i-Mubarak shahi,* ed Hidayat Hussain pub. Calcutta, p.58-59
8	Mandahar	Vakil-i-Dar of Malik Khurram	T. F. *Tarikh-i-Firuzshahi* of Diya Baeani, ed. Syed Ahmad Khan, pub, Calcutta, p-196
9	Malik rayak	Mukti of sanam and sumana under Ala al Din Khalji	Op. cit, p.-195
10	Panchamin	An officer in Ala-al din's army who was sent for the conquest of Gujrat in 1299.	Isami, *Futuhal Salatin*, ed. A. S. Usha, Madras, 1948. p.-286-87
11	Payak or Manik	officer in Ala-al Din's army who was saved the life of the Sultan when akat khan made an asssault on him in 1300,	T. F. *Tarikh-i-Firuzshahi* of Diya Barani, ed. Syed Ahmad Khan, pub, Calcutta, p-273.
12	Malik nayak or Nanak	A general in ala Al Dins army who defeated the Mangols-Ali Beg and Tartak etc-in 1306.	D. R. K.K. Dewal, *Rani Khidr Khan, of Amir Khusraw*, pub. Aligarah, p-61

www.pathagar.com

13	Nain	An offer under Ala al Din Khalji	C.J.L.-T.D, *Contemporary Jain Literature*, Quted Agha Mahdi Hussain, *Tughluq Dynesty*, pub. Calcutta, 1963, p-315.
14	Rananaul	An officer in Khusraw Khans army who was sent againt Ghazi Malik Tughluq.	T.F. *Tarikh-i-Firuzshahi* of Diya Baeani, ed. Syed Ahmad Khan, pub, Calcutta, p-406
15	Gul Chandra	They fought on the side of Ghiyath al Din Tughluq in his strugle againest Khusraw Khan	Op. cit, p-375, Isami, *Futuhal Salatin*, ed. A. S. Usha, pub., Madras, 1948. p-286-87
16	Malik Thabba	Treasurer under Ghiyath al-Din Tughluq	T. F. *Tarikh-i-Firuzshahi* of Diya Barani, ed. Syed Ahmad Khan, pub, Calcutta, p-424
17	Nanak or Manik	Muqti of Ajmir under Muhammed Bin Tugluq	Ajmir inscription
18	Ratan	Muqti of sahwan or siwistan under Muhammed bin Tugluq	Rehla,II, *Rehla of Ibn Battuta*, pub., Cairo, 1938
19	Kishan Bazran Indari	Muqti of Awadh under Muhammad bin Tugluq.	T. F. *Tarikh-i-Firuzshahi* of Diya Barani, ed. Syed Ahmad Khan, pub, Calcutta, p-424
20	Dhara	Naib Wazir of Deogiri under Muhammad bin Tugluq.	Op.cit.p-501
21	Nathu Sondhal	Hajib of Sultan Muhammad bin Tugluq.	Yahya, *Tarikh-i-Mubarak shahi*, ed. Hidayat Hussain pub. Calcutta, p-120
22	Najaba	Held iqta in territories of Gujarat, Multan and Badaum under Muhammad bin Tugluq.	Op.cit.p-505
23	Sai Raja	Minister of sultan Muhammad bin Tugluq.	Op.cit.p-501
24	Bhiran or Bharan	Muqti of Gulbarge Unde Muhammad bin Tugluq.	T.F. *Tarikh-i-Firuzshahi* of Diya Barani,ed, Syed Ahmad Khan, Pub, Calcutta, p-189-89.
25	Samar Sing Jain	Muqti of Telangana under Muhammad bin Tugluq.	C.J.L-T.D, *Contemporary Jain literature*, Quted Agha Mahdi Hussain, *Tugluq Dynesty*, Pub. Calcutta, 1963, p-316
26	Mehta	An officer under Muhammad bin Tugluq.	T.F. *Tarikh-i-Firuz shahi* Diya Barani,ed. Syed Ahamad Khan,pub, Calcutta, p-523
27	Kharpara	A commander of Hindu troops in the army and also the Governor of Bundelkhand under Muhammad bin Tugluq.	Op.cit-p334.

www.pathagar.com

28	Lal Bahadur	They were military offcers under Muhammad bin Tugluq and were sent against rebal bahram Aiba Kishli Khan in 1327	Isami, *Futuhal Salatin*, ed.A.S. Usha, pub., Madras, 1948.p-435
29	Khandi Rai	An army offcer of Qutlugh Khan, the governor of Daulatabad under Muhammad bin Tugluq.	Op. cit,p-719
30	Gujar Shah	Officer incharge of riyal mint Firoz shah Tugluq	afif, *Tarikh-i-Firz Shahi* of Sams Siraj, pub. Calcatta, 1890.p-349
31	Rai Bhiru Bhatti	Sarjander under Firoz Shah Tugluq.	T.F. *Tarikh-i-Firuzshahi* Diya Barani, ed. Syed Ahamad Khan, pub, Calcutta, p-587.
32	Udai Singh	A Tributary under Firuz Shah Tughluq	Yahya, *Tarikh-i-Mubarak Shahi*, ed.Hidayat Hussain pub. Calcutta, p-124-25.

গিয়াস উদ্দিন বলবেন পূর্বে এবং ফিরোজ শাহ তুঘলকের পর কোন অমুসলিমের নাম উল্লেখিত টেবিলে তেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না। এজন্য অনেকেই বলে থাকেন কেবল ধর্মীয় কারণে অমুসলিমরা প্রশাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে কথাটি সত্য নয়। তবে বলবনের পূর্বে অমুসলিমরা যে সেনা ও সিভিল প্রশাসনে ছিল এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৬] একটি কথা আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি যে বলবনের পূর্বে তুর্কী মুসলমানেরা তাদের প্রশাসনে কেবলমাত্র তুর্কীদের নিয়োগ করত। যার ফলে উচ্চ পদগুলোতে অমুসলিম কেন ভারতীয় মুসলমানদেরও কোন অংশিদারিত্ব ছিলনা। আর ফিরোজ শাহের পর থেকে অতি দ্রুততার সাথে দিল্লী সালতানাত দুর্বল হতে থাকে। ফিরোজ শাহ তুঘলকের অনুসারী সাইয়্যেদ শাসন খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর প্রশাসন এত শক্তিশালী ছিলনা যে, দৃঢ়ভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কেন্দ্রে ছিল কেবল অরাজকতা আর বিশৃংখলা। এ অরাজকতার সুযোগে অনেক হিন্দু-মুসলিম সাবলম্বী হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতা সংহত করে বসে। তদুপরি ইয়াহইয়া সের হিন্দী ব্যতীত আর কোন সুত্র থেকে আমরা সাইয়্যেদ শাসন সম্পর্কে তেমন কিছু জানতে পারিনা। পরবর্তীতে লোদীরাও তুর্কীদের অনুরূপ প্রশাসন চালাতে থাকে। তারা প্রশাসনের উচ্চ পদগুলোতে আফগানদের থেকে লোক নিয়োগ করে। তদুপরি রায় প্রতাপ সিং, রায় কারান সিংহ, রায় বীর সিংহ, রায় তিলক চাঁদ, রায় ডাম্ভোসহ আরো অনেকে বাহলুল লোদী ও সেকান্দর লোদীর শাসননামলে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন।[৪৭] ঐতিহাসিক মুশতাকীর মতে লোদীরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে আফগান ব্যতীত কেবল তিনজন মুসলমানকে নিয়োগ দিয়েছিল।[৪৮] হিন্দুদের শাসন আমলে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত হয়েছে। কেননা হিন্দু ধর্মে বিভিন্ন জাত ও শ্রেণী স্বীকৃত। ফলে উঁচু শ্রেণীর লোকজন নীচু শ্রেণীর লোকদেরকে অস্পৃশ্য মনে করে।[৪৯] কিন্তু ইসলামে কোন জাত পাত নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। এখানে আশরাফ আতরাফ ধনী-দরিদ্রের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। দিল্লীর সুলতান তার সাম্রাজ্যে জাত, বর্ণ বা ধর্মের ভিত্তিতে কর্মসংস্থান করেননি বরং যা করা হয়েছে, তা হলো সমতা ও ইনসাফ ভিত্তিক।

---

৪৬. Isami. *Futuhal Salatin.* ed. A.S Usha, pub, Madras, 1948. p 139,178.

৪৭. Nimat Allah, *Tarikh-i-Jahani*, vol.i (Dacca : 1960)p-155

৪৮. Riza Allah Mustaqi, Waqi at-i Mustaqi, Rotograph of The MS in Research Library, History Deparment, A .M.U. Aligarah, f-24

৪৯. M. Ifzalur Rahaman Khan, *The attiude of Delhi Sultans Towards Non-Muslim ; Some Observation*, Op. cit, p-50.

www.pathagar.com

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, দিল্লী সালতানাত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সকল নাগরিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছিল। মুসলমানদের বিজয়াভিযানের সময় হয়তো কিছু ধর্মীয় স্থান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার পর এমন কোন রেকর্ড পাওয়া যায়নি যে, জোর পূর্বক মুসলমানেরা অন্য কোন ধর্মের মন্দির বা উপসনালয় ধ্বংস করেছে। বরং যুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্থ মন্দির পুনরায় সংস্কারসহ অনেক নতুন মন্দির স্থাপনে সরকারী সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তার পরও ঐতিহাসিক দলীল ও তথ্যাদি ব্যতীত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় গোঁড়ামি ধর্মাবলম্বীদের উপসনালয় ভাঙ্গার একপেশে কিছু অভিযোগ এনেছেন। হাসান নিজামীর ভাষায়, অভিযোগ আনার সময় এমন সব ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যা শিষ্টাচার বর্জিত ও মানহানিকর।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল- জুন ২০০৩

বিকাশমান বাঙালী মুসলিম সমাজের প্রথম শিল্প নিদর্শন : নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'আনোয়ারা' উপন্যাস

শেখ রেজাউল করিম*

উনিশ শতকের বিকাশমান গ্রামীণ মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রথম শৈল্পিক রূপায়ণ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের (১৮৬০-১৯২৩) *আনোয়ারা* উপন্যাস। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নজিবর রহমান 'গ্রামীণ সমাজ-জীবনের রূপকার' হিসেবে কৃতিত্বের দাবীদার। গ্রামীণ সমাজ-জীবনের চিত্র ও পর্দানশিন মুসলিম সমাজ-জীবনের বাস্তব চিত্রাংকনে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গ সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর মর্যাদা, শিক্ষা ও বাকস্বাধীনতা চিরকালই ছিল উপেক্ষিত এবং মুসলিম সমাজে নারীর অন্তর-প্রেম-অধিকার এসব ছিল শৃঙ্খলিত। বিশ শতকের প্রথমভাগে বাংলা সাহিত্যে '*আনোয়ারা*' উপন্যাস পর্দানশিন মুসলিম অন্তঃপুরের প্রথম সাহিত্য প্রয়াস এবং পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস হিসেবে নজিবর রহমানের প্রথম শিল্প নিদর্শন।

বিধাতার প্রেমরাজ্যে সতীর মাহাত্ম্য প্রকাশে ঔপন্যাসিক ব্রতী হলেও নারী শিক্ষা, ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও চাকুরির পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের উন্নয়নকামী চেতনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। *আনোয়ারা* উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮ মে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে[১] কলিকাতার ১২/১, সারেঙ্গ লেনস্থ নূর লাইব্রেরী হতে। এ উপন্যাসের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬+৩৫০ এবং মূল্য (এক টাকা আট আনা) দেড় টাকা।[২] আনোয়ারা উপন্যাসের ২৬তম মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে ওসমানীয়া বুক ডিপো, ঢাকা থেকে।

আনোয়ারা বিকাশমান মুসলমান জনগোষ্ঠীর জীবনভাষ্য। সর্বাধিক প্রকাশিত পাঠক-নন্দিত এ উপন্যাস পঁয়ষট্টিটি পরিচ্ছেদ ও উপসংহার অংশে বিভক্ত।। পরিচ্ছেদগুলো আরব্ধ অংশ, তিনটি পর্ব ও উপসংহারে বিন্যস্ত হয়েছে। সুপরিকল্পিত কাহিনী বিন্যাসে ঔপন্যাসিক আরব্ধ অংশে দশটি পরিচ্ছেদ, বিবাহ পর্বে আটটি পরিচ্ছেদ, ভক্তিপর্বে বাইশটি পরিচ্ছেদ এবং পরিমাণ পর্বে পাঁচটি পরিচ্ছেদে কাহিনী পল্লবিত করেছেন। *অনোয়ারা* উপন্যাসের পর্ব বিভাজন মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১) '*বিষাদ সিন্ধু*'র (১৮৮৫-৯১) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৩] এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের '*বিষবৃক্ষ*' উপন্যাসের পরিচ্ছেদ পরিকল্পনার সাথে তুলনীয়।

নজিবর রহমান গ্রামীণ পরিবেশ পটভূমিতে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে *আনোয়ারা* উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র-চিত্রণ, আঙ্গিকশৈলী ও ভাষা প্রয়োগে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উপন্যাসের ভাষারীতি ও গঠনশৈলী নির্মাণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মীর মশাররফ হোসেনকে অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন। তবে নব্য বিকশিত বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, *আনোয়ারা*, ঢাকা-১৯৬৬, ২৬ তম-সং, পৃ. [কৃতজ্ঞতাপত্র]

২. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা-সমকালের দর্পনে*। ঢাকা-১৯৯১, পৃ. ৩৩৬

৩. মীর মশাররফ হোসেন, *বিষাদ সিন্ধু*, ঢাকা-১৯৯৭, (পর্ব-প্রবাহ দ্র.)

www.pathagar.com

সমাজের চিত্র অঙ্কনে নজিবর রহমানের স্বকীয়তা বিদ্যমান। বলা যায় তিনি মুসলিম সমাজের প্রথম শিল্প রূপকার। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"বিষাদ সিন্ধু (১৮৮৫-৯১)-তে যেমন অতীত প্রিয় শিল্পীর যুদ্ধ-সংঘর্ষ ও রক্তপাতের শব্দ বিস্তার প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি গাজী মিয়ার বস্তানী (১৮৯৯)-তে সামন্ত জীবন কাঠামোর অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের স্বরূপ উন্মোচন প্রয়াসই মুখ্য। এদিক থেকে মোহাম্মদ নজিবর রহমান-এর আনোয়ারা উপন্যাসই নব্য বিকশিত বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রথম ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ।[৪]

গ্রামীণ পটভূমিতে প্রথম দর্শন পূর্বরাগের মাধ্যমে কাহিনীর সূচনা এবং বিবাহ, আত্মপ্রতিষ্ঠা, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সতীর মাহাত্ম প্রকাশ ও মিলনাত্মকভাবে এ উপন্যাসের পরিণতি। *আনোয়ারা* উপন্যাসের প্রণয়-বিবাহের অনুষঙ্গে পল্লবিত 'বিবাহ-পর্ব'। শাখা কাহিনীর আবির্ভাব, বিমাতার অত্যাচার, নানাবিধ চরিত্রের সমাবেশে কাহিনীতে হয়েছে বৈচিত্র্য ও জটিলতার সূত্রপাত। এছাড়াও আনোয়ারার সতীত্ব পরীক্ষা, অসুস্থ নূরুল এসলামের আরোগ্য লাভ ও বহুবিধ ঘটনার আবর্তে 'ভক্তি পর্ব' পরিপূর্ণ। আনোয়ারা চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্কের জনশ্রুতিতে নূরুল এসলাম মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তার অন্যমনস্কতার সুযোগে পাট কোম্পানীর অর্থ চুরি হয়ে যায়। ফলে কাহিনীতে উত্তেজনা, মামলা-মোকদ্দমা ও শেষ পর্যন্ত নূরুল এসলামের নিরপরাধ মুক্তি লাভ করে। এ পর্বে আনোয়ারার প্রতি নূরুল এসলামের সন্দেহের অবসান হয়েছে। আনোয়ারার ধর্মীয় আদর্শ প্রচারে 'পরিণাম পর্ব' ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেও ঔপন্যাসিকের চৈতন্য-প্রবাহ, বিকাশমান মুসলমান শ্রেণীর উত্থানে ও শিক্ষ-দীক্ষার পূর্ণ প্রকাশ এতে প্রতিফলিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যে নূরুল এসলামের ধনবার হয়ে উঠার বর্ণনা–

"ওয়ারিশ সূত্রে অতঃপর আনোয়ারা সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইল।.....পঁচিশ হাজার টাকার সম্পত্তি পাইয়া আনোয়ারা তাহা তাহার স্বামীন পায়ে উৎসর্গ করিল।.....পর বৎসর তিনি মরসুমের প্রথমেই কারবার আরও বিস্তৃত করিয়া লইলেন। এইরূপে নূরুল এসলাম বাণিজ্য প্রাসাদাৎ অল্প সময় মধ্যে ধনকুবের হইয়া উঠিলেন।.....নূরুল এসলামের অর্থ সাহায্যে ও স্বজাতি প্রিয়তায় গ্রামের দুঃস্থ লোকগণের সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি দরিদ্র লোকের শিক্ষার জন্য স্বগ্রামে অবৈতনিক মাইনর স্কুল খুলিয়া দিলেন।"[৫]

উপন্যাসে আনোয়ারার সমাজসেবা ও নারী শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

"কিছুদিন পর পুণ্যবতী আনোয়ারার কামনায় তাহাদের বহির্বাটিতে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে পরম রমণীয় প্রকান্ড মসজিদ নির্মিত হইল এবং সর্বসাধারণের পানির ক্লেশ নিবারণের জন্য মসজিদ সম্মুখে এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা হইল। আনোয়ারা গ্রামের মেয়েদের সুশিক্ষার নিমিত্ত অন্তঃপুর পার্শ্বে সুন্দর অট্টালিকায় বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া স্বয়ং তাহাতে শিক্ষা দিতে লাগিল।"[৬]

আনোয়ারা উপন্যাসের আখ্যান ভাগে সমাজ ও জীবন পরিপূর্ণভাবে বিধৃত হয়েছে। মুসলিম অন্তঃপুরের ঘটনা বিন্যাস *আনোয়ারা* উপন্যাসে প্রথম প্রযত্ন-প্রয়াসে চিত্রিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ ভীষ্মদেব চৌধুরী উল্লেখ করেছেন ঃ

"আনোয়ারা উপন্যাসের কাহিনী-বয়ন-কৌশল প্রথানুগ। স্থান-কাল-পাত্র এবং আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত উনিশ শতকীয় প্রথানুগ উপন্যাসের শিল্পাদর্শ মোহাম্মদ নজিবর রহমানের ছিল অন্বিষ্ট। ধর্মকেন্দ্রিক স্বসমাজের শিল্প-সাহিত্যে তখন কোন অত্যাধুনিক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়নি। ফলত উনিশ শতকীয় সাহিত্যতত্ত্বে বিশ্বাসী এই ঔপন্যাসিক সাহিত্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করে

৪. রফিকউল্লাহ খান, *মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য*। ঢাকা : ১৯৮৫, পৃ.১৫৪
৫. *আনোয়ারা*, পৃ. ৩১৫
৬. *আনোয়ারা*, পৃ. ৩২৩

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ শাসিত পূর্ব বাংলার মুসলিম-জীবন-নির্ভর কথাসাহিত্য রচনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আনোয়ারায় অবলম্বিত হয়েছে যে-কাহিনী সেখানে বড় স্থান অধিকার করে আছে জীবনের অকপট সারল্য।"[৭]

বৃটিশ শাসিত পূর্ব বাংলায় মধ্যবিত্ত মুসলিম-জীবন নির্ভর কথাসাহিত্য *আনোয়ারা* উপন্যাসে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠায় পাত্র-পাত্রীদের জীবনের পরিধি নানাবিধ পেশায় বিস্তার লাভ করেছে। সমাজ জীবনের অসংখ্য প্রকৃতির চরিত্র সমাবেশে ছোট বড় শাখা কাহিনীর মধ্যদিয়ে আনোয়ারা-নূরুল এসলামের জীবন সংগ্রামের মূলস্রোত বেগবান হয়েছে। এ উপন্যাসের ঘটনা বিন্যাস আনোয়ারার পিতৃগ্রাম মধুপুর হতে শুরু হয়েছে এবং বেলগাঁও জুট কোম্পানি ও তার বড় বাবু নূরুল এসলামের রতনদিয়া গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে আনোয়ারার 'সই' হামিদার স্বামী মীর আমজাদ হোসেনের বাড়ি বেলতা ও শহর কলকাতার ঘটনা। নূরুল এসলাম জুট কোম্পানীর অর্থ চুরির দায়ে আটক হলে উকিল আমজাদ হোসেন মামলা পরিচালনা করে। উপন্যাসের শেষাংশে আনোয়ারা সতীত্বের মহিমা প্রকাশের মাধ্যমে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস সম্বন্ধে একজন প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেন–

"সমাজ বিন্যাসে নতুন ধরণের সামাজিক চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে তারা। যেমন ইস্কুল মাস্টার, পুলিশ ইন্সপেক্টর, উকিল এই সব।"[৮]

আধুনিক সাহিত্য সমালোচনা-রীতি অনুযায়ী বাংলা উপন্যাসে নজিবর রহমনের আগমন বিশেষ মুহূর্তে। তার উপন্যাসের শিল্পমান অন্বেষণে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও কালিক বিবেচনা দাবী রাখে। শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমানদের আগমন শুরু হলেও উচ্চশিক্ষার ব্যয় সংকুলানের অপারগতা, নারীশিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ধর্মীয় গোঁড়ামী ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে শিক্ষ গ্রহণ অতি অল্প সংখ্যক বাঙালি মুসলমানের ভাগ্যে জুটতো। নজিবর রহমানের সামনে এ ধরণের স্বল্পশিক্ষিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীই ছিল মূলত পাঠক। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) *চোখের বালি'র* (১৯০৩) মতো মনস্তাত্বিক উপন্যাস রচিত হবার পরেও নজিবর রহমান সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনা বিন্যাসে ভাষা মাধুর্যে প্রকাশ করেন *আনোয়ারা, প্রেমের সমাধি, গরীবের মেয়ে* প্রভৃতি উপন্যাস। তিনি অবহেলিত গ্রামীণ সমাজ জীবনকে সাহিত্য-দর্পণে তুলে ধরেছেন বিশেষ প্রযত্নে। এদিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মুসলিম সমাজচিত্র রূপকার হিসেবে তাঁর ভূমিকা পথ-প্রদর্শকের। তিনি সর্বোজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বর্ণনা করেছেন আখ্যানভাগ। নজিবর রহমান চরিত্র চিত্রনে হয়েছেন সচেষ্ট। পাপের প্রতি সহজাত ঘৃণাবোধ ও সতীত্বের মহিমা প্রকাশ প্রভাবিত করেছে তাঁর সৃষ্টিকর্মকে। ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও ধর্মীয় গোঁড়ামী তাঁকে আবদ্ধ করতে পারেনি। ফলে অন্য ধর্মের চরিত্র বিকাশেও তিনি যত্নশীল হয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রসমূহকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত, সত্য ও আদর্শের প্রতীক, দ্বিতীয়ত, পাপাচারী ও অসৎ চরিত্র। উপন্যাসে আনোয়ারা-নূরুল এসলাম, হামিদা-আমজাদ হোসেন, ফরহাদ হোসেন, ডব্লিউ. সি. স্মিথ-এর পাশে খোরশেদ ভূঞা, গোলাপজান, খাদেম আব্বাস, রতিশ, দূর্গাবৈষ্ণবী ও অন্যান্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে।

নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের মানস-কন্যা *আনোয়ারা*। স্বদেশ-স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের সাহিত্য-রূপায়ণ *আনোয়ারা* উপন্যাসে আনোয়ারা প্রধান ও নাম চরিত্র। আনোয়ারাকে কেন্দ্র করেই এ উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যস্ত হয়েছে। সৎমায়ের দুর্বিসহ অত্যাচার, বিড়ম্বিত জীবন, সংযম, অত্মত্যাগ, বঞ্চনা-অবহেলা ও প্রত্যাশা-প্রাপ্তির মধ্যে আনোয়ারা চরিত্র বিভিন্ন গুণে বিভুষিতা। উপন্যাসের পারম্ভেই আনোয়ারার পরিচয় রয়েছে–

---

৭. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণা ও অন্যান্য*, ঢাকা-১৯৯১, পৃ. ১৫৮

৮. জুলফিকার মতিন, *মোহাম্মদ নজিবর রহমান*, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৩৭

www.pathagar.com

"এই সময় মধুপুর গ্রামের একটি চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকা তাহাদের খিড়কীদ্বারে বসিয়া বন্যার পানিতে ওযু করিতেছিল। তাহার মুখ, হস্তদ্বয়ের অর্ধ্ব ও পদদ্বয়ের গুলফমাত্র অনাবৃত এবং সমস্ত দেহ কাল ইঞ্চিপেড়ে ধুতি কাপড়ে আবৃত। গায়ে লাল ফুলেরা কাল ডোরা ছিটের কোর্ত্তা। দুই হাতে ছয় গাছি চাঁদির চুড়ি। অযত্ন-বিন্যস্ত সুদীর্ঘ কেশরাশি আলগাভাবে খোপা বাঁধা। বালিকার মুখমন্ডল বিষাদে ভরা।"[৯]

মাতৃহীন চতুর্দশবর্ষীয়া আনোয়ারার পিতা খোরশেদ ভূঞা স্ত্রীবিয়োগের পর বিয়ে করে। স্ত্রৈণ খোরশেদ ভূঞা ও গোলাপজান আনোয়ারাকে স্নেহমমতার লেশমাত্র দেখায় নি। তবে দাদীমা শিক্ষিতা মহিলা সে ছায়ার মতো আনোয়াকে আগলে রেখেছে। জগত সংসারে বালিকা আনোয়ারার আর একজন সাথী ছিল সে হামিদা। সকালবেলা খিড়কীদ্বারে বর্ষার জলে অজু করতে গিয়ে নৌকার মধ্যে এক যুবককে দেখতে পেয়ে হামিদা বাড়ি চলে যায় নিজের স্বামী সন্দেহে কিন্তু আনোয়ারা নৌকায় মধুবর্ষী স্বরে কুরআন তিলাওয়াত শুনে হয় অত্মহারা। স্বপ্নের সাথে বাস্তবের মিল খুঁজে পেয়ে আনোয়ারার মনোজগতে শুরু হয় আলোড়ন। খিড়কী দুয়ার হতে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করার সময় আনোয়ারা তাকায়। এ সময়–

"চারিচক্ষের মিলন হইল। কিন্তু কল্পিত বা স্বপ্নদৃষ্ট হৃদয়ের সামগ্রী প্রত্যক্ষ করিলে লোকে যেমন আশ্চর্যবোধে চমকিয়া উঠে–যুবকের প্রতি দৃষ্টিমাত্র বালিকা সেইরূপ শিহরিয়া উঠিল।"[১০]

এ দৃশ্যের সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের কুন্দ-নগেন্দ্রর প্রথম সাক্ষাত-এর ভাষা সাদৃশ্য–

"দূর হইতে নগেন্দ্রকে দেখিয়া কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার পর আর পা সরিল না। সে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিমূঢ়ার ন্যায় নগেন্দ্রর প্রতি চাহিয়া রহিল।....কুন্দ কহিল, যাহাকে মা [স্বপ্নে] কাল রাত্রে আকাশের গায়ে দেখাইয়াছিলেন।"[১১]

দৃশ্য পরিকল্পনায় সাদৃশ্য সত্ত্বেও নজিবর রহমান আনোয়ারার মনোজগত আবিষ্কারে প্রত্যাশী ছিলেন। উপরিউক্ত দৃশ্যে আনোয়ারার আশার আকাঙ্খার চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

আনোয়ারা অসাধারণ সুন্দরী সহজ-সরল প্রকৃতির এবং লেখাপড়ায় ছিল উত্তম। সৎমায়ের সংসারে অমানুষিক খাটুনী, পুঁথি-পুস্তক ও পোশাক-পরিচ্ছদের কষ্টের মধ্যেও আনোয়ারা ১৮ টাকা বৃত্তি পেয়েছে।[১২] তাঁর খেলার সাথী হামিদার সাথে কাহিনীর শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক অটুট রয়েছে। সে তার সৎ ননদ সালেহাকে স্নেহ ভালবসায় আপন করে নিয়েছে। সৎ শাশুড়ীর অত্যাচার-অপবাদ গালি-গালাজ কুৎসা রটনা নীরবে সহ্য করেছে। সালেহা ও তার মায়ের কথোপকথনে লক্ষ্য করা যায়–

"মেয়ে ॥ তুমি যতই বলনা কেন, ভাবী আমাদের অনিষ্ট করিবেন না। তিনি আমাকে কত ভালবাসেন, আদর করেন, হাতে তুলে কত জিনিষ খাইতে দেন, কত মিঠা কথা বলেন। তোমাকেও ত' খুব ভক্তি করেন।"[১৩]

প্রকৃতপক্ষে স্বজন-বাৎসল্য-হৃদয়ের অধিকারিণী আনোয়ারা অকপট সারল্য ও বিশ্বাসে সবাইকে আপন করে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

পতিপ্রাণা, সতী-সাধ্বী নারী চরিত্র হিসেবে আনোয়ারা আদর্শস্থানীয়া। ঔপন্যাসিক আনোয়ারাকে সতীকুল বরণীয়া করে তুলেছে। হামিদার পিতার সংলাপে জানা যায় আনোয়ারাকে প্রথমে তার পিতা টাকার লোভে মাতাল পাত্রের সাথে বিবাহের সম্বন্ধ করে তবে সতীর তেজে সব ব্যর্থ হয়ে যায়। আনোয়ারা নৌকায় দেখা ধর্মপ্রাণ যুবকের চিকিৎসায় শিরঃপিড়া ও জ্বর হতে আরোগ্য লাভ করেছিল এবং

---

৯. *আনোয়ারা*, পৃ. ১-২
১০. *আনোয়ারা*, পৃ. ১১
১১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খন্ড)। কলিকাতা-১৯৯১, কামিনী সংস্করণ, পৃ. [*বিষবৃক্ষ*]-২৩৭
১২. *আনোয়ারা*, পৃ. ৮
১৩. *আনোয়ারা*, পৃ. ১০৬

www.pathagar.com

সংসার সমুদ্রে একজন সাথীও পেয়েছিল। স্বামী হিসেবে নূরুল এসলামের ভালবাসার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

"ভালবাসনা– এ কথায়, এই চিন্তায় স্ত্রীর হৃদয়ে যাতনাবোধ করিতে লাগিল, সে পতির হাত টানিয়া লইয়া নিজবুকে স্থাপন করিল। পতি হস্তস্পর্শে অনুভব করিতে লাগিলেন উত্তাপে জল যেমন টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে স্ত্রীর হৃৎপিন্ড সেইরূপ স্পন্দিত হইতেছে। তখন পতি স্ত্রীকে কহিলেন, প্রেমময়ী তুমি আমাকে এতখানি ভালবাসিয়াছ.....।"[১৪]

আনোয়ারা সর্বংসহা ও ধৈর্যশীলা চরিত্রের অধিকারিণী। বিমাতার সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নিরবে সহ্য করেছে এবং সৎ শাশুড়ীর সব অপবাদ-অত্যাচারে গোপনে অশ্রুপাত করেছে কিন্তু সংসারের শান্তি বিঘ্নের অশঙ্কায় কখনোই তা প্রকাশ করেনি। এ যেন শাশ্বত বাঙালি নারীর প্রতিনিধি। আনোয়ারা অপহৃতা হবার কলঙ্ক অপবাদে জর্জরিত ও স্বামীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছে তবুও সে সবকিছু করেছে স্বামীর আরোগ্য প্রত্যাশায়। স্বামীর দুর্ব্যবহারে আনোয়ারা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে :

".....কিন্তু নাথ! আপনি যে আমাকে ভ্রমে চরিত্রহীনা বলিয়া মনে স্থান দিয়াছেন, আজ দাসী সে কলঙ্ক মোচনে মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিবে।"[১৫]

গৃহকর্ম-নিপুণা ও রান্নাবান্নায় পারদর্শী আনোয়ারার শিক্ষাব্রতীরূপ লক্ষণীয়। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে নিজ বাড়িতে বালিকা বিদ্যালয় দিয়ে সেখানে নিজে শিক্ষকতা করেছে। সে কেবল নামায রোযার মাহাত্ম্য প্রচারে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমসাময়িক যুগচাহিদা নারী শিক্ষা বিস্তারে সবিশেষ অনুরাগী ছিলো। সমাজের অবহেলিত নারী সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার উদ্যোগে আনোয়ারা চরিত্রকে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। এ অনুচ্ছেদটি লক্ষণীয়—

"আনোয়ারা গ্রামের মেয়েদের সুশিক্ষার নিমিত্ত অন্তঃপুর পার্শ্বে সুন্দর অট্টালিকায় বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া স্বয়ং তাহাতে শিক্ষা দিতে লাগিল।"[১৬]

তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্না আনোয়ারা ক্ষমাশীলা ও মহতী চরিত্রের অধিকারিণী। দূর্গা বৈষ্ণবীর 'শয়তানী লীলা ও ষড়যন্ত্রের' কারণে আনোয়ারা সর্বস্ব হারাতে গিয়েছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হবার পর তাদের নামে মোকদ্দমা শুরু হলে স্বামীর কথা প্রসঙ্গে আনোয়ারার ক্ষমাশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

"আনোয়ারা বৈষ্ণবীর বজ্জাতির কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিল। ঘৃণায় লজ্জায় সে মরিয়া যাইতে লাগিল। তথাপি কিয়ৎক্ষণ চুপ থাকিয়া কহিল– উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে হয় না?"[১৭]

সমাজ সংসারে সহজ-সরল পতিপ্রাণা আনোয়ারার আবাল্য সারল্য তাকে মাধুর্য দান করেছে। যাদের প্রতিহিংসায় আনোয়ারার জীবন বিপন্ন হয়েছিল তাদের সমুচিত শাস্তি হয়েছে কিন্তু তাদের প্রতি আনোয়ারার ক্ষোভ ঘৃণায় নয় বরং ক্ষমায় পরিণত হয়েছে। সালেহা ও সৎশাশুড়ীর অনাহার-বস্ত্রকষ্টের কথা শুনে আনোয়ারার হৃদয় ব্যথিত হয়েছে। সে স্বামীকে বলেছে–

"আম্মাদিগের দিন চলে না, আল্লাহর ফজলে এখন তোমার স্বচ্ছল অবস্থা এ সময় তাহাদিগকে সাহায্য না করা বড়ই অন্যায় হইতেছে।"[১৮]

কেবল মাত্র ধর্মীয় নীতি-উপদেশ বর্ণনার ক্ষেত্রে নয়, অবহেলিত জাগরণের লক্ষ্যে নারীশিক্ষা বিস্তারে অবতীর্ণ হয়েছে শিক্ষয়িত্রী ভূমিকায়। অপাপবিদ্ধ, অহংমুক্ত, সরলপ্রাণা, হৃদয়বতী আনোয়ারা ত্যাগতিতীক্ষা

---

১৪. *আনোয়ারা*, পৃ. ৯৯
১৫. *আনোয়ারা*, পৃ. ২৭১
১৬. *আনোয়ারা*, পৃ. ৩২৩
১৭. *আনোয়ারা*, পৃ. ১৯৬
১৮. *আনোয়ারা*, পৃ. ৩৩৬

www.pathagar.com

ও সতীত্বের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এ উপন্যাসের অন্যান্য নারী চরিত্র নির্মাণে নজিবর রহমানের অসাধারণ নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়।

আনোয়ারার পাশে তার বাল্য-সখ হামিদার চরিত্র সৎগুণাবলীতে বিভূষিত করে অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আনোয়ারার বিবাহের সম্বন্ধ হলে হামিদা ব্যাকুল হয়েছে এবং উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে নূরুল এসলামের কারামুক্তির জন্যে অর্থের প্রয়োজন মুহূর্তে নিজের ছেলের মুখে ক্ষীর দেয়া উপলকে জমানো টাকা দিয়েছে। বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রদেয় আনোয়ারার সব গহনা যথাসময়ে ফেরত দেবার উদ্দেশ্যে সযত্নে তুলে রেখেছে। হামিদাও এখানে সতীসাধ্বী পতিপ্রাণা ও বিশ্বস্ত নারী চরিত্র।

এ উপন্যাসে আনোয়ারার সৎমা রূপবতী-কুলগর্বিনী-গোলাপজানের চরিত্র সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক শৈল্পিক মনের পরিচয় দিয়েছে। অর্থলোভী, স্বার্থপর, অত্যাচারী, পুত্রঘাতী, পরশ্রীকাতর-পাপীয়সী ও বিশ্বাসঘাতিনীরূপে গোলাপজান চিত্রিত হয়েছে। এ চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিত রয়েছে। নূরুল এসলামের অর্থের প্রতি লোভ তাকে করেছে হত্যাকান্ডে প্রলুব্ধ। স্বামীকে সে প্ররোচিত করেছে এ হত্যাকান্ডে সহযোগিতা করতে। শেষ পর্যন্ত নিয়তির দূর্বিপাকে ভ্রমবসত নিজ পুত্র বাদশাকে হত্যা করেছে। পরদিন প্রভাতকালে ঘটনার সত্যতা জানতে পেয়ে নূরুল এসলামকে পুত্রের সঙ্গী করার জন্য তরবারীর খোঁজে সে গৃহে প্রবেশ করেছে। যদিও ব্যর্থ হয়েছে তার পরিকল্পনা এবং পরিণামে বিচারে দীপান্তর হয়েছে। ঔপন্যাসিক সার্থক হয়েছে সমাজ সংসারের এমন একটি জীবন্ত চরিত্রাঙ্কনে। আনোয়ারার সৎশাশুড়ীর চরিত্র নির্মাণেও প্রতিহিংসা ও পরশ্রীকাতরতা উন্মোচিত হয়েছে।

উপন্যাসের একটি অন্যতম চরিত্র আনোয়ারার দাদীমা। বিদূষী এক বিধবা বৃদ্ধার চরিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে কাহিনীর প্রারম্ভে গতির সঞ্চার হয়েছে। আনোয়ারার সমব্যথী দাদীমা তার মঙ্গল কামনায় ব্যস্ত। নূরুল এসলামের সাথে আনোয়ারার বিবাহপূর্ব সাক্ষাৎ ও বিবাহের ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। দাদীমার পরিচয়-

"আনোয়ারার পিতামহ আরবী ফারসী বিদ্যায় প্রসিদ্ধ মুন্সী ছিলেন।.....আনোয়ারার দাদীমা, আনোয়ারার বয়সেই মুন্সী সাহেবকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহাদের বিবাহ পরস্পর পবিত্র প্রণয়-সূত্রে সংঘটিত হয়।"[১৯]

নজিবর রহমান প্রধান চরিত্র নির্মাণ অপেক্ষা টাইপ চরিত্র সৃষ্টিতে সার্থকতা অর্জন করেছেন। দূর্গা বৈষ্ণবী একটি উল্লেখযোগ্য টাইপ চরিত্র। আনোয়ারার সতীত্ব নাশ ও নারীলিপ্সু আব্বাস খাদেমের হীন স্বার্থ চরিতার্থের সহযোগী দূর্গা বৈষ্ণবী। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ (১৮৬১)-এর হীরা চরিত্র ও দূর্গা চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। দূর্গা চরিত্রের বাল্যবিধবা নারীর অতৃপ্ত কামনা-বাসনা চরিতার্থের কুৎসিত ফল দৃশ্যামান হয়েছে। দূর্গা রাজবংশী ধীবরের মেয়ে। ভরা যৌবনে স্বজাতি এক প্রতিবেশী যুবকের গোপন প্রণয়ে দেশান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে সঙ্গীবদল ও তন্ত্রমন্ত্র আয়ত্ব করে দেশে ফিরে-অবশেষে অব্বাস আলীর পিতার আশ্রয়ে ভরাডুবায় আখড়া গড়ে। দূর্গা এখন বয়োভারে ক্লান্ত তবুও নৈতিক চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ঔপন্যাসিকের ভাষায়–

"ভিক্ষা ও কামরূপী মন্ত্রে চিকিৎসা তাহার জীবিকা নির্বাহের ভাণমাত্র। হীরা যেমন সুন্দরের মাসী ছিল, দূর্গাও সেইরূপ আব্বাস আলীর মাসী হইল এবং তাহার অনুগ্রহে মাসীর গ্রাসাচ্ছদন চলিতে লাগিল।"[২০]

দূর্গা শুধুমাত্র ঠক-প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, চরিত্রভ্রষ্ট নারী নয়, সে নারীর সতীত্ব নাশের সহায়ক হিসেবে অদ্বিতীয়। দূর্গা বৈষ্ণবীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে বিচার কঠিন পরিশ্রমসহ সাত বছরের কারাদন্ড হয়।

www.pathagar.com

পাপের প্রতি ঔপন্যাসিকের বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা থাকলেও পাপীর প্রতি সহানুভূতির কারণেই উপন্যাসে কোন পাপাচারী ও কুলত্যাগিনীকে 'বিষপান কিংবা গুলিতে' জীবন দিতে হয়নি এ ক্ষেত্রে তিনি প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে চরিত্র সংশোধনের পক্ষপাতী ছিলেন। বিপথগামী কুলত্যাগিনী দূর্গা জীবনের ধরা-বাঁধা ছকবাঁধা গণ্ডির মধ্যে আবর্তিত হয়নি। জীবনকে উপভোগের অমিত বাসনায় ঘর বাঁধার প্রত্যাশায় সে ঘর ছেড়েছিল কিন্তু ভাগ্য তাকে করেছে বিড়ম্বিত। উপন্যাসের এক ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী দূর্গা ঔপন্যাসিকের বাস্তবানুগ ও জীবন্ত চরিত্রের প্রতীক।

উপন্যাসের অন্যতম প্রদান পুরুষ চরিত্র নূরুল এসলাম। সতীত্ব মহিমা, ভাস্বর আনোয়ারা চরিত্রের পাশে নূরুল এসলামের চরিত্রটি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয় নি। সতী-সাধ্বী স্ত্রীর সতীত্ব মহিমা প্রকাশ ও ধর্মীয় জীবনবোধের ভাষ্যকারে পরিণত হয়ে সন্তাননাময় এ নায়ক চরিত্রে নায়কোচিত ভাব হয়েছে অনুপস্থিত। নূরুল এসলাম রতনদিয়া গ্রামের আমির-উল-ইসলামের পুত্র। বি. এ. ক্লাশে অধ্যয়ন করে পিতার মৃত্যুর কারণে পরীক্ষা পর্যন্ত অগ্রসর সম্ভব হয়নি। স্বাধীন ব্যবসা করার সংকল্প থাকলেও বেলগাঁও জুট কোম্পানীতে বড়বাবু হয়েছিল নূরুল এসলাম।

উপন্যাসের প্রারম্ভেই পাট ক্রয়ের নিমিত্তে ঘাটে পানসী নৌকায় আনোয়ারা যে যুবককে সুমধুর স্বরে কুরআন শরীফ পাঠ করতে দেখেছিল তার নাম নূরুল এসলাম। কুরআন শরীফ পাঠ শেষে দয়াময়ের কাছে নূরুল এসলাম প্রার্থনার মধ্যে বলেছে–সে অকৃতদার, তাকে সংসারী করে যেন প্রেমের পথে খোদাকে লাভ করতে পারে। ঔপন্যাসিক সাবলীল ভাষা ব্যঞ্জনায় যুবকের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

"যুবক নৌকায় বসে কোরান শরীফ পাঠ করিতেছেন। যুবকের দেহের বর্ণ ও গঠন সুন্দর, নবোদ্ভিন্ন ঘনকৃষ্ণগুল্‌ফ-শ্মশ্রু তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। যুবকের বয়স ত্রয়োবিংশ বৎসর। মাথার রুমী-টুপী, গায়ে সাদা সার্ট ও পরিধানে রেঙ্গুনের লুঙ্গি।"[২১]

নূরুল এসলাম একজন পরোপকারী ও জনহিতৈষী ব্যক্তির প্রতীক। পাট ক্রয়কালে আনোয়ারার দুর্বিসহ শিরঃপীড়ায় সে বিনা টাকায় চিকিৎসা করেছে। নূরুল এসলাম এক বাক্স হোমিওপ্যাথী ঔষধ সঙ্গে রাখে, প্রয়োজনে নিজের ও অন্যান্যদের পীড়া নিরাময়ে প্রয়োগ করে থাকে। আনোয়ারার পীড়ায় চিকিৎসার প্রয়োজনে 'একবার দেখা আবশ্যক' হলে ডাক্তার বাবুকে আনোয়ারার শয়ন কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। দাদীমা পূর্বেই মশারী দ্বারা পর্দার ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু রোগী দূর্বিসহ যন্ত্রণায় মশারী উল্টায়ে ফেলায় পর্দার সামান্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। বালিকার মুখের দিকে দৃষ্টিমাত্র বিস্ময়ে তার অন্তঃস্থল আলোড়িত হয়। নূরুল এসলাম আনোয়ারার চিকিৎসায় ধর্মীয় কোন গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয়নি। রোগীর চক্ষু পরীক্ষা, হাত ধরে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব ও থার্মোমিটার দিয়ে রোগীর তাপমাত্রা পরীক্ষা করে ঔষধ দিয়েছে। এতে ঔপন্যাসিকের আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। রোগী পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত নূরুল এসলাম পাট ক্রয়ের ফাঁকে এসে ঔষধ বদল করে দিয়েছে। আনোয়ারা সম্পূর্ণ সুস্থ হলেও আনোয়ারার প্রতি প্রেমভাব জাগরিত হওয়ায় প্রিয় সান্নিধ্য পাবার প্রত্যাশায় নুরুল এসলাম বারবার আনোয়ারাকে দেখতে এসেছে। এ বিষয়টি পরিস্ফুট হয়েছে এভাবে—

"তিনি (নূরুল) ঔষধ বদলাইয়া দিয়া সে রাত্রি ভূঞা সাহেবের বাড়ীর ঘাটেই নৌকা বাঁধিয়া অবস্থান করিলেন। মঙ্গলমত রাত্রি প্রভাত হইলে পুনরায় তিনি রোগীকে দেখিতে বাড়ীর মধ্যে গেলেন। দেখিলেন, স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ-কলিকা যেন মধ্যাহ্নিক রবিকরতাপে বিবর্ণ ও কুঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে ; কিন্তু সুখের বিষয়, তাহার জ্বর ও চক্ষুর রক্তাভাব ছুটিয়া গিয়াছে। নূরুল এসলাম.....ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং কহিলেন.....কিছুদিন এ অঞ্চলে আছি, ২/৩ দিন পরে আবার আসিয়া ঔষধ বদলাইয়া দিয়া যাইব।"[২২]

www.pathagar.com

আনোয়ারার সাথে নূরুল এসলামের 'শুভ-পরিণয়' সম্পন্ন হয় হামিদার স্বামী আমজাদ হোসেনের প্রচেষ্টায়–

"যাকে কোরান পাঠে মুগ্ধ করে চিকিৎসায় আরোগ্য করে বিবাহের পূর্বেই হৃদয় জয় করেছিল–আজ ২৬শে আশ্বিন সোমবার রাত্রিতে শুভক্ষণে, আনন্দ কোলাহল মধ্যে মোহাম্মদ নূরুল এসলাম-মোসাম্মাৎ আনোয়ারা খাতুনের পাণি গ্রহণ করিলেন।"[২৩]

নূরুল এসলাম বাসরঘরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছে এবং স্ত্রীকে তার সাথে খোদাতা'আলার কাছে 'শোকর গোজারী' করতে নির্দেশ দিয়েছে। স্বীয় সতী-সাধ্বী স্ত্রী আনোয়ারার প্রতি নূরুল এসলামের 'হিমালয়ের মতো অটল-অচল বিশ্বাস' থাকলেও কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীদের কুমন্তব্য শুনে সে সন্দেহ প্রবণ হয়ে পড়ে। প্রিয়তমা পত্নীর সাথে ঘটে সম্পর্কের অবনতি। স্ত্রীকে উপেক্ষার ভাব দেখালেও সে দুশ্চিন্তার তৃষাণলে ভস্মীভূত হতে থাকে। পৌরানিক রাম চরিত্রের অনুরূপ অবস্থায় নূরুল এসলাম ভাবতে থাকে–

"একদিকে সাধ্বী-সতী, অপরদিকে লোকাপবাদ ; কোনটি ত্যাজ্য ? কোন্‌টি উপেক্ষণীয় ? সরলা অবলা অন্ধকার রাত্রি সত্যই কি পাপিষ্ঠেরা তাহার ধর্মনাশ করিতে পারিয়াছে ? স্মরণ মাত্র তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের ভাবান্তর ঘটিল।.... কতিপয় নীচাশয় ব্যক্তির অলীক কথায় বিশ্বাস করিয়া পতি পরায়ণা সতী রমণীকে ত্যাগ করিব ? আহা কি নিষ্ঠুরতা।"[২৪]

আনোয়ারা সম্বন্ধে এই লোকাপবাদ নূরুল এসলামের মনোজগতকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত। স্ত্রীগতপ্রাণ স্বামীর প্রেম-প্রবণ হৃদয় হয়েছে অস্থির। নূরুল এসলামের এই ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় যন্ত্রণায় ট্রাজিক মহিমার ছায়াপাত ঘটেছে এ উপন্যাসে। নূরুল এসলামের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় ভাষ্য–

"এই সময় নূরুল এসলামের মানসিক অবস্থা ভীষণভাবে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আত্মগ্লানির অনিবার্য্য হুতাশনে তাহার সুরম্য হৃদয়োবন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে এবং সেই দাবাগ্নির প্রবর্তিত বহ্নিমুখ-শিখায় তাহার মুখমন্ডল বিবর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল।"[২৫]

স্বাধীন পেশায় বিশ্বাসী নূরুল এসলামের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক উনিশ শতকের শিক্ষিত মানুষের পরাধীন চাকরি পেশাকে নিরূৎসাহিত করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজ কাঠামোর উপরে বিকাশমান মুসলিম সমাজের প্রতিষ্ঠালাভ স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই সম্ভব—লেখক তা ফুটিয়ে তুলেছেন। নূরুল এসলাম জুট কোম্পানীর চাকরী পরিত্যাগ করে ব্যবসা শুরু করে এবং আশাতিরিক্ত সাফল্যে অল্পদিনেই সে ধনবান হয়ে যায়। বিত্তবৈভব বৃদ্ধির সাথে নূরুল এসলাম সমাজ ও স্বজাতির মঙ্গল কামনায় আত্মনিয়োগ করেছে। দরিদ্র মানুষের শিক্ষার জন্যে নিজ গ্রামে স্বতন্ত্র অবৈতনিক মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং এই বাড়ি সংলগ্ন মসজিদ, পুকুর ও অন্তঃপুরপার্শ্বে সুন্দর অট্টালিকায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছে। স্বীয় স্ত্রী আনোয়ারা এই বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। পর্দানশিন মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় মাদ্রাসার পরিবর্তে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং নিজ পত্নীকে শিক্ষকতা করার অনুমতি এসব প্রচেষ্টা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক ধারার সূচনা করেছে। নজিবর রহমানের প্রত্যাশা নিখুঁত শিল্প-সম্ভার সৃষ্টি নয় বরং একটি বিকাশমান সমাজের সামনে সাহিত্যদর্পণ স্থাপন করতে তিনি ছিলেন সচেষ্ট। নূরুল এসলাম বিকাশমান মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে দোষেগুণে নয়–সৎগুণাবলী ভূষিত আদর্শ চরিত্র।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, *আনোয়ারা* উপন্যাসে প্রধান চরিত্র অপেক্ষা পার্শ্ব চরিত্র চিত্রনে নজিবর রহমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পার্শ্ব-চরিত্র ও টাইপ চরিত্রের উপর নীতিবোধ ও সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব প্রয়োগ না করার ফলেই স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পেরেছে। বন্ধু বাৎসল্য, কর্তব্যপরায়ণ

www.pathagar.com

আইনজীবী আমজাদ হোসেন, হৃদয়বান উদার ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন জুট কোম্পানীর ম্যানেজার ডব্লিউ. সি. স্মিথ, স্ত্রৈণ খোরশেদ ভূঞা, পাপাচারী রতীশ, আব্বাস খাদেম নবা প্রভৃতি চরিত্র নির্মাণে ঔপন্যাসিক শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। এসব চরিত্রে সমাজ, সংস্কারের বাস্তব দিক উন্মোচিত হয়েছে। চরিত্রগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও নির্মাণ শৈলীতে নজিবর রহমান তার শৈল্পিক সত্তার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন।

আনোয়ারা উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র আনোয়ারাকে আবর্তন করে কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। ঔপন্যাসিক কাহিনীর ঘটনা পরিক্রমা, গ্রন্থিমোচন এবং সতীত্ব মাহাত্ম্য ও নূরুল এসলামের আরোগ্য, কারামুক্তি ও বিষয়-বিত্তের অধিকারী হওয়া এবং স্বদেশের মঙ্গল কামনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর কার্যের বিবরণ ভাষা পরিচর্যায় প্রাণবন্তরূপে প্রকাশ করেছেন। ঔপন্যাসিক মুসলিম নর-নারীর বিবাহ-পূর্ব প্রণয় এবং নারীকে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে অবমুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছে। তিনি উপন্যাসের নামকরণ প্রধান নারী চরিত্র আনোয়ারার নামে করেছেন। *'আনোয়ারা'* নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে। বিকাশোন্মুখ মুসলিম সমাজের ভাষাচিত্রের নামকরণে নারী চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে নজিবর রহমান আধুনিক ও শৈল্পিক মনের পরিচয় দিয়েছেন।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান তাঁর উপন্যাসে তৎকালীন 'পূর্ব বাংলার বিকাশমান মুসলিম সমাজের জীবন ভাবনা এবং জীবন বিশ্বাসের বিশ্বস্ত শিল্প প্রতিমা'[২৬] সৃষ্টিতে ঘটনা-সংস্থান ও প্রকরণ-পরিচর্যায় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। উপন্যাসের ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পাঠক উপযোগী ভাষা নির্মাণে তিনি যত্নশীল ছিলেন। তৎসম শব্দবহুল বাংলা গদ্যে আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক প্রয়োগ নজিবর রহমানের উপন্যাসের ভাষা সার্থক হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের ভাষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর মন্তব্য :

> *"আপনার আনোয়ারা পড়িলাম। শুধু নভেল পড়ার মতো পড়ি নাই, সবিশেষ মনোযোগ দিয়াই পড়িয়াছি।.....আপনি মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি ফার্সী কথার ব্যবহার করিয়াছেন। যথা ঃ আম্মাজান, কলেজা, দুলা মিয়া, বরকত, খোস, এলহান প্রভৃতি। হিন্দু পাঠকবর্গের নিকট এই সকল শব্দগুলি অবোধ্য হইলেও এই সকল শব্দ ব্যবহার আদৌ অন্যায় হয় নাই, কারণ মুসলমান সমাজে এই শব্দ নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে বাঙ্গালা ভাষায় এক-চতুর্থাংশ আরবী-ফার্সী হইতে প্রাপ্ত। আরো মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালা শুধু হিন্দুর মাতৃভাষা নহে মুসলমানদের মাতৃভাষাও বটে।"*[২৭]

আনোয়ারা উপন্যাসে আব্বাজান, ফুফু, আম্মা, কদমবুছি, দামাদ মিঞা, বেহুস, নামাজ, রোজা, কাবিন ইত্যাদি শব্দ বহুল পরিমাণে তৎসম শব্দের পাশাপাশি একই বাক্যে প্রয়োগ করেছেন। আনোয়ারার বক্তব্যে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়–

> *"অনোয়ারা সেকথার কোন উত্তর না করিয়া লজ্জিত-সংকুচিতভাবে রোজনামচা দেখিয়া বলিতে লাগিল, আমরা যদি আল্লাহ, ফেরেস্তা, কোরআন, পয়গম্বর ও কেয়ামত বিশ্বাস করি..... তবে নামাজ-রোজা সম্বন্ধে মনগড়া ভিন্ন মত করা কাহারো উচিৎ নহে।"*[২৮]

উপন্যাসের গদ্যশৈলী সহজ ও সাবলীল। সাধু গদ্য ভঙ্গিতে সংক্ষিপ্ত বাক্য প্রয়োগে ভাষামাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে। মীর মশাররফ হোসেনের রচনারীতির অনুরূপ সংক্ষিপ্ত বাক্য গঠন, তৎসম শব্দবহুল বাক্য রচনা নজিবর রহমানের ভাষায় অন্যতম বৈশিষ্ট। যেমন–

> *"কি ভীষণ দৃশ্য। বিভীষিকাময়ী লীলা। বালিকা স্তব্ধ নিঃশ্বাসে নিস্পন্দ নয়নে ভীতিশূন্য মনে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।"*[২৯]

---

২৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, ঢাকা-১৯৯১, পৃ. ২
২৭. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা-১৯৬৯,দ্বি-সং পৃ. ৮৫-৮৬
২৮. *আনোয়ারা*, পৃ. ২৮৩
২৯. *আনোয়ারা*, পৃ. ১৬৭

www.pathagar.com

ভাষা বিচারে লক্ষ্য করা যায় নজিবর রহমান চিত্রধর্মী ভাষা সৃষ্টিতে পারদর্শী ছিলেন। গোলাপজান, স্বামী খোরশেদ ভূঞাকে জামাই হত্যায় প্ররোচিত করেছে। শেষ পর্যন্ত দু'জনে মিলে হত্যা করে শ্রাবণের ভরা নদীতে নূরুল এসলামকে ফেলে দেবার জন্যে উজ্জ্বল অসি ও দড়ি-কলসী-ছালা নিয়ে প্রস্তুত। এ ধরণের ঘটনা বর্ণনায় চিত্রকল্প লক্ষণীয় —

"শ্রাবণ মাস। বর্ষা পূর্ণযৌবনা। সর্ব্বত্র পানি থৈ থৈ করিতেছে। ভূঞা সাহেবের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের গলি দিয়া স্রোত পূর্ণবেগে দক্ষিণ দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। সম্মুখে অমানিশীথিনী। জীব-কোলাহল মুখরিত মেদিনী সুষুপ্ত। রাত্রি নিঝুম। অনন্ত নীলাকাশের অগণিত প্রদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে, তথাপি নিবিড় অন্ধকার বিশ্ব গ্রাস করিতে ছাড়ে নাই।.....এই সময় গোলাপজান পতিকে সঙ্গে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অগ্রে বদ্ধপরিকর-বসনা আততায়িনী পাপিয়সী ; হস্তে তীক্ষ্ণধার উজ্জ্বল অসি, পশ্চাতে কিঙ্করসম ক্লৈব পতি, হস্তে দড়ি, কলসী ও ছালা। যেন করাল কৃতান্তরূপিনী দানবীর পশ্চাতে মন্ত্রমুগ্ধ দৈত্য।"[৩০]

এছাড়াও সংলাপধর্মী ভাষারীতিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আনোয়ারার অর্থকষ্টে নবার বৌয়ের কাছে শাড়ি বিক্রয় প্রসঙ্গে সংলাপধর্মী বক্তব্য :

"আনো ঃ আমাদের টাকা-পয়সার খুব টানাটানি হইয়াছে।
নবার বৌ ঃ এ্যার দাম কত?
আনো ঃ নয় টাকা ; এখন সাত টাকা হইলেই দিব।
নবার বৌ পোটম্যানের দিকে চাইয়া কহিল, ঐ যে হোনার ন্যাগাল জ্বলতিছে ওহান কি হাড়ী?
আনো ঃ হ্যা, উহার দাম বেশী।"[৩১]

উপন্যাসে তৎসম শব্দের স্বার্থক প্রয়োগ, ভাষাভঙ্গিকে করেছে হৃদয়গ্রাহী। পরিবেশ ও প্রকৃতির বর্ণনায় ঔপন্যাসিক আকর্ষণীয় ভাষারীতি প্রয়োগ করেছেন। লক্ষ্য করা যায়—

"ভাদ্র মাসের ভোর বেলা। স্বর্গের উষা মর্ত্যে নামিয়া ঘরে ঘরে শান্তি বিলাইতেছে। তাহার অমিয় কিরণে মেদিনী-গগন হেমাভ বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে ; উত্তর বঙ্গের নিম্ন সমতল গ্রামগুলি সোনার জলে ভাসিতেছে ; কর্মজগতে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে.....পাখিকুল সমধুর স্বরলহরী তুলিয়া জগৎপতির মঙ্গল গানে তান ধরিয়াছে ও ধর্মশীল মুসলমানগণ প্রাভাতিক নামাজ অন্তে মসজিদ হইতে গৃহে ফিরিতেছেন ; হিন্দু-পল্লীর শঙ্খঘন্টার রোল থামিয়া গিয়াছে।"[৩২]

আরবী-ফারসী শব্দ চয়নে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের শিল্প প্রতিমা'[৩৩] নির্মাণে নজিবর রহমানের গদ্যভঙ্গি ভাব-ভাষায় সার্থক হয়ে উঠেছে। তিনি সমকালীন উপন্যাস-রচনাশৈলী যথার্থরূপে গ্রহণ করেন নি। ভাষারীতি ও উপস্থাপন কৌশল, আঙ্গিক কাঠামো ও ভাষা পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও মশাররফ হোসেনকে সচেতনভাবে অনুসরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষের* ভাব ভাষা ও অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে আনোয়ারা উপন্যাসের সাদৃশ্য লক্ষণীয় :

বিষবৃক্ষ এর চতুস্ত্রিংশতম পরিচ্ছেদ : পথিপার্শ্বে—

"বর্ষাকাল। বড় দুর্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা।.....রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী-আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারের স্তূপস্বরূপ লক্ষিত হইতেছে।"[৩৪]

---

৩০. *আনোয়ারা*, পৃ. ১০৫
৩১. *আনোয়ারা*, পৃ. ২৪৫
৩২. *আনোয়ারা*, পৃ. ১

www.pathagar.com

আনোয়ারা উপন্যাসের 'পরিণাম' পর্বে বিশ পরিচ্ছেদ—

"শ্রাবণ মাস। বর্ষা পূর্ণযৌবনা। সর্বত্র পানি থৈ থৈ করিতেছে। ভূঞা সাহেবের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের গলি দিয়া স্রোত পূর্ণবেগে দক্ষিণ দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।....রাত্রি নিঝুম। অনন্ত নীলাকাশের অগণিত প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, তথাপি নিবিড় অন্ধকার বিশ্ব গ্রাস করিতে ছাড়ে নাই।"[৩৫]

ভাষা নির্মাণে এ সাদৃশ্যের পাশাপাশি চরিত্র চিত্রণ, সমাজ চিত্র অঙ্কন ও ভাষারীতিতে আরবী-ফারসী শব্দের সার্থক প্রয়োগে তাঁর স্বাতন্ত্র্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। পতিপ্রাণা আনোয়ারা পতির ঋণ মোচনের প্রয়োজনে মধুপুরে তার দাদীমাকে লেখা একটি পত্রের ভাষ্য :

"গতকল্য আম্মাজান পৃথক হইয়াছেন। তজ্জন্য আমাদের কিছু ঠেকা ঠেকি হইয়াছে। পত্রপাঠ আমার নিজ টাকা হইতে ছয়শত টাকা তোমার দুলা ভাইজানের নামে–যাহাতে পরবর্তী সোমবার বেলগাঁও পৌঁছে, এইরূপ তাগিদে পাঠাইবে। বাবাজান ও মাকে এবং ওস্তাদ চাচাজান ও চাচী আম্মাকে আমার সালাম জানাইবেন।"[৩৬]

নজিবর রহমান *আনোয়ারা* উপন্যাসের গদ্যরীতিতে ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দ চয়ন, সমাসবদ্ধ শুদ্ধ ও বাক্য-রীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ করেছে। এর পাশাপাশি সাধু গদ্যরীতিতে আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ ও সংক্ষিপ্ত বাক্য গঠনে মীর মশাররফ হোসেনের ভাষাদর্শ ও গঠন নির্মিতি নজিবর রহমানকে আকৃষ্ট করেছে। *বিষাদ-সিন্ধুর* গদ্যরীতি :

"কি ঘৃণা ! কি লজ্জা ! এজিদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ? এজিদের আশ্রয় গ্রহণ ? মাবিয়ার পুত্রের নিকট বশ্যতা স্বীকার ? ছি ! ছি ! তুমি আমার প্রভু হইতে ইচ্ছা কর ? তোমার বংশাবলীর কথা, তোমার পিতার কথা একবার মনে কর। ছি ! ছি ! বড় ঘৃণার কথা।"[৩৭]

আনোয়ারা উপন্যাসে অশ্রুপূর্ণনেত্রে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে করুণাময়ের কাছে আনোয়ারার মনোবেদনা প্রকাশের ভাষা—

"খোদা, তুমি না দয়াময় ? তুমি না সুখ-শান্তির জনক ? তবে তোমার এ বিধান কেন ? অন্তর্যামী প্রভু। দাসীর যাতনা চরমে উঠিয়াছে, আর সহিতে পারিতেছি না। মঙ্গলময় ! এখন মৃত্যুই দাসীর পক্ষে শ্রেয়। অতএব প্রার্থনা, আর জীবিত রাখিয়া দগ্ধিয়া মারিও না, এককালে মৃত্যুপথে শান্তিদান কর। দুনিয়া আর চাই না।"[৩৮]

নজিবর রহমানের শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় সাহিত্যকর্ম *আনোয়ারা* উপন্যাসের অভিনবত্ব তার কাব্যময় সাবলীল ভাষারীতি। নাটকীয় গুণ ও কাব্যময়তা মিশ্রিত হয়ে এ উপন্যাসের ভাষা ভিন্নতর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। নূরুল এসলামের সাথে আনোয়ারার বিবাহ প্রসঙ্গে দাদীমার সাথে কথোপকথনে শিল্পবোধ, জীবনানুভূতি ও ভাষাসৌকর্য লক্ষণীয়–

"....আচ্ছা ডাক্তার সাহেবের সহিত তোর বিবাহের প্রস্তাব করিলে কেমন হয় ? আনোয়ারা ইহাতেও কোন উত্তর করিল না ; কিন্তু ডাক্তার সাহেবের নামে তাহার ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল। আরাধ্য প্রিয়জন-প্রতি অকৃত্রিম প্রেমপ্রযুক্ত তাহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল....তিনি (দাদিমা) পরিহাস করিয়া কহিলেন.....কি লো ডাক্তার সাহেবের নাম শুনিয়াই যে দশা ধরিলি। কথা বলিস্ না কেন ?

---

৩৫. *আনোয়ারা*, পৃ. ৩০৫
৩৬. *আনোয়ারা*, পৃ. ১১৮
৩৭. *বিষাদ সিন্ধু*, পৃ. ২১৭

www.pathagar.com

আনোয়ারা বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল–দাদিমা, দেখ জানালার পাশে কি সুন্দর চাঁদের আলো আসিতেছে।"[৩৯]

মুসলিম সমাজের অন্তঃপুর ও বিবাহপূর্ব প্রেম-প্রণয়ের চিত্র অঙ্কনে ঔপন্যাসিক ধর্মীয় সংস্কার অতিক্রমে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন। বড়বাবু (নূরুল এসলাম) চিকিৎসার প্রয়োজনে আনোয়ারার শয়ন কক্ষে প্রবেশের পূর্বেই মশারী দ্বারা দাদিমা পর্দার ব্যবস্থা করলেও আনোয়ারার হস্তপদ সঞ্চালনে মশারী উল্টায়ে পর্দার প্রচেষ্টা অবসান হয়ে যায়। এছাড়াও বিবাহপূর্ব অনুরাগ প্রকাশে ঔপন্যাসিকের ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে মুক্তি প্রয়াসী শিল্প-মনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। শিরঃপীড়া থেকে আরোগ্যের পরবর্তীকালে আনোয়ারার অন্তর্ময় ভাবনাপুঞ্জ দূর ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখের চিন্তায় যেন আত্মহারা। ঔপন্যাসিক অসামান্য শিল্প-দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন–

"সে এক্ষণে কেবল নির্জনতা চায়, নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসেন। সুখের সংসারে চির সোহাগে পালিতা অনূঢ়া কুমারী তাহার আবার নির্জনতা চিন্তা কি? চিন্তা নৌকার সেই সুন্দর মুখখানি।"[৪০]

আনোয়ারা উপন্যাসের ভাষা-পরিকল্পনার পাশাপাশি উপমা-উৎপ্রেক্ষা রূপক ও প্রবাদ-প্রবচনে নজিবর রহমানের শিল্পচেতনার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। উপমা-উৎপেক্ষা-রূপকের নমুনা নিম্নরূপ :

ক. *তখন সহসা অলক্ষিতে তাহার গোলাপ গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল, শ্বেত-বারিবিন্দু মুখমণ্ডলে ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। (পৃ. ৫)*

খ. *ডাগর চক্ষু দুইটি নীহারসিক্ত ফুটন্ত জবার ন্যায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। (পৃ. ১১)*

গ. *বাঘে মহিষের যুদ্ধের ন্যায় উনুন মধ্যে ভাদুরে খড়ি ও আগুন পরস্পর যুদ্ধ বাঁধাইয়া তীব্র ধুমপুঞ্জে পাচকবরকে ত্যাক্ত-বিরক্ত ও অন্ধীভূত করিয়া তুলিতেছিল। (পৃ. ১৫)*

ঘ. *নাক-চোখ-মুখ জবাফুলের মত লাল হইয়াছে, গা দিয়া আগুন ছুটিতেছে। (পৃ. ৩১)*

ঙ. *ঠাকুরুণের মাথার চুল যেন অমাবশ্যার আঁধার। মুখখানি তার পূর্ণিমার চাঁদ। (পৃ. ১৩২)*

প্রবাদ-প্রবচনে নজিবর রহমানের শিল্প নৈপুণ্য সঙ্গত কারণেই পাঠক-হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। যেমন–

ক. *সোনার গাছে মুক্তফল বুঝি এইরূপেই ফলে। (পৃ. ৫)*

খ. *উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে? (পৃ. ৫২)*

গ. *কারো সর্বনাশ, কারো মনে মনে হাস। (পৃ. ৫৩)*

ঘ. *পৃথিবী সর্ব্বংসহা হইলেও সূচের ঘা সহ্য করিতে পারে না। (পৃ. ১১০)*

ঙ. *কথায় বলে-টাকায় বাঘের চোখ মেলে। (পৃ. ১৩৮)*

চ. *ঢিলটি ছুঁড়িলে পাটকেলটি খাইতে হয়। (পৃ. ৩২০)*

আনোয়ারা উপন্যাসের জনপ্রিয়তা শিল্পবিচারের মানদন্ড নয়, তবু বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রথম বিশ্বস্ত শিল্প-নিদর্শন। নজিবর রহমানের এই পাঠক-সম্পৃক্ত, কালোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্মত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধ্বে নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, অলৌকিকত্ব, ধর্মীয় মত প্রকাশ ও নানারূপ সীমাবদ্ধতায় এ উপন্যাসের শিল্পমান ক্ষুন্ন হয়েছে। *আনোয়ারা* উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনায় ঔপন্যাসিকের সংযমহীনতা অনিয়ন্ত্রিত আবেগ শিল্পমানকে করেছে বাধাগ্রস্থ। কাহিনী বর্ণনায় শাখা-কাহিনী উপস্থাপন, অলৌকিকতার আশ্রয় চরিত্রসমূহকে করেছে দুর্বল এবং ঔপন্যাসিকের শিল্পচৈতন্যকেও করেছে দুর্বল। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের ভাষা-চিত্র নির্মাণে ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচার অপরিহার্য নয়। তবুও *আনোয়ারা* উপন্যাসের আনোয়ারা ও নূরুল এসলাম চরিত্র দুটি সত্য-আদর্শ-নীতিবোধ ও ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচারে অংশ নিয়ে

www.pathagar.com

স্বাভাবিকতা বিঘ্নিত করেছে। 'পরিণাম পর্বে' আনোয়ারা নামাজ, রোজা সম্বন্ধে বক্তৃতায় ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রচার করলেও এসব উপন্যাসের শিল্পমানের পরিপন্থী। আনোয়ারার দীর্ঘ বক্তৃতা–

"আমরা যদি আল্লাহ, ফেরেস্তা, কোরআন, পয়গম্বর ও কেয়ামত বিশ্বাস করি অর্থাৎ ভক্তির সহিত খোদাতালার প্রতি ঈমান স্থির রাখি, তবে নামাজ-রোজা সম্বন্ধে মনগড়া ভিন্নমত করা কাহারও উচিত নহে।[৪১]

কাহিনীতে অলৌকিকতার আশ্রয় নেয়ার ফলে চরিত্রসমূহ বাস্তবতার মুখোমুখী দাঁড়াতে পারেনি এবং ক্ষুণ্ন হয়েছে চারিত্রিক দৃঢ়তা। আনোয়ারা বিবাহ বন্ধ করার জন্যে বজ্রপাতে গৃহে আগুন, কুয়ায় কলসী ডুবা, মৃত্যুসঞ্জীবনীব্রত পালন করে রোগ নিরাময় ইত্যাদি অলৌকিক ঘটনা, কাহিনী বর্ণনায় সহায়ক হলেও 'এ ধরনের প্রয়াস আধুনিক জীবন-চেতনা ও শিল্পদৃষ্টির পরিপন্থী।'[৪২]

মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলিম সমাজের শিল্পরূপায়ণে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নজিবর রহমানের *আনোয়ারা* একটি নন্দিত ও কালোত্তীর্ণ উপন্যাস। উপন্যাসটির ভাষা পরিকল্পনা, কাহিনী বিন্যাস পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের প্রেরণার উৎস ও পথ নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছে। উপন্যাসে নজিবর রহমান সমকালীন মুসলিম সমাজজীবনকে ভাষা ঐশ্বর্যে রূপায়িত করেছেন। তিনি মুসলিম অন্তঃপুরের জীবনবোধের প্রথমও সার্থক শিল্পরূপকার। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোকের উক্তি–

"অর্থনীতিক-সামাজিক কাঠামোর অনুগামী চৈতন্যপ্রবাহ এ কারণেই 'আনোয়ারা'র মধ্যে শিল্প উপভোগের উপকরণ সন্ধান করেছে। বাঙালি জাতির সমন্বিত পরবর্তী অগ্রগতি যতো বিস্ময়করই হোক না কেন, মোহাম্মদ নজিবর রহমানের আনোয়ারা চিরায়ত ঐতিহাসিক মূল্য যে অক্ষুণ্ন থাকবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেননা, উপন্যাস যে অর্থে আধুনিক শিল্পরূপ, সমাজ চারিত্রের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে লেখক অনেকটাই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন।"[৪৩]

নজিবর রহমান *আনোয়ারা* উপন্যাসে উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও প্রবাদ-প্রবচনের পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম গ্রামীন সংস্কারকে তুলে ধরেছেন। সিঁথের সিন্দুর অক্ষয় থাকা, কাকের ডাকে অমঙ্গল আশঙ্কা ইত্যাদি সংস্কারকে তুলে ধরে উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়নি। মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা ও নারী শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে তাঁর উপন্যাস বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। গভীর সমাজ বাস্তবতাবোধের সাহিত্যপ্রয়াস *আনোয়ারার* চিরায়ত মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। ভাব-ভাষা ও অখ্যান পরিকল্পনায় নজিবর রহমানের *আনোয়ারা* অসামন্য শিল্পপ্রয়াস। বিশেষত এ উপন্যাসটি সমাজচিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের পথনির্দেশ ও প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

---

৪১. *আনোয়ারা*, পৃ. ২৮৩

৪২. আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা*, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ১২৪

৪৩. রফিক উল্লাহ্ খান, *মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য*, পৃ. ১৬৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল- জুন ২০০৩

জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা

নাসির হেলাল*

কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর সময়ের অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি, সহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য ইতিহাসে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। সমসাময়িক সময়ে সাহিত্য সাংস্কৃতিক অংগনে কালের কাম্য হিসেবে তাঁর প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য।

সম্পূর্ণ রবীন্দ্র বলয়ের কবি হয়েও গোলাম মোস্তফা স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল এক মহান কবি। তিনি অনগ্রসর মুসলিম সমাজকে এগিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ইসলামের আলো, যাতে তাদের প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে ইসলামী রেনেসাঁর কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদ-এর পথিকৃৎ।

'বিশ্বাস, বিশেষত ধর্ম বিশ্বাস গোলাম মোস্তফার চিন্তার ভিত্তি ভূমি। জগত ও জীবনের প্রতিটি সত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রগাঢ় ইসলামী ভাবধারায় সম্পৃক্ত। তাঁর সাহিত্যদর্শনও এই বিশ্বাসের উপফল। এই তত্ত্বাশ্রিত **মন্ময়** দৃষ্টি তাঁর সাহিত্য বিচারকেও নিয়ন্ত্রিত করে। তবে গতানুগতিক চিন্তাহীন ধর্মীয় আবেগ প্রকাশের সংগে এর বড় পার্থক্য এই যে, মোস্তফা-মানসের অভিব্যক্তি উদার, জ্ঞানময় এবং সুশৃংখল রুচিবান এবং নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে বিদগ্ধ।'[১]

মাত্র ১৩ বছর বয়সে লেখালেখি শুরু করেন। দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' কবিতা লিখে (যেটা ছিল তাঁর প্রকাশিত প্রথম কবিতা), রাতারাতি সুধিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন তিনি। এরপর তিনি আমৃত্যু একের পর এক জাতির প্রয়োজনে, জাতির খিদমতের জন্য গদ্যে-পদ্যে সংগীতে অসংখ্য লেখা উপহার দিয়েছেন। 'বিশ্বনবী', 'ইসলাম ও কমিউনিজম', 'ইসলাম ও জিহাদ', 'আমার চিন্তাধারা' এবং পাঠক নন্দিত অনেকগুলো কাব্য গ্রন্থ উপহার দিয়ে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। সংগীতের ক্ষেত্রেও রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন শিক্ষক যে কারণে তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে চেষ্টা করেছিলেন শিক্ষা বিভাগের কারিকুলামের আমূল পরিবর্তন করতে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পাঠ্য বই রচনা করতে। যে জন্য তিনি রচনা করেন আলোক মালা, পথের আলো, আলোক মঞ্জুরী, নূতন আলো, ইসলামী নীতি কথা, ইতিহাস পরিচয়, মরু দুলাল, কাব্য কাহিনী প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে এ গ্রন্থগুলোর বেশীর ভাগই সে সময়ে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও তিনি আদর্শ শিক্ষক হবার গৌরব অর্জন করেন। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রধান স্কুলের তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। শিশু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে কবি ঈর্ষণীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। শিশুদের উপযোগী করে এমন চমৎকার রচনা অন্য কেউ উপহার দিতে পারেন নি। কলকাতার '*কিশোর*' পত্রিকার সম্পাদক কবির লেখা 'কিশোর' কবিতাটি হাতে পেয়ে কবিকে লিখেছিলেন-

---

* প্রাবন্ধিক, লেখক, গবেষক।

১. *কবির চিন্তাধারা ও গদ্যরীতি* (প্রবন্ধ)- মুনীর চৌধুরী ; *কবি গোলাম মোস্তফা সংগ্রহ ও সম্পাদনা*, ফিরোজা খাতুন, পৃ. ৮৭, বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস ঢাকা : প্রকাশকাল ১৯৬৭ খ্রি.।

www.pathagar.com

প্রিয় মুস্তফা সাহেব

আপনার কবিতার জন্য ধন্যবাদ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পরিধি মাপিলে হয়তো তিন মাইল লম্বা হইয়া যাইবে। কিন্তু দীর্ঘ পরিধির মধ্যেও এমন একটি কবিতা তাঁহার নাই যাহা কিশোর মনে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, এই কবিতা আপনাকে অমর করিয়া রাখিবে।[২]

সত্যিই কবির প্রতিটি শিশুতোষ কবিতায় রয়েছে শিশু মনের স্বপ্ন ও সাধের সমন্বয়। যে কারণে কবিতাগুলো আজ এতকাল পরেও সমানভাবে জনপ্রিয়। পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে কবি ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে চেয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন। অবশ্য বাস্তবে তা হয়নি। মূলত কবি চেয়ছিলেন পাকিস্তান হবে একটি আদর্শ কল্যাণরাষ্ট্র। যে কারণে কবি রচনা করেছিলেন 'তারানা-ই পাকিস্তান' নামক কাব্যগ্রন্থ।

কবি ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, পাকিস্তানের ঐক্য ও স্বাধীনতা বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে, কিন্তু তিনি কখনই বাংলা ভাষার বিরোধী ছিলেন না। তিনি নিজেই লিখেছেন-

'উর্দু ভাষার স্বপক্ষে কিছু বলিলেই বাংলা ভাষার বিরোধিতা বোঝায় না। আজ বাংলা ভাষার জন্য যাঁহারা আন্দোলন চালাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার চেয়ে বাংলা ভাষার অনুরাগী কয়জন আছেন, জানি না। ত্রিশ বৎসরেরও উর্দ্ধকাল ধরিয়া আমি বাংলা ভাষার সেবা করিয়া আসিতেছি এবং দেশ ও জাতির জন্য যাহা কিছু দান করিয়াছি, বাংলা ভাষাতেই করিয়াছি।[৩]

ব্যক্তিগত জীবনে কবি ছিলেন একজন আমুদে, ভোজন রসিক ও পরিচ্ছন্ন মানুষ। তবে তিনি ভোজনের কাজটা অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে সারতেন না। তিনি তাঁর শান্তিনগরস্থ 'মোস্তফা মঞ্জিলে' কবি সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আপ্যায়িত করতেন। কবি অন্যকে খাওয়ায়ে নিজে তৃপ্তি পেতেন। এ কারণে, 'মোস্তফা মঞ্জিল' সব সময় অভ্যাগতদের কলগুঞ্জনে মুখর থাকতো।

কবি ছিলেন উদার, অসাম্প্রদায়িক ও নীতির ব্যাপারে অনমনীয়। তিনি ইসলামকে তাঁর আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে বলেছিলেন ঃ

'ইসলাম নিজেই যখন মিলন ও সমন্বয় প্রয়াসী, তখন ইসলামী সাহিত্য কেন হবে সংকীর্ণ ও অনুদার ? ইসলামী কোনো জিনিসই তো সংকীর্ণ বা অনুদার নয়। দেশই হোক, জাতিই হোক, ধর্মই হোক, সংস্কৃতিই হোক, সমাজ হোক, শিল্পই হোক ইসলাম সর্বত্রই মিলেছে ও মিলিয়েছে। খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতর স্বপ্ন যেখানেই ভিড় জমিয়েছে, সেখানেই প্রয়োজন হয়েছে ইসলামের। সকলের জন্য স্থান সংকুলান করাই তো ইসলামের কাজ। নিজেও থাকবে, অপরকে থাকতে দেবে, এই Coexistence-ই হলো তাঁর নীতি।'[৪]

আমৃত্যু গোলাম মোস্তফা ইসলামের এ নীতি অনুযায়ী পথ চলেছেন।

১৮৯৭ সালে কবি গোলাম মোস্তফা বৃহত্তর যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) শৈলকূপা থানার মনোহরপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল নিয়ে একটু কথা আছে। তিনি নিজেই 'আমার জীবন স্মৃতি' তে লিখেছেন—

---

২. *আমার জীবন স্মৃতি* (প্রবন্ধ) ; *গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন*-সম্পাদনা, মাহফুজা খাতুন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা : ১, প্রথম মুদ্রণ-জুন ১৯৬৮, পৃ. ১৩০

৩. *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাঃ উর্দু না বাংলা ?*—গোলাম মোস্তফা, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা (প্রকাশকাল উল্লেখ নেই) পৃ. ১-২

৪. ইসলামী সাহিত্য (প্রবন্ধ), *আমার চিন্তাধারা*- গোলাম মোস্তফা, পৃ. ১৭৩ ; প্রকাশক: শ্রী রাখালচন্দ্র দত্ত, পরিবেশক: স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার-ঢাকা, মার্চ ১৯৬২ খ্রি.।

www.pathagar.com

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমার জন্ম। কিন্তু আমার মনে আছে শৈলকূপা হাই স্কুলে ভর্তি হবার সময় আমার আব্বা আমার বয়স প্রায় বছর দুই কমিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্রকৃত জন্ম হয়েছিল সম্ভবত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। তবে এটা ঠিক যে, যে দিন আমার জন্ম হয় সে দিন বাংলা তারিখ ছিল ৭ ই পৌষ রবিবার।'

'কবির পিতার নাম কাজী গোলাম রব্বানী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গ্রাম্য কবি ছিলেন। তাঁর দাদা কাজী গোলাম সরওয়ার নীল বিদ্রোহের সময় নীলকরদের বিরুদ্ধে জাতীয় উদ্দীপনামূলক কবিতা লিখে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেন। এই গোলাম সরওয়ার সাহেবের আদি বাসস্থান ছিল ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত নিবেকৃষ্ণপুর গ্রামে। তিনি মনোহরপুর গ্রামে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে সেখানেই থেকে যান। জানা যায় 'সুসাহিত্যিক ও দাবা গুরু' কাজী মোতাহার হোসেন ঐ একই কাজী পরিবারের সন্তান।'[৫]

মনোহরপুরের কাজী পরিবারের বিদ্যা ও সংস্কৃতি চর্চার পূর্ব ঐতিহ্য ছিল। এ পরিবারে বহুকাল পূর্ব থেকেই আরবী, ফারসী ও বাংলা ভাষা চর্চার রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায়। কবির পিতা কাজী গোলাম রব্বানী ও পিতামহ কাজী গোলাম সরওয়ার আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কাজী গোলাম রব্বানী তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত হিতবাদী, মিহির, সুধাকর ও বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তিনি নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করতেন। এমনকি নিত্যদিনকার সান্ধ্য আসরে গোলাম রব্বানী সাহের সুর করে পুঁথি পাঠ করে সকলকে শোনাতেন। এ সব পুঁথির মধ্যে ছিল জঙ্গনামা, আমীর হামজা, কাসাসুল আম্বিয়া, গুলে বাকাওলি, অন্নদা মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি।

কবির মাতা মোছাম্মাৎ শরীফা খাতুন ছিলেন একজন স্বভাব কবি। এ ব্যাপারে কবি কন্যা ফিরোজা খাতুন লিখেছেন—

'একদিন খাবার সময় দাদীকে বললাম, 'ডাল খেলে না যে'? দাদী বললেন, 'ডাল ? ও খাবোন কাল'। বললাম, কাল আলিয়ে যাবে। দাদী বললেন, 'যদি যায় আলিয়ে দিবানে ফেলিয়ে।[৬]

এজন্যে তিনি আরও লিখেছেন, 'আমার মনে হয় আব্বার প্রতিভা ও পরিবেশ দাদীর কাছ থেকেই বেশি প্রভাবিত।[৭] কবির বাল্যজীবন গ্রাম মনোহরপুরেই কেটেছে। কুমার নদী বিধৌত মনোহরপুর হলো প্রকৃতির লীলা নিকেতন। গ্রামের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য গায়ে মেখেই কবি বেড়ে উঠেছিলেন। এ জন্য পরিণত বয়সে তিনি লিখেতে পেরেছিলেন-

নিখিলের এত শোভা, এত রূপ, এত হাসি গান
ছাড়িয়া মরিতে মোর কভু নাহি চাহে মন-প্রাণ।
এ বিশ্বের সবই আমি বাসিয়াছি ভাল
আকাশ বাতাস জল রবি-শশী তারকার আলো।

(পরপারের কামনা-রক্তরাগ, পৃ. ৬৫)।

মাত্র চার বছর বয়সেই পিতা মুন্সী গোলাম রব্বানীর কাছে কবির লেখা পড়ার হাতে খড়ি হয়। মনোহরপুরের পার্শ্ববর্তী দামুদিয়া গ্রামের পাঠশালাতে প্রথমে শিশু গোলাম মোস্তফাকে ভর্তি করা হয়। এই পাঠশালাতে তিনি পন্ডিত ত্রৈলক্ষনাথ দত্তকে শিক্ষক হিসেবে পান।

ফাজিলপুল পাঠশালায় দু'বছর লেখাপড়া করার পর তাঁকে ভর্তি করা হয় শৈলকূপা হাই স্কুলের নীচের শ্রেণীতে। কিছুদিনে মধ্যেই তিনি মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষক ও ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তী বছরগুলোর বার্ষিক পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম

৫. *আমার আব্বা কবি গোলাম মোস্তফা,* মোস্তফা আজীজ, কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণিকা-৯০, যশোর সমিতি ঢাকা। প্রকাশকাল : ১৯৯০।

৬. মোশররফ হোসেন খান সম্পাদিত, *নতুন কলম,* অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ. ১৯

৭. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

স্থান অধিকার করা অব্যাহত রাখেন, সাথে সাথে পুরস্কৃতও হন। এই শৈলকূপা স্কুল থেকেই তিনি ১৯১৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি খুলনার দৌলতপুর কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১৬ সালে সেখান থেকে আই. এ পাস করেন। আই এ পাস করে তিনি কলকাতা রিপন কলেজে ভর্তি এবং ১৯১৮ সালে সেখান থেকে বি. এ পাস করেন। উল্লেখ্য যে ঐ ১৯১৮ সালে প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৪) বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে বি. এ পাস করেন। তিনিও যশোরের লোক ছিলেন। রিপন কলেজে পড়াকালে 'পথের পাঁচালি'র লেখক উপন্যাসিক বিভূতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সহপাঠি ছিলেন। শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করার পর ১৯২২ সালে গোলাম মোস্তফা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. টি পাস করেন।

আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বি. এ পাস করার পর আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। ফলে ১৯২০ সালে তিনি ব্যারাকপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এই স্কুলে থাকা অবস্থায়ই তিনি বি. টি ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। পরে ১৯২৪ সালে তিনি ব্যারাকপুর স্কুল থেকে কলকাতার হেয়ার স্কুলে বদলী হন। হেয়ার স্কুলে তিনি একটানা ৯ বছর শিক্ষকতা করার পর কলকতা মাদ্রাসায় বদলী হন। সেখান থেকে ১৯৩৬ সালে বালিগঞ্জ গভর্ণমেন্ট ডিমনস্ট্রেশন হাই স্কুলে বদলী হন এবং এক সময় প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। উল্লেখ্য যে, আজ পর্যন্ত এক মাত্র কবি গোলাম মোস্তফা ছাড়া অন্য কোন মুসলমান শিক্ষক বালিগঞ্জ স্কুলের উক্ত পদে আসীন হননি।

বালিগঞ্জ স্কুল থেকে কবিকে বদলী করা হয় হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে। সেখান থেকে ১৯৪০ সালে তাঁকে বাঁকুড়া জেলা স্কুলে বদলী করা হয় এবং সর্বশেষ ১৯৪৬ সালে তাঁকে ফরিদপুর জেলা স্কুলে বদলী করা হয়। এই ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকেই তিনি ১৯৫০ সালে দীর্ঘ ৩০ বছর একটানা শিক্ষকতার মত মহান দায়িত্ব পালন করার পর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। তবে মাঝে ১৯৪৮ সালে তাদানীন্তন পূর্ব বাংলা সরকার কর্তৃক গঠিত "ভাষা সংস্কার কমিটি"র সম্পাদকের পদে যোগদান করেন এবং দায়িত্ব পালন করেন।

নিতান্ত শিশু বয়সেই কবির মধ্যে কাব্য চিন্তার উন্মেষ ঘটে। পিতা, পিতামহের পুঁথিপাঠ, বিয়ের দাওয়াতপত্র রচনা ইত্যাদি থেকে তাঁর মধ্যে কবিত্ব ভাব জেগে ওঠে। তিনি 'আমার জীবন স্মৃতিতে' এ সম্বন্ধে লিখেছেন—'আমার বেশ মনে পড়ে, আমার কাব্য জীবনে প্রথম উন্মেষ হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। আমি তখন শৈলকূপা হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। নীচের ক্লাস থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত আমি শৈলকূপা হাই স্কুলে পড়েছি। পঞ্চম শ্রেণীতে উঠবার পরই কেমন যেনো একটা কাব্যিক ভাব আমার মধ্যে এলো।'

১৯১১ সালে কবি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি কাটানোর পর তাঁর এক বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি কবিতায় রচনা করেন। যতদূর জানা যায় এটিই তাঁর প্রথম রচনা। কবিতাটি হল—

'এস এস শীঘ্র এস ওহে ভ্রাতৃধন
শীতল করহ প্রাণ দিয়া দরশন।
ছুটিও ফুরাল স্কুলও খুলিল,
তবে আর এত দেরি কিসের কারণ।'

এই সময়ে 'মানময়ী গার্লস স্কুলে'র রচয়িতা শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ঐ শৈলকূপা স্কুলে কবি গোলাম মোস্তফার দু'ক্লাস ওপরে লেখাপড়া করতেন।

কবির পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম লেখা ছিল, 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' শিরোনামের কবিতা। কবি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। প্রখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক মওলানা আকরাম খাঁ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'তে

www.pathagar.com

১৯১৩ সালে কবিতাটি ছাপা হয়। কবিতাটির রচনা ও প্রকাশের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বন্দে আলী মিয়া লিখেছেন, 'পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং বন্ধুবর্গের প্রেরণায় গোলাম মোস্তফার অবরুদ্ধ কাব্য প্রবাহ ঝর্ণা প্রবাহের মতো বাইরে আত্মপ্রকাশ করলো। সেই সময়ে ইউরোপ ভূ খণ্ডে বলকান যুদ্ধ চলছিলো। তুরস্ক সেনাবাহিনী বুলগোরিয়ানদের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় সমগ্র মুসলিম জাহানে একটা বিমর্ষতার ছায়া নেমে এসেছিল। এমন সময়ে সহসা সংবাদ পাওয়া গেল, কামাল পাশা বুলগেরিয়ানদের নিকট থেকে 'আদ্রিয়ানোপল' পুনরুদ্ধার করেছেন। এই খবরে স্বজাতি বৎসল কিশোর কবির প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। তিনি 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' নাম দিয়ে এক রাতের মধ্যে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন। অতঃপর কবিতাটি তিনি 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে পাঠিয়ে দিলেন। পরবর্তী সপ্তাহে কবিতাটি মুদ্রিত হলো। কবিতাটির ছিল এরূপ—

'আজিকে প্রভাত কি বারতা নিয়া
ধরায় আসিল নামিয়া।'

'কবিতার ছন্দ, ভাব এবং প্রকাশভংগী তখনকার দিনে সবই ছিলো নতুন। এই কবিতায় পাঠক মহলে তাই একটা সাড়া পড়ে গেল। বাংলার মুসলিম সমাজে যে একজন আধুনিক কবির আবির্ভাব হয়েছে একথা সহজেই স্বীকৃতি লাভ করলো। গোলাম মোস্তফাও নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সেই থেকে তিনি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতে শুরু করলেন।'[৮]

বাঙালি মুসলমানের জাতীয় জাগরণের পথিকৃতদের অন্যতম কবি গোলাম মোস্তফা জীবনের প্রথম থেকেই পরিকল্পিতভাবে তাঁর লেখনি চালনা করেন।

তিনি নিজেই লিখেছেন—

> 'যে যুগে আমার জন্ম সে যুগে বাংলার মুসলমানের অবক্ষয়ের যুগ। সে যুগে আমাদের সাহিত্যের না ছিল কোন স্বাতন্ত্র্য, না ছিল কোন স্বকীয়তা। প্রত্যেক জাতির মননশক্তি, ঐতিহ্য, ধ্যান-ধারণা ও আশা আকাংক্ষা রূপায়িত হয় তার মাতৃভাষার মধ্যে। সেই হিসাবে বাংলার মুসলমানদের কোন সাহিত্যই তখন রচিত হয়নি। আমি তাই ছোটবেলা থেকেই চেয়েছিলাম মুসলিমের জাতীয় সাহিত্য রচনা করতে। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগী হলেও, আমার মনে জেগেছিলো আমাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির একটা দুর্জয় আকাঙ্খা। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির তাগিদে নয়-সহজ ভাবেই আমি বাংলা সাহিত্যে চেয়েছিলাম ইসলামী কৃষ্টির রূপায়ণ।'[৯]

উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই ১৯১৩ সালের লেখা প্রকাশ থেকে পরবর্তী পঞ্চাশ বছরকাল তাঁর লেখালেখির গতি ছিল নদীর স্রোতের মত অব্যাহত। এই অর্ধশত বছরে তাঁর ২ টি উপন্যাস, ৭ টি মৌলিক কাব্য, ৪ টি কাব্যানুবাদ, ২ টি কাব্য সংকলন, ৪ টি জীবনী, ২টি রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ, ২টি ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ, আল কোরআন-এর তারজমা, ১টি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ, ১টি প্রবন্ধ সংকলন ও ১টি গানের সংকলন ছাড়াও অনেক লেখাই তিনি লিখেছিলেন। এর মধ্যে পাকিস্তান পূর্ব যুগে প্রকাশিত হয়—১. রূপের নেশা (উপন্যাস, ১৩২৬ খৃ.); ২. ভাঙ্গা বুক (উপন্যাস, ১৯২১ খৃ.); ৩. রক্তরাগ (কবিতা, ১৯২৪ খৃ.); ৪. (ক) হাস্নাহেনা (কবিতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ); (খ) হাস্নাহেনা (কবিতা সংগ্রহ ১৯৩৭ খৃ.); ৫. খোশরোজ (কবিতা ১৯২৯ খৃ.); ৬. সাহারা (কবিতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ); ৭. কাব্য কাহিনী (কবিতা, ১৯৩৮ খৃ.); ৮. মোসাদ্দাস-ই-হালী (অনুবাদ কবিতা, ১৯৪১ খৃ.); ও ৯. বিশ্বনবী (জীবনী, ১৯৪২ খৃ.)।

---

৮. আবদুস সাত্তার সম্পাদিত, *ছোটদের জীবনীগ্রন্থ*, ১২ খণ্ড, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা : ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, পৃ. ২৩

৯. *গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন*, সম্পাদনা: মাহফুজা খাতুন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা :১, প্রথম মুদ্রণ-জুন ১৯৬৮, পৃ. ১৩২

www.pathagar.com

পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত হয়- ১. ইসলাম ও জেহাদ (রাজনীতি ১৯৪৭ খৃ.); ২. মরু দুলাল (জীবনী, ১৯৪৮ খৃ.); ৩. বুলবুলিস্তান (কাব্য সংকলন, ১৯৪৯ খৃ.); ৪. ইসলাম ও কমিউনিজম (ধর্ম, ১৯৪৯ খৃ.); ৫. তারানা-ই-পাকিস্তান (কবিতা, ১৯৫৬ খৃ.); ৬. কালাম-ই-ইকবাল (ইকবাল কাব্যের অনুবাদ, ১৯৫৭ খৃ.); ৭. আল কুরআন (বাংলা কাব্য অনুবাদ, ১৯৫৭ খৃ.); ৮. বনি আদম, প্রথম খন্ড (কবিতা, ১৯৫৮ খৃ.); ৯. বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য (জীবনী, ১৯৬০ খৃ.); ১০. শিকওয়া ও জবাব ই-শিকওয়া (অনুবাদ কবিতা, ১৯৬০ খৃ.); ১১. অবিস্মরণীয় বই (ইতিহাস সম্পাদনা, ১৯৬০ খৃ.); ১২. আমার চিন্তাধারা (প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৬২ খৃ.); ১৩. হযরত আবু বকর (জীবনী, ১৯৬৫ খৃ.); ১৪. কাব্য সংকলন (কবিতা-সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদিত, ১৯৬০); ১৫. গীতি সঞ্চয়ন (গান-ফিরোজা খাতুন সম্পাদিত, ১৯৬৫ খৃ.); ১৬. কাব্য গ্রন্থাবলী ১ম খন্ড (কবিতা- আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১৯৭১ খৃ.) ও ১৭. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (রাজনীতি, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই)।

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের নাম থেকেই বোঝা যায় গোলাম মোস্তফা শুধু কবিই ছিলেন না, সাহিত্যের নানা শাখায় ছিল তাঁর সদম্ভ বিচরণ। তিনি ছিলেন একজন চৌকশ লেখক। আর এ জন্যেই কবি বন্দে আলী মিয়া তাঁর সাহিত্যিক অবদান সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লিখেছেন, ' গোলাম মোস্তফার সাহিত্যিক অবদান মুসলিম বাংলার এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর দান সাহিত্যের নানা শাখায় পল্লবিত হয়ে আছে। তিনি যে কেবল মাত্র কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয় সাহিত্যের বিবিধ বিভাগে তিনি দান করেছেন অনেক কিছু। খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, গীতি কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, রস রচনা, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও ধর্মালোচনা, সংগীত রচনা, তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা, কোরান শরীফের অনুবাদ, নব নব ছন্দ প্রবর্তন, ইখওয়ানুস শাফা, মুসাদ্দেস-ই-হালী, ইকবালের অনুবাদ প্রভৃতি নানা দিকে গোলাম মোস্তফার দান স্বীকৃতি লাভ করেছে।'

তিনি সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও জনসমাজে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। হারমোনিয়াম, পিয়ানো এবং অর্গান বাজিয়ে গান করতে পারতেন। তাঁর নিজের কণ্ঠে গাওয়া কয়েকখানি গান অবিভক্ত বাংলায় রেকর্ড হয়েছিলো।

ইংরাজী সাহিত্যেও তাঁর প্রচুর অধিকার ছিলো। The Musalman, The star of India, The Morning News, The Pakistan Observer, The Down প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি বহু তথ্যপূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। Morning News তাই তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল : He is also a fine prose writer both in Bengali and English.[১০]

প্রেম ও ইসলাম তাঁর কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আবাল্য তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি ইসলামী ধারা সৃষ্টি করা। তিনি বিশ্বের সকল মুসলমানকে প্যান ইসলামীজমের ধারণায় একই জাতি মনে করেছেন। সমস্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হিসেবে ইসলামের পুনর্জাগরণ কামনা করেছেন। তবে তিনি কখনো সাম্প্রদায়িকতা লালন করেন নি; সর্বদায় তিনি ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করেছেন। তাঁর লেখা অনেক কবিতায় এর প্রমাণ রয়েছে।

"ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কিত তাঁর কবিতাগুলোকে কয়েকভাগে বিন্যাস করা যায়। এক শ্রেণীর কবিতায় তিনি বিভিন্ন পর্বকে (ঈদ, কোরবানী, শবেবরাত, ফতেহা ইয়াজ-দহম) অবলম্বন করেছেন, অপর এক শ্রেণীর কবিতায় প্রকাশ করেছেন আধুনিক পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের জাগরণে উল্লাস ও আনন্দ (মোস্তফা কামাল, মিসর, কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং দলের লীগ বিজয়), আরও এক শ্রেণীতে

১০. *ছোটদের জীবনী গ্রন্থ-২২*, আবদুস সাত্তার সম্পাদিত, পৃ. ২৫

www.pathagar.com

রয়েছে ইসলামের ইতিহাসের মহত্ত্ব, উদারতা, সাম্য ও বীরত্বব্যঞ্জক বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনীর বর্ণনা এবং সর্বশেষ শ্রেণী পড়ে ইসলামের বিভিন্ন উপকথাকে ভিত্তি করে রচিত কবিতাসমূহ।'[১১]

অধ্যাপক সাঈদ উর রহমান লিখেছেন—

'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা গোলাম মোস্তফার কাব্য সাধনায় গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্য রাত্রিতে ঢাকা রেডিও থেকে কোরআন তেলাওয়াতের পর গীত হয় তাঁর রচিত সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা/দুনিয়াতে ভাই কোন সে স্থান/পাকিস্তান সে পাকিস্তান।'[১২]

কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের নাম 'রক্তরাগ' (১৯২৪)। এর আগে অবশ্য কবির দু'খানা উপন্যাস 'রূপের নেশা' (১৩২৬) ও 'ভাঙ্গা বুক' (১৯২১ খৃ.) প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত রচিত কবিতা 'রক্তরাগ'-এ স্থান পেয়েছিল। প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে কাব্যগ্রন্থটি প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এমন কি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্যগ্রন্থটি পড়ে কবিকে কবিতা লিখে অভিনন্দন জানান। গোলাম মোস্তফা তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সাথে সাথে তাঁর প্রিয় কবিকে সৌজন্য কপি পাঠালে তিনি তাঁকে নিম্নোক্ত দু'লাইন কবিতা লিখে বরণ করে নেন। তিনি লিখিছিলেন—

"তব নব প্রভাতের রক্তরাগ খানি
মধ্যাহ্নের জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।"

আর 'সাম্যবাদী' পত্রিকার ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল—

"রক্তরাগ' তাঁহার কবি প্রতিভার পরিচয় বাঙ্গালী পাঠক সামাজে পূর্ণ ভাবেই করিয়া দিবে।'

এ কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলো প্রধানত ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে লেখা। মোট ২৯ টি কবিতা এ কাব্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'পরিচয়' নামক কবিতাটি ১৯১৬ সালে 'মাসিক মোহাম্মদী'তে ছাপা হয়েছিল। কবিতাটি হল—

যে জাতি একদা উষর-ধূসর ভীষণ আরব দেশে
বিরাজ করিত অতীব তুচ্ছ, অতীব ঘৃণ্য বেশে
জীবনমন্ত্র, সমাজতন্ত্র ভুলিয়া যাহারা হায়
মরার অধিক পড়িয়া রহিল সুনিবিড় তমসায়।
সহসা আবার নবীন মন্ত্রে লভিল যাহারা প্রাণ-
তারাই আজকে বিশ্বব্যাপ্ত-আমরা মুসলমান।

এই কবিতায় তিনি আরও লিখেছেন—

বিজয় করিয়া য়ুরোপ প্রথমে যাহারা লভিল মান
প্রাচ্যবর্গ হে জগদ্বাসী আমরা মুসলমান।
.....
.....
আমরা জগতে মরিব না কভু চিরকাল বেঁচে রব
যুগে যুগে লভি নুতন শক্তি বিশ্ববিজয়ী হব।

রক্তবাগ' কাব্য গ্রন্থে ভিন্নধর্মী বেশ কয়েকটি কবিতাও স্থান পেয়েছে। যেমন 'হিন্দু মুসলমান' কবিতাটি। এ কবিতায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথা বলা হয়েছে—

এসো ভাই দাঁড়াইয়া মাতৃবক্ষে আজি
লই দীক্ষা, করি পণ, জীবনে মরণে

১১. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি*, সংস্কৃতি ও কবিতা, পৃ. ১৩৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর ১৯৮৩ খ্রি.।
১২. প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৬

www.pathagar.com

এক হয়ে রবো মোরা, সমবেত ভাবে
সাধিব মায়ের কাজ, ভারত জননী
উভয়ের মুখ পানে উঠিবে হাসিয়া,
ঘুচে যাবে দুঃখ ক্লেশ, ঘুছিবে বিরোধ ;
ঘরে ঘরে কল্যাণের হবে অভ্যুদ্বয়
ধন্য হবো মোরা সবে। তৃপ্ত হবে প্রাণ
হেরিয়া যুগল-মূর্তি হিন্দু মুসলমান।

কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হাস্নাহেনা' ১৪টি কবিতা নিয়ে এ কাব্যগ্রন্থটি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে কাব্যগ্রন্থটি কবি নিজেই প্রকাশ করেন। আনন্দময়ী, প্রথম চিঠি ও ভূষণ কবিতা তিনটি যা 'হাস্নাহেনা'য় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'রক্তরাগে'ও ছিল। কাব্যগ্রন্থটি সম্বন্ধে ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সওগাত' লিখেছিল—"ইহা কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক। 'রক্তরাগে' তাঁহার যে শক্তি 'ফুটে ফুটে না' অবস্থায় দেখিয়াছিলাম 'হাস্নাহেনা'য় তাহা অনেকটায় ফুটিয়াছে বলিয়া মনে হইল। কবি গোলাম মোস্তফার কাব্য সাধনা ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা আমরা আজ আনন্দ সহকারে ঘোষণা করিতেছি। প্রার্থনা করি, কবির শক্তি দিন দিন পরিবর্তিত হউক এবং তাহাতে দরিদ্র মুসলিম বঙ্গ সাহিত্য উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধি লাভ করুক।'

এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা 'শ্যালিকা' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি জসীম উদ্‌দীন লিখেছেন, তাঁহার 'কুড়ানো মানিক', 'শ্যালিকা' প্রভৃতি কবিতা পড়িয়া কেবলই বলিতে ইচ্ছে করে, কি সুন্দর! কি সুন্দর! 'শ্যালিকা' কবিতাটির অধিকাংশ লাইনের শেষ তিন অক্ষরের শব্দ যোজন করিয়া ইহার লঘু পরিহাসটি কবি কি অপূর্ব করিয়া ফুটাইয়াছেন—

বুঝে পড়ে দেখিলাম করি তালিকা
সবচেয়ে সুমধুর ছোট শ্যালিকা;
নাই তার তুল
মন মশগুল
প্রাণ পাওয়া বাসরের ফুল মালিকা।

(শ্যালিকা-হাস্নাহেনা, পৃ. ১২)

'এই কবিতায় কবি কি বলিতে চাহিয়াছেন তাহার চাইতেও লক্ষ্য করি তিনি কেমন পরিহাস পটু করিয়া তাঁহার কথাগুলোকে এখানে ছন্দে পুরিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিতাটি বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে একক ; কি বিষয় বস্তুতে, কি প্রকাশ ভঙ্গীতে সকল ভাবেই ইহা মৌলিক রচনা।'[১৩]

মূলত 'হাস্নাহেনা' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলো প্রেমের কবিতা। অনেকেই কবি গোলাম মোস্তফাকে মোল্লা কবি বললেও রসবোধের ক্ষেত্রে তিনি সকল কিছুকে অতিক্রম করেছেন, প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। তাঁর সময়কালের কথা চিন্তা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ কবির সময়কালে কোন মুসলিম কবির, বিশেষ করে তাঁর মত ইসলামপন্থী কবির পক্ষে প্রকাশ্যে ধর্ম- সমাজ, নীতি-নৈতিকতাকে দূরে ঠেলে প্রেমের কথা বলা সত্যিই দুঃসাহসের ব্যাপার। ২২টি কবিতা নিয়ে ১৯২৯ সালে কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ' খোশরোজ' প্রকাশিত হয়। এর প্রায় সবগুলোই দীর্ঘ কবিতা এবং মুসলমানদের সম্পর্কে লেখা। মুসলমানরা যে এক সময় বিশ্ববরেণ্য ছিল, বিশ্বের সেরা জাতি ছিল কিন্তু কুসংস্কার আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে গিয়ে এখন তারা নিগৃহীত ও পতিত জাতি। কবি মুসলমানদেরকে আবার

১৩. ফিরোজা খাতুন সংগ্রহ ও সম্পাদিত, *কবি গোলাম মোস্তফা*, পৃ. ২৯-৩০, বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা ডিসেম্বর ১৯৬৭ খ্রি.।

www.pathagar.com

আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়ানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি কল্পনার রথে চড়ে দেখেছেন মুসলমানরা 'ইসলামী হুকুমতের' ছায়াতলে এসে পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

আবার এ কাব্য গ্রন্থেই রয়েছে 'বঙ্গরবি আশুতোষ' নামে একটি কবিতা। যেটি আশুতোষ মুখোপধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪)-এর মৃত্যুর পর তাঁর বন্দনা করে লেখা হয়েছে। কবিতাটিতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বাংলার জাতীয় গৌরব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন—

হে বঙ্গের আশুতোষ, বাঙালীর জাতীয় গৌরব।
গগনে-পবনে তুমি রেখে গেছো যে সুধা- সৌরভ,
.....
.....
হে বঙ্গের আশুতোষ। বাঙলার শ্রেষ্ঠ শের নর
মরিয়াও তুমি যে গো চিরদিন রহিবে অমর।[১৪]

১১টি দীর্ঘ ব্রুস কবিতা নিয়ে কবির চতুর্থ কাব্য গ্রন্থ 'সাহারা' ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এ কাব্য গ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় প্রেম বিষয়ক। কবি যে একজন প্রেমিক পুরুষ ছিলেন তা এ কাব্য গ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় সাক্ষ্য দেবে। যেমন কবি বলছেন-

হে মোর মানসী প্রিয়া!
তোমারে যে আমি করেছি রূপসী
কবির দৃষ্টি দিয়া
এত সুন্দর ছিলে নাকো তুমি আমার দেখার আগে,
ছিলে বনফুল পাতায় ঢাকা- সে জানি!
সহসা যেদিন হেরিনু তোমারে নবপ্রেম- অনুরাগে,
সেইদিন হতে হলে তুমি ফুল রাণী।
তোমার যে আমি করেছি রূপসী কবির দৃষ্টি দিয়া- [সাহারা, পৃ. ২৫]

১৯৩৮ সালে ১৭টি কবিতা নিয়ে কবির পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'কাব্য কাহিনী' প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থটি রচিত হয়েছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী'র অনুসরণে। কবিতাগুলোতে ইসলামের ইতিবৃত্ত ছাড়াও কয়েকটি উপকথা ও কাহিনীর কাব্যরূপ দেয়া হয়েছে। আর 'রাখী-ভাই' ' মোগল প্রহরী' ও 'প্রতিশোধ' শিরোনামের তিনটি কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের একে অপরের প্রতি সহযোগিতা ও মিলন চিত্র। শেষ দু'টি কবিতা সিরাজী ও 'আফজাল খা' এবং শ্রী হিন্দগড়'- এ দেখানো হয়েছে মুসলমানদের সাথে হিন্দু মারাঠা ও শিখদের বিশ্বাসঘাতকতার চিত্র। তবে এ কাব্যগ্রন্থের বেশিরভাগ কবিতায় রয়েছে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য, আত্মত্যাগ ও মহত্বের কথা। 'মক্কা-বিজয়' কবিতায় কবি বলছেন-

মক্কা আজিকে হয়েছে জয়,
নাহিকো শঙ্কা-নাহিকো ভয়,
কাটিয়া গিয়াছে-সব বিপদ
দীর্ঘ অষ্ট বর্ষ পর

১৪. বঙ্গরবি আশুতোষ, খোশরোজ, পৃ. ৩৮ উদ্ধৃত; *গোলাম মোস্তফা কাব্যসমগ্র,* সম্পাদনায়; ফিরোজা খাতুন, পৃ. ১১০

www.pathagar.com

আসিছেন ফিরে আপন ঘর।
খোদার হাবীব মোহাম্মদ।

(মক্কা বিজয়-কাব্য কাহিনী, পৃ. ৯)

কবির প্রকাশিত ৬ষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হলো 'তারানা-ই-পাকিস্তান'। এই কাব্যগ্রন্থে মাত্র তিনটি শিরোনাম- ইসলামী গজল, পাকিস্তানী গান ও বিবিধ রয়েছে। ইসলামী গজল শিরোনামে মোট ১৭টি গজল, পাকিস্তানী গান শিরোনামে মোট ১৫টি গান এবং বিবিধ শিরোনামে ৩০টি গান সংকলিত হয়েছে।

- গজল ১৭টির মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত কয়েকটি গজল। যেমন-

১. বিসমিল্লাহির-রাহমানির রাহিম
সকল কাজের শুরুতে বল
ওরে ও মুমিন মুসলিম ॥

২. অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি/বিচার দিনের স্বামী।
যতো গুণগান, হে চির মহান,/ তোমার অন্তর্যামি ॥

৩. হে খুদা দায়াময় রহমান-রহিম।
হে বিরাট, হে মহান, হে অনন্ত অসীম ॥

৪. নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি/আমার মুহাম্মদ রসূল।
কুল মাখলুকাতের গুলবাগে/ যেন একটি ফোটা ফুল ॥

৫. বাদশা তুমি দীন ও দুনিয়ার/ হে পারোয়ার দিগার।

৬. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রসূল।
এই কলেমা পড়রে আমার পরাণ-বুলবুল ॥

৭. নামাযের এই পাঁচ পিয়ালা গুলাবী শরবৎ।
দান করে তোর দিলতাজা কর, হে নবীর উম্মৎ।

৮. গো মদীনা মানোয়ারা
কে বলে তুমি মরুভূমি
কে বলে তুমি সবহার ॥

৯. তুমি যে নূরের রবি/নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়/আঁধারে ডুবিত সবি ॥

ইত্যাদি কালোত্তীর্ণ গানগুলো কবির বিজয় ঘোষণা করছে। উল্লেখ্য যে, উদ্ধৃত গানগুলো সমকালে তো বটেই, বর্তমান সময়েও মুসলিম সামজে সমানভাবে জনপ্রিয়। এমন কি এগুলো ধর্মীয় সভা, অনুষ্ঠানাদিতেও গীত হয়ে থাকে।

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় কবির ৭ম কাব্যগ্রন্থ 'বনি আদম'-এর ১ম খণ্ড। তিন খণ্ডে সমাপ্ত করার ইচ্ছে নিয়ে ১৯৫১ সালে রচনা শুরু করেন 'বনি আদম' মহা-কাব্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সমাপ্ত হয়নি। এই মহাকাব্যটি সম্পর্কে কবি নিজে লিখেছেন। '.....মাইকেলের পরবর্তী কবিরা মাইকেলকে অনুসরণ করতে গিয়ে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছেন, তার কারণ তাঁহারা এই যতি ভঙ্গের কলাকৌশল সম্যক আয়ত্ব করিতে পারেন নাই।.... 'বনি আদম' কাব্যে আমিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দে আমি কিছু নূতনত্ব আনিতে চেষ্টা করিয়াছি। জোড়া অক্ষরে (অর্থাৎ ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪- তে) যতি ত ফেলিয়াছিই, বিজোড়-অক্ষরে (অর্থাৎ ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩ তেও) যতি ফেলিয়াছি।'

কিন্তু একথা ঠিক যে কবি গোলাম মোস্তফাও এক্ষেত্রে সফল হতে পারেন নি। তিনিও হেম-নবীনের মতই ব্যর্থ হয়েছেন। যে কারণে 'বনি আদম' কাব্যগ্রন্থটি পাঠক মহলে খুব বেশি সাড়া জাগাতে পারেনি।

www.pathagar.com

'মহাকাব্যিক ঘটনা, গঠনকল্পনা ও বিস্তৃতি থাকলেও 'বনি আদম' এ উপযুক্ত ভাষা নেই। স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষে বিস্তৃত কাহিনী বর্ণনায় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সংলাপে অর্ধতৎসম ও তদভব শব্দ ব্যবহার করার ফলে তাতে গাম্ভীর্য ও গাড়বন্ধতা আসেনি।'[১৫]

তবে কাব্যের শুরুতে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন কবি। যেমন-

নিস্তব্ধ নির্জন রাতি! মহাশূন্য মাঝে
কোটি কোটি চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা দল
জেগে আছে অতন্দ্র নয়নে! মনে হয়
স্বচ্ছ নীলিমায় এক সমুদ্র-প্লাবন
ডুবাইয়া অন্তরীক্ষ-বিশ্ব চরাচর
অনন্তকালের বুকে পাতিয়াছে তার
চিরন্তন অধিকার। [১-২]

গোলাম মোস্তফার গদ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কাজী কাদের নওয়াজ লিখেছেন—

'কবির গদ্য রচনা সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, মিলটনের 'এরিও পেজেটিকার গদ্য যেমন জ্ঞানস্পৃহা বাড়িয়ে তোলে, গোলাম মোস্তফার গদ্য রচনাও তাই।'[১৬]

গোলাম মোস্তফা কবি হিসেবে পরিচিত ও নন্দিত হলেও তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'রূপের নেশা' নামক উপন্যাস। এবং দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থও উপন্যাস (১৩২৮)। এ জন্য মরহুম মুনীর চৌধুরী গোলাম মোস্তফা সম্বন্ধে লিখেছেন—

'মরহুম গোলাম মোস্তফার সম্পূর্ণ নাম কবি গোলাম মোস্তফা। লোকের স্মৃতিতে 'কবি' তাঁর নামের অবিচ্ছেদ্য আদ্যাংশরূপে চিরকাল জাগরূক থাকবে। কিন্তু তাঁর সমগ্র সাহিত্য কীর্তির বিচারে এই পরিচয় অসম্পূর্ণ। কবির পদ্য রচনার গুণ ও পরিমাণ কোনো অর্থেই সামান্য নয়। এমন কি এই গদ্যের কবিত্বপূর্ণ এক বিশেষ ওজস্বিতার তারিফ করে যাঁরা ক্ষান্ত হন তাঁরাও সুবিচার করেন এমন বলতে পারি না। কারণ, গোলাম মোস্তফার গদ্য যে কেবল কাব্যিক উদ্দামতায় বেগবান তাই নয়, ইহা গদ্য পরিণত চিন্তা ধারার সংগে সংগতি রক্ষা করে সরস, শান্তি ও সংহত রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম।'[১৭]

সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় কবি গোলাম মোস্তফার অবাধ পদচারণা ছিল। যেহেতু তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল অধপতিত, পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে তাদের স্বমহিমায় দাঁড় করানো-তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় অনেকগুলো প্রবন্ধ রচনা করেন। যে সব প্রবন্ধ মাসিক মোহম্মদী, সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ইসলাম দর্শন, মোয়াজ্জিন, সত্যবার্তা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এসব প্রবন্ধ 'আমার চিন্তাধারা' (১৯৬২) নামক প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আসলে-

'এমন এক সময় গোলাম মোস্তফার জন্ম হয়েছিল যখন তাঁর সধর্মীয় সমাজ অর্থাৎ বাংলার মুসলিম জনসমাজ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার গভীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, তারা ছিল সর্বক্ষেত্রে শোষিত, পীড়িত, নিগৃহীত ও অপাংতেয়।'[১৮]

---

১৫. সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১৪০

১৬. মুনীর চৌধুরী, *কবির চিন্তাধারা ও গদ্যরীতি* (প্রবন্ধ) ; *কবি গোলাম মোস্তফা,* ফিরোজা খাতুন সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস,ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৬৭, পৃ. ৮৪

১৭. মুস্তফা মাসুদ, *গোলাম মোস্তফার গদ্যে কাব্যিক আমেজ* (প্রবন্ধ) ; *ঐতিহ্য*; (১৮৯৭-১৯৯৭, কবি গোলাম মোস্তফা জন্ম শতবর্ষ বিশেষ প্রকাশনা) হাসান আবদুল কাইয়ুম সম্পাদিত, ইফাবা, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৮০।

১৮. হাসান আবদুল কাইয়ুম সম্পাদিত, *ঐতিহ্য,* ১১ বর্ষ, ৭-১২ সংখ্যা।

www.pathagar.com

এই প্রেক্ষাপটে কবি গোলাম মোস্তফা চাচ্ছিলেন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বতন্ত্র সাহিত্য ধারা গড়ে উঠুক।

প্রবন্ধকার গোলাম মোস্তফা অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ ছিলেন। যেমন 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রকাব্যে ইসলামী ভাবনার প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে তিনি নানা যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করেছেন। তিনি সরাসরি কোরআনের বিভিন্ন সুরা থেকে আয়াতের নির্দেশ পেশ করে তুলনা মূলক বিচার করতে চেষ্টা করেছেন। 'ইসলাম ও কমিউনিজম' গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। মানবরচিত মতবাদ যে মানুষের মুক্তির সনদ হতে পারে না এ কথা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ইসলামই যে মুক্তির একমাত্র পথ সে কথা তিনি তুলে ধরেছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে কমিউনিজম মুখ থুবড়ে পড়বে। যা আজ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে 'বিশ্বনবী' গোলাম মোস্তফার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। আজ একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কবি গোলাম মোস্তফা যদি 'বিশ্বনবী' গ্রন্থটি ছাড়া অন্য কিছু রচনা না-ও করতেন তবুও যুগের পর যুগ বাঙালি পাঠকদের কাছে বেঁচে থাকতেন, শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন থাকতেন। 'বিশ্বনবী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে, এরই মধ্যে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল পেরিয়ে গেছে, কিন্তু 'বিশ্বনবী'র কদর পাঠকের কাছে বিন্দুমাত্র কমেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রথম খণ্ডে মোট ৫৮ টি পরিচ্ছদে আলোচনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে মোট ১৪টি পরিচ্ছদে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছদের আলোচনায় অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল। 'বিশ্বনবী' নিঃসন্দেহে একটি গবেষণা গ্রন্থ, সর্ব সাধারণের বোধগম্যও। এর কোনও আলোচনা যুক্তির ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি, আবার আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন অযৌক্তিক কিছুকেও প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। বর্তমানে 'বিশ্বনবী' গ্রন্থটিকে গদ্য কাব্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রেও কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন অনন্য। তিনি উর্দু কবি আলতাফ হোসেন হালী, মহাকবি আল্লামা ইকবাল ও কোরআনের বিভিন্ন অংশের প্রাঞ্জল অনুবাদ করেছেন। এ ব্যাপারে ড. খালেদ মাসুকে রসুল লিখেছেন—

'অমর কবি ইকবালের কাব্যদর্শন ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা এ মহান কবি ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফার সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবনের অভ্রান্ত দিশারী। পাকিস্তানোত্তর কালে তিনি প্রাচ্যের এই মহাকবির অজস্র বাণী আমাদের সাহিত্যে পরিবেশন করেন। 'কালাম-ই-ইকবাল', 'শিকওয়া', 'জওয়াব-ই-শিকওয়া'র অনবদ্য অনুবাদ গোলাম মোস্তফার অনন্য অবদান। তিনি কুরআনের কোনো কোনো সূরারও সুললিত অনুবাদ করেছেন। ১৯২৭ সালে মাসিক 'সাহিত্যিক' পত্রিকায় ধারবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর 'এখওয়ানুস সাফার' অনুবাদ। সেই একই বছর মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয় 'মুসাদ্দাস-ই-হালী' ধারাবাহিকভাবে।'[১৯]

সুদীর্ঘকাল শিক্ষকতার মত মহান পেশার সাথে জড়িত থাকার কারণে এবং শিক্ষা বিজ্ঞানে ডিগ্রীপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে শিশু কিশোরদের মনের খোঁজ তিনি সহজেই পেয়েছিলেন। যে কারণে তিনি শিশুদের জন্য অজস্র লেখা উপহার দিতে পেরেছেন। তিনি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের অনেক পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছেন। যে কারণে অনেকেই ভুল করেন, তাঁর রচিত শিশু পাঠ্য রচনা পাঠ্যপুস্তক সর্বস্ব মনে করেন।

---

১৯. *মুসলিম রেনেসাঁর কবি গোলাম মোস্তফা*, ডঃ খালেদ মাসুকে রসূল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৫৩

www.pathagar.com

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, তিনি ছাত্র ছাত্রীদের যাবতীয় বিষয়বস্তুকে নীতি উপদেশ ও ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য করার প্রয়াসী ছিলেন। তবে 'ভাব, বিষয়, ভাষাভঙ্গি, ছন্দোগতি, শব্দ লালিত্য, রচনাশৈলী এ সকল দিকেই তিনি ছিলেন স্বার্থক শিশুমনোরঞ্জক রচনাকার।

গোলাম মোস্তফা ছোটদের জন্য লিখেছেন—আলোক মালা, পথের আলো, আলোক মঞ্জুরী, নূতন আলো, ইসলামী নীতিকথা (১৯৩৫), কাব্য কাহিনী (১৯৩৮), ইতিহাস পরিচয় ও মরু দুলাল (১৯৪৮)-এর মত গ্রন্থ।

আলো অভিসারী এ কবি ছোটদেরকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার মানসিকতায় তাঁর গ্রন্থের নামকরণও সেইরূপ করেছেন, যে কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

তিনি শিশুদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় ও মন মাতানো প্রচুর ছড়া কবিতা লিখেছেন, যা এখনো সবার মুখে ফেরে। যেমন—

ক. আমরা নতুন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল বন নন্দনে
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা জীবন জাগে স্পন্দনে।

.....

ভবিষ্যতের লক্ষ্য আশা মোদের মাঝে সন্তরে
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।

(কিশোর-রক্তরাগ, পৃ. ৪৯)।

খ. খুকুমনি জনম নিলো যেদিন মোদের ঘরে
পরীরা সব দেখতে এল কতই খুশী ভরে।

(খুকুমনি-আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি পৃ. ৫)।

গ. এই করিনু পণ, মোরা এই করিনু পণ
ফুলের মত গড়ব মোরা মোদের এ জীবন।

(শিশুর পণ-আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি, পৃ. ৮)।

ঘ. নূরু, পুশি, আয়েশা, শফী সবাই এসেছে,
আম বাগিচার তলায় যেন তারা হেসেছে।

(বনভোজন, আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি, পৃ. ৬। ইত্যাদি)।

সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে। তিনি 'সাহিত্যিক' (১৯২৭, মোহাম্মদ ওয়াকুব আলী চৌধুরীর সাথে যৌথ সম্পাদনা, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মাসিক মুখপত্র), পুরবী (১৩৭৬, মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সাথে যৌথ সম্পাদনা, পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র), লেখক সংঘ পত্রিকা (সম্পাদনা), নওবাহার (কবির সার্বিক সহযোগিতায় কবি স্ত্রী মাহফুজা খাতুন সম্পাদনা করতেন) সম্পাদনা করেছেন।।

তিনি করাচীর ইকবাল একাডেমীর আজীবন সদস্য, জীবন সদস্য বাংলা একাডেমী, নির্বাহী সদস্য, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ন্যাশনাল সেন্টার অব পাকিস্তান (ঢাকা), ইসলামিক একাডেমী (ঢাকা), উর্দু বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (লাহোর), জাতীয় উন্নয়ন ব্যুরো, পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি, পাকিস্তান মজলিস, রওনক, পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড প্রভৃতি'র সদস্য ও কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি যশোর সমিতি, (ঢাকা) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। পাকিস্তান স্বাধীন হবার পূর্বে তিনি ছয় বছর তাঁর নিজ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট (চেয়ারম্যান) ছিলেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা 'পি-ই-এন-এর কেন্দ্রীয় পাকিস্তান শাখা এবং পূর্ব পাকিস্তান শাখার তিনি ছিলেন অন্যতম কর্মকর্তা।

www.pathagar.com

তিনি ১৯৪৫ সালে ঢাকা ও কলকতার মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী ও মুসলিম বেঙ্গল প্রেস স্থাপন করেন।

যশোরবাসীর পক্ষ থেকে ১৯৫১ সালে তাঁকে 'কাব্য সুধাকর' উপাধি, ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পুরস্কার Pride of performance লাভ, ১৯৬০ সালে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 'সিতারা ই ইমতিয়াজ খেতাব', ১৪০৪ হিজরীতে কবিকে মরণোত্তর ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

৮ই অক্টোবর ১৯৬৪ সালের দিবাগত রাতে মুসলিম বাংলার জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা হঠাৎ সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হন এবং পক্ষাঘাত গ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৩ই অক্টোবর ১৯৬৪ সালের দিবাগত রাত ১১ টার সময় ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযার ইমামতি করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁকে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল -জুন ২০০৩

ইসলামে খেলাধুলা, শরীর চর্চা ও বিনোদন

আবদুল্লাহ আল-মারুফ*

ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। মানুষের সহজাত প্রকৃতি, মানবিক প্রয়োজন ও আবেদনকে এ ব্যবস্থায় এমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, এখানে কোন সংঘাতের অবকাশ নেই। এর কারণ হলো, ইসলামী জীবন বিধান আর বিশ্বপ্রকৃতি একই স্রষ্টার সৃষ্টি। এ জন্যই মহান সৃষ্টিকর্তার কোন সৃষ্টির মধ্যে অসঙ্গতি বা ফিতরাত বিরুদ্ধ কিছু পাওয়া যায় না। সব কিছু পরস্পর সম্পূরক। আর এটাই তো স্বাভাবিক। কিসে মানুষের মঙ্গল ও অমঙ্গল তা মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। এই চিরন্তন সত্যের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَا للَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ-

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না ? তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী ও সবজান্তা।"[১]

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি সৃষ্টজীবের স্বাভাবিক আবেদনকে পূরণের জন্য সকল প্রয়োজনের আয়োজন রেখে দিয়েছেন। এ কথারই প্রমাণ মেলে মহানবী (সা)-এর বাণীতে : فكل ميسر لما خلق له-"যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজসাধ্য করা হয়েছে।"[২]

প্রতিটি বস্তুই তার অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য তার নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। প্রকৃতির আবহ ও অনুষঙ্গের সাথে কোন গরমিল ও সংঘাত সৃষ্টি হয় না। মানব প্রকৃতিও এর বাইরের কোন অসংলগ্ন বিষয় নয়।

ঠিক এ কারণেই মানুষের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক আবেদনকে ইসলাম অস্বীকার বা অবজ্ঞা করেনি। বরং তাকে বিকশিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিয়ন্ত্রিত করেছে। মানুষের প্রাত্যহিক ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় নানা চাহিদা থাকে, কিছু শারীরিক, কিছু তো মানসিক। এর মধ্যে খেলাধুলার বিষয়টি এসে যায়। খেলাধুলা কি ইসলামে উৎসাহিত নাকি নির্বাসিত ? এ ক্ষেত্রে একটি সাধারণ সূত্র হলো—যে সব খেলা কেবল সময় পার করে দেওয়ার জন্য, বরং বলা যায় সময় নিধনের জন্য, যাতে কোন মহান লক্ষ্য বা উপকারী উদ্দেশ্য নেই, সে সব খেলাধুলাকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি শরীর চর্চা ও সুস্থ বিনোদনের উদ্দেশ্যে যে সব ক্রীড়া নিবেদিত তা উৎসাহিত করেছে।

এই শ্রেণীর ক্রীড়ার মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছে- এথলেটিক, বর্শা নিক্ষেপ, দৌড় ইত্যাদি। এই ধরনের ক্রীড়া ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা)-এর নির্দেশনাতেই উৎসাহিত হয়েছে। মহানবী (সা) বলেছেন :

"ليس من اللهب إلا ثلاث : تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه، فانهن من الحق"

"বাহ্যত উদ্দেশ্যহীন খেলাধুলার মধ্যে কেবল তিনটি বিবেচ্য ঃ ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিজ পরিবারের সাথে বিনোদন করা এবং তীর-ধনুক দিয়ে শুটিং করা, কারণ এগুলো বাস্তব বিষয়।"[৩]

---

* গবেষক, লেখক ও প্রাবন্ধিক।

১. সূরা আল-মুলক্ : ১৪

২. ইবন আসীর, *আন- নেহায়া ফি গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬। উসূলুত তারবিয়াহ আল-ইসলামিয়াহ, পৃ. ১০২।

৩. উক্‌বা ইবন আমির থেকে আবু দাউদও তিরমিযীর হাদীসটি বর্ণনা করেন। ড. ওয়াহাবাহ আয যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, খণ্ড ৫, পৃ. ৭৮৭।

www.pathagar.com

এখানে বিষেশভাবে লক্ষণীয় যে, বর্ণিত তিনটি ক্রীড়া মূলত প্রতিনিধিত্বমূলক। এগুলোর ওপর কিয়াস করে এ শ্রেণীর অন্যান্য ক্রীড়া ও বিনোদনকে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা একটি বাস্তব প্রয়োজনের আয়োজন করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لاَتَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ.

"তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত রাখবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে, এ ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদের জানেন ; আল্লাহ্র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।"[৪]

এই আয়াতে "কুয়্যাত" (শক্তি)-এর ব্যাখ্যায় মহানবী (সা) বলেছেন ঃ এ হচ্ছে রমি—তীর, বর্শা ইত্যাদি নিক্ষেপ (শুটিং)।"[৫]

قا ل رافع بن خديج : "كنا نصلّى المغرب مع النّبى ﷺ فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله"

"রাফি' ইবন খাদীজ (রা) বলেন, আমরা মহানবী (সা)-এর সাথে মাগরিব পড়তাম, তারপর আমাদের কেউ কেউ নামায শেষ করে তার তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ার স্থানটি দেখতে পেত।"[৬]

হাদীসে বিষয়টিকে তাদের প্রাত্যহিক অনুশীলনের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ জন্যই ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেছেন ঃ চারটি ইভেন্ট টাকার বিনিময়ে হলেও প্রতিযোগিতা করা জায়িয- ১. তীর ও বর্শা নিক্ষেপ, ২. ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর দৌড় ৩. উট, গরু, মহিষ ইত্যাদির দৌড় এবং ৪. পায়ে দৌড় প্রতিযোগিতা। কারণ এগুলো যুদ্ধের প্রস্তুতি।[৭]

বলা বাহুল্য, এগুলো প্রথমত নিজের শারীরিক ফিটনেসের জন্য সহায়ক এবং দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের জন্য প্রথমেই শক্তিশালী দেহ প্রয়োজন।

এ ছাড়া মহানবী (সা) বিশেষ পরিচর্যায় প্রশিক্ষিত ও সাধারণ ঘোড়ার মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন।[৮] দু'টি দলের মধ্যে প্রথমোক্ত দলটি হাইফা থেকে সানিয়াতুল ওয়াদা' দ্বিতীয়টি সানিয়া থেকে মসজিদে বনী যুরাইক পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

এর ওপর কিয়াস করে সাঁতার, নৌকা বাইচ ইত্যাকার প্রতিযোগিতাসমূহ জায়িয।

মহানবী (সা) কোন মল্লযোদ্ধা হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেন নি। কিন্তু আরবের সেরা কুস্তিগীর 'রুকানাহ' যখন তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বলল যে, যদি তিনি তাকে হারাতে পারেন, তাহলে সে ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন তিনি তাকে কুস্তিতে হারিয়ে দেন।[৯]

---

৪. সূরা আনফাল, : ৬০

৫. উকবা বিন 'আমের সূত্রে ইমাম মুসলিম ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। *নাইলুল আওতার*, ৮/৮৫, *সুবুলুস্-সালাম*, ৮/৭১।

৬. *বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০, দারুল ফিকর

৭. *আল-ফিকহুল ইসলামী*, খণ্ড, ৫, পৃ. ৭৮৭

৮. ইবনে 'উমর (রা) থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, النبى ﷺ سابق بين الخيل المضمرة وبين التى لم تضمر" *সুবুলুস-সালাম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৮৭।

৯. মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন রুকানাহ সূত্রে আবু দাউদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

www.pathagar.com

এটি গর্হিত কাজ হলে কখনও তিনি এ কাজে অবতীর্ণ হতেন না।

মহানবী (সা) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এক চাঁদনী রাতে আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেন। ইতিপূর্বে তাঁর দেহ কিছুটা ভারী হয়ে যাওয়াতে একবার দৌড় প্রতিযোগিতায় আয়েশা (রা)-এর কাছে হেরে যান। পরে তিনি জিতে যান এবং বলেন, এটা আগের পরাজয়ের প্রতিশোধ।[১০]

অপর এক হাদীসে জানা যায়- মহানবী (সা) একবার চলার পথে কিছু সংখ্যক সাহাবীকে দেখেন যে, কে বেশী শক্তিশালী তা প্রমাণ করার জন্য তারা পাথরের ভার উত্তোলন করছিল, কিন্তু মহানবী (সা) তাদেরকে বারণ করেননি।[১১]

এতে প্রমাণিত হয় যে, যে সকল ক্রীড়ায় অযথা সময় নষ্ট হয় না বা কারও কোন ক্ষতি হয় না বরং এতে নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, তা ইসলাম অনুমোদন করে। কারণ, ইসলাম প্রকৃতির বিরুদ্ধে যায় না।

এ প্রসঙ্গে অনেকে বলে থাকেন যে, যে সব ক্রীড়ায় হারজিত বা গোল নেই, সেগুলো জায়িয। এ কথাটি ব্যাখ্যার দাবী রাখে। কারণ কোন গোল বা লক্ষ্যকে সামনে না রাখলে কোন খেলা এমনকি কোন কাজই জমে ওঠে না। সাময়িক এ হারজিত স্থায়ী কোন শত্রুতার জন্ম দেয় না। এক্ষেত্রে জুয়ার মত বাজি ধরা হচ্ছে নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হলে তা বৈধ।

কাজেই ইসলামের কোন নির্দেশ বা অনুশাসনের ব্যাঘাত না ঘটলে যে কোন খেলাধুলাই হতে পারে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার সহায়ক।

মহানবী (সা) বলেছেন ঃ المؤمن القوى خير وأحب من المؤمن الضعيف "শারীরিকভাবে শক্তিশালী মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দুর্বল মু'মিন ব্যক্তি অপেক্ষা প্রিয়তর ও উত্তম।"[১২]

যে সকল নির্দোষ খেলাধুলা ব্যক্তির শরীর গঠন ও শারীরিক শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিতে সহায়ক তা এ হাদীসের আওতায় উৎসাহিত করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা)-এর এই বিখ্যাত বাণীগুলো বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

১. الصحة نعمة كبرى 'স্বাস্থ্যই শ্রেষ্ঠ নিয়ামত।'

২. পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের আগে সুবর্ণ সুযোগ মনে করবে। এর একটি হচ্ছে- "তোমার অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে সুস্থ থাকার সময়টি।"

কাজেই যে সকল অঙ্গ-সঞ্চালনমূলক ক্রীড়া ব্যায়ামের পর্যায়ে পড়ে এবং শারীরিক সুস্থতার সহায়ক, তা অবশ্যই নির্মল বিনোদন, যা ইসলাম অনুমোদন করে।

বিনোদন

ইসলাম চিত্ত-বিনোদন বিষয়টিকে হালকা করে দেখেনি। মহানবী (সা) বলেছেন : "তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, তোমার দর্শনার্থীদের অধিকার রয়েছে।"[১৩]

---

১০. قالت عائشة رضى الله عنها " سابقنى رسول الله ﷺ فبقتة، فلبثنا حتى إذاارهقنى اللحم سابقنى، فسبقنى، فقال هذه بتلك" উরওয়া ইবন সাবীহ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন- আহমদ, আবু দাউদ, শাফিঈ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ও বায়হাকী (র)।

১১. *আল-ফিকহুল ইসলামী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৮৭

১২. *আল-মুনযেরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, আবদুর রহমান আল কালাবী, উসূলুত তারবিয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, দারুল ফিকর পৃ. ১০৬।

১৩. ড. ইউসুফ আল কারদাবী, *আল-ইবাদাহ ফিল ইসলাম*, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত: পৃ. ১৮৩ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম মুসলিম।

www.pathagar.com

মহানবী (সা) এ কথাটি বলেছেন যুবক সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন 'আসকে, যিনি নব বিবাহিত স্ত্রীকে ফেলে রেখে নফল নামাযের জন্য মসজিদে পড়ে থাকতেন।

বিনোদনের নানা মাত্রা রয়েছে। বয়সের ভিন্নতায় বিনোদনেরও হয়ে থাকে রকমফের। যেমন এক শিশু সাহাবী (হযরত আনাসের ছোট ভাই) একটি বুলবুলি খাঁচায় পুষে আনন্দ করতেন। হঠাৎ সেটি মরে যাবার পর মহানবী (সা) তার বাসায় গিয়ে পাখিটিকে না দেখে আদুরে কণ্ঠে ছড়া কাটলেন : يا با عمير ما فعل نغير "হে আবু উমায়ের ! কি করিল নুগায়ের।"[১৪]

নুগায়ের অর্থ বুলবুলি। (তবে আল্লামা আবদুর রহমান নাহলাবী (র) বলেছেন, এটি একটি পাখির নাম, যার সাথে তিনি খেলতেন।[১৫]

এখানে মহানবী (সা) শিশুর সাথে তার মতো করে বললেন। এ ছিল আনন্দ ও বিনোদনেরই বহিঃপ্রকাশ। একবার সাহাবী আকরা ইবন হারিস (রা) মহানবী (সা)-কে দেখলেন যে, তিনি তাঁর পৌত্র হাসান (রা)-কে চুমু খেলেন, তখন ঐ সাহাবী অবাক হয়ে বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে তাদের তো একবারের জন্যও চুমু দেইনি। তখন মহানবী (সা) তার দিকে তাকিয়ে বললেন : من لا يرحم لا يرحم-"যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।"[১৬]

মহানবী (সা) তাঁর নাতি-হাসান ও হুসাইন (রা)- কে আদর করতেন, কোলে নিতেন, তাদের সাথে আনন্দ করতেন। একবার মহানবী (সা) ঘোড়ার মত সেজে হুসাইন (রা)- কে পীঠে তুলে মসজিদে নব্বীর একপাশ থেকে আরেক পাশে ঘুরেছেন।

মহানবী (সা)-এর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম সম্পর্কে কে না জানে। তাঁর মত একজন নবী যদি শিশুদের সাথে এরূপ স্নেহময় অনুপম ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে আমরা আমাদের শিশুদের সাথে কেন উত্তম ব্যবহার করব না ?

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, মহানবী (সা) তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর সাথে দাম্পত্য জীবন শুরু করেন তাঁর নয় বছর বয়সের সময়। এ সময় তিনি তাকে কিছু পুতুল কিনে দিয়েছিলেন খেলার জন্য।[১৭]

মহানবী (সা) তাঁকে এ বয়সে বিবাহ করেছিলেন মহান আল্লাহর এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য। পক্ষান্তরে মহানবী (সা) তাঁর বয়সের স্বাভাবিক প্রবণতাকে অবজ্ঞা করেননি।

মহানবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের সাথে হাস্য-রসিকতা করতেন। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র) একটি হাদীস বর্ণনা করেন :

عن ابن أبى مليكة قال مزحت عائشة رسول الله ﷺ فقال امها يا رسول الله بعض دعابات هذا الحى من كنانة قال النبى ﷺ بل بعض مزاحنا هذا الحى.

ইবন আবু মুলাইকা (র) বলেন, আয়েশা (রা) একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বসে রসিকতা করলেন। তখন তাঁর মা বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মহল্লার কিছু কিছু চুটকি কেনানা গোত্র থেকে

---

১৪. *সহীহ আল-বুখারী,* কিতাব আল-আদব, বাব-আল এনবেসাত ইলান নাস।

১৫. *সহীহ বুখারী* খণ্ড ৪, পৃ. ৩৬ (মিসরের উসমানী প্রেস থেকে প্রকাশিত)

১৬. *আল-বিদায়া ওয়ান- নিহায়া*

১৭. এ প্রসঙ্গে আয়েশা (রা) বলেছেন- فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو "কাজেই তোমরা অল্প বয়সী মেয়েদের খেলাধুলার আবেদনকে মূল্যায়ন করবে।" *সহীহ বুখারী,* কিতাবুন নিকাহ, *সহীহ মুসলিম,* কিতাবুল ঈদাইন, ইমাম নববীর শরাহ-দ্র. খণ্ড ৬, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

www.pathagar.com

এসেছে। তখন মহানবী (সা) বললেন : বরং আমাদের মহল্লাটিই কিছু হাস্য-রসিকতার মূর্ত প্রতীক।[১৮] (হয়তো এখানে মহানবী (সা) চুটকি (دعابات) শব্দটিকে সংশোধন করে রসিকতা (مزاح) শব্দটি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন)।

মহানবী (সা) তাঁর সাথীদের সাথেও মাঝে হালকা রসিকতা করতেন। তবে তা কখনও সত্যকে ছাড়িয়ে যায়নি।

একবার এক সাহাবী মহানবী (সা)-এর নিকট একটি বাহন চাইতে আসে। তখন তিনি তাকে বলেন : আমি তোমাকে বাহন হিসেবে একটি উটনীর বাচ্চা দিচ্ছি। লোকটি বলে উঠলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি উটের বাচ্চা দিয়ে কি করব! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আরে! উটনী কি বাচ্চা ছাড়া কিছু প্রসব করে? (অর্থাৎ আজকের বয়স্ক উটটি তো একদিন কোন না কোন উটনীর পেট থেকে বাচ্চা হয়েই জন্ম নিয়েছিল)।[১৯]

আরেকবার তিনি এক বৃদ্ধাকে দেখে বললেন ঃ "বৃদ্ধারা বেহেশতে যাবে না। বৃদ্ধা তো এ শুনে কেঁদে খুন। তখন মহানবী (সা) বললেন : বেহেশতে যখন যাবে তখন যুবতী হয়েই যাবে।"

লক্ষণীয়, মহানবী (সা) মিথ্যা বলে কাউকে হাসাতেন না। সত্য কথাকেই বিনোদনের নিগড়ে প্রকাশ করতেন মাত্র।

একবার মহানবী (সা) তাঁর মসজিদে ইথিওপিয়ান নিগ্রোদের যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে খেলার অনুমোদন দিয়েছিলেন—বিনোদনের জন্য। তখন মহানবী (সা)-এর কাঁধে ভর দিয়ে গালে গাল লাগিয়ে আয়েশা (রা) তা দেখছিলেন। তিনি তাদেরকে এ বলেও উৎসাহ দিচ্ছিলেন- دونكم يا بنى أرفدة তোমাদের পেছনে.....হে বনী আরফেদাহ।[২০]

বনী নাজ্জার থেকে একখণ্ড জমি কিনে মহানবী (সা) মদীনায় মসজিদ নির্মাণের সময় সাহাবীরা ইট ও মাটি বহনের সময় ক্লান্তি দূর করার জন্য কবিতা আবৃত্তি করছিলেন :

اللهم لا عيش إلاعيش الآخرة ★ فارحم الانصار والمهاجرة[২১]

"হে আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই আসল জীবন। আপনি আনসার ও মুহাজিরদের উপর রহম করুন।"

এ ছাড়া বিনোদনের উদ্দেশ্যে কবিতা পাঠের আসর বসত মদীনা শরীফে। তিনি নিজে বহু কবিতা শুনেছেন। এমনকি 'বানাত সুআদ' কবিতাটির জন্য কবি কাব বিন যুহাইরকে তাৎক্ষণিকভাবে গায়ের পবিত্র চাদর (বুরদাহ) উপহার দিয়েছিলেন।[২২]

বিনোদন বলতে সহজভাবে আমরা বুঝি নিজের বা অপরের মনে আনন্দের সঞ্চার করা। মানুষের হৃদয়ে আনন্দ সৃষ্টি করার মধ্যে যে বিরাট সওয়াব রয়েছে, তা মহানবী (সা)-ই আমাদের জানিয়েছেন :

أحب الأعمال إلى الله عزَّ وجلَّ سرور تدخله فى مسلم.

"কোন মুসলিম নর-নারীর মনে আনন্দের সঞ্চার করা হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ।[২৩]

মহানবী (সা) অপর এক বাণীতে বলেন :

ما أدخل رجل على مؤمن سروراً الا خلق الله عزّ وجلّ ذالك السرور ملكا يعبد الله عزوجل

১৮. ইমাম বুখারী প্রণীত *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুচ্ছেদ ১৩৩, হাদীস নং ২৬৫।
১৯. আল আদাব আল-মুফরাদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৬৬
২০. *সহীহ মুসলিম*, খণ্ড ৩, কিতাবুল ঈদাইন
২১. বুখারী, কিতাবুস্ সালাত
২২. ইবন হিশাম, *সীরাতুন্নবী (সা)*, ৩/৫০৩
২৩. তাবরানী, *আল-মুনযেরী, আত্তারগীব ওয়াত্ তারহীব*, কায়রো, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৫০

www.pathagar.com

ويوحده، فإذا صار العبد فى قبره أتاه ذالك السرور فيقول : أما تعرفني؟ فيقول له من أنت؟ فيقول : أنا السرور الذى آدخلتني على فلان أنا اليوم أونس وحشتك، وألقنك حجتك واثبتك بالقول الثالث، وأشهدك فشهدك يوم القيامة، وأشفع لك ربى ربك وأريك منزلك من الجنة- رواه أبى الدنيا وابو الشيخ فى كتاب الثواب-

"যখন কোন ব্যক্তি কারো মনে কোন আনন্দের সঞ্চার করে তখনই আল্লাহ্ তা'আলা এ আনন্দটির পুরস্কারস্বরূপ একজন ফিরিশতা সৃষ্টি করেন, যিনি তাঁর ইবাদত ও তাওহীদে মশগুল হয়ে যান। যখন ঐ বান্দা কবরস্থ হয়, তখন সেই আনন্দটি ফিরে এসে বলে, আমি আপনার সেই আনন্দ যা আপনি অমুকের মনে সঞ্চার করেছিলেন। আমি আজ আপনার ভয় বিহ্বলতার সময় সঙ্গে দেব, আপনাকে যুক্তিপূর্ণ উত্তর স্মরণ করিয়ে দেব এবং দৃঢ়বাক্যে আপনাকে অবিচল রাখব। আমি কিয়ামতের দিন আপনার সাথে উপস্থিত থাকব এবং আপনার জন্য আপনার কাছে সুপারিশ করব এবং বেহেশতে আপনার আবাসস্থল দেখিয়ে দেব।"[২৪]

আনন্দিত হওয়া বা হাসতে ইসলাম বারণ করেনি। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের লক্ষ্য করে পাক কুরআনে বলেছেন :

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

"তারা যেন কম হাসে এবং বেশী কাঁদে, এটা তাদের কর্মের প্রতিদান স্বরূপ।"[২৫]

কিন্তু অনেকে না বুঝে মু'মিনদের এ আয়াত শুনিয়ে সব সময় চিন্তা ক্লিষ্ট রাখতে চায়। দেখা যায়, অনেকেই মুখ গোমড়া করে রাখাকে বুযুর্গি মনে করে থাকেন। অথচ মহানবী (সা) বলেছেন :

لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق-

"কোন ভাল কাজকেই তুচ্ছ মনে করো না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে দেখা করাকেও।"[২৬]

আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন :

تبسمك فى وجه أخيك لك صدقة

"তোমার ভাইয়ের অবয়ব লক্ষ্য করে তোমার স্মিত হাসিও তোমার একটি সাদকা হিসেবে গণ্য হয়।"[২৭]

তাছাড়া, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেওয়া নিয়ামতের নিশানা বান্দাহর মধ্যে দেখে খুবই খুশি হন। মহানবী (সা) বলেছেন : إن الله يسره أن ينظر اثر نعمته على عبده -"বান্দাহর মধ্যে নিজ নিয়ামতের চিহ্ন দেখে আল্লাহ তা'আলা খুশী হন।" পবিত্র কুরআনের এসেছে : وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ -"আর আপনি আপনার রবের নিয়ামতকে প্রকাশ করুন।"[২৮]

আল্লাহর দেওয়া নি'য়ামত—সুরেলা কণ্ঠে যদি উঠে আসে কোন গান, বা মূলত নির্দোষ বক্তব্যের কবিতা, তা ইসলাম নিষেধ করে না। তবে অশ্লীল গান-বাজনা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

---

২৪. আল-মুনযেরী (রহ) ইবনে আবিদ দুনইয়া থেকে বর্ণনা করেন। *আত-তারগীব*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৫১

২৫. সূরা তাওবা : ৮২

২৬. *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৬২৬

২৭. *তিরমিযী* (১৯৫৬) : *ইবনে হিব্বান* ; *বুখারী*, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৩০৭। আল-মুনযেরী, *আত-তারগীব*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৬৯, কায়রো : হাদীস নং ৩৯৬৯।

২৮. সূরা আদ্‌দোহা

www.pathagar.com

মহানবী (সা) শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা ও বিনোদনের স্বাভাবিক আবেদনকে কখনো প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং তাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

সহীহ বুখারীতে সঙ্কলিত একটি হাদীসে আয়েশা (রা) বর্ণনা করেলেন :

دخل على رسول اللّٰه ﷺ وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه، فدخل أبو بكر، فانتهرنى وقال : مزمار الشيطان عند رسول اللّٰه ﷺ فاقبل عليه رسول اللّٰه ﷺ فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا.

"মহানবী (সা) আমার ঘরে এলেন, তখন দুটি কিশোরী বু'আস যুদ্ধের গান গাইতেছিল। তখন তিনি বিছানায় শয়ন করলেন এবং নিজের মুখটা ঘুরিয়ে রাখলেন। এ সময় আবু বকর (রা) এলেন। (তিনি মহানবী (সা) লক্ষ্য করেন নি, তাই) আমাকে তিনি শাসিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহর দরবারে শয়তানের বাঁশি! তখন মহানবী (সা) তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ওদেরকে গাইতে দাও। এরপর যখন মহানবী (সা) অন্যমনস্ক হলেন, তখন আমি তাদেরকে ইশারা করলে তারা বেরিয়ে যায়।"[২৯]

এ হাদীসটি এ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ হাদীস। এর বাখ্যা করার বেশ কয়েকটি দিক রয়েছে। স্থানটি ছিল খোদ মহানবী (সা)-এর কক্ষ, কালটি ছিল ঈদের দিন, বাধা দিয়েছেন আবু বকর নিজ মেয়েকে। অনেকটা আদব দেওয়ার ভঙ্গিতে। তাকে থামিয়ে দিলেন মহানবী (সা)। এবার সবাই একসাথে গান শুনলেন। সে গানটি ছিল বিখ্যাত বু'আস যুদ্ধের গান। এইসব অনুষঙ্গ বিচার করলে আমাদের একথা মানতেই হয় যে, মহানবী (সা) ছিলেন- জগতসমূহের রহমত। তিনি সকল বয়সের, সকল ফিতরতের ভারসাম্য রক্ষা করে একটি সহজ স্বাচ্ছন্দ জীবনের দিশা দিয়ে গেছেন। কোন বিগতযৌবন পৌঢ় বা বৃদ্ধের নিজ মানসিক ও শারীরিক অবস্থানকে মানদণ্ড বানিয়ে শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতীর স্বাভাবিক আকাঙ্খাকে অবদমিত করেন নি। তাই তো আমাদের সকলের আদর্শ হচ্ছেন মহানবী (সা)।

এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভাল যে, মহানবী (সা) হলেন আল্লাহর রাসূল। তিনি পাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকীম দেখাতে পৃথিবীতে এসেছিলেন। শৈশবে মাতাপিতা হারা, যৌবনে দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটানো এবং পরবর্তীতে নবুয়াতের অভিষেকের পরে দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে সীমাহীন শত্রুতার কবলে পড়েছেন, হিজরত করেছেন। সাহাবীদের পুনর্বাসন ও যুদ্ধের পর যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়েছিল কাফিরদের আক্রমণের মুখে। এমনি একটি পরিবেশে আমরা মহানবী (সা)-এর মত মহাপবিত্র ব্যক্তিত্ব থেকে কীভাবে খেলোয়াড়ের মত খেলাধুলা, ব্যায়াম বীরের মত শরীরচর্চা, অথবা আধুনিক সাংস্কৃতিক ধারায় বিনোদনের নানা মুদ্রা ও মাত্রা আশা করতে পারি! তারপরও উম্মতের জন্য তিনি তাঁর পবিত্র জীবনাচারে যে সব মূল্যবান অনুষঙ্গ রেখে গেছেন এবং ইতিপূর্বে আমরা যে সব আয়াত ও হাদীসের সাথে পরিচিত হয়েছি, তাতে এটা স্পষ্ট যে, তিনি তাঁর উম্মতকে নির্মল খেলাধুলা, প্রয়োজনীয় শরীরচর্চা এবং অনাবিল চিত্তবিনোদনের দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

আগেই বলেছি, ইসলাম মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক চাহিদাকে উপড়ে ফেলেনি বরং সুকুমার বৃত্তিকে লালন করেছে, মানবিক আবেদনকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছে। ইসলাম চিরায়ত, শাশ্বত এক বিজয়ী আদর্শ এবং মহানবী (সা) সর্বযুগে অনুসরণীয় এক অনুপম আদর্শের নাম। এখানে রূঢ় জীবনের বিরস ও বিবর্ণ পথচলাকে উৎসাহিত করা হয়নি। বরং এখানে আনন্দঘন পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনের মাঝে স্রষ্টার প্রেম ও ভালবাসা সন্ধানের এক আশ্চর্য সুন্দর পথ দেখানো হয়েছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল- জুন ২০০৩

আরবী পত্র-পত্রিকা : সৌদি আরব প্রসঙ্গ

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ*

এ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পত্র প্রকাশিত হয় চীন দেশে। বর্ণিত আছে পৃথিবীর প্রথম সংবাদপত্রটি সে দেশে প্রকাশিত হয় খৃস্টপূর্ব ৯১১ সনে। সম্ভবত এটি ছিল সরকারের একটি ঘোষণাপত্র। ইউলিয়ূস কায়জারের সময় খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকে '*Acta Duria*' নামে রোমানরা একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে। সরকারের কার্যাবলী ও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ তাতে প্রকাশিত হত। মতান্তরে এটি খৃ. পূ. ৬৯১ সনে প্রকাশিত হয়। তবে আধুনিক সংবাদপত্র সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় জার্মানীতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ছাপাখানা আবিষ্কারের পর। আর প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র ১৬২২ এবং ফরাসী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৬৩১ খৃ.।[১] তবে মধ্যপ্রাচ্যে খৃস্টীয় উনিশ শতকের পূর্বে কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। আর এ ক্ষেত্রে অন্যান্য আরব দেশগুলোর মধ্যে মিসর অগ্রগামী। সংবাদপত্র আধুনিক নাগরিক সভ্যতার অনুষঙ্গ—ফরাসীরা যা খৃস্টীয় আঠারো শতকের শেষ দিকে সর্বপ্রথম মিসরে নিয়ে আসে। তারা মিসরে অবস্থান কালে (খৃ. ১৭৯৮-১৮০১) "*Decade Egyptienne*" ও "*Currirer d'Egypte*" নামে ফরাসী ভাষায় দু'টি পত্রিকা প্রকাশ করে। কিন্তু মিসর থেকে তাদের চলে যাবার সাথে সাথে পত্রিকা দু'টোও বিলুপ্ত হয়। মিসরে তারা বিচার বিষয়ক যে দিওয়ান প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে '*আত-তানবীহ*' নামেও একটি পত্রিকা ইসমাইল আল-খাশ্‌শাবের সম্পাদনায় প্রকাশ করে—কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বিলি করতো। এটি ছিল সামরিক ও বিচার বিষয়ক একটি পত্রিকা। কিন্তু সত্যিকারভাবে ১৮২৮ খৃস্টাব্দে '*আল-ওয়াকাই আল-মিসরিয়া*' নামে মিসরে প্রকাশিত পত্রিকাটি প্রথম আরবী পত্রিকা। এটিও প্রথমে তুর্কী, পরে তুর্কী-আরবী এবং সব শেষে শুধু আরবী ভাষায় প্রকাশিত হত।[২] মিসরের তৎকালীন শাসক মুহাম্মদ আলী পাশা এটি রিফা'আ বেক তাহ্‌তাবী'র সহযোগিতায় প্রকাশ করেন।[৩]

সিরিয়াতে সংবাদপত্রের প্রকাশনা শুরু হয় আরও পরে। সেখানে কর্মরত খৃস্টান মিশনারীদের হাতেই এর সূচনা হয়। এ কারণে এখানকার প্রথম পত্রিকাগুলো ছিল ধর্মীয়। এগুলোকে সাময়িকী বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, অনিয়মিতভাবে বেশ কিছু দিন পর পর বের হত। আমেরিকান খৃস্টান মিশনারীরা পাদ্রী আলী স্মীথের সম্পাদনায় সর্বপ্রথম ১৮৫১ সনে একটি প্রচারপত্র, অন্য কথায় ধর্মীয় ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। বছরে মাত্র একটি সংখ্যা বের হত। পরে চার মাস পরপর বের হতে থাকে এবং ১৮৫৫ সনে বন্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য আমেরিকান খৃস্টান মিশনারীরাও এমন প্রচারপত্র বের করতো। এর দশ বছর পর ১৮৬৬ সনে সিরিয়ার সবগুলো খৃস্টান মিশনারী সম্মিলিতভাবে একটি মাসিক পত্রিকা বের করে এবং ১৮৭১ সনে তা একটি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।[৪]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাব আল-লুগাহ্ আল-আরাবিয়্যা*, বৈরুত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৮, ২য় খন্ড, পৃ. ৪১১

২. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৪১২

৩. হাসান যায়াত, *তারীখ আদাব আরবি* (উর্দূ). লাহোর : গোলাম আলী এন্ড সন্স. ১৯৬১, পৃ. ৫৯৮

৪. জুরজী যায়দান, ২য় খন্ড, পৃ. ৪১৩

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের শেষের দিকে আরব বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ হতে শুরু করে। এমন কি আমেরিকা প্রবাসী আরবরাও থেমে থাকেনি। তারা '*কাওকাবু আমরিকা*' নামে একটি আরবী পত্রিকা ১৮৯১ সনে নিউইয়র্ক থেকে নাজীব আরাবীলীর সম্পাদনায় প্রকাশ করে। এপর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে একাধিক আরবী সংবাদপত্র প্রকাশ হতে আরম্ভ করে।[৫]

সৌদি আরবে পত্র-পত্রিকা

আরব উপ-দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে সাংবাদিকতার সূচনা, ক্রমোন্নতি ও তার গতিধারা সম্পর্কে কিছু বলা ও লেখা খুবই কঠিন কাজ। এর কারণ কয়েকটি। প্রথমত, তুর্কি ও হাশিমি শাসনামলে যে সব পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল তার সবই হারিয়ে গেছে। তাছাড়া সৌদি আরবে প্রকাশিত প্রথম পর্বের সংবাদপত্রের সংগ্রহ থেকে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, পাবলিক লাইব্রেরী ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিশ্বকোষসমূহ সম্পূর্ণ শূন্য। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ মানুষের জাতীয় প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া। আর কেউ কিছু তার সংগ্রহে রাখলেও কেবল সেই সংখ্যাটি বা সংখ্যাগুলো রেখেছে যাতে তার নিজের কোন লেখা প্রবন্ধ, সমালোচনা বা রচিত কবিতা বা এ জাতীয় কিছু নিকট বা দূর অতীতে ছাপা হয়েছে। তৃতীয়ত, এই সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসবেত্তাদের স্বল্পতা তথা-অনুপস্থিতি। এ বিষয়ে সৌদি আরবের মাত্র চার ব্যক্তি সামান্য কিছু লেখালেখি করেছেন। তারা হলেন : রুশদী মালহাস[৬] মুহাম্মদ হুসায়ন নাসীফ[৭], মুহাম্মদ সাঈদ আল আমূদী[৮] ও 'আবদুল কুদ্দুস আল-আনসারি।[৯] কিন্তু তাঁদের সবার অধ্যয়ন ও লেখালেখি একই ধরণের ও একই ধাঁচের। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বহু বাক্য ও শব্দের মিলও দেখা যায়।

সৌদি তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংবাদপত্র অধিদপ্তর '*সৌদি সাংবাদিকতা*'[১০] শিরোনামে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশের চেষ্টা করেছে কিন্তু তাতেও পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। মূলত তাতে আল-'আমূদী ও

---

৫. প্রাগুক্ত, ৪২৩

৬. একজন ইতিহাসবেত্তা, লেখক ও সাংবাদিক। কনস্টান্টিনোপলের "*জামইয়্যাতু আল-আহদ আল-আরাবি* " নামক সংগঠনের সেক্রেটারী ছিলেন। '*উম্মুল কুরা*' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। তিনি অনেকগুলো গল্পের রচয়িতা। (উমার কাহহালা, *মু'জাম আল-মুআল্লিফীন*, দিমাশক : মাতবা'আতু আত-তারাক্কি, ১৩৮০ হি. ১৩তম খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃ. ৩৮৭)

৭. জিদ্দায় হি. ১৩২১/খৃ. ১৯০৩ সনে জন্ম এবং মৃত্যু মিসরের হি. ১৩৭৯ খ্রি. ১৯৫৯ সনে। প্রথম জীবনে সরকারী চাকরিতে থাকলেও পরবর্তীতে জিদ্দায় 'আরব ব্যবসা কোম্পানী'-এর চেয়ারম্যান হন। '*মাদি আল-হিজায ওয়া হাদিরুহু*' নামে তাঁর একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আছে। (আব্দুল কুদ্দুস আল-আনসারি, *তারীখু মাদীনাতু জিদ্দা*, জিদ্দা : মাতাবি আল-ইসফাহানী, ১৯৬৩, পৃ. ১৯২)

৮. হি. ১৩২৩/খৃ. ১৯০৫ সনে মক্কায় জন্ম। মক্কার 'আল-ফালাহ' বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, দারুণ পাঠ্যাভাস ছিল তাঁর। এ কারণে তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারটি নানা ধরনের পুস্তকে ঠাসা ছিল। কবিতা রচনা করতেন। মিশর থেকে প্রকাশিত '*আল-হিলাল* ' ও '*আল-মুকতাতাফ*' পত্রিকা দু'টিতে তাঁর বহু কবিতা ছাপা হয়েছে। সরকারি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিদেশে অনেক সাহিত্য সম্মেলনে সৌদি আরবের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দীর্ঘ দিন যাবত '*সাওত আল-হিজায*', '*আল-হাজ্জ*' ও '*রাবিতাতুল 'আলম আল-ইসলামী*' জার্নালগুলোর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। (দ্র: বাকরী শায়খ আমীন, *আল-হারাকাতুল আদাবিয়্যা ফী-আল-মামলিকাতিল আরাবিয়্যা আস-সাউদিয়া*, বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৭২, পৃ. ১০৪

৯. হি. ১৩২৪/কৃ. ১৯০৬ সনে মদীনায় জন্ম, সেখানেই পড়ালেখা করেন। সরকারের বিভিন্ন দফতরে কর্মরত ছিলেন। হি. ১৩৫৫/খৃ. ১৯৩৬ সনে মাসিক '*আল-মানহাল*' পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। তাঁর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আছে। (আল-মানহাল, আল-উদাবা' সংখ্যা, খন্ড ২৭, পৃ. ৯১৩)

১০. ৩২ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা। ২৪/৮/১৩৮৩ হি./খৃ. ১৯৬৩ সনে জিদ্দার 'মাতাবিউ দার আল-ইসফাহানী' প্রেস থেকে মুদ্রিত। এতে সংবাদপত্রের ইতিহাস, ব্যক্তি মালিকানাধীন সংবাদপত্রের প্রকাশনা বাতিল এবং প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সংবাদপত্র প্রকাশের ফরমানের কারণ তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

আল-আনসারির গ্রন্থদ্বয়ের কথা ও ভাব প্রকাশ পেয়েছে। লেখক আদীব মুরুওয়াহ্[১১] *'আরবী সাংবাদিকতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'* শিরোনামে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে সৌদি সাংবাদিকতা বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন তাতেও তিনি যে উল্লেখিত সৌদি লেখকদ্বয়ের লেখার সাহায্যে গ্রহণ করেছেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আল-ফিকোন্ট ফিলিপ ডি তাররাযী[১২] তাঁর *'আরবী সাংবাদিকতার ইতিহাস'* গ্রন্থের চতুর্থ খন্ডে সৌদি সাংবাদিকতা সম্পর্কে যতটুকু আলোচনা করেছেন তা একজন পাঠকের জানার চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। তিনিও তাঁর এই গবেষণায় উল্লিখিত সূত্র ও উৎসসমূহ এবং সৌদি আরবের ভিতরে ও বাইরে যে সকল সংবাদপত্র হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়, কিছু সৌদি সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ, বিশেষ গৃহ, অফিস, সৌদি তথ্যমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা *ছাপাখানা ও প্রকাশনার ব্যবস্থাপনা ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা* ইত্যাদিরই সাহায্য নিয়েছেন। তাছাড়া সংবাদপত্রের সাথে জড়িত কিছু কিছু বিশেষ ব্যক্তি, যেমন হামদ আল-জাসির, আবদুল্লাহ ইবন খুমায়স, ফুয়াদ শাকির, আবদুল্লাহ ইবন ইদরীস, আবদুল করীম আল-জুহায়মান, সা'দ আল-বাওয়ারদি, আহমাদ আবদুল গফুর আল-আত্তার, আবদুল কুদ্দুস আল-আনসারি প্রমুখের সাক্ষাৎকারের সাহয্য যেমন নিয়েছেন তেমনিভাবে রিয়াদের সংবাদপত্র অধিদপ্তরের বেশ কিছু দায়িত্বশীল কর্মকর্তারও সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। পূর্বে আলোচিত গবেষণা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে যা কিছু সংগৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যায় এসব গবেষণা কর্ম দু'ভাগে বিভক্ত। ১. তুর্কি শাসন আমলের, অতঃপর হিজাযে হাশেমি শাসন আমলের পত্র-পত্রিকা এবং ২. সৌদি রাজতন্ত্রে পত্র-পত্রিকা। শেষের ভাগটি আবার দু'টি পর্বে বা পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত ব্যক্তি বিশেষের মালিকানাধীন পত্র-পত্রিকা ; দ্বিতীয়ত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পত্র-পত্রিকা।

একথা স্বীকৃত যে, সমাজকে মার্জিত ও সংস্কৃতিবান করতে, সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, জনগণের মতামতকে সঠিক পথে চালিত করতে এবং লেখক, সাহিত্যিক সৃষ্টি করতে, তাদেরকে গড়ে তুলতে পত্র-পত্রিকার প্রয়োজন অপরিসীম। এ প্রয়োজন আরও বড় হয়ে দেখা দেয় যদি সে পত্র-পত্রিকা হয় অধিক কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্ব সচেতন।

পত্র-পত্রিকার এত বেশী গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও হিজাযে ও আরব উপ-দ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে উসমানী খিলাফতের অধীনে থাকাকালে তুর্কি খলীফাগণ এর প্রতি মোটেও গুরুত্ব দেননি। একারণে সে সময় সাধারণভাবে গোটা উপ-দ্বীপ এবং বিশেষভাবে বর্তমানের সৌদি আরব পত্র-পত্রিকার ময়দান থেকে বহু দূরে সরে পড়ে। এভাবে কেটে যায় হিজরী চতুর্দশ শতকের প্রথম সিকি অংশ।

হিজরী ১৩০১ সনে তুর্কি সরকার মক্কা থেকে তুর্কি ভাষায় *হিজায বিলায়তী সালনামা সী* নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করে। অনিয়মিতভাবে হি. ১৩০৯ সন পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সত্যিকার অর্থে এটি কোন সাময়িকী ছিল না, এটাকে বরং একটি সাময়িক পুস্তক বলা যেতে পারে। হিজরী চতুর্দশ শতকের প্রথম সিকি অংশের অধিকাংশ সময় অন্য কোনো আরব দেশের বিশেষ করে মিসরের আরবী পত্র-পত্রিকা হিজাযে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

সৌদি আরব একত্রীকরণের পূর্বের আরবী পত্র-পত্রিকা

এ সময় সংবাদপত্রের বিষয়ে যে সব লেখা-লেখি হয়েছে তা কেবল হিজায কেন্দ্রিক সংবাদ পত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখা যায়। কারণ, সৌদি আরবের অন্যান্য অঞ্চল যেমন—নাজদ, 'আসীর, হায়িল, আল-আহসা-প্রভৃতি তখন অশিক্ষা ও মূর্খতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায়

---

১১. একজন লেবাননী সাংবাদিক। বৈরুতের *আল-হায়াত* পত্রিকায় কাজ কতেন। একজন সুসাহিত্যিক এবং অনেক গুলো গ্রন্থের লেখক। (*আদীব মুরুওয়াহ্, আস-সাহাফাহ্ আল-'আরাবিয়্যা, নাশআতুহা ওয়া তাতাওয়ারুহা*, বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৬১, পৃ. ১০৪)

১২. হি. ১২৮২/খৃ. ১৮৬৫ সনে। বৈরুতে জন্ম এবং মৃত্যু হি. ১৩৭৫/খৃ. ১৯৬৫ সনে। তিনি অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রেখে গেছেন। (*মু'জাম আল-মুআল্লিফীন*, ৮ম খন্ড, পৃ. ৮৯)

www.pathagar.com

হিজাযের অবস্থা ছিল ভিন্ন। তাই তুলনামূলকভাবে এখানে অন্যান্য অঞ্চলেরর আগে সংবাদ পত্রের প্রকাশ ঘটে। এ সময়কালের সংবাদ পত্রের আবার দু'টি রূপ ও পর্যায় দেখা যায় : তুর্কি ও হাশিমি যুগ। তুর্কি যুগের পরিধি হলো হি. ১৩২৬/খৃ. ১৯০৮ সনে উসমানী সংবিধান ঘোষণার পর থেকে হি. ১৩৩৪/খৃ. ১৯১৬ সনের 'মহান আরবী বিপ্লব' বলে খ্যাত শরীফ হুসায়নের বিপ্লবের মধ্যবর্তী সময়কাল। হি. ১৩২৬/খৃ. ১৯০৮ সনকে পত্র-পত্রিকার সাথে হিজাযের সত্যিকার অর্থে প্রথম পরিচয় বলে ধরা হয়। এই তুর্কি আমলে হিজায থেকে মোট ছয়টি পত্রিকা প্রকাশ পায়। হি. ১৩২৬ সনে মক্কা থেকে প্রকাশিত হয় *'হিজায '*। হি. ১৩২৭ সনে মক্কা থেকে *'শামসুল হাকীক'* একই বছর জিদ্দা থেকে *'আল-ইসলাহ আল-হিজায'*, *'সাফা আল-হিজায'* এবং মদীনা থেকে *'আর-রাকীব'* ও *'আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারা'* প্রকাশ পায়। এর প্রত্যেকটি আরবী ও তুর্কি দু'ভাষায় প্রকাশ পেত। *'হিজায'* ছিল একটি গেজেট টাইপের পত্রিকা এবং তুর্কি সরকারের মুখপত্র। তবে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা প্রকাশের ব্যাপারেও জোর দেয়া হত। তুর্কি আমলের এটাই একমাত্র সংবাদপত্র যা একাধারে সাত বছর প্রকাশিত হয়। মক্কা কেন্দ্রিক শরীফ হুসায়নের বিপ্লবের পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। *'শামসুল হাকীকা'* ছিল *'হিযবুল ইত্তিহাদ ওয়াত তারাক্কী'* দলের মুখপত্র। শরীফ হুসায়নের আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি ঝোঁক থাকার কারণে এটি তাঁর কঠোর সমালোচক ছিল। এ কারণে *'আল-ইসলাহ আল-হিজাযী'*-র ভূমিকা ছিল তার বিপরীতে। এটি শরীফ হুসায়ন ও আরবদের মুখপত্রে পরিণত হয়।[১৩]

এ সময়ের সংবাদ পত্রের সাহিত্য, শিক্ষা ও রাজনীতিগত তেমন গুরুত্ব ছিল না। যেহেতু এগুলো প্রকাশের সাথে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা সংবাদপত্র শিল্পের অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি ছিলেন না, তাই এর মানও তত উন্নত ছিল না। পাঠকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য।

এ সময়কালের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিধি হলো হি. ১৩৩৪/খৃ.১৯১৬ সনে মহান আরবী বিপ্লবের মাধ্যমে শরীফ হুসায়নের ক্ষমতা লাভের সময় থেকে[১৪] হি. ১৩৪৩/খৃ. ১৯২৪ সনে হাশিমি শাসনের অবসানের মধ্যবর্তী এই সংক্ষিপ্ত সময়কাল। এসময় তিনটি পত্রিকা ও একটি সাময়িকী প্রকাশ পায়। *'আল-কিবলা '* ছিল এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পত্রিকা। এটি সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হত। এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৫ শাওয়াল হি. ১৩৩৪/খৃ. ১৯১৬ সনে। এটি ছিল একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক ও সামাজিক পত্রিকা। এর সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন ফুআদ আল-খতীব। অন্য সম্পাদকরা সবাই হিজায ও আরব বিশ্বের বড় বড় লেখক ছিলেন। শরীফ হুসায়ন নিজেই এতে *'ইবন জালা '* ছদ্ম নামে রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেন। তাই ধারণা হয়, এটির প্রকাশনায় বেশ যত্ন নেওয়া হত। হি. ১৩৪৩/খৃ. ১৯২৪ পর্যন্ত *'আল-কিবলা '* পত্রিকাটি সরকারী পত্রিকা হিসেবে বিদ্যমান থাকে। তারপর হিজাযের শাসন ক্ষমতার পট পরিবর্তনের সাথে সাথে এটিও বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়কালে এর মোট ৮৫২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।[১৫] ড. বাকরী শায়খ আমীন উল্লেখ করেছেন।[১৬] 'সত্যি কথা বলতে কি, এই *'আল-কিবলা'* পত্রিকা ছিল সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্র ও রচনা শিল্পের একটি প্রতিষ্ঠান।'

---

১৩. ড. মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন হুসায়ন, *আল আদাব আল-হাদীস, তারীখ ওয়া দিরাসাত*, (রিয়াদ : দারু আবদিল আযীয, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৮), খন্ড-২, পৃ. ২৫

১৪. হি. ১৩৩৬ সনের শাবান/খৃ. ১৯১৬ সনের জুন মাসে শরীফ হুসায়ন তুর্কি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেকে প্রথমে হিজায, পরবর্তীতে গোটা আরবের বাদশাহ্ ঘোষণা করেন।

১৫. হি. ১২৯৮/খৃ. ১৮৮০ সনে লেবাননে জন্ম। তুর্কি শাসন বিরোধী গোপন আরব সংগঠনের সদস্য ছিলেন। এ কারণে তুর্কি শাসক জামাল পাশা তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। তিনি মিসরে পালিয়ে যান। ফিলিস্তীন, মিসর, সুদানে অবস্থানের পর হিজাযে গিয়ে স্থায়ীভাবে থেকে যান। তিনি একজন কবি ছিলেন। তাঁর একটি কবিতার দিওয়ান আছে। (ফুয়াদ আল-খতীব, দিওয়ান আল-খতীব, মিসর : দারুল মা'রিফ ১৯৫৯, পৃ. ৬)

১৬. *আল-হারাকাতুল আদাবিয়্যা ফিল মামলিকা আল-আরাবিয়্যা আস্-সাউদিয়্যা*, পৃ. ১০৮

www.pathagar.com

এই '*আল-কিবলা*' ছিল যেন একটি স্বাধীন মঞ্চ, যেখান থেকে হিজায, আরব বিশ্ব ও প্রবাসের আরব সাহিত্য-সেবীরা তুর্কি, ফরাসি, ইংরেজ ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিপরীতে তাঁদের অনুপম জাতীয় সাহিত্য কর্মের ঘোষণা দিতেন। তাদের রচিত কবিতা বদলে দেয় অথবা তাঁদের লেখার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে দেয় এমন কোন ক্ষমতাবান প্রতিপক্ষের ভয় তাঁদের ছিল না। এ কারণে আরব উপ-দ্বীপের সাহিত্য ও চিন্তা ক্ষেত্রের রেনেসাঁর পশ্চাতে যে সব প্রত্যক্ষ কার্যকারণ বিদ্যমান ছিল তার মধ্যে '*আল-কিবলা*'র ভূমিকা অন্যতম প্রধান বলে মনে হয়।

এ সময়ের হিজাযের অন্য পত্রিকাগুলো চিন্তা ও প্রকাশ-পদ্ধতি কোন দিক দিয়েই 'আল-কিবলা'র মানে উন্নীত হতে পারেনি। এগুলো খুবই দুর্বল ও দায়সারাভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

মক্কা থেকে '*আল-ফালাহ*' পত্রিকাটি হি. ১৩৩৮ খৃ. ১৯১৯ সনে প্রকাশিত হয় এবং মাত্র ৪৬টি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। তেমনিভাবে '*বারীদ আল-হিজায*' পত্রিকাটি মাত্র ৫২টি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। মক্কার কৃষি বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে '*আল-মাজাল্লা আস-যিরাঈয়্যা*' নামে কৃষি ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করে তার মাত্র ২/৩টি সংখ্যা প্রকাশ পায়।

এই পত্রিকাগুলোর দৈন্যদশা ও দুর্বলতার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করলে এর পশ্চাতে বহু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শৈল্পিক, সাহিত্যিক ও চৈন্তিক কার্যকারণ পাওয়া যায়।

মোটকথা, এ সময় একমাত্র '*আল-কিবলা*' ছাড়া হিজায থেকে সত্যিকার অর্থে কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। অনেকে মনে করেছেন এটিরও কোন স্বাধীনতা ছিল না। হাশিমি সরকারের বাধ্যবাধকতার নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল। তবে যাবতীয় দোষারোপ সত্ত্বেও একথাই ঠিক যে, এটিই ছিল সে সময়ের স্বাধীন আরবী পত্রিকা। আর এ পত্রিকাটি যে, হিজায তথা আরব উপ-দ্বীপের সাহিত্য ও চিন্তা জাগরণের অন্যতম ছিল তা মোটেই অস্বীকার করার নয়।[১৭]

সৌদি আরব একত্রীকরণের পর পত্র-পত্রিকা

আবদুল আযীয আলে সাউদ সৌদি আরবের বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রীকরণ করেন।[১৮] ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থা স্থায়ীরূপ নেয়, শান্তি-নিরাপত্তা স্থিতি লাভ করে এবং নব্য প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র সভ্যতার বাহনে পরিণত হয়। সংবাদপত্র পূর্ণতা ও উন্নত আদর্শের দিকে ধাবিত হয়। আর এ পথে চলার সময় সংবাদপত্র কখনও মুখ থুবড়ে পড়েছে, আবার কখনও গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। যাত্রাপথে নানা রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। সব বাঁধা ডিঙ্গিয়ে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়েছে। আজও সৌদি সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা অভিজ্ঞতা অর্জনের পর্যায়ে রয়েছে।

সৌদি সংবাদপত্র দু'টি অভিজ্ঞতা বা দু'টি যুগের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করেছে। ১. ব্যক্তি মালিকানাধীন সংবাদপত্রের অভিজ্ঞতা ও যুগ এবং ২. প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সংবাদপত্রের অভিজ্ঞতা ও যুগ।

ব্যক্তি মালিকাধীন সংবাদপত্রের অভিজ্ঞতা অব্যাহত থাকে প্রায় চল্লিশ বছর যাবত। নির্দিষ্টভাবে তা হলো হি. ১৩৪৩/খৃ. ১৯২৪ থেকে হি. ১৩৮২/খৃ. ১৯৬৩ সনের মধ্যবর্তী সময়কাল। এ সময়ের সংবাদপত্রকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংবাদপত্র বলার কারণ হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সময় প্রকাশিত সংবাদপত্র সমূহের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য একক ব্যক্তির প্রতি আরোপ করা হয়।

এ সময়কালে সৌদি আরবের বিভিন্নস্থান থেকে মোট তেত্রিশটি (৩৩) পত্রিকা-ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশিত হয় '*উম্মুল কুরা*'। ১৫ জুমাদা আল-উলা হি. ১৩৪৩/১২ ডিসেম্বর খৃ. ১৯২৪

---

১৭. হুসায়ন নাসীফ, *মাদী-আল হিজায ওয়া-হাদিরুহু* (কায়রো : মাতবা'আতু খায়র, ১৩৪৯ হি. পৃ. ১০৯)

১৮. এই সমীকরণের প্রক্রিয়ায় ১৭ রাবিউল আউয়াল হি. ১৩৪৩/১৬ অক্টোবর ১৯২৪ সনে সর্ব প্রথম মক্কা দখল করেন এবং ২১ জুমাদা আল-উলা হি. ১৩৫১/২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সনে এক রাজকীয় ঘোষণায় দেশের নাম- 'আল-মামলিকাতুল 'আরাবিয়্যা আস-সা'উদিয়্যা' করার মাধ্যমে তা শেষ করেন। (আমীন আর-রায়হানী, নাজ্দ ওয়া মুলহিকাতুহু, বৈরুত : দার আর-রায়হানী, সংস্করণ-৩, ১৯৬৪, পৃ. ৩৩৬)

www.pathagar.com

সনে মক্কা থেকে প্রকাশিত হয়। এটা পূর্বে বন্ধ হয়ে যাওয়া 'আল-কিবলা'র স্থান পূরণ করে। প্রথম থেকেই এটি সরকারি মুখপত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে, যা আজও অব্যাহত আছে। এর প্রধান সম্পাদক হিসেবে অনেকে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের কয়েকজন হলেন : ইউসুফ ইয়াসীন,[১৯] রুশদী মালহাস, মুহাম্মদ সাঈদ আবদুল মাকসূদ,[২০] আবদুল কুদ্দূস আল-আনসারি, আত্-তায়্যিব আস-সাসী,[২১] প্রমুখ সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ। বর্তমানে 'উম্মুল কুরা" সৌদি আরবের প্রাচীনতম পত্রিকা গণ্য করা হয়।

প্রকাশ ভঙ্গি ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনের মনের দিক দিয়ে 'উম্মুল কুরা' ও 'আল-কিবলা'র তুলনা করলে 'উম্মুল কুরা'কে 'আল-কিবলা'র সামনে নিষ্প্রভ ও দীপ্তিহীন মনে হয়। তবে সংবাদপত্র শিল্পের মানের দিক দিয়ে দু'টিকেই কাছাকাছি ও সমান মনে হয়।

হি. ১৩৪৭/খৃ. ১৯২৮ সনে মক্কা থেকে আশ-শায়খ মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাকী-এর[২২] সম্পাদনায় '*মাজাল্লাতুল ইসলাহ*' নামে একটি জার্নাল-প্রকাশিত হয়। ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিকতার বিষয়টি এতে প্রাধান্য দেয়া হত। প্রথম দিকে ছিল মাসিক, তারপর পাক্ষিকে পরিণত হয়। কিন্তু দু'বছর না যেতেই বন্ধ হয়ে যায়।

হি. ১৩৫০/খৃ. ১৯৩১ সনে জিদ্দা থেকে-'*সাওতুল হিজায*' প্রকাশিত হয়। মুহাম্মদ সালিহ নাফীস, যিনি হাশিমি আমলে জিদ্দার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, জিদ্দা পৌরসভার চেয়ারম্যান হন এবং কেন্দ্রীয় হাশিমি ব্যাংক-এর প্রতিষ্ঠাতা, তারই সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও মালিকানায় এটি প্রকাশ পায়।[২৩] এর প্রথম ও প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন আবদুল ওয়াহ্হাব আশী। তারপরে আরো অনেকে এ দায়িত্ব পালন করেন। যেমন—আহমাদ ইবরাহীম আল-গাযাবী, মুহাম্মদ হাসান ফাকী, মুহাম্মাদ সাঈদ আল-আমূদী, মুহাম্মাদ হাসান আওয়াদ, আহমাদ আস-সুবা'ঈ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। হি. ১৩৫৪/খৃ. ১৯৩৫ সনে এটির মালিকানা '*শারিকাতুত তাব'ই ওয়ান নাশরি*' (আরব প্রকাশনা ও প্রচার কোম্পানী)-এর নিকট হস্তান্তরিত হয়। তারা এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রথমে প্রকাশ করে, তারপর এটি অর্ধ সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধশেষে কাগজের সরবরাহ স্বাভাবিক হবার পর একটি সাপ্তাহিক হিসেবে পুনঃ প্রকাশনা শুরু হয়। তবে পূর্ব নাম পরিবর্তন করে '*আল-বিলাদ আস-সাউদিয়্যা*' রাখা হয়। কিছুদিন পর এটি অর্ধ সাপ্তাহিকী হয় এবং আরও কিছুদিন পর সপ্তাহে তিন দিন প্রকাশ হতে থাকে। হি. ১৩৭৩/খৃ. ১৯৫৩ সনে এটি দৈনিক হিসেবে প্রকাশ হতে আরম্ভ করে এবং হি. ১৩৭৮/খৃ. ১৯৫৮ পর্যন্ত চালু থাকে। অতঃপর '*আরাফাত*' নামক জার্নালটি এর সাথে একীভূত করে দু'টি দৈনিক '*আল-বিলাদ*' নামে প্রকাশ পায়।

হি. ১৩৫৫/খৃ. ১৯৩৬ সনে একটি মাসিক জার্নাল ও একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। প্রথমটি ছিল '*আল-মানহাল*', আবদুল কুদ্দূস আল-আনসারির সম্পাদনায় প্রকাশ পায়। এটি ছিল মাসিক

---

১৯. ইউসুফ ইয়াসীন সিরীয় বংশোদ্ভূত। নাজদে আবাস গড়ে তোলেন। বাদশাহ আবদুল আযীযের ব্যক্তিগত সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। আবদুল হাদীদ আল-খতীব, আল-ইমাম আল-'আদিল, (মাতবা'আতু মুস্তাফা আল-হালাবী, ১৯৫১) খন্ড-১, পৃ. ১২১, ১৩২, ১৪৫, ১৮৭

২০. মুহাম্মদ সা'ঈদ ইবন 'আবদুল মাকসূদ-এর জন্ম মক্কায়। সেখানে পড়ালেখা করেন। '*উম্মুল কুরা*' পত্রিকা ও ছাপাখানার পরিচালক ছিলেন। *ওয়াহয়ুজ-সাহারা* নামে একখানি গ্রন্থ আছে। তিনি তায়িফে মারা যান। (*আল-মানহাল, আল-উদাবা*' সংখ্যা, খন্ড-২৭ পৃ. ৯৫৮)

২১. আত-তায়্যিব আস-সাসী জন্ম হি. ১৩১০/খৃ. ১৮৯২ সনে মদীনায়। মক্কায় শরীফ হুসায়নের সাথে এবং পরবর্তীতে বাদশাহ্ আবদুল আযীযের সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। হি. ১৩৭৮/খৃ. ১৯৫৮ সনে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মদীনায় মারা যান। (উমার আবদুল জাব্বার, *সিয়ার ওয়া তারাজিম মক্কা* : মুওয়াস্সাসাতু মাক্কা, সংস্করণ-২, হি. ১৩৫৮, পৃ. ৮১১)

২২. মুহাম্মাদ আল-ফাকীর, জন্ম মিসরে হি. ১৩০৯/খৃ. ১৮৯০ এবং মৃত্যু কায়রোতে হি. ১৩৭৮/খৃ. ১৯৫৯ সনে। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের প্রণেতা। (*মু'জাম আল-মুআল্লিফীন*, খন্ড-৭, পৃ. ১৭২)

২৩. *তারীখু মাদীনাতি জিদ্দা*, পৃ. ১৮৭

www.pathagar.com

জার্নাল। এতে সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজ বিষয়ক লেখালেখি প্রাধান্য দেয়া হত। রাজনীতি বিষয়ক কোন লেখা এতে ছাপা হত না। '*আল-মানহাল*' প্রথমত মদীনা থেকে প্রকাশ পেত। পরবর্তীতে মক্কায় যেহেতু তুলনামূলকভাবে ভালো ছাপাখানা ও সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল, এ কারণে কিছুদিন পর দফতর মদীনা থেকে মক্কায় স্থানান্তর করা হয়। তারপর আরও পরে জিদ্দায় স্থানান্তরিত হয়। আজও জিদ্দা থেকে প্রতি মাসের শুরুতে এর একটি করে সংখ্যা প্রকাশ হয়ে চলেছে। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে কিছুদিনের জন্য এর প্রকাশনা বন্ধ ছিল। এই '*আল-মানহাল*' -কে সৌদি আরবের প্রাচীনতম সাহিত্য পত্রিকা গণ্য করা হয়। তেমনিভাবে গণ্য করা হয় আরব উপ-দ্বীপের প্রাণকেন্দ্রে সাহিত্য-সংস্কৃতির অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিশেষত আধুনিক যুগে '*আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারা*' পত্রিকাটি মদীনা থেকে প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ পায় ২৬ মুহররম হি. ১৩৫৬/১০ মার্চ খৃ. ১৯৩৭ সনে। এর মালিক ছিলেন দুই ভাই-আলী ও উসমান হাফিজ এবং প্রথম সম্পাদক ছিলেন আমীন মাদানি ও সহযোগী সম্পাদক ছিলেন মুহাম্মাদ যায়দান ও জিয়াউদ্দীন রজব। প্রথম দিকে এটি ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। তারপর সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাগজ সঙ্কটের সময় এর প্রকাশনা কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকে। তারপর এটি দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে দায়িত্বে কিছু রদবদল করা হয়। এক ভাই আলী প্রধান সম্পাদক হন, আর অন্য ভাই উসমান অফিস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

'আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারা' আত্মপ্রকাশের প্রথম দিন থেকে সাহিত্য প্রবন্ধ, গবেষণা ইত্যাদির চেয়ে সংবাদের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। বিশেষত আরব-ইসলামি বিশ্বের সংবাদ সমূহের প্রতি দিয়েছে সর্বাধিক গুরুত্ব। এটি হচ্ছে মদীনা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন।

পরের বছর (হি. ১৩৫৬/খৃ. ১৯৩৭) মুস্তাফা আন্দারকীরি (মৃ. হি. ১৩৮৮/খৃ. ১৯৬৮)-কে '*আন-নিদা আল-ইসলামী*' নামক মাসিক জার্নালটি প্রকাশের অনুমতি দান করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে এটি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর হি. ১৩৬৫/খৃ. ১৯৪৫ সন পর্যন্ত যুদ্ধের কারণে নতুন কোন পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা দেখা যায় না। কাগজ সঙ্কটের কারণে একমাত্র 'উম্মুল কুরা' ছাড়া সকল সাময়িকীর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের পর বিশ্বে শান্তি ফিরে এলে বন্ধ হয়ে যাওয়া পুরাতন সকল পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন-জার্নাল প্রকাশ হতে শুরু করে। সরকারও নতুন নতুন সাময়িকী প্রকাশের অনুমতি দিতে আরম্ভ করে।

হি. ১৩৬৫/খৃ. ১৯৪৫ সনে '*শারিকাতুয যায়ত আল-আরাবিয়্যাতু আল-আমরিকিয়্যা*' (আরব-আমেরিকা তেল কোম্পানী) আরামকো জাহরান থেকে *'Sun and Flare'* নামে ইংরেজি ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে যা আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

হি. ১৩৬৬/খৃ. ১৯৪৫ সনে হজ্জ বিষয়ক অধিদপ্তর, পরবর্তীতে যা 'হজ্জ ও আওকাফ মন্ত্রণালয়' -এ রূপ নেয়, প্রকাশ করে মাসিক '*মাজাল্লাতুল হাজ্জ*'। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন হাশিম যাওয়াবি। তারপর এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-আমূদি। এই মাসিকটির নাম দেখেই বোঝা যায় এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় এবং হজ্জের বিধি-বিধান তুলে ধরা।

পরের বছর ১৯৪৬ সনে '*মাজাল্লাতুল গুরফা আত-তিজারিয়্যা*' (চেম্বার অব কমার্স জার্নাল) প্রকাশিত হয় এবং এটি আজও জিদ্দা থেকে প্রকাশ হয়ে চলেছে। হি. ১৩৪৩/খৃ. ১৯২৪ সনে সৌদি রাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ের পর থেকে হি. ১৩৬৬/খৃ. ১৯৪৬ সন পর্যন্ত প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীগুলোর বর্ণনা হিসেবে আমরা এটা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করি যে, তা-সবই প্রকাশিত হয়েছে রাজতন্ত্রের পশ্চিম অঞ্চল থেকে। হিজাযের এমন কোন বড় শহর পাওয়া যাবেনা যেখানে থেকে এ সময়ে একাধিক পত্রিকা ও জার্নাল-ম্যাগাজিন প্রকাশ হয়নি। জাহরানের আরামকোর ইংরেজি সাময়িকীটি বাদ দিলে রাজতন্ত্রের অন্য

www.pathagar.com

কোন অঞ্চল থেকে এ সময়কালে প্রকাশিত কোনো পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজতন্ত্রের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল-ম্যাগাজিন প্রকাশিত না হওয়া বিস্ময়ের কোনো ব্যাপার নয়। কারণ, পশ্চিম অঞ্চল থেকে অন্যান্য অঞ্চল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক দিয়ে দারুণভাবে পশ্চাদপদ ছিল।

হামাদ আল-জাসির সর্বপ্রথম রাজধানী রিয়াদ থেকে-'*আল-ইয়ামামা*' নামে একটি জার্নাল প্রকাশ করেন। প্রথমে ছিল মাসিক, পরে সাপ্তাহিক হয়। এতে সাহিত্য বিষয়, আরব উপ-দ্বীপের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শহর ও স্থানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা ও পর্যালোচনার প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। হি. ১৩৭৩/খৃ. ১৯৫৩ সন থেকে এটি আজও প্রকাশিত হচ্ছে। এ বছরই জিদ্দা থেকে মাসিক '*মাজাল্লাতুর রিয়াদ*' প্রকাশিত হয়। পরে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। এটি ছিল একটি সচিত্র পত্রিকা। এটাকেই সৌদি আরবের প্রথম সচিত্র পত্রিকা গণ্য করা হয়। এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন মাদানী হামাদ[২৪] এবং পরিচালক ছিলেন আহমাদ-উবায়দ। একই বছর জাহ্‌রান থেকে মাসিক '*কাফিলাতু আয-যায়ত*' প্রকাশিত হয়। আরবী ভাষার এ জার্নালটি প্রকাশিত হয় আরব-আমেরিকা তেল কোম্পানী 'আরামকো'র মালিকানায় এবং তা একইভাবে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন শাকীব আল-উমারি, যার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সায়ফুদ্দীন আশূর। এই জার্নালটির নাম দ্বারাই বোঝা যায় তেল বিষয়ক গবেষণা ও লেখালেখির প্রতি এতে গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে এতে সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক লেখালেখি ছাপানোর প্রতিও সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সাধারণভাবে পত্রিকাটি বিক্রি করা হয় না, বিনা মূল্যে সৌজন্যমূলকভাবে বিশেষ ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানে বিরতরণ করা হয়। সৌদি আরব থেকে যত সাময়িকী প্রকাশিত হয় তার মধ্যে এটির ছাপা, বাধাই, প্রচ্ছদ ইত্যাদি সবচেয়ে বেশী সুন্দর।

হি. ১৩৭৪/খৃ. ১৯৫৪ সনে সৌদি আরবের পূর্ব ও মধ্য অঞ্চল থেকে দু'টি সাময়িকী ও একটি সাপ্তাহিকী প্রকাশিত হয়। আবদুল করীম আল-জুহায়মানের[২৫] সম্পাদনায় দাম্মাম থেকে সাপ্তাহিক '*আখবারুজ জাহ্‌রান*' প্রকাশিত হয়। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন বাস্তবে এটি একটি পাক্ষিকে পরিণত হয়। পরে এর নাম পরিবর্তন করে 'আজ-জাহ্‌রান' রাখা হয়। এক বছর কয়েক মাস পরে এটি বন্ধ হয়ে যায়। এর মাত্র পঞ্চাশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

প্রথম সাময়িকী '*আল-মাজাল্লাতুয যিরাইয়্যা*' কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বধানে বছরে চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হত। দ্বিতীয়টি ছিল '*আল-ফাজরুল জাদীদ*'। দাম্মাম থেকে আহমাদ ইবন ইয়াকুব আশ-শায়খ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় এবং কয়েক মাস পরে বন্ধ হয়ে যায়।

পরের বছর হি. ১৩৭৫/খৃ. ১৯৫৫ সনে দু'টি মাসিক প্রকাশিত হয়। প্রথমটি জিদ্দার বেতার, সংবাদপত্র ও প্রচার বিষয়ক সাধারণ অধিদফতর থেকে '*মাজাল্লাতুল ইযা'আ আস-সাউদিয়্যা*" নামে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি '*মাজাল্লাতুল ইশা'আ*' সা'দ আল-বাওয়ারদির[২৬] মালিকানায় '*খুবার*'[২৭] থেকে মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। মাত্র তেইশটি সংখ্যা প্রকাশের পর হি. ১৩৭৬/খৃ. ১৯৫৬ সনে এটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় এটি বিশেষভাবে আধুনিক সাহিত্য ও সামাজিক বিষয়ের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিত।

---

২৪. মাদানী হামাদ জিদ্দার অধিবাসী। জিদ্দার শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২)

২৫. আবদুল করীম আল-জুহায়মানের জন্ম 'গাসলা' শহরে হি. ১৩৩৩/খৃ.১৯১৪ সনে। পিতার সাথে রিয়াদে চলে আসেন এবং সেখানে স্থায়ী হন। তাঁর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আছে। ('আবদুল্লাহ ইবন ইদরীস, *শু'আরাউ নাজদ আল-মু'আসিরূন*, মিসর : দার আল-কিতাব আল-'আরাবি, সংস্করণ-১, ১৯৬০, পৃ. ১৭০)

২৬. আল-বাওয়ারদী নাজদের 'শাকরা' শহরে হি. ১৩৩০/খৃ.১৯৪৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। নাজদ ও তায়িফে লেখাপড়া করেন। বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। তাঁর গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের অনেকগুলো বই আছে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩)

২৭. *খুবার* সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলের জাহ্‌রানের নিকটবর্তী একটি ছোট্ট শহর।

www.pathagar.com

হি. ১৩৭৬/খৃ. ১৯৫৬ সনে তিনটি সাময়িকী প্রকাশ পায়। প্রথমটি '*মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিত তারবিয়্যা*'। শিক্ষা, শিল্প ও প্রশিক্ষণমূলক লেখালেখি এতে ছাপা হত। দ্বিতীয়টি '*মাজাল্লাতুশ আদওয়া*' ছিল একটি সাপ্তাহিক—জিদ্দা থেকে প্রকাশ পেত। এর সম্পাদক ছিলেন মুহাম্মদ সাঈদ বা'আশন।[২৮] এক বছরের বেশী এর বয়স হতে পারেনি। তৃতীয়টি সাপ্তাহিক '*হিরা*' মক্কা থেকে প্রকাশিত হত। প্রথম থেকে দীর্ঘকাল যাবত এর সম্পাদক ছিলেন সালিহ মুহাম্মাদ জামাল এবং এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিল মক্কার সংস্কৃতি বিষয়ক দফতর। হি. ১৩৭৭/খৃ. ১৯৫৮ সনে এটাকে 'আন-নাদওয়া' নামক আর একটি সাময়িকীর সাথে একীভূত করা হয়। কারণ, এ দুটো সাময়িকী এক সাথে মক্কা থেকে প্রকাশিত হত। এ দু'টো একীভূত হবার পর নতুন নাম হয় '*হিরা*'। কিছু দিন পর নাম পরিবর্তন করে '*আন-নাদওয়া*' রাখা হয় এবং দৈনিকে পরিণত হয়। সম্পাদক হন সালিহ জামাল।

হি. ১৩৭৮/খৃ. ১৯৫৮ সনে দু'টি সাপ্তাহিক ও একটি জার্নাল প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়। এ বছর এক পত্রিকা অন্য পত্রিকার সাথে একীভূত করার জন্য বিশিষ্ট হয়ে আছে। প্রথম সাপ্তাহিকটি ছিল- '*আন-নাদওয়া*' আহমাদ-আস-সুবাঈ-এর মালিকানা ও সম্পাদদনায় মক্কা থেকে প্রকাশিত হয়। শক্ত প্রশাসন ও নির্ভুল রীতি-পদ্ধতি, আন্তর্জাতিক সংবাদ সমূহের ওপর গুরুত্বারোপ, সুন্দর উপস্থাপনা তদুপরি আরব বিশ্বের অন্যান্য নামকরা সাপ্তাহিকগুলোর সমান্তরাল চলার জন্য এটি বিশিষ্ট্য হয়ে আছে। এর মালিক আহমাদ আস-সুবাঈ পত্রিকার মালিকানা সাপ্তাহিক -'*হিরা*'-এর মালিক সালিহ মুহাম্মাদ জামালের নিকট বিক্রি করে দেন। তিনি দু'টোকে একীভূত করে '*হিরা*' নামে প্রকাশ করতে থাকেন। পরবর্তীতে এটি একটি ফাউন্ডেশনে পরিণত হওয়ায় '*আন-নাদওয়া*' নামে আজও এটি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। দ্বিতীয় সাপ্তাহিকটি জিদ্দা থেকে '*আরাফাত*' নামে হাসান কায্যাযের[২৯] সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এটিও "আল-বিলাদ আস-সাউদিয়্যা" সাময়িকীর সাথে একীভূত হয়ে '*আল-বিলাদ*' নামে দৈনিকে পরিণত হয়। এটিও যথেষ্ট শক্তিশালী সাপ্তাহিক ছিল। তৃতীয় জার্নালটি ছিল-'*আল-মারিফা*'। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে রিয়াদ থেকে প্রকাশিত হয়। মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বিষয়ক লেখালেখিতে ভরা একটি শক্তিশালী সাময়িকী হওয়া সত্ত্বেও এর বয়স খুব বেশী হতে পারেনি। কারণ, সরকার রাজতন্ত্রের সকল সাময়িকী বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে এটিও বন্ধ হয়ে যায়।

হি. ১৩৭৯/খৃ. ১৯৫৯ সনে তাহির আস-যামাখ্শারি[৩০] '*মাজাল্লাতু রাওদাতিল আতফাল*' নামে একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন প্রকাশের অনুমতির আবেদন জানালে তাঁকে অনুমতি দান করা হয়। তিনি এটা জিদ্দা থেকে প্রকাশ করেন। এটি ছিল একটি শিশু-কিশোর ম্যাগাজিন এবং সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত এ জাতীয় প্রথম পত্রিকা। চিত্তাকার্ষক রঙ্গিন সব ছবিতে পূর্ণ থাকায় এটি দারুণ সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু সকল সাময়িকী ও জার্নাল-ম্যাগাজিন বন্ধের সরকারী সিদ্ধান্তের কারণে বেশীদিন প্রকাশ হতে পারেনি। এটি ছিল একটি অনন্য শিশু-কিশোর ম্যাগাজিন। আজ পর্যন্ত অন্য কোন শিশু-কিশোর পত্রিকা এর শূন্যতা পূরণ করতে পারেনি। একই বছর আবদুল ফাত্তাহ আবূ মাদীন[৩১] '*আর রাঈদ*' নামক পাক্ষিক জার্নালটির

---

২৮. হি. ১৩৫৩/খৃ. ১৯৩৪ সনে জিদ্দায় জন্ম। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরির সুবাদে রিয়াদে আগমন। এক সময় জিদ্দা পৌরসভার সহকারী হিসাবে কাজ করেন। বেশকিছু লেখালেখি ও বই পুস্তক আছে। (*আল-মানহাল, আল-উদাবা*' সংখ্যা, খন্ড-২৭, পৃ. ৯৫৭)

২৯. হাসান কায্যায জিদ্দায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে সরকারী চাকুরি করেন। পরে ব্যবসাতে আত্মনিয়োগ করেন। (*তারীখু মদীনাতি জিদ্দা*, পৃ. ১৩৫)

৩০. তাহির আস-যামাখ্শারি হি. ১৩৩২/খৃ. ১৯১৩ সনে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে লেখাপড়া করেন। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। পরে বিভিন্ন পৌরসভা, রেডিও এবং সরকারী ছাপাখানাসমূহে বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত সাতটি দিওয়ান (কবিতা) ছাড়াও অপ্রকাশিত আরও কিছু দিওয়ান আছে। (*আল-মানহাল, আল-উদাবা*' সংখ্যা, খন্ড-২৭, পৃ. ৮১৫)

৩১. আবদুল ফাত্তাহ আবূ মাদীনের জন্ম লিবিয়ায়। মদীনায় লেখাপড়া করেন এবং জিদ্দায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সাহিত্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন। সমাজ, সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক লেখালেখি করতেন। সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। '*আমওয়াজ*' নামে তাঁর একটি গ্রন্থ আছে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫১)

www.pathagar.com

প্রকাশনার অনুমতি লাভ করেন। তিনি এটি মাসে দুইবার প্রকাশ করতেন। ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষা বিষয়ক গবেষণাধর্মী লেখা দ্বারা জার্নালটি পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও এটি বেশী দিন টিকে থাকেনি। অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। এ বছরই আহমাদ আস-সুবাঈ যিনি পূর্বে 'আন-নাদওয়া'-এর স্বত্ব ত্যাগ করেছিলেন, তিনি একটি নতুন সাপ্তাহিকের প্রকাশনার অনুমতি লাভ করেন এবং মক্কা থেকে '*কুরায়শ*' নামে একটি সাপ্তাহিক জার্নাল প্রকাশ করেন। সাহিত্য বিষয়ক লেখালেখি ও ছোট গল্প প্রকাশকে অন্য সবকিছু থেকে বেশী প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিতেন। এ বছরই রিয়াদ থেকে আবদুল্লাহ আল-আলী আলে-সানি-এর তত্ত্বাবধানে '*আল-কাসীম*' নামে একটি জার্নাল প্রকাশিত হয়।

হি. ১৩৭৯-৮০/খৃ. ১৯৬০ সনে চারটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। আবদুল্লাহ ইবন খামীস রিয়াদ থেকে-'*মাজাল্লাতুল জাযীরা*' প্রকাশ করেন। প্রথমত এটি মাসিক থাকলেও পরবর্তীতে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। মূল্যবান গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, বিচিত্রমুখী বিষয়বস্তু ও চমৎকার উপস্থাপনার জন্য এটি একটি অনন্য পত্রিকার মর্যাদা লাভ করে। দ্বিতীয়টি মাসিক-'*রায়াতুল ইসলাম*' রিয়াদ থেকে সালিহ ইবন মুহাম্মাদ লুহায়দানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি ধর্মীয় জার্নাল। ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন লেখা এবং মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজদীর বিশ্বাস ও সংস্কার আন্দোলন বিষয়ক লেখা প্রকাশের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হত। সৌদি আরবের সকল পত্র-পত্রিকা বন্ধের সরকারি ঘোষণার আওতায় এটিও সে সময় বন্ধ হয়ে যায়। তৃতীয়টি ছিল '*উকাজ*'। আহমাদ আবদুল গফুর আল-আত্তারের[৩২] মালিকানা ও সম্পাদনায় একটি সাপ্তাহিক হিসেবে তায়িফ থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়। তাঁরপর কার্যালয় জিদ্দায় স্থানান্তর করা হয়। এর মহাপরিচালক ছিলেন আযীয জিয়া।[৩৩] সাহিত্য সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশের জন্য এটি সুপরিচিতি ছিল। তাছাড়া সমাজ, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণাধর্মী লেখাও ছাপা হত। তবে সংবাদ ও রাজনীতির প্রতি গুরুত্ব খুব কমই দিত। পরবর্তীতে নতুন পর্যায়ে মালিকানার পরিবর্তন সত্ত্বেও 'উকাজ' নামটি বলবৎ থাকে। চতুর্থটি ছিল '*মাজাল্লাতুত তিজারাহ্*'। জিদ্দা থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক জার্নাল, '*মাজাল্লাতুল গুরফা আত-তিজারিয়্যা বিজিদ্দা*' (জিদ্দা চেম্বার অব কর্মার্স জার্নাল)-এর পাশা পাশি এটিও ছিল ব্যবসা সংক্রান্ত একটি জার্নাল। এর সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন আহমাদ তাশকিন্দী।[৩৪]

হি. ১৩৮১/খৃ. ১৯৬১ সনে কোন সাময়িকী প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই নতুন কোন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। তবে পরের বছর হি. ১৩৮২/খৃ. ১৯৬২ সনে দু'টি সাময়িকী প্রকাশ পায়। প্রথমটি '*আল-উসবূ আত-তিজারী*' জিদ্দা থেকে প্রকাশিত হয়। মূলত এতে বন্দরে জাহাজের আগমন-নির্গমনের, ব্যবসায়ীর পণ্য খালাসের বিজ্ঞাপন, পণ্য আমদানী-রপ্তানী বিষয়ক খবর প্রকাশের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়া হত। দ্বিতীয়টি ছিল মক্কা থেকে প্রকাশিত '*রাবিতাতু আল-আলাম আল-ইসলামী*'। মক্কাস্থ

---

৩২. আবদুল গফুর আল-আত্তার হি. ১৩৩৭/ সনে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে মক্কায় পরে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্য বিভাগে লেখাপড়া করেন। প্রথম জীবনে সরকারী চাকুরী করেন। পরে চাকুরী ছেড়ে লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। রচনা ও সম্পাদনা মিলে তাঁর চল্লিশটির মত বই আছে। '*উকাজ*' ও '*দাওয়াতুল হক*' নামে তাঁর সম্পদনায় দু'টি সাময়িকী বের হত। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮০)

৩৩. হি. ১৩৩২/খৃ. ১৯১৩ সনে মদীনায় জন্ম। '*আর-রকিয়্যা আর-হাশিমিয়্যা*' ও '*মাদরাসাতুস সিহহা*'য় পড়লেখা করেন। স্বাস্থ্য বিভাগ, জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা দফতর এবং সৌদি এয়ার লাইন্সে চাকুরী করেন। জিদ্দায় 'মধ্যপ্রাচ্য সংস্কৃতি ও প্রচার ফাউন্ডেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং জিদ্দার 'সংবাদপত্র, প্রকাশনা ও প্রচার ফাউন্ডেশন'-এর পরিচালক ছিলেন। '*উকাজ*' ও '*আল-মাদীনা আল-মুনাওয়ারা*' সাময়িকী দু'টির সম্পাদক ছিলেন। অনুবাদক হিসেবে কিছুকাল ভারতেও ছিলেন। দেশে ফিরে বিদেশী নাগরিক পর্যবেক্ষণ দফতরের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। (প্রগুক্ত, পৃ. ৮১৩)

৩৪. আহমাদ তাশকিন্দী নাম দ্বারাই বোঝা যায় তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন তাশকন্দের অধিবাসী। তাঁরা হিজাযে চলে আসেন ও স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। জিদ্দায় লেখাপড়া করার পর দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা পেশায় ছিলেন। তারপর অন্য স্বাধীন পেশায় চলে যান। দীর্ঘদিন যাবত জিদ্দাস্থ চেম্বার অব কমার্স জার্নালের সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। (*আল-হারাকাতুল আদাবিয়্যা ফিল মামলিকাতি আরাবিয়্যা*, পৃ. ১২৩)

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক সংস্থা আর-রাবিতার একটি জার্নাল। মুহাম্মদ সা'ঈদ আল আমূদী 'মাজাল্লাতুল হাজ্জ' সম্পাদনার পাশাপাশি এটিরও সম্পাদনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন। ইসলাম ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হত। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ইসলামী পণ্ডিতগণ এতে লিখেছেন। আজও মাসিক জার্নাল হিসেবে এটি মক্কা থেকে প্রকাশ হচ্ছে।

এগুলোই ছিল সাময়িকী—যার সংখ্যা তেত্রিশটি। ইচ্ছাকৃতভাবে দু'টির প্রকাশনা বন্ধ হয়েছে, বাধ্য হয়ে দু'টি বন্ধ করতে হয়েছে, দু'টি অন্য দু'টির মধ্যে একীভূত করা হয়েছে। অতঃপর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাতাশটি-যা দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। এর মধ্যে পাঁচটি দীন ও ধর্মীয় সেবায় নিয়োজিত, বারোটি রাজনীতি ও সাধারণ সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়েছে, নয়টি ব্যবসা, কৃষি, প্রশিক্ষণ ও শিশু জগতের চার পাশে চক্কর দিয়েছে, আর কেবল একটি সাহিত্যবিষয়ক লেখা-লেখি নিয়ে থেকেছে। অঞ্চল ভিত্তিক ভাগ করলে দেখা যায় ঃ পূর্বাঞ্চলে চারটি, মধ্যাঞ্চলে পাঁচটি এবং পশ্চিমাঞ্চলে চব্বিশটি। (এটি একীভূত ও বন্ধ হয়ে যাবার পূর্বের হিসেবে)।

এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, পত্রিকাগুলো অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনে ব্যর্থ হয়েছে এবং কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়নি। সম্ভবত এ কারণে এ পর্যন্ত প্রকাশিত সকল পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন-জার্নালের প্রকাশনা অনুমতি সরকার প্রত্যাহার করে এবং প্রকাশনা সংক্রান্ত নতুন বিধি-বিধান ঘোষণা করে। যার আলোকে নতুন পত্র-পত্রিকা নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ পায়।

এই সময়কালে ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রকাশিত একক ও স্বতন্ত্র পত্র-পত্রিকার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশীই ছিল বলা যায়। পশ্চিম অঞ্চলে ২৪টি পত্র-পত্রিকা সংখ্যার দিক দিয়ে যে অনেক বেশী ছিল এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই। রিয়াদ শহরের পাঁচটি প্রয়োজনের তুলনায় বেশীই বলা চলে। অথবা একথাও বলা যায় যে, পত্রিকা প্রকাশ করা একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। এ কারণে অতিরিক্ত লাভের আশায় অনেকে এ ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে জনসাধারণের কল্যাণ চিন্তা উপেক্ষিত হয়। অনেকে কেবল বিজ্ঞাপন ও ব্যবসা সংক্রান্ত সংবাদ ও বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শিল্পগত মানের দিক দিয়েও এসব পত্র-পত্রিকা অন্যান্য আরব ও পশ্চিমা বিশ্বের পত্র-পত্রিকার চেয়ে নিম্নে ছিল। তা সে আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক সংবাদের দিক দিয়ে হোক, অথবা হোক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শের ব্যাখ্য-বিশ্লেষণের দিক দিয়ে। অতি তুচ্ছ ও ছোট্ট বিষয়কে গুরুত্বদানের ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারেননি। অনেক সময় শব্দের যের, যবর ও পেশ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের অবতারণা করেছে। এ সব কারণেই সরকার এ জাতীয় পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে নতুন করে পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আসলে এই ব্যর্থতার যথেষ্ট কারণও আছে। পত্র-পত্রিকা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য যে পরিমাণ দক্ষ মানুষের প্রয়োজন ছিল এবং যাদের উপর একজন পত্রিকা মালিক নির্ভর করতে পারতেন তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অপ্রতুল।

তবে এসময়ে যাঁরা পত্র-পত্রিকা প্রকাশের দিকে এগিয়ে আসেন তাঁদের অধিকাংশ খুবই যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা ছিলেন দেশের সাহিত্য ও চিন্তা জগতের নেতৃবৃন্দ। অত্যন্ত সাহস ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে তাঁরা কাজ করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা ও বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁদের অনেকে একাই একটি পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। লেখা বাছাই, সম্পাদনা থেকে ছাপানো, প্রচার ইত্যাদি সব কাজ করেছেন—যা করতে একদল দক্ষ লোকের প্রয়োজন হয়।

তবে সংবাদপত্র ও জার্নাল-ম্যাগাজিনের নানা রকম বিধি-নিষেধ আরোপের ফলে সাহিত্যের অতি চমৎকার উন্নতি ও অগ্রগতি ঘটে। অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে ঠাসা থাকতো, সমালোচনামূলক প্রবন্ধে ভরা থাকতো। গল্প, উপন্যাস, নাটিকা, বিভিন্ন ধরনের কবিতার প্রকাশ ঘটে

www.pathagar.com

ব্যাপকভাবে। ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সাম্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি ছাপা হয়। এই বিপুল পরিমাণের সাহিত্য মানের লেখা পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ফলে সৌদি সাহিত্য পুস্তকের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রত্যেক লেখক, কবি তাঁর নিজ নিজ লেখা সংগ্রহ আকারে, গ্রন্থের আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। এ কারণে কেউ কেউ এ সময়ের পত্র-পত্রিকাকে সাহিত্য-পত্রিকা হিসেবে আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন। তবে একথাও ঠিক যে, পত্রিকার পৃষ্ঠার এ সব সাহিত্যিকরা তাঁদের সাহিত্যের কাঙ্খিত শিল্পরূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের সাহিত্যের শিল্পমান অতি নীচে নেমে গেছে। এসব সাহিত্যিকের ছোট্ট একটি গ্রুপ যখন নিজেদের নাম পত্রিকার পাতায় মুদ্রিত দেখেছেন এবং দেখেছেন তাঁদের লেখা পড়া হয়, সমালোচনা করা হয় তখন তাঁরা মনে করেছেন তাঁদের লেখা উৎকর্ষতার চূড়ায় পৌঁছে গেছে। আত্মতুষ্টিতে তাঁদের অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। তাঁদের প্রতিভার বিকাশ থেমে গেছে। তাঁরা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারেননি।

সংবাদপত্র ফাউন্ডেশন সমূহ

হি. ১৩৮৩ সনের ২৩ জুমাদা আল-উলা (খৃ. ৮/১১/১৯৬৩) মন্ত্রীপরিষদ সৌদি রাজতন্ত্রে বর্তমান সকল ব্যক্তি মালিকানাধীন পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা স্থগিত এবং তদস্থলে প্রাইভেট কোম্পানী অথবা বেসরকারী ফাউন্ডেশন বা প্রতিষ্ঠান গঠনের অনুমতিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের এই নতুন পদক্ষেপের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় বলে : 'সরকার চায় তার দেশের সংবাদপত্র হবে একটি মিশন, কোন ব্যবসা নয়। বস্তুগত লাভ-ক্ষতির উর্ধে উঠে সৌদি জনগণকে মার্জিত করণ, সংশোধন ও জনরায়কে সঠিকভাবে দিক-নির্দেশনা দান এবং জনগণের বুদ্ধি-প্রজ্ঞা ও আবেগ-অনুভূতিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করণের দায়িত্ব পালন করবে। সংবাদপত্র হবে জনগণের সেবক। তা ইসলাম পরিত্যাক্ত ব্যক্তি বিশেষের আনুগত্য ও ব্যক্তি বিশেষের সুবিধার সেবা দান থেকে দূরে থাকবে। দেশে বিদ্যমান বহু অভিজ্ঞ এবং পরিচালনা ও দিক-নির্দেশনা দানে দক্ষ ব্যক্তিদের সহযোগিতা গ্রহণ থেকে দূরে থেকে এক বা দুই ব্যক্তির মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে পত্রিকা প্রকাশ অকল্যাণ থেকে মুক্ত নয়। এ কারণে রাষ্ট্র চায় তার সংবাদপত্রকে শক্তিশালী করতে, তার মানকে উন্নত করতে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার দেশের পত্র-পত্রিকাসমূহকে একটি দল বা গ্রুপ যোগ্য নাগরিকের দায়িত্বে অর্পন করার যাতে তার মিশন সফল হয়। প্রত্যেকটি গ্রুপ বা দল হবে এককটি 'বেসরকারি ফাউণ্ডেশন' বা 'কোম্পানী'। জনস্বার্থ রক্ষার প্রয়োজন না হলে সেখানে সরকারের কোন হস্তক্ষেপ-থাকবে না।'

২৪ শা'বান হি. ১৩৮৩/খৃ. ৪/২/১৯৬৪ সনে 'বেসরকারী সংবাদ পত্র প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডেশন' পরিচালনা বিষয়ক রাজকীয় ফরমান জারি হয়। তাতে শর্ত দেয়া হয়, যে কোন সংবাদপত্র ফাউন্ডেশনের সদস্য হতে হবে অন্যূন ১৫ জন এবং প্রতিষ্ঠা লগ্নে মূলধন থাকতে হবে কমপক্ষে এক লাখ রিয়াল। এই রাজকীয় ফরমানের ভিত্তিতে নিম্নে উল্লেখিত সংবাদপত্র ফাউন্ডেশনগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৫]

১. উকাজ	ফাউন্ডেশন	এর অধীনে জিদ্দা থেকে দৈনিক *উকাজ* প্রকাশ হয়।
২. আন নাদওয়া	"	এর অধীনে জিদ্দা থেকে দৈনিক *আন-নাদওয়া* প্রকাশ হয়।
৩. আল-মদীনা	"	এর অধীনে জিদ্দা থেকে দৈনিক *আল-মদীনা* প্রকাশ হয়।
৪. আল-বিলাদ	"	এর অধীনে জিদ্দা থেকে দৈনিক *আল-বিলাদ* প্রকাশ হয়।
৫. আল-জাযীরা	"	এর অধীনে রিয়াদ থেকে দৈনিক *আল-জাযীরা* প্রকাশ হয়।
৬. আল-ইয়ামামা	"	এর অধীনে রিয়াদ থেকে দৈনিক *আল-ইয়ামামা* প্রকাশ হয়।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

www.pathagar.com

৭. আদ-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যা " এর অধীনে রিয়াদ থেকে দৈনিক *আদ-দা'ওয়াহ আল ইসলামিয়্যা* প্রকাশ হয়।

৮. আল-ইয়াওম লিস-সাহাফা " এর অধীনে দাম্মাম থেকে সাপ্তাহিক *আল-ইয়াওমলিস সাহাফা* প্রকাশ হয়।

সরকার আল-মানহাল, আল-হাজ্জ, মাজাল্লাতু রাবিতাতিল আলম আল-ইসলামী, কাফিলাতু আয-যায়ত ও কুল্লিয়াতু আত-তাররিয়্যা-এই সাময়িকী ও জার্নালগুলোর পূর্বের প্রকাশনা অনুমতি বহাল রাখে। তারপর আরও কিছু নতুন সাময়িকী ও জার্নালের প্রকাশনার অনুমতি দান করে। যেমন হামাদ আল-জাসির-এর মালিকানায় মাসিক '*আল-আরাব*'[৩৬] মক্কাস্থ রাবিতাতুল আলম আল-ইসলামীর মালিকানায় সাপ্তাহিক '*আখবারুল আলম আল-ইসলামী*'। এর সম্পাদক হন ফুয়াদ শাকির।[৩৭] রিয়াদ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির মালিকানায় হি. ১৩৮৬/খৃ. ১৯৬৬ সনে মাসিক '*তিজারাতু আর-রিয়াদ*' প্রকাশিত হয়। আবদুল গফুর আল-আত্তার-এর মালিকানায় মক্কা থেকে '*দাওয়াতুল হক*' প্রকাশ পায়।[৩৮] হি. ১৩৮৮/খৃ. ১৯৬৮ সনে দাম্মাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজের মালিকানায় দাম্মাম থেকে মাসিক '*তিজারাতু আদ-দাম্মাম*' প্রকাশ পায়। সরকার কোন কোন মন্ত্রণালয়কেও নিয়মিত সাময়িকী প্রকাশের অনুমতি দেয়। এগুলো কেবল মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লেখালেখির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন '*মাজাল্লাতু আল-ইয'আ আস্-সা'উদিয়্যা*', '*আল-মাজাল্লাতু আল-মাদরাসিয়্যা*' ইত্যাদি।

সৌদি আরবের প্রকাশনা বিষয়ক মহাপরিদপ্তরের হি. ১৪১৮/খৃ. ১৯৯৭ সনের একটি ইশতিহারে দেখা যায় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক দেশের বিভিন্ন শহর ও অঞ্চল থেকে মোট ৮৫ টি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। তার মধ্যে ১৪টি দৈনিক, ১৩টি সাপ্তাহিক, ৩টি পাক্ষিক, ২৭টি মাসিক, ৪টি দোমাসিক, ১৫টি ত্রৈমাসিক, ১টি চতুর্মাসিক ও ৮টি ষান্মাসিক। ১৪টি দৈনিকের মধ্যে ৩টি ইংরেজি ভাষায়।[৩৯] দুই একটি দৈনিকের প্রভাতী ও সান্ধ্যকালীন সংস্করণও দেখা যায়। দু'একটি দৈনিক ও সাময়িকী যুগপৎ ভাবে দেশ-বিদেশের একাধিক স্থান হতে প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে যে সব ব্যবসায়িক দলিল-দস্তাবেজ ও তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তা যেমন এই ইশাতিহারে সন্নিবেশিত হয়নি, তেমনি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত স্কুল ম্যাগাজিন, বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা ও প্রচার মূলক ম্যাগাজিন সহ আরও অনেক সাময়িকী যা তথ্য মন্ত্রণালয়ের অজ্ঞাতে ছাপা হয়েছে—তাও এতে স্থান পায়নি। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের পর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হতে চলছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ববর্তী একক ব্যক্তি মালিকানাধীন নিয়ম রহিত করে এ ব্যবস্থা চালু হয়, তা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে খতিয়ে দেখার সময় হয়তো এসে গেছে। একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, সৌদি পত্র-পত্রিকার বেশ বড় রকমের বস্তুগত উন্নতি হয়েছে। কোন একক ব্যক্তির সেবা, অথবা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত আঞ্চলিকতার দোষে দুষ্ট বলে আজ কোন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা যাবেনা। আর্থিক দিক দিয়ে ভিত্তি মজবুত হবার কারণে বহির্বিশ্বেও আজ তারা নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠাতে সক্ষম হচ্ছে, আন্তর্জাতিক কোন কোন সংবাদ সংস্থার শেয়ারও ক্রয় করেছে, নিজস্ব সংবাদদাতা, প্রতিনিধি, চিত্রগ্রাহকসহ দেশের অভ্যন্তরে প্রতিটি বড় বড় শহরে নিজস্ব কার্যালয় স্থাপন করেছে। প্রধান কার্যালয়গুলো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করেছে, যাতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সরাসরি তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে। মুদ্রণ, সুন্দর প্রযোজনা ও চমৎকার

---

৩৬. এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় রজব হি. ১৩৮৬/অক্টোবর খৃ. ১৯৬৬ সনে।

৩৭. প্রথম সংখ্যাটি জিদ্দা থেকে প্রকাশ হি, ১৩৮৬/খৃ. ১৯৬৬ সনে।

৩৮. হি. ১৩৮৬/খৃ. ১৯৬৬ সনে প্রথম প্রকাশ পায় এবং মাত্র চারটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।

৩৯. *আল-আদাব আল-হাদীস, তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২৯-৩২

www.pathagar.com

প্রচ্ছদের প্রতি যত্নবান হয়েছে। অন্য দিকে আগে যেমন ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক লেখালেখির প্রতি বেশি জোর দেয়া হত, এখন তা কাট-ছাঁট করে সপ্তাহে একটি পৃষ্ঠা নির্ধারণ করা হয়েছে। খেলাধুলা, ব্যায়াম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কারের খবর, মহিলাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজগোজ, লেখালেখি, চিকিৎসা সংবাদ প্রভৃতির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সাহিত্য বিষয়ক লেখালেখি পূর্বের তুলনায় কম হলেও আন্তর্জাতিক গল্প-কাহিনীর আরবী অনুবাদ অনেক বেশী হচ্ছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে বিচিত্রমুখী সচিত্র সংবাদ। কোন রকম গোঁড়ামি, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও কাউকে আহত করার চেষ্টা দেখা যায় না। ভাষা অত্যন্ত মার্জিত, পরিশীলিত। কোন মানুষের আবেগ অনুভূতিকে আহত করে না, কারও মান-মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে না। সবচেয়ে বড় কথা আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের যাবতীয় সঙ্কট ও সমস্যার পর্যালোচনা ক্ষেত্রেও নৈতিকতার দিকটি একেবারে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখা যায় না।

অবশ্য এসব সংবাদপত্র ফাউন্ডেশন ও প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্র জগতের এক একটি ডিক্টেটর হয়ে উঠতে পারে। কারণ তাদের কোন প্রতিপক্ষ ও প্রতিযোগী নেই। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার উপাদান এতে বিলুপ্ত হতে পারে। পত্রিকার দায়িত্বশীলগণ এখানে কর্মকর্তা ও কর্মচারী। তাই সাংবাদপত্রকে দিন দিন উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবার আগ্রহ ব্যক্তি মালিকানার চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম হয়। একেকটি পত্রিকা প্রচুর অর্থ লাভ করে থাকে। কারণ নির্ধারিত খাত থেকে নির্ধারিত পরিমাণের অর্থ আসতেই থাকে। যেমন, সরকারি বিজ্ঞাপন প্রতিটি পত্রিকা লাভ করে এবং সেখান থেকে পর্যাপ্ত অর্থ পেয়ে থাকে। তেমনি ভাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী, ব্যবসা, শিল্প ও কলকারখানার মালিকগণ তাঁদের নিজ নিজ প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপনগুলো এখানে দিতে বাধ্য হয় এবং সরকারি-বেসরকারি অফিস, আদালত, প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয় একেকটি পত্রিকার বহু সংখ্যক কপির গ্রাহক হয় এবং বিনিময়ে বিশাল অংকের অর্থ পরিশোধ করে। বিজ্ঞাপন দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। আর অর্থও সেই পরিমাণ আসে। রাষ্ট্র বিনাভাড়ায় বিমানে সংবাদপত্র পরিবহনের সেবা দান করে, বিনাশুল্কে কাগজ সরবরাহ করে। এত কিছু সত্ত্বেও এসব সংবাদপত্রে সত্যিকার দক্ষ ও যোগ্য লোকের অভাব রয়েই গেছে। এটাও সঠিক যে, অনেকে যথেষ্ট শিল্পগত অভিজ্ঞতা অর্জন করে দক্ষ হয়ে উঠেছেন, তথাপি এখনও অনেক দুর্বলতাই রয়ে গেছে। অনেক পত্রিকার প্রযোজনা ও সাজানো আগোছালো রয়ে গেছে। অনেক পত্রিকার বিশৃঙ্খলা ভাব পরিলক্ষিত হয় যা পাঠকদের মোটেই আকৃষ্ট করে না। সব পত্রিকায় একই রকম বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন, খবর, ছবি ও টেণ্ডার। অধিকাংশ পত্রিকা কোন রকম সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বিশ্লেষণ শূন্য। রেডিও-টেলিভিশনে উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও মন্তব্যসমূহ হুবহু উপস্থাপন করা হয়। খবর একই ধরনের একই শব্দে ও বাক্যে। মাঝে মাঝে হয়তো দু একটি শব্দ ও বাক্য পরিবর্তন করা হয়। সাহিত্য বিষয় লেখালেখির প্রতি কিছুটা অবহেলা সাহিত্য ক্ষেত্রে বন্ধুত্বভাব সৃষ্টি করতে পারে। তাই কোনো কোনো সমালোচক বলে থাকেন, এসব ফাউন্ডেশন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সৃষ্টি হয়েছে ব্যবসার জন্য, কোন মিশনের সফলতার জন্য নয়। দোষ-ত্রুটি যতটুকুই থাকুক না কেন সৌদি পত্র-পত্রিকার জন্য দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা সফল প্রমাণিত হয়েছে বলা চলে। এখন তা নিজের শক্তিতে টিকে থাকতে সক্ষম।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল -জুন ২০০৩

الإعجام : نشأته وتطوره

أحمد على*

إن الإعجام من أهم خصائص الخط العربى فإن اللغة العربية من اللغات العالمية التى احتفظت بهذه الخاصية، بينما تركته لغات أخرى كانت لغات متميزة الحروف بعضها من بعض بصورها، لأن إهمال الحروف قد يفضى إلى وقوع أخطاء كبيرة فى تمييز الحروف بعضها من بعض، وإدراك المعنى الصحيح والمراد المنشود من الكتابة، ولا يخفى أن الإعجام لم يظهر فى الخط العربى من أول وهلته ، بل أخذ فى الظهور رويدا رويدا حتى يستوى على سوقه. ها أنا أذكر فيما يلى عن الإعجام ووضعه وتطوره عبر القرون، ومن اللّه التوفيق.

معنى الإعجام واشتقاقه

الإعجام عند علماء الخطوط هو تنقيط الأحرف المتشابهة رسما لتمييزها بعضها من بعض ، مأخوذ من قولهم " أعجمت الكتاب " أى أزلت عجمته[1] ، قال إبن جنى : "أعجمت الكتاب" أى أزلت استعجامه، والهمزة ههنا للسلب كقولهم "أشكيت زيدا" أى أزلت شكايته، منه حروف المعجم، سميت بذلك لان من شأنها أن تُعْجَم، قال إبن الأثير : "حروف المعجم ا - ب - ت - ث سميت بذلك من الإعجام، وهو إزالة العجمة بالنقط، ومنه قولهم "كتاب معجم " إذا أعجمه كاتبه بالنقط سمى معجما لأن شكول النقط فيها عجمة لا بيان لها كالحروف المعجمة لا بيان لها وإن كانت أصولا للكلام كله، و "معجم الخط " هو الذى أعجمه كاتبه بالنقط، قيل : أعجم الكتاب وعجَّمه : نقطه[2]

---

*. الأستاذ المساعد، قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، جامعة شيتاغونغ.

١. العجمة : معناها الإبهام، ومنه قول العرب : "العجمى" أى مبهم الكلام لا يتبين كلامه، وفى حديث عطاء : "سئل عن رجل لهز رجلا فقطع بعض لسانه فعجم كلامه فقال يعرض كلامه على المعجم فما نقص كلامه منها قسمت عليه الدية".

٢. إبن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقى المصرى ، لسان العرب ، نشر ادب الحوزة قم ، إيران ، ١٤٠٥ هـ ج ١٢ ص ٣٨٧ - ٣٨٩ ، الراغب الاصفانى ، أبو القاسم حسين بن محمد ، المفردات فى غريب القران ، دفتر نشر الكتاب ، مصر ١٤٠٤ هـ، ص ٣٢٣ - ٣٢٤.

www.pathagar.com

سبب وضع الإعجام

لا يخفى أن حروف المعجم تسعة وعشرون حرفا قد وضعت أشكالها على تسعة عشر شكلا فمنها ما يشترك فى الصورة الواحدة منه الحرفان كالدال والذال، والراء والزاء، والسين والشين، والصاد والضاد، والطاء والظاء، والعين والغين ، ومنها ما يشترك فى الصورة الواحدة منه الثلاثة كالباء والتاء والثاء، والجيم والحاء والخاء، ومنها ما ينفرد بصورة واحدة كالألف، ومنها ما لايلتبس حالة الإفراد فإذا ركب ووصل بغيره التبس كالنون والقاف فإن النون فى حالة الإفراد منفردة بصورة فإذا ركبت مع غيرها فى أول الكلمة أو وسطها اشتبهت بالياء وما فى معناها، وهكذا القاف إذا كانت منفردة لا تلتبس فإذا وصلت بغيرها أولا أو وسطا التبست بالفاء فاحتيج إلى مميز يميز بعض الحروف من بعض : نقط او إهمال ليزول اللبس، ويذهب الاشتراك فإذا كتبت بغير ذلك المميز صار من الصعب التمييز بين الأحرف المتشابهة، وإدراك المعانى الصحيحة فيجب على القارئ حينيذ الرجوع إلى علمه فى اللغة وسليقته فى الفهم لإدراك المعنى.[٣]

كان العرب يكتبون فى الجاهلية وفى عصرصدرالإسلام كتابة عرية عن الإعجام (الشكل : ١) فإن القران الكريم قد دون فى أول الأمر غير معجم ولا منقوط (الشكل : ٢)، وقد كتب على هذا النحو بأمر من سيدنا عثمان رضى اللّه عنه فى عهد خلافته (٦٤٤ م - ٦٥٦ م)، ومكث الناس على هذا النحو بأن يقرؤا القران نيفا وأربعين سنة لا تصحيف فيها ولا تحريف معتمدين على سليقتهم العربية أو على الرواية أو التلقين؛ ولكن لما انتشر الإسلام، واختلط العرب بالعجم، فسدت الألسنة، وضاعت ملكة الإعراب والقراءة الصحيحة نظرا لأن الدين "الإسلام" دخله أناس ليسوا بعرب، وليست لديهم السليقة العربية السليمة حتى روى أن سيدنا عثمان (رض) قد كتب يوما إلى أهل مصر فى تولية رجل عليهم وقال : "إذا جاء كم فاقبلوه" فقرأ ها الناس "إذا

٣. القلقشندي، أبو العباس أحمد ، صبح الأعشى ، المطبعة الاميرية ، القاهرة ، مصر ١٩١٤ م ج ٣، ص ١٥٣ - ١٥٤.

www.pathagar.com

جاء كم فاقتلوه ". فكانت سببا لفتنة، أودت بحياته وروى : أيضا أن سليمان بن عبد الملك (٧١٥ م – ٧١٧ م) كتب إلى عامل له فى المدينة : "أن أحص المخنثين" فقرأها أخص المخنثين فخصى تسعة منهم، أما فى باب قراءة القران الكريم فإن أعرابيا سمع إماما يقرأ الأية من سورة الأعراف "قال عذابى أصيب به من أشاء " هكذا "أصيب به من أساء ".[٤]

فللتغلب على هذه المشكلة أعجم علماء الخطوط بعض هذه الحروف بوضع نقط فوقها أو تحتها لتمييزها بعضها من بعض، عرف هذا التنقيط بالإعجام، قال محمد بن عمر المدائنى : "ينبغى للكاتب أن يعجم كتابه ويبين إعرابه فانه متى أعراه عن الضبط، وأخلاه عن الشكل و النقط كثر فيه التصحيف، وغلب عليه التحريف " و أخرج بسنده إلى إبن عباس (ض) أنه قال : "لكل شئ نور، ونور الكتاب العجم " و قال أبو مالك الحضرمى : " أى قلم لم تعجم فصوله استعجم محصوله " و من كلام بعضهم : " الخطوط المعجمة كالبرود المعلمة "[٥]

مع أنه وضع ذلك فكان الجمهور فى بداية الأمر يكرهه فى الكتابة وينفر منه إلا إذا تحتمل اللبس لأنه ما وضع إلا لإزالته، وأما مع أمن اللبس فتركه أولى، سيما إذا كان المكتوب إليه أهلا، وقد يقع بالنقط ضرر كما حكى محمد بن عمر المدائنى : " أن جعفرا المتوكل (٨٤٧م – ٨٦١م) كتب إلى بعض عماله أن أحص من قبلك من الذميين، وعرفنا بمبلغ عددهم فوقع على الحاء نقطة فجمع العامل من كان فى عمله منهم، وخصاهم فماتوا غير رجلين أ و واحد "[٦]؛ لكن الناس رجعوا بعد ذلك عن رأيهم حتى كانوا يعدون الإعجام واجبا فى الكتب العادية فضلا عن المصحف، و يعتبرون إهماله خطأ فى الكتابة، واستمر الأمر على اتباع هذا الإعجام إلى الأن .

٤. الرفاعى ، بلال عبد الوهاب ، الخط العربى : تاريخه وحاضره ، دار إبن كثير ، دمشق ، بيروت ١٩٩٠ م، ص ٦١

٥. القلقشندى ، المصدر السابق ، ج ٣، ص ١٥٣.

٦. حاجى خليفة ، مصطفى بن عبد الله القسطنطنى الرومى الحنفى ، كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ، مكتبة المثنى ، بغداد ١٩٤١ م، ج ٢، ص ٧١٣.

www.pathagar.com

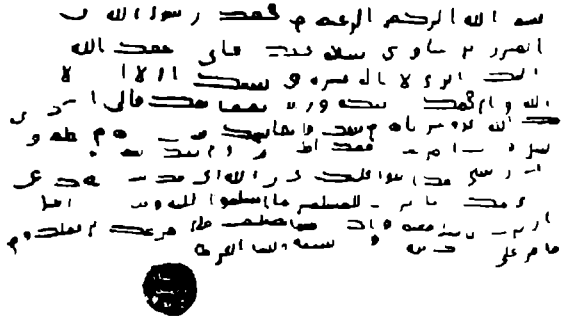

الشكل : ١

رسالة النبى صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى كتب بالخط الكوفى البدائى المبسط بدون أى نوع من الإعجام والشكل -

ونصه :

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك فانى أحمد الله إليك الذى لااله غيره وأشهد ان لا اله إلا الله وأن محمدا عبده و رسوله أما بعد فانى أذكرك الله عز و جل فانه من ينصح فانما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلى و يتبع أمرهم فقد أطاعنى ومن نصح لهم فقد نصح لى وان رسلى قد أثنوا عليك خيرا لله وإنى قد شفعتك فى قومك فاترك للمسلمين ما اسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم وإنك مهما تطع فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على يهودية او مجوسية فعليك الجزية محمد رسول الله.

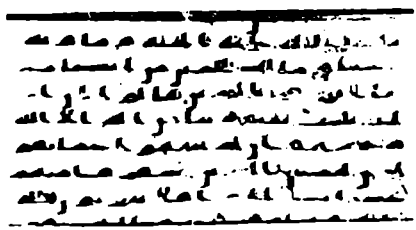

الشكل : ٢

جزء من مخطوط قرانى نادر من القرن الأول الهجرى كتب على الرق بالخط البدائى المبسط بدون اى نوع من الإعجام، استعمل المداد الأسود بدون أى نوع من التلوين او الزخرفة الجمالية.

النص القرانى للمخطوط حسب الأسطر (سورة المائدة : ٧٣ - ٧٤)

حرم الله عليه الجنة ومأ واه جهنم وما للظالمين من أنصار، لقد كفر

www.pathagar.com

الذين قالوا إن الله ثالث ثلثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمس الذين كفروا منهم عذاب اليم -

وضع الاعجام

كان الخط لما اقتبسه العرب من السريان والأنباط خاليا من النقط (الشكل : ٣) و لاتزال الخطوط السريانية بلا نقط الى اليوم[٧] (الشكل : ٤) يرى كثير من العلماء أن الإعجام موضوع مع وضع الحروف، قال ابن عباس : "أول من كتب بالعربية ثلثة رجال من بولان و هى قبيلة سكنوا الأنبار، و إنهم اجتمعوا فوضعوا حروفا مقطعة و موصولة وهم مرار بن مرة، وأسلم بن سدرة، و عامر بن جدرة، ويقال مروة و جدلة - فاما مرامر فوضع الصور، و أما أسلم ففصل و وصل، وأما عامرفوضع الإعجام.[٨]

يفهم من هذا الخبر أن العرب وضعوا الإعجام فى الوقت الذى ابتدعوا خطهم العربى، والظاهر أنه موضوع مع الحروف إذ يبعد أن الحروف مع تشابه صورها كانت عرية عن النقط إلى حين نقط المصحف، وقد روى: "أن الصحابة جردوا المصحف من كل شئ حتى من النقط والشكل؛[٩] " يدل هذا الخبر أن الصحابة يعرفون النقط؛ لكنهم يتحرجون من زيادة شئ على أحرف القران حسب ما وردت فى المصحف العثمانى، ولو لم يوجد فى زمانهم لما يصح التجريد منه، روى عن ابن مسعود (رض) انه قال: "جردوا القران ليربو فيه صغيركم ولا ينأى منه كبيركم "، وقد شرح الزمخشرى ذلك بقوله : "أراد تجريده من النقط والفواتح والعشور لئلا ينشا نشء فيرى أنها من القران"[١٠] فيفهم من هذا الخير أن التنقيط كان معروفا، وأن ابن مسعود (رض) عرفه، وأنه رأى تجريد القران من النقط ليصرف الصغير همه فى فهمه فهما عميقا لأن تجريده.

---

٧. جرجى زيدان ، تاريخ التمدن الإسلامى ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ١٩٦٧ م، ج ٣، ص ٦٢.

٨. إبن النديم ، محمد إبن اسحاق ، الفهرست ، مطبعة الخياط ، بيروت ١٨٧٢ م، ص ٤ - ٥.

٩. طاش كبرى زاده ، أحمد بن مصطفى ، مفتاح السعادة و مصباح السيادة ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد ، دكن ، الهند ١٩٦٨. م، ج ١، ص ٨٦.

١٠. الزمخشرى ، أبو القاسم محمود ، الفائق فى غريب الحديث ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، (د - ت)، ج ١، ص ١٨٩.

www.pathagar.com

يحث القارئ على بذل الجهد فى فهم غامضه ومشكله ومعناه فيرسخ فهمه فى عقله أما إذا كانت الحروف معجمه ومشكلة فلا يجد القارى ما يحثه على بذل الجهد وإجهاد نفسه لفهم القران فتنفر همته عن فهمه ولا يبذل نفسه بذلا مرضيا فى تعلم كتاب الله

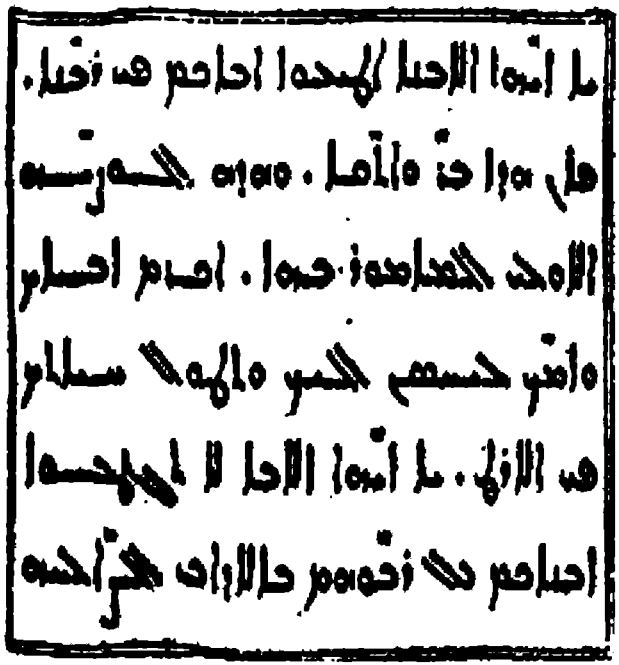

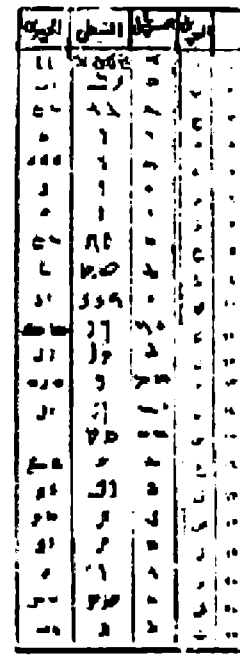

الشكل : ٣ الشكل : ٤ الخط السريا نى (الانجيل)

وقد عثر الدكتور جروهمن على وثيقة من وثائق البردى ، أحد عمال عمرو بن العاص (رض) ، يرجعز عهدها الى سنة ٢٢ هـ، ووجد فيها حروفا منقوطة[١١] وكذلك عثر ما يلس (G. C. Miles) على كتابة قرب الطائف يعود عهدها إلى سنة ٥٨ هـ، ووجد فيها أيضا حروفا منقوطة[١٢] وإن التنقيط فى هاتين الكتابتين تدل على وجود النقط فى ذلك العهد وقبله إذ لا يعقل أنهما أول كتابات استخدم فيها النقط.

١١. الرفاعى ، المصدر السابق ، ص ٦١.

١٢. جواد على ، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ، دار العلم ، بيروت، ١٩٧١ م، ج ٨، ص ١٨٥.

www.pathagar.com

ويرى البعض الآخر أن أول من وضعه أبو الأسود الدؤلى[١٣] ، روى "أن أول من نقط المصاحف، ووضع العربية أبو الأسود الدؤلى من تلقين على (رض)"[١٤]، إن أريد بالنقط فى ذلك الإعجام فيحتمل أن يكون ذلك ابتدا"؛ لوضع الإعجامء لكننا إذا فحصا عن عمل أبى الأسود الدؤلى أن هذا الاحتمال لا يصح؛ بل هو وهم وقعوا فيه من عدم إدراكهم للعمل الذى قام به، (وهو النقط الذى هو الشكل)، فظنوا أنه استعمل النقط فى الحالين : فى النقط الذى هو الشكل، و فى النقط الذى هو الأعجام، وذلك لأنه قد مر آنفا ان الصحابة كانوا يعرفونه قبل كتابة المصاحف.[١٥]

والذى يراه الجمهور أن اختراعها كان فى زمن عبد الملك بن مروان (٦٨٥ م - ٧٠٥ م)، وذلك أنه لما كثر التصحيف، خصوصا فى العراق والتبست القراءة على الناس لتكاثر الأعاجم من القراء، والعربية ليست لغتهم فصعب عليهم التمييز بين الأحرف المتشابهة فانتبه لذلك الحجاج أمير العراق (٦٦٠ م - ٧١٤ م) فى أيام عبد الملك ففزع إلى كتابه، وسألهم أن يضعوا لهذه الأحرف المتشابهة علامات تميزها بعضها من بعض، ودعا نصر بن عاصم الليثى[١٦] ، ويحيى بن يعمر العدوانى[١٧] لذلك الأمر فوضعا النقط أفرادا وأزواجا، وخالف بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق الحروف، وبعضها تحت الحروف، واعتمدا نقط الحروف بنفس لون المداد الذى تكتب به الأحرف لكون النقطة جزءا من أصل الحرف، ليست إضافة حتى لا يختلط بنقط أستاذهما أبى الأسود للشكل الذى كان بمداد يخالف المداد الذى تكتب به الأحرف، وبعد موافقة الحجاج على طريقتهما أمر كتابه فى الإمارة بنسخ المصحف وشكله بمداد أحمر وإعجامه بنفس المداد، وبعد ذلك أبلغ الخليفة عبد الملك بن مروان فاستحسن عمله، وحمل الناس عليه حتى عمت طريقته

---

١٣. أبو الأسود الدؤلى (٦٠٥ - ٦٨٨ م) : هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدولى الكنانى واضع علم النحو ، كان معدودا من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضرى الجواب، من التابعين ، سكن البصرة فى خلافة عمر (رض)؛ وولى إمارتها فى أيام على (رض)، ولم يزل فى الإمارة إلى أن قتل على (رض) (الزركلى ، خير الدين ، الأعلام ، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٠ م، ج ٣، ص ٣٣٦).

١٤. طاش كبرى زاده ، المصدر السابق ج ١، ص ٨٦

١٥. جواد على ، المصدر السابق ، ج ٨، ص ١٨٧

١٦. نصر بن عاصم الليثى (ت : ٧٠٨ م)؛ كان من فقهاء التابعين، أوائل واضعى النحو ، وله كتاب فى العربية، وكان يرى رأى الخوارج، ثم ترك ذلك، وله فى تركه أبيات ، مات بالبصرة (الزركلى ، ج ٨، ص ٢٤).

١٧. يحيى بن يعمر (ت : ٧٤٦ م) : هو أبو سليمان يحيى بن يعمر الوشقى العدوانى ، ولد بالاهواز، وسكن بالبصرة، وكان من علماء التابعين ، عارفا بالحديث والفقه ولغات العرب وكتاب الرسائل الديوانية ، أخذ اللغة عن أبيه، والنحو عن أبى الأسود الدؤلى (الزركلى ج ٨ ص ١٧٧).

www.pathagar.com

المصاحف والكتب جميعا[١٨] ، وقد عثر اليوم على مصاحف كثيرة مكتوبة على رقوق صغيرة وعليها نقوط حمراء للحركات ونقط سوداء للإعجام، (الشكل : ٥ و ٦)

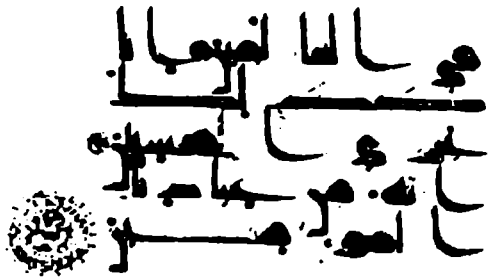

الشكل : ٥

(مخطوط قرانى معجم كتب على الرق فى المدينة المنورة بالخط الكوفى المجود، وأدخلت عليه النحلية الذهبية فى مواقف الآيات، يرجع تاريخه إلى القرن الثانى، جمع التحديث الأول الذى أدخله أبو الأسود الدؤ لى، وهو تنقيط الإعراب النحوى (النقاط الحمراء)، والتحديث الثانى الذى أدخل فى أيام الحجاج الثقفى.)

النص القرانى للمخطوط حسب الأسطر (سورة الصافات : ٧٩ - ٨١)

فى العالمين إنا-كذلك-نَجزى المحسنين-إنه من عبادنا - المؤمنين .

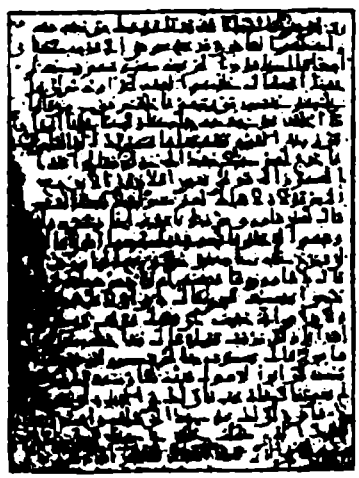

الشكل-٦

(مخطوط قرانى كوفى مسطور مجود معجم كتب فى العراق على الورق البغدادى حسب التحديث الاول والثانى، النقاط الحمراء للدلالة على حركات الأعراب حسب تحديث أبى الاسود الدولى، والنقاط السود للدلالة على إعجام الأحرف كما وضعت فى أيام الحجاج الثقفى يرجع تاريخه الى القرن الثالث الهجرى.)

١٨. عباده ، عبد الفتاح ، انتشار الخط العربى فى العالم الشرقى والغربى ، مطبعة هندية بالموسيكى بمصر ١٩٦٥ م، ص ٢٨.

www.pathagar.com

نرى فى عبارة ابن خلكان شيئا من الالتباس أنه قال : " ..... فيقال إن نصر بن عاصم، وقيل يحيى بن يعمر قام بذلك فوضع النقط أفرادا وأزواجا، وخالف بين أماكنها فعبر الناس بذلك زمانًا لا يكتبون إلا منقوطا فكان مع استعمال النقط أيضا يقع التصحيف فأحدثوا الإعجام فكانوا يتبعون النقط بالإعجام"[١٩] ، لا يفهم ماذا أراد إبن خلكان بقوله، ولا ما الفرق بين التنقيط والإعجام، وهما واحد، ولا يعقل أن يكون المراد بالنقط الحركات، لأنهم إنما عمدوا اليها لكثرة التصحيف أى إختلاف القراءة باختلاف النقط، فالظاهر أن النقط المذكورة هى من قبيل الإعجام لتمييز الحروف المتشابهة؛ ولكن نصرا لم ينقط إلا بضعة حروف مما يكثر وروده، ويخشى الإلتباس فيه، ثم راؤا القراءة لا تضبط إلا بتنقيط كل الحروف كما هى الان، وهذا ما عبروا عنه بالإعجام، وقد عثر اليوم فى معرض الخطوط فى دار الكتب المصرية على كتابة عربية على صحيفة من البردى "البابيروس" يرجع عهد ها إلى سنة ٩١ هـ، وفيها إعجام، لكنه قاصر على الصور المتشابهة للباء للتمييز بين الباء، والياء والتاء وصورة حرف الشين لتمييزه من السين بثلاث نقط موضوعة على استواء واحد.[٢٠]

والذى ثبت عندى بعد الاستقصاء فى البحث عنه أن الإعجام كان قبل كتابة المصحف "الإمام"، وقد جرد منه قصدا كما مضى فيما قبل حتى إذا اتسعت رقعة الدولة، وزاد المسلمون من غير العرب، بدأ التصحيف، وكثر فى قراءة القران فوضع الإعجام عاصم وصاحبه يحيى بأمر الحجاج، ثم تلقته العوام بالقبول حتى انتشر فى الكتابة جميعا، وثبت أيضا أن الحروف لم يعجم كلها فى وقت واحد، بل تطور أمر التنقيطو، تدرج حسب الحاجة، يتضح ذلك لمن يتأمل فى المخطوطات العربية القديمة فان الإعجام لم يبلغ ما هو عليه الان إلا بتوالى الأجيال، وآخر حرف أعجم الياء" لتمييزها من الألف المقصورة، وأول من فعل ذلك المرسلون الأمريكيون فى بيروت فى أوائل القرن الماضى.[٢١]

---

١٩. إبن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ، وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٤٨ م، ج ١، ص ٣٤٤.

٢٠. جرجى زيدان ، المصدر السابق ، ج ٣، ص ٦٢

٢١. جرجى زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، (د. ت)، ج ١، ص ٢٢٤.

www.pathagar.com

صورة الإعجام وكيفية وضعه :

للنقط صورتان : إحدهما : شكل مربع والأخرى : شكل مستدير، وإذا كانت نقطتان على حرف يجوز أن تجعلا واحدة فوق أخرى، أو تجعلا فى سطر معا، وإذا كان بجوار ذلك الحرف حرف ينقط لم يجز أن تكون النقط إلا واحدة فوق أخرى، سبب ذلك أن النقط إذا كانت فى سطر خرجت عن حروفها فوقع اللبس فى الإشكال، فاذا جعل بعضها على بعض كان كل حرف قسطه من النقط فزال الإشكال، وإذا كان على الحرف ثلاث نقط فان كانت ثاء جعلت واحدة فوق إثنتين وإن كانت شينا فبعض الكتاب ينقطه كذلك، وبعضهم ينقطه ثلاث نقط سطرا، وذلك لسعة حرف الشين بخلاف الثاء.[٢٢]

نقص الإعجام ووجه إصلاحه :

قد مر فيما سبق أن رموز الخط العربى تنقسم إلى طوائف تحتوى كل طائفة منها على حروف مرسومة بشكل واحد، ولا يميز بعضها عن بعض إلا بالإعجام والإهمال، وذلك الرسم من أهم عيوب الخط العربى يؤدى الى أضرار كثيرة، أهمها ما يلى :

١ - إن رسم الكلمة العربية يقتضى الكاتب بعد الفراغ من كتابتها أو فى أثنائها أن يضع ما يجب وضعه من نقط فوق معظم حروفها أو تحتها، وفى هذا إسراف فى المجهود، وإكثار فى العمليات التى يقوم بها القلم وفى نوعها.

٢ - إن القلم كثيرا ما يزل فى تدوين هذه النقط فيغفل بعضها ينقص من عددها، أو يزيدها، أو ينحرف بها عن موضعها، وخاصة فى الرسم السريع ، فتصبح الكلمة عرضة لأن تقرأ على وجوه متعددة، ويقع القارئ فى الحيرة، أو يضطر فى تمييز هذه الحروف المتشابهة بعضها من بعض إلى الاعتماد على فراسته وفهمه لسياق الكلام.

٣ - إن كثرة الحروف المنقوطة، وخروج النقط عن هيكل الكلمة ، كل ذلك يجهد القارئ، ويوقع نظره فى الارتباك فيقرأ الكلمة على غير وجهها حتى مع صحة كتابتها ورسم نقطها فى مواضعها، ولاتقاء ذلك تضطر بعض الكتب والمعجمات إلى النص على نوع الحروف التى يخشى فيها اللبس نحو "جمل" بالجيم المعجمة التحتية، و"حمل" بالحاء المهملة" و "بيت "بالباء الموحدة التحتية فالياء المثناة التحتية فالتاء المثناة الفوقية.

---

٢٢. القلقشندى ، المصدر السابق ، ج ٣، ص ١٥٥ - ١٥٦.

www.pathagar.com

قد اهتدى بعض من البحاثة إلى طريقة تخلص الخط من آثار الإعجام الضارة التى أشرنا إليها آنفا، وهى أن تكتب الحروف المتحدة الصورة (ب ت ث ..... الخ) بصور مختلفة يؤخذ بعضها من صورة الحرف منفردا و بعضها من صورته متصلا بغيره، أو يؤخذ بعضها من صورته فى خط الرقعة[٢٣] وبعضها من صورته فى خط النسخ[٢٤]، أو الثلث[٢٥]، وبذلك يتميز الحرف عن غيره بصورته، لا بإعجامه أو إهماله كما هو الحال الأن، ويتخلص الخط العربى من نقص الإعجام ومضراته بدون حاجة الى اختراع أشكال جديدة للحروف تبعد بها عن أشكالها الحالية، وتقطع الصلة بين قديمنا وحديثنا، ويمكن فى هذه الحالة أن يستغنى عن النقط لأن صورة الحرف ستكون كافية فى تمييزه.[٢٦] ينتصر لهذا الاهتداء عدد كبير من الباحثين، على رأسهم الدكتور على عبد الواحد الوافى، قد نشر رأيه فى كتابه "فقه اللغة"، رغم ذلك يفضل الاحتفاظ بالنقط أو بما يحل محلها فى خط الرقعة توثيقا للصلة بين الخطين القديم والحديث.

---

٢٣. الرقعة : هى أحد الأقلام التى يعود الفضل في وضعها إلى الأتراك العثمانيين، سميت بذلك نسبة للرقعة وهى قطعة الورق التى يكتب عليها، ويتميز هذا الخط بقصر حروفه، وسهولة وسرعة كتابته وفى حين أن المطابع قد اتخذت خط النسخ حروفا لها فان خط الرقعة هو الخط الممتمد للكتابة باليد (الرفاعى ، ص ١٠٩ - ١١٠).

٢٤. النسخ : سمى بذلك لأنه الخط الذى اعتاده المؤلفين فى نسخ مؤلفاتهم، وبخاصة لنسخ المصحف الشريف، وهو الخط الذى انتهى إلى عرب الحجاز فى صورته الأخيرة بعد أن تحرر من صورته القديمة قبل عصر النبوة، واستمر خطا معتمدا في دواوين الدولة والمراسلات على امتداد أيام صدر الإسلام، قد طور هذا الخط الوزير ابن مقلة، وأخوه وهذباه، ووضعاه بصورته الكاملة فى بداية القرن الرابع الهجرى فقفز قفزة نوعيه، في عهد الأتابكة في أواسط القرن السادس الهجرى، وحل محل الخط الكوفى فى كتابة القرآن وبشكل نهائى (الرفاعى ، ص ٩٢).

٢٥. الثلث : هو قلم خاص تبلغ مساحة عرضه ثمانية شعرات، قطته محرفة لا متبازه بحركات لا يمكن رسمها إلا بحرف القلم يميل للتقوير أكثر منه للبسط، وقد ذكر المولى زيد الدين شعبان فى ألفيته : انه يروس فيه من الحروف : الألف المفردة والجيم والحاء والخاء والطاء والكاف المجموعة واللام المفردة وعقده من الصاد والطاء والعين وأخواتها والفاء والقاف والميم والهاء والواو واللام الف المحققة كلها مفتحة لا يجوز طمسها بحال من الأحوال (القلقشندى ، ج ٣، ص ٦٢).

٢٦. الوافى ، على عبد الواحد ، فقه اللغة ، دار نهضة مصر ، القاهرة ١٩٧٣ م، ص ٢٦١ و ٢٦٧.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল- জুন ২০০৩

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী-এর

মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো ?

মূললেখক : আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী।
অনুবাদক : অধ্যাপক মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
প্রকাশনায় : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা
পৃষ্ঠা : ৩৫৪, দাম : ১৮০ টাকা

'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো ?' এ গ্রন্থটি বিংশ শতাব্দীর মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রপথিক ও মুসলিম উম্মাহর ঐতিহ্যের রূপকার আল্লামা শায়খ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ) কতৃর্ক আরবী ভাষায় রচিত '*মাযা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন*'-এর বাংলা রূপান্তর। মাত্র ৩০ বছর বয়সে লিখিত এই ইতিহাস গ্রন্থটি আল্লামা আলী মিয়া নদভীর গবেষণার অবিনাশী কীর্তি ও অজানা বিষয়ের শিল্পিত আবিষ্কার।

বিশ্ব জুড়ে পাঠক নন্দিত এই গ্রন্থটি বাংলায় তরজামা করে অধ্যাপক মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী বাংলা ভাষী জনগোষ্ঠীকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন এতে সন্দেহ নেই। এই মেহনতের জন্য আমরা তাঁকে মুবারকবাদ জানাই।

আলোচ্য গ্রন্থটি মূলত ইতিহাস বিষয়ক হলেও সাহিত্যের মানদন্ডে স্বার্থকভাবে উত্তীর্ণ। বিজ্ঞ গ্রন্থকার বিষয়ের অভিনবত্ব, ভাষার নৈপুণ্য ও শিল্প কুশলতার মাধ্যমে গবেষণা গ্রন্থটিকে বাস্তবতার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত সার্বজনীন সাহিত্য কর্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থটির শিরোনাম Islam and the World বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় অনূদিত এ গ্রন্থ সারা দুনিয়ার বিদগ্ধ ও সচেতন জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা এবং মেধা ও মননে আলোড়ন সৃষ্টি করে। খ্যাতি, পাঠকপ্রিয়তা ও বিষয় বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে এই গ্রন্থটি মাওলানা রূমীর 'মসনভী' ইবনে খালদূনের 'মুকাদ্দামা' শেক্সপিয়ারের 'হ্যামলেট' ইবনে জারীরের 'তারিখুল উমাম ওয়াল মুলূক' ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদের India Wins Freedom গ্রন্থের সাথে তুলনীয়। আল্লামা নদভী (র) তাঁর গবেষণালব্ধ গ্রন্থটিতে প্রাক ইসলামী যুগে বিশ্বের সার্বিক অবস্থা ; মুসলমানরা কিভাবে ক্ষমতার বাগডোর হাতে নেয় ; বিশ্ব সভ্যতায় তাঁদের অবদান ; কি ভাবে মুসলিম সত্যতার ঝান্ডাবাহীদের এ দায়িত্ব অযোগ্য মানুষের হাতে পৌঁছল ; মুসলমানরা কি কারণে অধঃপতনের নিম্ন গহবরে পতিত হলো ; এ সবের ধারাবিবরণী ও ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ করেছেন স্বচ্ছন্দ রচনা ভঙ্গিতে।

আল্লামা আলী মিয়া নদভী (র) বলেন, মুসলমানদের পতনকে কেবল স্থানীয় বিপদ বা জাতীয় দুর্ঘটনা হিসেবে দেখলে চলবে না বরং বৈশ্বিক বিপদ্দশা ও মানবতার বিপর্যয় হিসেবে কবূল করতে হবে। অনেক মুসলমান এখনও রয়েছেন যারা মনে করেন দুনিয়াতে তাদের কোন দায়িত্ব ও জিম্মাদারী নেই। গবেষক আলিম মাওলানা মুহউদ্দিন খান বলেন যে, 'মাযা খাসিরাল আলম' প্রকাশিত হওয়ার পর আরব পন্ডিত সমাজ অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন যে, পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার নিকট আত্মসমর্পন শুধু মাত্র আরবদের জন্য আত্মঘাতী হয়নি, গোটা মানব সভ্যতার জন্য মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এই বিপর্যয়ের হাত

www.pathagar.com

থেকে আত্মরক্ষা করতে আমাদিগকে ইসলামের পথেই ফিরে যেতে হবে। (মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, 'আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ) স্মরণে' স্মারক জাতীয় সীরাত কমিটি, ঢাকা, পৃ. ৯)।

'ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানোকে উরূজ ও যাওয়াল কা আসর' এ শিরোনামে উর্দূ ভাষায় এ গ্রন্থটির ১২টি সংস্করণ বেরিয়েছে। এ পর্যন্ত লেখকের অনুমতি নিয়ে ১৪ টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর মন্টগোমারী ওয়াট মুসলমানদের পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে ইউরোপে এ গ্রন্থটির প্রকাশ ও বহুল প্রচার কামনা করেন। মূল আরবী গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন খ্যাতনামা মুফাসসিরে কুরআন, মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রাণপুরুষ সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ)। তাঁর সুচিন্তিত ভূমিকার ফলে আরব বিশ্বে গ্রন্থটির চাহিদা অস্বাভাবিক। এই পর্যন্ত আরব বিশ্বে গ্রন্থটির সত্তরোর্দ্ধ সংস্করণ বেরিয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এটাকে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে নিয়েছে। সাইয়েদ কুতুব এ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবী হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও অতীতের প্রতি তার আস্থা সৃষ্টি করা যাতে তিনি প্রত্যাশা, সাহসিকতা ও উচ্চ সংকল্পের মাধ্যমে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মুকাবেলা করতে পারেন। যে ধর্মে তাঁর বিশ্বাস ও স্বীকৃতি তাঁকে পুনরুজ্জীবিত ও তেজোদ্দীপ্ত করতে হবে কারণ ধর্মের সহজাত সৃজনী ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল নন পূর্ণভাবে। ইসলামের সাথে তাঁর বন্ধন বংশানুক্রমিক এবং ইসলাম ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই তিনি প্রথাগত মুসলমান। তাঁর মধ্যে দ্বীনের আসল উপলব্ধি অর্জনের জন্য আন্তরিক প্রয়াস কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়।

এ বিষয়ের উপর আধুনিক ও প্রাচীন যত গ্রন্থ ইসলামকে উপলব্ধি করার জন্য আমি অধ্যয়ন করেছি, তার মধ্যে 'মাযা খাসিরাল আলম বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন'-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব কারণে ধর্মীয় ও সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে শুধু নয় বরং ইসলামের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস কিভাবে রচনা করতে হয় এবং বিশ্লেষণ করতে হয় এ গ্রন্থটি তাঁর উজ্জল দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ বিশ্বের ইতিহাস রচনা করেছেন তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। জাতীয় ও ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব এবং তাঁদের দার্শনিক চেতনার নিয়ন্ত্রণ থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসতে পারেননি।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ইতিহাস তৈরী রীতি নকল না করে এবং তাঁদের গবেষণা পদ্ধতি উপেক্ষা করে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নথিবদ্ধ করার জন্য কিভাবে কলম ধরতে হয় ; কিভাবে প্রাপ্ত তথ্যের অনুক্রমিক আলোচনা করতে হয়, আল্লামা নদভী মুসলমানদের দেখিয়ে দিয়েছেন। সাধারণত পাশ্চেত্যের গবেষক ও ইতিহাসবিদদের রচনার মধ্যে ভারসাম্য, ঐতিহাসিক সত্যপরায়ণতা এবং পর্যাপ্ত পাণ্ডিত্য ও গবেষণার ঘাটতি থাকে। (Sayyid Qutub, Foreword, *Islam and the World*, (AIRP) Lucknow, 1969. p. 1-7)।

বিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁর মূল্যবান গ্রন্থটিতে সর্বমোট আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদে রয়েছে তথ্যনির্ভর ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এগুলো হচ্ছে ঃ (ক) বিশ্বনবী (সা)-এর আগমনপূর্ব অবস্থা, (খ) বিশ্বনবী (সা)-এর আবির্ভাবের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতি, (গ) মুসলমানদের নেতৃত্বের ও গৌরবের যুগ, (ঘ) মুসলমানদের পতন, (ঙ) বৈশ্বিক পর্যায়ে পাশ্চাত্যের উত্থান ও তার প্রভাব, (চ) পাশ্চাত্য আধিপত্যে মানব জাতির বাস্তব ক্ষতি, (ছ) কর্মক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ, (জ) আরব বিশ্বের নেতৃত্ব।

পাঠক এ গ্রন্থ অধ্যয়নে পাশ্চাত্য সভ্যতার সামাজিক গন্তব্য সম্পর্কে খোরাক পাবেন। তিনি দিব্য চোখে প্রত্যক্ষ করবেন যে, নেতৃত্ব মুসলমানদের হাত থেকে পাশ্চাত্যে স্থানান্তরিত হওয়ার পর কি নিষ্ঠুর দুর্বিপাক মানব জাতিকে তছনছ করে দিয়েছে। পাশ্চাত্য জনগোষ্ঠির প্রবৃত্তি হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে বস্তুবাদী

www.pathagar.com

এবং তারা যে জীবন কাঠামো গড়ে তুলেছে তা মানবিক চেতনা ও মননের সাথে সাংঘর্ষিত। এই গ্রন্থের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়কে 'মাযা খাসিরাল আলম' গ্রন্থের প্রাণ বললে অত্যুক্তি হবে না। বিজ্ঞান প্রযুক্তির অঙ্গনে বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও পাশ্চাত্য সভ্যতা কিভাবে মানব জাতিকে একাকীত্ব, ভীতি, লোলুপতা ও আধ্যাত্মিক হতাশার উর্বর ভূমিতে ঠেলে দিয়েছে বিজ্ঞ গ্রন্থকার তার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি সাহসের সাথে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ঈমান ও ইসলামী জীবনধারার ভিত্তি স্থাপন ও মানবতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের আচরণ যদি বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের সাথে মানানসই না হয় তাহলে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অর্থহীন। আলোচ্য গ্রন্থটি ইতিহাসের উপর ইসলামের প্রভাব, মানবতার অগ্রগতি ও অধোগতি এর ভূমিকা এবং মুসলমানদের পতনে মানবতার বিপর্যয়ের নিরপেক্ষ সমীক্ষা। এই গ্রন্থটি ইংরেজী অনুবাদক ড. মুহাম্মদ আসীফ কিদওয়াই 'অনুবাদকের কথা' শিরোনামে মন্তব্য করেন যে, গ্রন্থকারের প্রধান উচ্চাকাঙ্খা হচ্ছে মানবীয় অগ্রগতির ইতিহাসে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার মমার্থ উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের নাড়া দেয়া এবং তাদের মধ্যে গভীর অনুসন্ধানের ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত করা যাতে তাঁরা নিজেরা উপলব্ধি করতে পারেন যে বিশ্বের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব ও মিশন সম্পর্কে তাঁরা কতটুকু সচেতন। (Dr. Asif Kidwai. Translator's note, *Islam and the world*, Lucknow, 1974, p. 8).

ইসলাম সেকেলে হওয়ায় তার কার্যকারিতা হারিয়েছে এবং আধুনিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে কোন স্পষ্ট নির্দেশনা দিতে ইসলাম ব্যর্থ ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতদের এ অভিযোগ তিনি জোরালো ভাবে খণ্ডন করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। লেখক বলেন : 'ইসলাম এক শাশ্বত বাস্তবতা এবং জীবনধর্মী এমন কর্মসূচী যা কখনো অপ্রচলিত ও নিষ্প্রাণ হতে পারে না'। চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ গ্রন্থ মানবতার অগ্রগতি তথা জাগতিক ও আত্মিক কল্যাণে ইসলামী সভ্যতার প্রভাব, উদ্দেশ্য, শ্রেষ্ঠতর সুযোগ নিয়ে নতুন সমীক্ষা চালিয়েছে। কালজয়ী এই গ্রন্থের ছত্রেছত্রে আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভীর (রহ) পাণ্ডিত্য ও সৃজনশীল মেধার অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য বিশ্বের খ্যাতনামা পণ্ডিত, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডল ইস্ট সেকশনের চেয়ারম্যান ড. বাকিংহাম এই গ্রন্থের মূল্যায়ন করে বলেন, "এই শতাব্দীতে মুসলিম রেনেসাঁর জন্য যত উন্নততর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এই গ্রন্থ তাঁর শ্রেষ্ঠ ও ঐতিহাসিক দলীল"। (তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত, প্রাগুক্ত, পরিশিষ্ট)

অনুবাদ মূলত কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার। উভয় ভাষার বাকরীতি, সূক্ষ্মশৈলী ও শব্দ ভাণ্ডারের উপর সমান পারঙ্গমতা না থাকলে অনূদিত বিষয় সরস ও গতিময়তা লাভ করতে পারেনা। বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার আমেজের ছোঁয়ায় অধ্যাপক মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত এই গ্রন্থে উপস্থাপনা ও বর্ণনার যে নান্দনিক মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তাতে চমৎকৃত না হয়ে পারা যায়না।

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর (রহ) পরিশীলিত চিন্তা, সূক্ষ্ম চেতনা, কালোত্তীর্ণ ভাবাদর্শ ও অনুপম ভাষা চাতুর্যের সাথে বিজ্ঞ অনুবাদক বহু আগে থেকেই পরিচিত ও সম্পৃক্ত। মূল গ্রন্থকারের সাথে রয়েছে অনুবাদকের রূহানী সম্পর্ক। ইতোমধ্যে তিনি আল্লামা আলী মিয়া নদভী বিরচিত অনেক গ্রন্থ বিশেষত 'নবীয়ে রহমত' 'তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত' 'জব ঈমান কি বাহার আঈ' 'সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ' প্রভৃতি গ্রন্থ বোধগম্য ও সাবলীল বাংলায় তরজামা করে রীতিমত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিজ্ঞ অনুবাদক অপরূপ আঙ্গিকে মনের মাধুরী মিশিয়ে অনুবাদ কর্ম সম্পাদনের ফলে ৩৫৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত অনূদিত গ্রন্থটি হয়েছে সুখপাঠ্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রূপসৌকর্যে পরিপুষ্ট।

যে কোন নিবন্ধ, গ্রন্থ ও বিষয়ের নামকরণ একটি শৈল্পিক প্রকরণ। নামের আড়ালে লুকিয়ে থাকে বক্তব্যের আভাস, ঘটনা ও বর্ণনার ইংগিত। বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণ যৌক্তিক, সঙ্গত ও শিল্পধন্য। আল্লামা আলী মিয়া নদভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর গভীরতা সদৃশ্য। গ্রন্থকার প্রদত্ত মূল শিরোনামের যথার্থ ও হুবহু বাংলা অনুবাদ করেছেন

www.pathagar.com

বিজ্ঞ অনুবাদক। উর্দূ ও ইংরেজি ভাষায় এই গন্থের শিরোনাম দেয়া হয়েছে যথাক্রমে 'ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানোকে উরূজ ও যাওয়াল কা আসর' (মানব জাতির উপর মুসলামনদের উত্থান পতনের প্রভাব) ও Islam and the world (ইসলাম ও বিশ্ব) গতানুগতিক এই শিরোনাম দু'টিতে আল্লামা নদভীর দেয়া শিরোনামের প্রতিফলন ঘটেনি। 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো ? এই শিরোনামে 'মাযা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন'-এর আবেদন ও বৈচিত্র্য রক্ষিত হয়েছে পুরোপুরি ।

অনূদিত গ্রন্থটির মুদ্রণ সন্তোষজনক, বাঁধাই যুৎসই, প্রচ্ছদ মার্জিত ও মনোত্তীর্ণ। তবে মলাটের মাঝখানে ইসলামী বিশ্বের মানচিত্রটি কালার সেপারেশনের ত্রুটির কারণে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেনি। মূল গ্রন্থের পরিশিষ্টে নির্ঘন্ট থাকলেও অনূদিত গ্রন্থে তা নেই ; এই ঘাটতি চোখে পড়ার মত। এ সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার বাজারে হাজারো গ্রন্থের ভীড়ে আলোচ্য শিরোনামের গ্রন্থটি পাঠকের দৃষ্টি কাড়বে- এই কথা জোর দিয়ে বলা যায়। তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ এ গ্রন্থটির বহুল ও ব্যাপক প্রচার কামনা করছি আল্লাহর দরবারে।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ওমর গণি এম. ই. এস কলেজ
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৪২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল- জুন ২০০৩

পাঠকের মতামত

'আরবী সাহিত্যে ইবনুল মুকাফ্ফা' শীর্ষক প্রকাশিত প্রবন্ধের অসম্পূর্ণ তথ্যসূত্র প্রসঙ্গ

'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'-র ৪২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় (জানুয়ারী-মার্চ'০৩) মোঃ জয়নুল আবেদীন বিরচিত 'আরবী সাহিত্যে ইবনুল মুকাফ্ফা' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে বেশ কিছু অসম্পূর্ণ তথ্যসূত্র আমাদের নজরে এসেছে। যেমন—

১. ৪ নং টীকায় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলেও প্রকাশকের নাম ও প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়নি।

২. ৫৫ নং টীকায় 'সাহিত্য পত্রিকা' থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হলেও সংখ্যা, প্রকাশক ও প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়নি। টীকা ৩, ১০, ১৩ ও ১৫-তে 'পূর্বোক্ত' বলা হলেও পূর্বে সে সম্পর্কিত তথ্যসূত্রের উল্লেখ নাই। এছাড়া একই প্রবন্ধে ৫/৬টি মুদ্রণজনিত বানান বিভ্রাটও লক্ষ্য করা গেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা সুধিমহলে যথেষ্ট খ্যাতি ও গবেষণা জার্নাল হিসেবেও অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রয়েছে। এরূপ অসম্পূর্ণ তথ্যসূত্র ও মুদ্রণজনিত বানান বিভ্রাট পত্রিকার মান ক্ষুন্ন করবে। সুতরাং এ বিষয়ে সম্মানিত গবেষক ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নুরুল ইসলাম, সাং-বড় বনগ্রাম (ভাঁড়ালী পাড়া), পোঃ সপুরা, রাজশাহী

প্রবন্ধিকের বক্তব্য

সম্মানিত পাঠকের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে ৩, ৪, ১০, ১৩, ১৫ ও ৫৫ নং তথ্য সূত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

৩. ড. ফকতুর আল-কাক, *ইব্ন আল-মুকাফ্ফা আদীর আল-আক্‌ল*, (বৈরুত ঃ দার আল-কুত্তাব আল-লুবনানী, ১৯৭৩ খ্রি.) পৃ. ৫ ; হান্না আল-ফাখুরী, *তারীখু আদব আল-আরবী* (বৈরুত : মাকতাবা আল-বুলসিয়্যাহ, তা. বি.) পৃ. ৪৩৭ ; বুতরুস আল্-বুসতানী, *দায়িরাতু আল-মা'আরিফ* (বৈরুত : মাতবা'আতু আল-মা'আরিফ, ১৮৭৭ খ্রি.) পৃ. ৫২১।

৪. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮) পৃ. ৩৪৬ ; ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখ আল-আদব আল আরবী*, ৩য় খণ্ড, আব্বাসী ১ম যুগ, (মিশর ঃ দার আল-মা'আরিফ, নবম সংস্করণ, ১৯৭২), পৃ. ৫০৭ ; ড. ওমর ফররুখ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।

১০. অনেকেই ইবন আল-মুকাফ্ফার নিহত হওয়ার সন হিজরী ১৪২ বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফ্য়াত আল-আ'য়্যান*, ১ম খণ্ড, (মিশর ঃ মাকতাবা আল- নাহ্দা, ১ম সংস্করণ ১৯৪৮ খ্রি.) পৃ. ৪১৬ ; ইবন আল-মুকাফ্ফা, *আল-আদব আল-কাবীর*-এর ভূমিকাংশ (মিশর : মাকতাবা মুহাম্মদ আলী, ১৯৬০) পৃ. ৭ ; কার্ল-ব্রুকেলম্যান, *তারীখ আল-আদব আল-আরবী*, ৩য় খণ্ড, ড. আবদুল হালীম আন্-নাজ্জার কর্তৃক অনূদিত (মিশর : দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬২) পৃ. ৯৩।

১৩. আহমদ হাসান যায়্যাত, *তারীখ, আল-আদব আল-আরবী*, মিশর : দার আল-নাহ্দা, ২৮তম সংস্করণ, ১৯৬১) পৃ. ৩৯৩।

www.pathagar.com

১৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৭ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫২ ; জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাহ্ আল আরাবিয়্যাহ্*, ২য় খণ্ড, (মিশর : দার আল-হিলাল ১৯৪৮), পৃ. ১৫২ ; আল সাইয়েদ আহমদ আল-হাশিমী, *জাওয়াহির আল আদব*, ২য় খণ্ড, (মিশর : মাকতাবা আল-তিজারিয়্যাহ্ আল-কুবরা, ২১তম সংস্করণ, ১৯৬৪ খ্রি.) পৃ. ১৭৩।

৫৫. শাওকী দায়ফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৬ ; আল-নাসর আল-আব্বাসী, সাহিত্য পত্রিকা, ২য় অধ্যায় (সউদী আরব : ভাষা অনুষদ, আরবী ভাষা বিভাগ, মালেক সউদ বিশ্বাবিদ্যালয়, ১৯৯২ খ্রি.) পৃ. ৭৩-৭৪।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার সম্পাদকের নিকট যে প্রবন্ধটি জমা দিয়েছিলাম, তাতে সম্পূর্ণ তথ্যসূত্র দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সম্পাদনাকালে কর্তৃকপক্ষ তা থেকে বেশ কিছু অংশ বাদ দেয়ার ফলে উপরোক্ত তথ্য বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে।

মোঃ জয়নুল আবেদীন, প্রাবন্ধিক, পি-এইচ. ডি, গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'প্রিন্সিপাল এ. এ. রেজাউল করীম চৌধুরী ঃ বহুমাত্রিক মনীষার এক পার্শ্বচিত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে সাল বর্ণনায় ত্রুটি প্রসঙ্গে

'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' অবশ্যই একটি গবেষণা মূলক তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ প্রামাণিক ত্রৈমাসিক, বিদ্বান ব্যক্তিদের লেখা দিয়ে সাজানো এই পত্রিকা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। পত্রিকার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কম্পোজ ও ছাপায় সতর্ক দৃষ্টি দেয়া উচিত। বিশেষভাবে কোন মনীষীর জীবনী আলোচনায় তারিখ ও সাল বর্ণনায়। গত জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৩ সংখ্যায় জনাব আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন লিখিত প্রবন্ধে প্রিন্সিপাল এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরীর জন্ম তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। অপরদিকে বলা হয়েছে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ হতে বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। যা একজন পাঠককে সহজেই সমস্যায় ফেলবে। পরে অবশ্য শিরোনাম দেখে বুঝতে পারলাম যে ১৯৬২-এর স্থলে ১৯২৬ হবে। বিষয়টির প্রতি নেক দৃষ্টি কাম্য।

আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা, মুদার্‌রীস, জামে'আ রহমানিয়া, শিরোইল কলোনী, রাজশাহী-৬১০০

www.pathagar.com

ইসলামী চিন্তাধারায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় গ্রন্থ

১. Scientific Indications in the Holy Quran -By Board of Editors.
২. Muslim Contribution to Science and Technology -By Board
৩. Islam in Bangladesh Through Ages -By Board of Editors.
৪. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (৩য় খণ্ড) -সম্পাদনা পরিষদ
৫. ফাতাওয়া ও মাসাইল (৬ষ্ঠ খণ্ড) -সম্পাদনা পরিষদ
৬. আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড) -সম্পাদনা পরিষদ
৭. আরবী প্রবাদ সাহিত্য-ডঃ আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
৮. তাফসীরুল কুরআনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী
৯. আল-আমসালুল কুরআন আল কারীম (আরবী)-আবদুল্লাহ্ আল মারুফ
১০. ইমাম তাহাভী (র) : জীবন ও কর্ম -ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ্
১১. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
১২. উলূমুল হাদীস -মাওলানা মুশতাক আহমদ
১৩. আল্লামা জারীর তাবারী : ইতিহাস চর্চায় তাঁর অবদান-ড. আজিজুল হক
১৪. হাদীস বিজ্ঞান -শামীম আরা চৌধুরী
১৫. ড. গোলাম মকসুদ হিলালী ঃ জীবন ও কর্ম -ড. আবু ইউনুছ খান মোঃ জাহাঙ্গীর
১৬. ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা -ড. এম. মুস্তাফিজুর রহমান
১৭. সিলেটে ইসলাম-অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
১৮. কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম-শ. ম. শওকত আলী
১৯. কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীদের মনোভাব-মাওলানা আবদুল জলিল
২০. ঈমান তত্ত্ব ও দর্শন-লেখকমণ্ডলী
২১. স্রষ্টা ও ইসলাম-লেখকমণ্ডলী
২২. মুসলিম মনীষা-লেখকমণ্ডলী
২৩. আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম-লেখকমণ্ডলী

www.pathagar.com

www.pathagar.com